রচনাবলি

[দশম খণ্ড]

সৈয়দ মুজতবা আলী

আলোকিত মানুষ চাই

রচনাবলি

সৈয়দ মুজতবা আলী

দশম খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৬৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রথম সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৩ এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওয়াসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0467-X

SYED MUJTABA ALI RACHONABOLI (Vol. 10)
Collected works of Syed Mujtaba Ali
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh
Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com
Price : Tk. 375.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

চাচা কাহিনী

স্বয়ংবরা ১১
কর্নেল ২৪
মা-জননী ৩৬
তীর্থহীনা ৪৪
বেলতলাতে দু-দুবার ৫৪
কাফে-দে-জেনি ৬৭
বিধবা-বিবাহ ৭১
রাক্ষসী ৭৮
পাদটীকা ৮৫
পুনশ্চ ৯২
বেঁচে থাকো সর্দিকাশি ৯৯

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ১১১

অপ্রকাশিত রচনা

প্রবাসীর চিঠি ১৪৭
ক্রিকেট ১৫২
উচ্ছে ভাজা সন্দেশ ১৫৩
ক্লাইন এর্না ১৫৪
বিদেশি ভাষা— ক্লাইন এর্না ১৫৫
ক্লাইন এর্না ১৫৬
গুরুদেব ১৫৭
রবির বিশ্বরূপ ১৬৩
ইউরোপ ও রবীন্দ্রনাথ ১৬৬
কবিগুরু গুরুদেব ১৬৮
মোল্লা ফয়েজ ১৭২

www.pathagar.com

বড়লাটি লাঠি ১৭৬
যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি ১৮২
যোগাযোগ ১৮৮
'বাংলা-একাডেমী পত্রিকা' ১৯১
রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ ১৯৬
বৈদেশিকী ১৯৯
আফগানি দাবি ২০০
সুদিনে দুর্দিনে জর্মনি ২০৫
অ্যানড্রুজ সাহেব ২০৯
যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী ২১১
ভাষার হাটে বেইমানি ২১৪
ধৈর্যং কুরু! পুনঃ গচ্ছং ঢাকায়ে ২১৬
ঈদ-আনন্দোৎসব ২১৯
ভাষা— বাঙলা ২২২

দিনলিপি ২২৫
পত্রাবলি ২৭৫
পাঠকের নিবেদন ৩০৯

www.pathagar.com

সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ১৯৭৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চাচা কাহিনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বয়ংবরা

বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন্-ডাম্ যেখানে উলান্ড-স্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে সেখান থেকে উলান্ড-স্ট্রাসে উজিয়ে দু-তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই 'Hindusthan Haus' অর্থাৎ 'Hindusthan House' অর্থাৎ 'ভারতীয় ভবন'। আসলে রেস্তোরাঁ, দা-ঠাকুরের হোটেল বললেই ঠিক হয়। জর্মনি শুয়ারের দেশ, অর্থাৎ জর্মনির প্রধান খাদ্য শূকর-মাংস; হিন্দুস্তান হাউসে সে মাংসের প্রবেশ নিষেধ। সেই যে তার প্রধান গুণ তা নয়, তার আসল গুণ, সেখানে ভাত ডাল মাছ তরকারি মিষ্টি খেতে পাওয়া যায় আর যেদিন ঢাকার ফণি গুপ্ত বা চাটগাঁর আবদুল্লা মিয়া রসুইয়ের ভার নিতেন সেদিন আমাদের পোয়াবারো, কিন্তু উলান্ড-স্ট্রাসেতে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। জর্মনিতে লাল লঙ্কার রেওয়াজ নেই ('পাপ্রিকা' নামক যে লাল আবির লঙ্কার পদ পেতে চায় তার স্বাদ আবিরেরই মতো), কাজেই হিন্দুস্থান হৌসে লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে তার চতুর্দিকে সিকি মাইল জুড়ে হাঁচি-কাশি ঘণ্টাখানেক ধরে চলত। পাড়াপড়শিরা নাকি দু-চারবার পুলিশে খবর দিয়েছিল কিন্তু জর্মন পুলিশ তদারক-তদন্ত করতে হলে খবর দিয়ে আসত বলে আমরা সেদিনকার মতো লঙ্কার হাঁড়িটা 'ডয়েটশে ব্যাঙ্কে' জমা দিয়ে আসতুম। শুনেছি শেষটায় নাকি প্রতিবেশীদের কেউ কেউ লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক্ পরত। জর্মনি বৈজ্ঞানিক দেশ।

ঢুকেই রেস্তোরাঁ। গোটা আষ্টেক ছোট ছোট টেবিল। এক-একটা টেবিলে চারজন লোক খেতে পারে। একপাশে লম্বা কাউন্টার, তার পিছনে হয় ফণি নয় আবদুল্লা লটর্‌চটর্ করত, অর্থাৎ অচেনা খদ্দের ঢুকলে তার সামনে ব্যস্ত-সমস্ততার ভান করত। কাউন্টারের পাশ দিয়ে ঢুকে পিছনে রান্নাঘর। রেস্তোরাঁর যেদিকে কাউন্টার তার আড়াআড়ি ঘরের অন্য কোণে কয়েকখানা আরাম কেদারা আর চৌকি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ কুণ্ডলীর চক্রবর্তী চাচা, উজির-নাজির গুটি ছয় বাঙালি।

অবাঙালিরা আমাদের আড্ডায় সাধারণত যোগ দিত না। তার জন্য দায়ী চাচা। তিনি কথা বলতেন বাঙলায়, আর অবাঙালি থাকলে জর্মনে। এবং সে এমনি তুখোড় জর্মন যে তার রস উপভোগ করবার মতো ক্ষমতা খুব কম ভারতীয়েরই ছিল। ফলে অবাঙালিরা দু দিনের ভিতরই ছিটকে পড়ত। বাঙালিরা জানত যে তারা খসে পড়লেই চাচা ফের বাঙলায় ফিরে আসবেন; তাই তারা তাঁর কট্‌মটে জর্মন দু দণ্ডের মতো বরদাস্ত করে নিত।

জব্বরপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালি শ্রীধর মুখুয্যে তাই নিয়ে একদিন ফরিয়াদ করে বলেছেন, 'বাঙালি বড্ড বেশি প্রাদেশিক। আর পাঁচজন ভারতবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে তারা ভারতীয় নেশন গড়ে তুলতে চায় না।'

www.pathagar.com

চাচা বলেছিলেন, 'প্রাদেশিক নয়, বাঙালি বড্ড বেশি নেশনাল। বাঙলাদেশ প্রদেশ নয়, বাঙলাদেশ দেশ। ভারতবর্ষের আর সব প্রদেশ সত্যকার প্রদেশ। তাদের এক-একজনের আয়তন, লোকসংখ্যা, সংস্কৃতি এত কম যে পাঁচটা প্রদেশের সঙ্গে জড়াজড়ি করে তারা যদি 'ইন্ডিয়ান নেশন, ইন্ডিয়ান নেশন' বলে চেল্লাচেল্লি না করে তবে দুনিয়ার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারে না। এই বার্লিন শহরেই দেখ, আমরা জন চল্লিশ ভারতীয় এখানে আছি। তার অর্ধেকের বেশি বাঙালি। মারাঠি, গুজরাতি কটা এক হাতের এক আঙুল, জোর দু আঙুলে গোনা যায়। ত্রিশটা লোক যদি বিদেশের কোনও জায়গায় বসবাস করে তবে অন্তত তার পাঁচটা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আড্ডা দেবে না? মারাঠি, গুজরাতিরা আড্ডা দেবার জন্য লোক পাবে কোথায়?'

আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'লোক বেশি হলেও তারা আর যা করে করুক আড্ডা দিতে পারত না। আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি-বাড়ি, টঙ্গি-ঘর, বৈঠকখানা— এককথায় জমিদারি প্রথা।'

চাচা জিগ্যেস করলেন, 'তাই বুঝি তুই কলেজ পালিয়ে আড্ডা মারিস?' তোদের জমিদারির সদর-খাজনা কত রে?'

সরকার বলল, 'কানাকড়িও না। জমিদারি গেছে, আড্ডাটি বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার ঠাকুরদাকে এক সায়েব আদালতে জিগ্যেস করেছিল তাঁর ব্যবসা কী? বুড়ো বলেছিল "সেলিং"।'

মুখুয্যে জিগ্যেস করল, 'তার মানে?'

'তার মানে তিনি জমিদারি বিক্রি করে জীবনটা কাটিয়েছেন। তাই বাবাকে কোনও সদর-খাজনা দিতে হয়নি।'

হিন্দুস্থান হৌসে মদ বিক্রি হত না। কিন্তু বিয়ার বারণ ছিল না। সূর্য রায় বেশিরভাগ সময়ই বিয়ারে গলা ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তেন। চাচার পরেই জ্ঞানগম্যিতে তাঁর প্রাধান্য আড্ডায় ছিল বেশি। চাচার জর্মনজ্ঞান ছিল পাণ্ডিত্যের জ্ঞান, আর রায়ের জ্ঞান ছিল বহুমুখী। বার্লিনের মতো শহরের বুকের উপর বসে তিনি কাগজে জর্মন কলাম লিখে পয়সা কামাতেন; ফোনে কথা শুনে শব্দতাত্ত্বিক হের মেনজেরাট্ পর্যন্ত ধরতে পারেননি যে, জর্মন রায়ের মাতৃভাষা নয়।

চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, 'হক কথা কয়েছ সরকার। সবই বিক্রি, সব বেচে ফেলতে হয়। খাই তো দু-ফোঁটা বিয়ার কিন্তু বিক্রি করে দিতে হয়েছে বেবাক লিভারখানা।'

আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া ছিল গোলাম মৌলা। রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে'। সে সবসময় ভয়ে ভয়ে মরত পাছে রায় বিয়ারে বানচাল হয়ে যান। চুপে চুপে বলল, 'মামা, বাড়ি চলুন।'

রায় চোখ মেললেন। একদম সাদা। বললেন, 'তুই বুঝি ভয় পেয়েছিস আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি। ইষ্ বিন্ ইন্ মাইনেম্ নরমালেন্‌ৎসুস্টান্ট, ডাস্ হাইস্ট, আইন বিস্‌শেন্ ব্লাউ। আমি আমার সাধারণ (নর্মাল) অবস্থায় আছি অর্থাৎ ঈষৎ নীল।' তার মানে মনে একটু রঙ লেগেছে, এবং ওই রঙ লাগানো অবস্থাই ছিল তাঁর নর্মাল অবস্থা। মদ্যসংক্রান্ত বিষয় রায় কখনও বাংলায় বলতেন না। তাঁর মতে বাংলায় তার কোনও পরিভাষা নেই। 'পান্তা ভাতে

www.pathagar.com

কাঁচা লঙ্কা চটকে এক সানকে গিলে এলুম' যেমন জর্মনে বলা যায় না, তেমনি মদ্যসংক্রান্ত ব্লাও (নীল), বেসফেন্ (টৈ-টম্বুর), ফল্ (সম্পূর্ণ), বেত্রুঙ্কেন (ডুবে-মরা) কথার বাংলা করলেও বাংলা হয় না।

চাচা জিগ্যেস করলেন, 'তোমার এবনরমাল অবস্থাটা দেখবার বাসনা আমার মাঝে মাঝে হয়।'

রায় আঁৎকে উঠে বললেন, 'ষাট্, ষাট্। আমি মরব, আপনিও মরবেন। গেল সাত বছরে একদিন এক-ঘণ্টার তরে বিয়ার না খেয়ে আমি এবনরমাল অবস্থায় ছিলুম। গিয়েছিলুম ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে— ঈদের পরবে।* মদ খেয়ে মসজিদে যাওয়ার সাহস ওমর খাইয়ামেরই ছিল না, আমি তো নস্যি। বলে ওস্তাদরা যে-রকম মিয়া (তানসেন) কী তোড়ি গাইবার সময় কানে হাত ছোঁয়ান সেইরকম কানমলা খেয়ে নিলেন। বললেন,

'ফল? ফেরার পথে মিস জমিতফকে বিয়ের কথা দিয়ে ফেলেছি। এবনরমাল—'

কিন্তু তার পর রায় কী বলেছিলেন, সেকথা শোনে কে? রায়ের পক্ষে খুন করা অসম্ভব নয়, অবস্থাভেদে গাঁটও হয়তো তিনি কাটতে পারেন কিন্তু তিনি যে একদিন বিয়ের ফাঁদে পা দেবেন এত বড় অসম্ভব অবস্থার কল্পনা আমরা কোনওদিন করতে পারিনি। স্বয়ং হিন্ডেনবুর্গ যদি তখন গোঁফ কামিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে উপস্থিত হতেন তা হলেও আমরা এতদূর আশ্চর্য হতুম না।

রায় তখন লড়াইয়ে-জেতা বীরের গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, 'দেখতে চান আমার এবনরমাল অবস্থা আরও দু-চারবার? সরকারি লাইব্রেরি পোড়ানো, আইনস্টাইনকে খুন, কিছুই বাদ যাবে না। তবু যদি—'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায় সাহেব।'

আমরা তখন সবাই কলরব করে রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেউ বলছে, 'এমন সুন্দরী সহজে জোটে না', কেউ বলছে, 'ম্যাথম্যাটিক্স্ যা জানে', কেউ-বা বলে, 'কী মিষ্টি স্বভাব।'

সরকার বলল, 'ওহে গোলাম মৌলা, রাধা কেস্টর কে হয় জানো?'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায় সাহেব।'

দু-দুবার চাচা যে কেন 'ভাবিত' হলেন আমরা ঠিক ধরতে পারলুম না। রায় যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তা নিয়ে আশ্চর্য হওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কী আছে?

চাচার সবচেয়ে ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই বলল, 'আপনি তো বিয়ে করেননি, কখনও এন্‌গেজ্‌ডও হননি। তাই আপনার ভয়, ভাবনা—'

চাচা বললেন, 'আমার ফাঁসি হয়নি সত্যি, কিন্তু তাই বলে আসামি হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াইনি তুই কী করে জানলি?'

* ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে ঈদ-পর্ব উপলক্ষে বার্লিনের আরব, ইরানি, ভারতীয় সব মুসলমান জড়ো হয়। অমুসলমানের মধ্যে প্রধানত যায় বাঙালি হিন্দু।

www.pathagar.com

ঠেলাঠেলির ভেতর বাসের হ্যান্ডেল ধরতে পেলে মানুষ যেরকম ঝুলে পড়ে, রায় ঠিক তেমনি চাচার জবানবন্দির হ্যান্ডেল পেয়ে বললেন, 'উকিলের নাম বলুন চাচা, যে আপনায় বাঁচালে।'

রায়ের বিয়ের খবর শুনে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম কিন্তু স্তম্ভিত হইনি। কারণ রায় স্ত্রীজাতিকে অতি সন্তর্পণে দূরে ঠেলে রাখতেন, তাই শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। কিন্তু চাচা এসব বাবদে স্ত্রী-পুরুষে কোনও তফাত রাখতেন না। বার্লিনের মেয়েমহলে তিনি ছিলেন বেসরকারি পাদ্রি। বরঞ্চ পাদ্রিদের সম্বন্ধে ফষ্টিনষ্টির কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায় কিন্তু চাচার হৃদয় জয় করতে যাবে কে? সে-হৃদয় তিনি বহু পূর্বেই আত্মজনের মাঝে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অত হিস্যেদারের সম্পত্তি নিলামে উঠলেও তো কেউ কেনে না। আমরা সবাই করুণ নয়নে চাচার দিকে তাকালুম, তিনি যেন কাহিনীটা চেপে না যান।

চাচা বললেন, 'ওরকম ধারা তাকাচ্ছিস কেন? তোরা কাউকে চিনবিনে। ১৯১৯-এর কথা। আমি তখন সবে বার্লিনে এসেছি। বয়স আঠারো পেরয়নি; মাকুন্দ বলে বিনা ব্লেডে গোঁফ কামাতুম— ল্যান্ডলেডি যাতে ঘর গোছাবার সময় ক্ষৌউরির জিনিসপত্র না দেখে ভাবে আমি নিতান্ত চ্যাংড়া। তার থেকেই বুঝতে পারছিস আমি কতটা অজ পাড়াগেঁয়ে, আনাড়ি ছিলুম। এক গাদা ভারতীয়ও ছিল না যে আমাকে সলা-পরামর্শ দিয়ে ওয়াকিফহাল করে তুলবে। যে দু-চারজন ছিলেন তাঁরা তখন আপন আপন ধান্দায় মশগুল— জর্মনির তখন বড় দুর্দিন।

ভাগ্যিস দু-চারটে গুঁত্তাগাঁত্তা খাওয়ার পরই হিম্মত সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

সাইনবোর্ডে গেট্রেঙ্কে (পানীয়) শব্দ দেখে আমি বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়ে বসেছি। কী করে জানব বল, পানীয়গুলো রূঢ়ার্থে বিয়ার ব্রান্ডি বোঝায়। ওয়েট্রেসগুলো পাঁজরে হাত দিয়ে দু-ভাঁজ হয়ে এমনি খিল্‌খিল্ করে হাসছিল যে শব্দ শুনে হিম্মত সিং রাস্তা থেকে তাড়িখানার ভিতরে তাকালেন। আমার চেহারা দেখে তাঁর দয়ার উদয় হয়েছিল— তোদের মতো পাষণ্ডগুলোরও হত। গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে বসে ওয়েট্রেসকে বললেন, 'এক লিটার বিয়ার, বিটে (প্লিজ)!'

আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'বিয়ার নহি পিতে?'

আমি মাথা নাড়িয়ে বললুম, 'না'।

'ওয়াইন?'

ফের মাথা নাড়ালুম।

'কিসি কিস্‌মকি শরাব?'

আমি বললুম যে, আমি দুধের অর্ডার দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁফের ভেতর যেন সামান্য একটু হাসির আভাস দেখতে পেলুম। বললেন, 'অব সমঝা'। তার পর আমাকে বসে থাকতে আদেশ দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন এক গেলাস দুধ হাতে নিয়ে। সমস্ত বিয়ার-খানার লোক যে অবাক হয়ে তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করেছে সেদিকে কণামাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। তার পর, সেই যে বসলেন

গেঁট হয়ে, আর আরম্ভ করলেন জালা জালা বিয়ার-পান। সে-পান দেখলে গোলাম মৌলা আর কক্‌খনও রায়ের পানকে ভয় করবে না।

শিখের বাচ্চা, রক্তে তার তিন পুরুষ ধরে আগুন-মার্কা ধেনো, আর মোলায়েমের মধ্যে নির্জলা হুইস্কি; বিয়ার তাঁর কী করতে পারে?

লিটার আষ্টেক খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পয়সা দিয়ে বেরোবার সময়ও কোনওদিকে একবারের তরে তাকালেন না। আমি কিন্তু বুঝলুম, বিয়ার-খানার হাসি ততক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে। সবাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হিম্মত সিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে, আর ফিস্‌ফিস্‌ প্রশংসাধ্বনি বেরুচ্ছে।

বাইরে এসে শুধু বললেন, 'অব ইনলোগোঁকো পতা চল্‌ গিয়া কি হিন্দুস্থানি শরাব ভি পি সক্তা'।

তার পর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে একখানা চেয়ারে বসালেন। নিজে খাটে শুলেন। কান পেতে আমার দুঃখ-বেদনার কাহিনী শুনলেন। তার পর বাড়ির কর্ত্রী ফ্রাউ (মিসেস) রুবেন্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মহিলাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিধবা। খানদানি ঘরের মেয়ে এবং হিম্মত সিংয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা কইলেন তার থেকে বুঝলুম যে হিম্মত সিং সে বাড়িতে রাজপুত্রের খাতির-যত্ন পাচ্ছেন।

তার পর একমাসের ভিতর তিনি বার্লিন শহরের কতসব হোমরাচোমরা পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন, এতদিন পর সেসব পরিবারের বেশিরভাগের নামও আমার মনে নেই। কূটনৈতিক সমাজ, খানদানি গোষ্ঠী, অধ্যাপক মণ্ডলী, ফৌজি আড্ডা সর্বত্রই হিম্মত সিংয়ের অবাধ গতায়াত ছিল। হিম্মত সিং এককালে ভারতীয় ফৌজের বড়দরের অফিসার ছিলেন। ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধে বন্দি হয়ে জর্মনিতে থাকার সময় তিনি জর্মনদের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন। এবং সেই সূত্রে বার্লিনের সকল সমাজের দ্বার তাঁর জন্য খুলে যায়। হিম্মত সিং আমাকে কখনও তাঁর জীবনী সবিস্তারে বলেননি, কাজেই জর্মনরা কেন যে ১৯১৭-১৮ সালে তাঁকে মস্কো যেতে দিয়েছিল ঠিক জানিনে। সেখান থেকে কেন যে আবার ১৯১৯ সালে বার্লিন ফিরে এলেন তা-ও জানিনে। তবে তাঁকে বহুবার রুশ-পলাতক হোমরাচোমরাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে দেখেছি। সেসব রুশদের কাছ থেকে একথাও শুনেছি যে, হিম্মত সিং মস্কোতে যে খাতির-যত্ন পেয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর বার্লিনের প্রতিপত্তির তুলনা হয় না। কম্যুনিস্ট বড়কর্তাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে তিনি নাকি মস্কো ত্যাগ করেন। আশ্চর্য নয়, কারণ হিম্মত সিংয়ের মতো জেদি আর একরোখা লোক আমি আমার জীবনে দুটি দেখিনি।

আর আমায় লাই যা দিয়েছিলেন। ভালোমন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করে আমাকে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতেন, আমি বেজার হয়ে বসে রইলে রাইস্টাক ভাড়া করে নাচের বন্দোবস্ত করবার তালে লেগে যেতেন। আমার সর্দি হলে বার্লিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে ডেকে পাঠাতেন, শরীর ভালো থাকলে নিজের হাতে কাবাব রুটি বানিয়ে খাওয়াতেন।

তিন মাস ধরে কেউ কখনও সুখ-স্বপ্ন দেখেছে? ফ্রয়েড নাকি বলেন, স্বপ্নের পরমায়ু মাত্র দু-তিন মিনিট। এ তত্ত্বটা জেনেও মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারলুম

www.pathagar.com

না, যেদিন হিম্মত সিং হঠাৎ কিছু না বলে-কয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌সও কিছুই জানেন না। বললেন, যে-স্যুট পরে বেরিয়েছিলেন তাই নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কয়েকদিন পরে মার্সাই থেকে চিঠি, তাঁর জিনিসপত্র ভিখিরি-আতুরকে বিলিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে।

বহু বৎসর পরে জানতে পেরেছিলুম, আন্‌হাল্‌টার স্টেশনে তাঁর এক প্রাচীন রাজনৈতিক দুশমনকে হঠাৎ আবিষ্কার করতে পেরে তাকে ধরবার জন্য পিছু নিয়ে তিনি একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

হিম্মত সিংয়ের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। তাঁর কাছ থেকে কোনওদিন কোনও চিঠিও পাইনি।

তার পর আরও তিন মাস কেটে গিয়েছে। বার্লিনে যে সমাজে আমাকে চড়িয়ে দিয়ে হিম্মত সিং মই নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে জখমও হলুম।

এমন সময় ফ্রাউ রুবেন্‌স একদিন টেলিফোন করে অনুরোধ জানালেন আমি যেন তাঁর সঙ্গে ক্যোনিক কাফেতে বেলা পাঁচটায় দেখা করি। বিশেষ প্রয়োজন। হিম্মত সিং চলে যাওয়ার পর ফ্রাউ রুবেন্‌সের সঙ্গে আমার মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। টেলিফোনে মাঝে মাঝে হিম্মত সিংয়ের খবর নিয়েছি— যদিও জানতুম তাতে কোনও ফল হবে না— কিন্তু ও-বাড়িতে যাবার মতো মনের জোর আমার ছিল না। গোঁসাইয়ের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বার্লিনে শরৎ চাটুয্যের উপন্যাস পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতুম না বটে, কিন্তু বাঙালি তো বটে।

পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে দেখি কাফের গভীরতম আর নির্জনতম কোণে ফ্রাউ রুবেন্‌স বসে, আর তাঁর পাশে— একঝলক যা দেখতে পেলুম— এক বিপজ্জনক সুন্দরী।

ফ্রাউ রুবেন্‌স পরিচয় দিয়ে নাম বললেন, 'ফ্রলাইন ভেরা গিব্রিয়াডফ'।

লেডি-কিলার অর্থাৎ নটবর পুলিন সরকার জিগ্যেস করল, 'বিপজ্জনক সুন্দরী বলতে কী বোঝাতে চাইলেন আমার ঠিক অনুমান হল না। বার্লিনের আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক, না আপনার নিজের ধর্মরক্ষায় বিপজ্জনক?'

চাচা বললেন, 'আমার এবং আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক। তোর কথা বলতে পারিনে। তুই তো বার্লিনের সব বিপদ সব ভয় জয় করতে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিস।'

শ্রীধর মুখুয্যে আবৃত্তি করল,

'মাইন হের্ৎস্‌ ইস্ট ভী আইন বীনেন হাউস
ডী মেডেলস সিন্ট ডী বীনেন—
হৃদয় আমার মধুচক্রের সম
মেয়েগুলো যেন মৌমাছিদের মতো
কত আসে যায় কে রাখে হিসাব বল
ঠেকাতে, তাড়াতে মন মোর নয় রত।'

রায় বললেন, 'কী মুশকিল! এরা যে আবার কবিত্ব আরম্ভ করল।'

www.pathagar.com

চাচা বললেন, 'ফ্রাউ রুবেন্‌স ফ্রলাইন ভেরার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বিশেষ করে জোর দিয়ে বললেন যে হিম্মত সিং যখন মস্কোতে ছিলেন তখন বসবাস করেছিলেন গিব্রিয়াডফদের সঙ্গে। আমি তখন ভেরার দিকে তাকাতে তিনিও ভালো করে তাকালেন।

ছ মাস ধরে প্রতিদিন যে লোকটির কথা উঠতে-বসতে মনে পড়েছে তিনি এঁদের বাড়িতে ছিলেন, এই মেয়েটির চোখে তার ছায়া কত-শত বার পড়েছে, আমি আমার অজান্তে তাঁর চোখে যেন হিম্মত সিংয়ের ছবি দেখতে পাবার আশা করে ভালো করে তাকালুম।

হিম্মত সিংয়ের ছবি দেখতে পাইনি, কিন্তু ভেরার চোখ থেকে বুঝতে পারলুম হিম্মত সিং আমার জীবনের কতখানি জায়গা দখল করে বসে আছেন, সেকথা ভেরাও জানেন। তাঁর চোখে আমার জন্য সহানুভূতি টলটল করছিল।

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'আপনি হিম্মত সিংকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।'

এর উত্তর দেবার আমি প্রয়োজন বোধ করলুম না।

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'আপনাকে একটি বিশেষ অনুরোধ করার জন্য আমরা দু জন আজ আপনাকে ডেকেছি। হিম্মত সিং আজ বার্লিনে নেই— যেখানেই হোন্ ভগবান তাঁকে কুশলে রাখুন— আমি ধরে নিচ্ছি তিনি যেন এখন আমাদের মাঝখানেই বসে আছেন। তাই আপনাকে প্রথমেই জিগ্যেস করছি, আজ যদি হিম্মত সিংয়ের কোনও প্রিয় কাজ করতে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি সেটা করবার চেষ্টা করবেন কি?'

আমি বললুম, 'আপনার মনে কি সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ আছে?'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'আমার মনে নেই। ফ্রলাইন ভেরার জন্য শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম।' ভেরা মাথা নাড়িয়ে বোঝালেন, তারও কোনও প্রয়োজন ছিল না। ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'ভেরা অত্যন্ত বিপদে পড়ে মস্কো থেকে বার্লিন পালিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক দলাদলিতে ধরা পড়ে তাঁর বাপ-মা, দু ভাই সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছেন। এক ভাই তখন অডেসায় ছিলেন। তিনি কোনও গতিকে প্যারিসে পৌঁছেছেন। ভেরা যদি তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন তবে তাঁর বিপদের শেষ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে রাশান পাসপোর্ট তো নেই-ই, অন্য কোনও পাসপোর্টও তিনি যোগাড় করতে পারেননি। জর্মন পাসপোর্ট পেলেও কোনও বিশেষ লাভ নেই; কারণ জর্মনদের ফ্রান্সে ঢুকতে দিচ্ছে না। তবে সেটা যোগাড় করতে পারলে তিনি অন্তত কিছুদিন বার্লিনে থাকতে পারতেন। এখন অবস্থা এই যে, বার্লিন পুলিশ খবর পেলে ভেরাকে জেলে পুরবে। রাশাতেও ফেরত পাঠাতে পারে।'

আমরা সবাই একসঙ্গে আঁতকে উঠলুম!

চাচা বললেন, 'এতদিন পরও ঘটনাটা শুনে তোরা আঁতকে উঠছিস। আমি শুনেছিলুম ফ্রলাইন ভেরার সামনাসামনি। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'এখন কী করা যায় বলুন?'

হিম্মত সিংয়ের কথা মনে পড়ল। আমাদের কাছে যে বাধা হিমালয়ের মতো উঁচু হয়ে দেখা দিয়েছে, তিনি তার উপর দিয়ে স্কেটিং করে চলে যেতেন। পাসপোর্ট যোগাড় করার চেয়ে দেশলাই কেনা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল— শিখধর্মের 'সিগ্‌রেট নিষেধ' তিনি মানতেন।

www.pathagar.com

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'ভেরার জন্য পাসপোর্ট যোগাড় করা তাঁর পক্ষেও কঠিন, হয়তো অসম্ভব হত। কিন্তু একথাও জানি যে শেষ পর্যন্ত তিনি একটা পথ বের করতেনই করতেন।

এ বিষয়ে আমার মনেও কোনও সন্দেহ ছিল না।

ফ্রাউ রুবেন্‌স অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?'

ধর্মত বলছি, আমি ভাবলুম, ফ্রাউ রুবেন্‌স রসিকতা করছেন। সব দেশেরই আপন আপন বিদঘুটে রসিকতা থাকে, তাই এক-এক ভাষার রসিকতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। হয়তো জর্মন রসিকতাটির ঠিক রস ধরতে পারিনি ভেবে ভ্যাবলার মতো আমি তখন একটুখানি 'হে হে' করেছিলুম।

ফ্রাউ রুবেন্‌স আমার কাষ্ঠরসময় 'হে হে'-তে বিচলিত না হয়ে বললেন, 'নিতান্ত দলিলসংক্রান্ত বিয়ে। আপনি যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করেন তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি পেয়ে যাবেন এবং অনায়াসে প্যারিস যেতে পারবেন। মাস তিনেক পর আপনি ভেরার বিরুদ্ধে ডেজারশনের (পতিবর্জনের) মোকদ্দমা এনে ডিভোর্স (তালাক) পেয়ে যাবেন।' তার পর একটু কেশে বললেন, 'আপনাকে স্বামীর কোনও কর্তব্যই সমাধান করতে হবে না।' একটুখানি থেমে বললেন, 'খাওয়ানো পরানো, কিছুই না।'

লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল, না ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, না আশ্চর্য হয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল আজ এতদিন বাদে বলতে পারব না। এমনকি ক্যাবলাকান্তের মতো 'হে হে' করাও তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

রায়ের বিয়ার ফুরিয়ে গিয়েছে বলে কথা বলার ফুরসত পেলেন, বললেন, 'বিলক্ষণ! আমারও সেই অবস্থা হয়েছে।'

চাচা বললেন, 'ছাই হয়েছে, হাতি হয়েছে। আমার বিপদের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না! সবকথা পয়লা শুনে নাও, তার পর যা খুশি বল।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফ্রাউ রুবেন্‌স যা বললেন তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তিনি ভাত ঠাণ্ডা হতে দেন না, তার উপরই গরম ঘি ছাড়েন। বললেন, 'আমার দৃঢ় প্রত্যয়, হিম্মত সিংকে এ পথটা দেখিয়ে দিতে হত না। তিনি দু মিনিটের ভিতর সবকিছু ফিক্‌স্ উন্ড ফের্তিস (পাকাপোক্ত) করে দিতেন।'

চাচা বললেন, 'ইয়োরোপে cold blooded খুন হয়, ভারতবর্ষে কোল্ড-ব্লাডেড্ বিয়ে হয়। এবং দুটোই ভেবে-চিন্তে, প্ল্যান মাফিক, প্রিমেডিটেটেড্। কিন্তু এখানে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল কোল্ড-ব্লাডেড্ বিয়ে করতে কিন্তু না ভেবে-চিন্তে, অর্থাৎ রোমান্টিক কায়দায়। প্রথম দর্শনে প্রেম হয় শুনেছি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিয়ে, এরকমধারা ব্যাপার আমি ইয়োরোপে দেখিওনি, শুনিওনি। অবশ্য আমার এ সব তাবৎ ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু বলির পাঁঠা আমি হতে যাব কেন?

অপরূপ সুন্দরী; দেখে চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছিল অস্বীকার করব না। কিন্তু বিয়ে—!'

www.pathagar.com

ফ্রাউ রুবেন্‌স গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?'

আমি চুপ।

তখন ফ্রাউ রুবেন্‌স এমন একখানা অস্ত্র ছাড়লেন যাতে আমার আর কোনও পথ খোলা রইল না। বললেন, 'আপনি কি সত্যি হিম্মত সিংকে ভালোবাসতেন?'

চাচা বললেন, 'অন্য যে কোনও অবস্থায় হলে আমি ফ্রাউ রুবেন্‌সকে একটা ঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করতুম কিন্তু তখন কোনও উত্তরই দিতে পারলুম না। তোরা জানিস আমি স্নেহ-প্রেম-দয়ামায়াকে বুদ্ধিবৃত্তি-আত্মজয়ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি দাম দিই। কাজেই ফ্রাউ রুবেন্‌সের আঘাতটা আমার কতখানি বেজেছিল তার খানিকটে অনুমান তোরা করতে পারবি। কোনও চোখা উত্তর যে দিইনি তার কারণ, ততখানি চোখা জর্মন আমি তখন জানতুম না।

ঘড়েল মাস্টারগুলো জানে যে ছাত্র যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তখন তাকে ভালো করে নির্যাতন করার উপায় হচ্ছে চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করা। ফ্রাউ রুবেন্‌স সেটা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরে বললেন, "আপনি তা হলে হিম্মত সিংয়ের ঋণ শোধ করতে চান না?"

রায়ের বিয়ার এসে গিয়েছে। চুমুক দিয়ে বললেন, 'চাচা, মাপ করুন। আপনার কেস্‌ অনেক বেশি মারাত্মক।'

চাচা রায়ের কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'সেই বে-ইজ্জতিরও যখন আমি কোনও উত্তর দিলুম না তখন ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কুণ্ডলী পাকানো গোখরো সাপকে আমি এরকমধারা হঠাৎ খাড়া হতে দেখেছি। গিব্রিয়াডফের মুখ লাল, কালো চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, সে আগুনের আঁচ ব্লন্ড চুলে লেগে চুলও যেন লাল হয়ে গিয়েছে।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তাঁকে বললেন, 'আপনি শান্ত হোন। বারন ফন্‌ ফাক্রেনডর্ফ যখন আপনাকে বিয়ে করার জন্য পায়ের তলায় বসেন, তখন এর প্রত্যাখ্যানে অপমান বোধ করছেন কেন?'

ভেরা বসে পড়লেন।

আমি তখন দিগ্বিদিকশূন্য। অতিকষ্টে বললুম, 'আমাকে দু দিন সময় দিন।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ভেরা বাধা দিয়ে বললেন, 'সেই ভালো।' দু জনাই উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'পরশুদিন পাঁচটায় তা হলে এখানে আবার দেখা হবে।'

হ্যান্ডশেক না করেই দু জনা বেরিয়ে গেলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স কাঁচা রেললাইনের উপর বিরাট এঞ্জিনের মতো হেলেদুলে গেলেন, আর ভেরার চেয়ার ছেড়ে ওঠা আর চলে যাওয়ার ধরন দেখে মনে হল যেন টব ছেড়ে রজনীগন্ধাটি হঠাৎ দু খানা পা বের করে ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সর্বাঙ্গে হিল্লোল, কিন্তু মাথাটি স্থির, নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো। যেন রাজপুত মেয়ে কলসি মাথায় চলে গেল। ক্যোনিক কাফের আন্তর্জাতিক খদ্দের গোষ্ঠী সে-চলন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখল।'

www.pathagar.com

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'মাইরি চাচা, আপনার সৌন্দর্যবোধ আর কবিত্বশক্তি দুই-ই আছে। অমনতরো বিপাকের মধ্যিখানে আপনি সবকিছু লক্ষ করলেন।'

চাচা বললেন, 'কবিত্বশক্তি না ষাঁড়ের গোবর। আমি লক্ষ করেছিলুম জ্বরের ঘোরে মানুষ যেরকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে, সেইরকম।'

তার পরে দু দিন আমার কী করে কেটেছিল সে-কথা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। একরকম হাবা হয় দেখেছিস, মুখে যা দেওয়া গেল তাই পড়ে পড়ে চিবোয় আর চিবোয়,— বলে দিলেও গিলতে পারে না। আমি ঠিক তেমনি দু দিন ধরে একটি কথার দুটো দিক মনে মনে কত লক্ষবার যে চিবিয়েছিলুম বলতে পারব না। হিম্মত সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র পন্থা যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করাই হয় তবে আমি সে কর্তব্য এড়াই কী করে— আর চেনা নেই, পরিচয় নেই, একটা মেয়েকে হুশ করে বিয়ে করিই-বা কী প্রকারে? সমস্যাটা চিবুচ্ছি আর চিবুচ্ছি, গিলে ফেলে ভালো-মন্দ যাই হোক, একটা সমাধান যে করব সে ক্ষমতা যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মুরুব্বি নেই, বন্ধু নেই, সলা-পরামর্শ করিই-বা কার সঙ্গে। হিম্মত সিং যাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মাবার কথা নয়, নিজের থেকেও কোনও বন্ধু জোটাতে পারিনি। কারণ আমার জর্মন তখনও গল্প জমাবার মতো মিশ্রির দানা বাঁধেনি। যাই কোথায়, করি কী?

য়ুনিভার্সিটির কাছে একটা দুধের দোকানে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি— আমার মেয়াদের তখন আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা বাকি— এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি সামনে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের ছাত্রী, বার্লিনের মেয়েদের হকি টিমের কাপ্তান। ছ ফুটের মতো লম্বা; হঠাৎ রাস্তায় দেখলে মনে হত মাইকেল এঞ্জেলোর মার্বেল মূর্তি স্কার্ট-ব্লাউজ পরে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।

জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

মাথা নাড়িয়ে জানালুম কিচ্ছু হয়নি।

ধমক দিয়ে বললেন, 'আলবত হয়েছে। খুলে বলুন।'

বয়সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড় হয় কি না হয়; কথার রকম দেখে মনে হয় যেন জ্যাঠাইমা। বললুম, 'বলছি, কিছুই হয়নি।'

ফন্ ব্রাখেল আমার পাশে বসলেন। আমার কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বলুনই-না কী হয়েছে।'

তখন চেখফের একটা গল্প মনে পড়ল। এক বুড়ো গাড়োয়ান তার ছেলে মরে যাওয়ার দুঃখের কাহিনী কাউকে বলতে না পেয়ে শেষটায় নিজের ঘোড়াকে বলেছিল। ঘোড়ার সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের অন্তত একটা মিল ছিল। হকিতে তাঁর ছুট যেমন-তেমন ঘোড়ার চেয়ে কম ছিল না। আমি তখন মরিয়া। ভাবলুম, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ি।

সমস্ত কাহিনী শুনে ফন্ ব্রাখেল পাঁচটি মিনিট ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে কখনও বলেন, 'ডু লীবার হের গট্' (হে মা কালী); কখনও বলেন, 'বী

www.pathagar.com

ক্যোস্‌ট্‌লিষ্‌' (কী মজার ব্যাপার), কখনও বলেন, 'লাখেন ডি গ্যোটার' (দেবতারা শুনলে হাসবেন)।

আমি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। ফন্‌ ব্রাখেল আমার কাঁধে দিলেন এক গুঁত্তা। ঝপ্‌ করে ফের বসে পড়লুম। বললেন, 'ডু ক্লাইনের ইডিয়ট্‌ (হাবাগঙ্গারাম), এখ্‌খুনি তোমার ফোন করে বলে দেওয়া উচিত, তোমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না।'

আমি বললুম, 'হিম্মত সিং থাকলে যা করতেন, আমার তাই করা উচিত।'

ফন্‌ ব্রাখেল বললেন, 'ঈসপের গল্প পড়নি। ব্যাঙ ফুলে ফুলে হাতি হবার চেষ্টা করেছিল। হিম্মত সিংয়ের পক্ষে যা সরল তোমার পক্ষে তা অসম্ভব। তাঁকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি— হকি খেলায় তিনি আমাদের তালিম দিতেন। তাঁর দাড়ি-গোঁফ নিয়ে তিনি পঁচিশখানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম পুষতে পারতেন। পার তুমি?'

আমি বললুম, 'গিব্রিয়াডফ বড় বিপদে পড়েছেন। আমার তো কর্তব্যজ্ঞান আছে।'

ফন্‌ ব্রাখেল বললেন, 'যে মেয়ে মস্কো থেকে পালিয়ে বার্লিনে আসতে পারে, তার পক্ষে বার্লিন থেকে প্যারিস যাওয়া ছেলে-খেলা। রুশ সীমান্তের পুলিশের হাতে থাকে মেশিনগান, জর্মন সীমান্তের পুলিশের হাতে রবারের ডাণ্ডা।'

আমি যতই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করি তিনি ততই হাসেন আর এমন চোখা চোখা উত্তর দেন যে আমার তাতে রাগ চড়ে যায়। শেষটায় বললুম, 'আপনি পুরুষ হলে বুঝতে পারতেন, যুক্তিতর্কের উপরেও পুরুষের কর্তব্যজ্ঞান নামক ধর্মবুদ্ধি থাকে।'

ফন্‌ ব্রাখেল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে পুরুষ তাতে আর কী সন্দেহ। সোজা বলে ফেল না কেন সুন্দরী দেখে সেই পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে।'

আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারলুম না। বেরোবার সময় শুনতে পেলুম, ফন্‌ ব্রাখেল বলছেন, 'বিয়ের কেক্‌ শ্যাম্পেন অর্ডার দিয়ো না কিন্তু। বিয়ে হবে না।'

একেই তো আমার দুর্ভাবনার কূলকিনারা ছিল না, তার উপর ফন্‌ ব্রাখেলের ব্যঙ্গ। মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল। শরৎ চাটুয্যের নায়করাই শুধু যত্রতত্র 'দিদি' পেয়ে যায়, আমার কপালে ঢুঢু।

সোজা বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লুম। অন্ধকারে শিস দিয়ে মানুষ যেরকম ভূতের ভয় কাটায় আমি তেমনি হিম্মত সিংয়ের প্রিয় দোহাটি আবৃত্তি করতে লাগলুম—

> 'এহসান নাখুদাকা উঠায় মেরি বলা
> কিস্তি খুদা পর ছোড় দুঁ লঙ্গরকো তোড় দুঁ।'

'মাঝি আমায় সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাবে এই আমার ভরসা। নৌকো খুদার নামে ভাসালুম, নোঙর ভেঙে ফেলে দিয়েছি।'

পরদিন পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে বসলুম। জানা ছিল, ফাঁসির পূর্বে খুনিকে সাহস দেবার জন্য মদ খাইয়ে দেওয়া হয়। হিম্মত সিং আমাকে কখনও মদ খেতে দেননি। ভাবলুম তাঁর ফাঁসিতে যখন চড়ছি তখন খেতে আর আপত্তি কী?'

গোলাম মৌলা অবাক হয়ে শুধাল, 'মদ খেলেন?'

চাচা বললেন, 'কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি।'

www.pathagar.com

সোয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছ টা বাজল। ফ্রাউ রুবেন্‌স, ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ কারও দেখা নেই। এর অর্থ কী? জর্মনরা তো কখনও এরকম লেট্ হয় না। নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে। যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমি পালাই।

বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে ল্যান্ডলেডিকে জিগ্যেস করলুম, ফ্রাউ রুবেন্‌স ফোন করেছিলেন কি? না। আমার উচিত তখন ফোন করা, অনুসন্ধান করা, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি তো; কিন্তু চেপে গেলুম। নোঙর যখন ভেঙে ফেলে দিয়েছি তখন আমি হালই-বা ধরতে যাব কেন?

সাত দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম। রাত্রে শুতে যাবার সময় একবার ল্যান্ডলেডিকে চিঁচিঁ করে জিগ্যেস করতুম, কোনও ফোন ছিল কি না? ল্যান্ডলেডি নিশ্চয় ভেবেছিল আমি কারও প্রেমে পড়েছি। প্রেমের দ্বিতীয় অঙ্কে নাকি মানুষ এরকম করে থাকে।

কোনও ফোনও না।

করে করে তিন মাস কেটে গেল; আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাজকর্মে মন দিলুম।

নটে গাছটি মুড়িয়ে দিয়ে চাচা চেয়ারে হেলান দিলেন।

ভোজের শেষে সন্দেশ মিষ্টি না দিলে বরযাত্রীদের যে-রকম হন্যে হয়ে ওঠার কথা আমরা ঠিক সেইরকম একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম। মুখুয্যে বলল, 'কিন্তু ওনারা সব এলেন না কেন, তার তো কোনও হদিস পাওয়া গেল না।'

সরকার বলল, 'আপনার শেষরক্ষা হল বটে, কিন্তু গল্পটির শেষরক্ষা হল না।'

রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, 'নোঙর-ভাঙা নৌকোতে আমাকে ফেলে আপনি কেটে পড়লেন চাচা? আমার উদ্ধারের উপায় বলুন।'

চাচা বললেন, 'মাস তিনেক পরে দস্তানা কিনতে গিয়েছি 'তিৎসে'। জর্মনদের হাতের তুলনায় আমাদের হাত ছোট বলে লেডিজ ডিপার্টমেন্টে আমাদের দস্তানা কিনতে হয়। সেখানে ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে পুরুষ-পুঙ্গব, এখানে কেন? নিজের জন্য দস্তানা কিনছ, না বউয়ের জন্য? কিন্তু বউ কোথায়?' আমি উষ্মাভরে গটগট করে চলে যাচ্ছিলুম— ফন ব্রাখেল আমার হাতটি চেপে ধরলেন— 'বুলি'র সময় হকিস্টিক যে-রকম চেপে ধরেন।

সেই কাফে ক্যোনিকেই নিয়ে বসালেন।

বললেন, 'আমি সেদিন পাঁচটার সময় কাফের উপরের গ্যালারিতে বসে তোমাকে লক্ষ করছিলুম।'

আমি তো অবাক।

বললেন, 'ওরা কেউ এল না বলে তোমার সঙ্গে কথা না বলে চলে গেলুম। কিন্তু তারা এল না কেন জান? তবে শোনো। তোমার মতো মূর্খকে বাঁচানো আমার কর্তব্য মনে করে আমি তাদের সঙ্গে লড়েছিলুম। হিম্মত সিং আমার বন্ধু, আমার পিতারও বন্ধু। তাঁর প্রতি এবং তাঁর "প্রতেজে", তোমার প্রতি আমারও কর্তব্য আছে।

'তোমার কাছ থেকে সবকথা শুনে আমি সোজা চলে যাই ফ্রাউ রুবেন্‌সের ওখানে। তাঁকে রাজি করাই আমাকে গিব্রিয়াডফের ওখানে নিয়ে যাবার জন্য। সময় অল্প ছিল বলে,

www.pathagar.com

এবং ইচ্ছে করেই ফোন করে যাইনি। গিয়ে দেখি সেখানে একপাল ষাঁড়ের সঙ্গে সুন্দরী শ্যাম্পেন খাচ্ছেন, হৈ-হল্লা চলছে। ফ্রাউ রুবেন্‌সের চক্ষুস্থির। তিনি গিব্রিয়াডফ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা করেছিলেন— ইংরেজিতে যাকে বলে ডেমজেল্ ইন্ ডিস্‌ট্রেস্ (বিপন্না)। সেকথা থাক্— আমি দু জনকে সামনে বসিয়ে পষ্টাপষ্টি বললুম যে তোমাতে-আমাতে প্রেম, বিয়ে স্থির— আমি অন্য কোনও মেয়ের নোন্‌সেন্স সহ্য করব না।'

আমি বললুম, 'এ কী পাগলামি! আপনি এসব মিথ্যে কথা বলতে গেলেন কেন?'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'চুপ করে শোনো। আমি বাজে বকা পছন্দ করিনে। এছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গিব্রিয়াডফ কিন্তু কামড় ছাড়ে না— আমি তখন ভয় দেখিয়ে বললুম যে, আমি পুলিশে খবর দেব তার পাসপোর্ট নেই, আর পাসপোর্ট যোগাড়ের জন্য তোমাকে মেকি বিয়ে করছে। আমি অবশ্য সমস্তক্ষণ ভান করছিলুম যে আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি— তোমার মতো অজমূর্খের প্রেমে হাবুডুবু, শুনলে মুরগিগুলো পর্যন্ত হেসে উঠবে!— আর তোমাকে বিয়ে করার জন্য এমনি হন্যে হয়ে আছি যে, পুলিশ লেলানো, খুনখারাবি সবকিছুই করতে প্রস্তুত।

'গিব্রিয়াডফ হার মানলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। গিব্রিয়াডফ যে তাঁকে কতদূর বোকা বানিয়েছে বুঝতে পেরে বড় লজ্জা পেলেন। বাড়ি ফেরার পথে গিব্রিয়াডফ তাঁর সঙ্গে কী করে বন্ধুত্ব জমিয়েছিল সে-ব্যাপার আগাগোড়া খুলে বললেন। তখন আরও অনুসন্ধান করে জানলুম, মস্কোতে এ গিব্রিয়াডফের বাড়িতে হিম্মত সিং কখনও বসবাস করেননি— এরা ওঁদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় মাত্র।'

চাচা বললেন, 'ফন্ ব্রাখেল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমার তাড়া আছে, হকি ম্যাচে চললুম।"

আমি বললুম, 'কিন্তু একটা কথার উত্তর দিন। গিব্রিয়াডফ বিয়ের জন্য আমাকেই বাছলেন কেন? বারন ফন্ ফাল্কেনডর্ফের মতো বর তো ছিল।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'লীবার ইডিয়ট (প্রিয় মূর্খ), গিব্রিয়াডফ তো বর খুঁজছিল না, খুঁজছিল শিখণ্ডী। ফাল্কেনডর্ফ বা অন্য কাউকে বিয়ে করলে সে-স্বামী তার হক্ক চাইত না? তা হলে পঁচিশটে ষাঁড়ের সঙ্গে দিবারাত্তির শ্যাম্পেন চলত কী করে? ফাল্কেনডর্ফ প্রাশান মোষ। নিটশের উপদেশে বিশ্বাস করে— স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না— হল? বুঝলে হে নরার্ষভ?'

চাচা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'জীবনে এরকম বোকা বনিনি, অপমানিত বোধ করিনি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা গিলে ফেলা ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না।'

গোলাম মৌলা বলল, 'একটা বাজতে তিন মিনিট। শেষ ট্রেন একটা দশে।'

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুট দিলুম সাভিন্নিপ্লাৎস স্টেশনের দিকে। রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'চাচা, ফন্ ব্রাখেলের ঠিকানা কী?'

চাচাও তখন তার গলাবন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুট দিয়েছেন। বললেন, 'সে-বিয়ারে ছাই। তোমার ফিয়াঁসে শ্রীমতী জমিতফের সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের গলাগলি। তাই তো বলেছিলুম, বড় ভাবিয়ে তুলেছ।'

www.pathagar.com

কর্নেল

কুরফুর্স্টেন্‌-ডাম্‌ বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইয়োরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবানিতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা; ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরিব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন-ডামের গা ঘেঁষে উলান্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার।

বহু জর্মন অজর্মন 'হিন্দুস্থান হৌসে' আসত। জর্মনরা আসত নতুনত্বের সন্ধানে— কলকাতার লোক যে রকম 'চাইনিজ' বা 'আমজাদিয়ায়' খেতে যায়। ভারতীয়েরা নিয়ে আসত জর্মন, অজর্মন বান্ধবীদের— মাছ-ভাত বা ডাল-রুটির স্বাদ বাৎলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ করার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না ভারতীয় রান্নার চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণির সত্তা যে তার সঙ্গে শুধু ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যে রকম প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জর্মনদের কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই করা যায় না। কারণ ভারতীয় রান্নার বর্ণনাতে আছে :—

> তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
> উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
> অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
> প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে।

এবং সে গ্রাম্ভারী রান্না কেন মামুলি রান্নার সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে-খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। আর মশলা না দিলে আমাদের ঝোল হয়ে যায় আইরিশ স্টু, ডাল হয় লেন্টিল সুপ, তরকারি হয় বয়েল্ড ভেজ, মাছভাজা হয় ফ্রাইড্‌ ফিশ্‌। আমাদের চতুর্বর্ণ তখন শুধু বর্ণ নয়, রস-গন্ধ-স্বাদ সব কিছু হারিয়ে একই বিস্বাদের আসনে বসেন বলে চণ্ডালের মতো হয়ে যান। কাজেই আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনও ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন। দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।

তবে হ্যাঁ, আমাদের ছানার সন্দেশ ছিল কান্টের কাটেগরিশে ইম্পেরাটিফের মতো অলঙ্ঘ্য ধর্ম। তার সামনে জর্মন অজর্মন সকলেই মাথা নিচু করতেন। ছানা-তত্ত্বে অবাঙালির অবদান অনায়াসে অবহেলা করা যেতে পারে।

'হিন্দুস্থান হৌসে'র সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা। হিন্ডেনবুর্গের গোঁপের পরেই বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত বস্তু ছিল চাচার বেশ— তার সঙ্গে 'ভূষা' শব্দ জুড়লে চাচার প্রতি অন্যায় করা হবে। সে বেশ ছিল সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত।

কারখানার চোঙার মতো গোলগাল পাতলুন, গলা-বন্ধ হাঁটু-জোকা কোট আর ভারী-ভারী একজোড়া মিলিটারি বুট। লোকে সন্দেহ করত, তাঁর কোটের তলায় কামিজ-

www.pathagar.com

কুর্তা নাকি নেই। তবে এ-কথা ঠিক কোট, পাতলুন, বুট ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় আবরণ বা আভরণ তাঁর শ্যামাঙ্গে কেউ কখনও বিরাজ করতে দেখেনি। বার্লিনের মতো পাথর-ফাটা শীতেও তিনি কখনও হ্যাট, টুপি, ওভারকোট বা দস্তানা পরেননি। খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরি চুল পাতলা হয়ে আসছিল কিন্তু চাচা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেই অপরূপ পাতলুন, গণ্ডারের চামড়ার মতো পুরু গলাবন্ধ কোট, আর একমাথা বাবরি নিয়ে চাচা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেন কুরফুর্স্টেন্-ডামের ফুটপাতে। পেছনের দিকে মাথা ঠেলে, উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন উড়ন্ত মেঘের পানে। কেন, কে জানে? হয়তো বিদেশের অচেনা-অজানা দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে একমাত্র আকাশ আর মেঘই তাঁকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দেশ ছেড়েছেন বহুকাল হল, কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করলে হ্যাঁ, না, কিছু কবুল না করে কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মতো শুধু বলতেন 'ললাটঙ্ক লিখন!'

বার্লিনের লোক শহরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করে না। দু মিনিট যেতে না-যেতেই চাচার চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। তাঁর অদ্ভুত বেশ, বাবরি চুল, ঘনশ্যাম দেহরুচি আর বেপরোয়া ভাব লক্ষ না করে থাকবার যো ছিল না।

ফিসফিস শুনেই চাচার ঘুম ভাঙত। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে 'বাও' করে একটু মৃদু হাসির মেহেরবানি দেখাতেন। ভিড় তখন ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিত। চাচা আবার 'বাও' করে 'হিন্দুস্থান হৌস' রওনা দিতেন। কেউ 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত) ধরনের কিছু বললে বা পরিচয় করবার চেষ্টা দেখালে চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত চালিয়ে তাঁর একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরে ফের 'বাও' করতেন— যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি নবাব কাউকে ডুয়েলে আহ্বান করছেন। সে-কার্ডে চাচার ঠিকানা থাকত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র। জর্মনরা চালাক; বুঝত, চাচা রাস্তার মাঝখানে নীরব কাব্য করেন বলে কথা বলতে চান না। কাজেই তারা চাচার আড্ডায় এসে উপস্থিত হত।

মেঘ দেখবার জন্য অন্য জায়গা এবং অন্য কায়দা থাকতে পারে কিন্তু 'হিন্দুস্থান হৌসে'র রান্নার খুশবাই ছড়াবার জন্য এর চেয়ে ভালো গ্যোবেল্‌স্ আর কী হতে পারে?

শ্রীধর মুখুয্যে বলছিল, 'সংস্কৃতের নতুন ছোকরা প্রফেসর এসেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পড়াচ্ছে গীতা। আজ সকালে প্রথম অধ্যায় পড়াবার সময় বলল, "কুলক্ষয়-ফুলক্ষয় সব আবোল-তাবোল কথা। বর্ণসঙ্কর না হলে কোনও জাতের উন্নতি হয় না।" তার থেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে গীতার প্রথম অধ্যায়টা গুপ্তযুগে লেখা। বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধযুগের পূর্বে ছিল না।'

চাচা বললেন, 'কী করে বর্ণসঙ্কর হয়, আর তার ফল কী, সেটা প্রথম অধ্যায়ে বেশ ধাপে ধাপে বাৎলানো হয়েছে না রে? বল তো, ধাপগুলো কী?'

শ্রীধর খাবি খাচ্ছে দেখে আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'কুলক্ষয় থেকে কুলধর্ম নষ্ট, কুলধর্ম নষ্ট থেকে অধর্ম, অধর্ম থেকে স্ত্রীলোকদের ভিতর নষ্টামি, নষ্টামি থেকে বর্ণসঙ্কর হলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ—'

www.pathagar.com

মুখুয্যে বাধা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রফেসর বলছিল, "পিণ্ডির পরোয়া করে কোন্ সুস্থবুদ্ধির লোক"?'

বিয়ারের ভিতর থেকে সূয্যি রায়ের গলা বুদ্বুদের মতো বেরলো, 'ছোকরা প্রফেসর ঠিক বলেছে। বর্ণসঙ্কর ভালো জিনিস। মুখুয্যে বামুনের ছেলে, এদিকে গীতার পয়লা পাঠ মুখস্থ নেই; সরকার কায়েতের ছেলে, পুরো চেনটা বাৎলে দিলে। মুখুয্যের উচিত সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে কুলধর্ম বাঁচানো।'

চাচা বললেন, 'ঠিক বলেছ, রায়। তা হলে তুমি এক কাজ কর। তোমার বিয়ারে একটু জল মিশিয়ে ওটাকে বর্ণসঙ্কর করে ফেলো।'

রায় রীতিমতো শক্‌ড্ হয়ে বললেন, 'পানশাস্ত্রে এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর কিছুই হতে পারে না। বিয়ারে জল!'

চাচা মুখুয্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের নয়া প্রফেসরটা নিশ্চয়ই ইহুদি। ওরা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন জাতটাকে খাঁটি রাখবার জন্য, ঠিক তেমনি আর পাঁচজনকে উপদেশ দেয় বর্ণসঙ্কর ডেকে আনবার জন্য। ওদিকে খাঁটি জর্মন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না একদম, কিন্তু কাজের বেলায় না খেয়ে মরবে তবু বর্ণসঙ্কর হতে দেবে না।'

সরকার জিগ্যেস করল, 'এদেশেও নিরম্বু উপবাস আছে নাকি?'

চাচা বললেন, 'আলবাৎ, শোন। আমি এ-বিষয়ে ওকিবহাল।'

পয়লা বিশ্বযুদ্ধের পর হেথায় অবস্থা হয়েছিল "জর্মনির সর্বনাশ, বিদেশির পৌষ মাস।" ইনফ্লেশনের গ্যাসে ভর্তি জর্মন কারেন্সির বেলুন তখন বেহেশ্‌তে গিয়ে পৌঁচেছে— বেহেশ্‌তটা অবশ্যি বিদেশিদের জন্য, জর্মনরা কেউ পাঁচ হাজার, কেউ দশ হাজারে বেলুন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। আত্মহত্যার খবর তখন আর কোনও কাগজ ছাপাত না, নারী-হৃদয় ইকনমিক্সের কমডিটি, এক 'বার্' চকলেট দিয়ে একসার ব্লন্ড কেনা যেত, পাঁচ টাকায় 'ফার' কোট, পাঁচশো টাকায় কুর্‌ফুর্স্টেন্‌ডামে বাড়ি, এক টাকায় গ্যোটের কম্‌প্লিট ওয়ার্কস।'

আড্ডার সবাই সেই সর্বনাশী পৌষ মাসের কথা ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। চাচা বললেন, 'সেই ঝড়ে তখনও যেসব বাড়ি দড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশি পেয়িং-গেস্ট। যে সব জর্মন পরিবারে বিদেশিরা পেয়িং-গেস্ট হয়ে বসবাস করছিল তাদের প্রায় সকলেই খেয়ে পরে জান বাঁচাতে পেরেছিল, কারণ যত নির্লজ্জ, কঞ্জুস, সুবিধাবাদী, পৌষমাসীই হও-না কেন, তামাম মাসের ঘরভাড়া, খাইখর্চার জন্য অন্তত পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। বিদেশি টাকার তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় তোমাকে নিয়ে একটা পরিবারের কায়ক্লেশে দিনগুজরান হয়ে যেত।'

গোঁসাই গুনগুন করে গান ধরলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, তোমার সেই নতুন বয়সের কালে।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু একটা দেশের দুর্দিনে এক সের ধান দিয়ে পাঁচ সের চাল নিতে আমার বাধত। তাই যখন আমার বুড়ো ল্যান্ডলেডি একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল

www.pathagar.com

তখন আমাকে লুফে নেবার জন্য পাড়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন সময় আমার বাড়িতে একদিন এসে হাজির ফ্রলাইন্ ক্লারা ফন্ ব্রাখেল।'

আড্ডা এক গলায় শুধাল, 'হকি-টিমের কাপ্তান?'

চাচা বললেন, 'আমার জান-বাঁচানে-ওয়ালি।' বললেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবাগঙ্গারাম), তুমি যদি অন্যত্র কোথাও না গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠো তা হলে আমি বড় খুশি হই। প্রাশান ওবের্স্টের (কর্নেলের) বাড়ি, একটু সাবধানে চলতে হবে। এককালে খুব বড়লোক ছিলেন, এখন "উন্জর টেগ্লিষেস্ ব্রট্ গিব্ উন্স্ হয়টে" (Give us this day our daily bread)। অথচ এমন দম্ভী যে পেয়িং-গেস্টের কথা তোলাতে আমাকে কোর্ট মার্শাল করতে চায়! শেষটায় যখন বললুম যে তুমি প্রাশান কারও কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের জর্মন শেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে বার্লিন এসেছ তখন ভদ্রলোক মোলায়েম হল। এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে বললুম। তুমি ভাবটা দেখাবে যেন তাঁর বাড়িতে উঠতে পেরে কৃতার্থম্মন্য হয়েছ; তুমি যে কোনও উপকার করছ সেটা যেন ধরতে না পারেন। তার বউ সম্বন্ধে কোনও দুর্ভাবনা করো না, তিনি সব বোঝেন, জানেন।'

চাচা বললেন, 'প্রাশান অফিসারদের আমি চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছি। দূর থেকে ব্যাটাদের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা স্টিফ ইউনিফর্ম আর স্টিফ ভাবসাব দেখে আমার সবসময় মনে হয়েছে এরা যেন হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল। সার্জেনরা কাটে নির্বিকার চিত্তে রোগীর পেট, এরা কাটে পরমানন্দে ফ্রান্সের গলা।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু ফন্ ব্রাখেলের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলুম। এবং মনে মনে ভাবলুম বেশিরভাগ ভারতীয়ই বসবাস করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দেখাই যাক না খানদানিরা থাকে কী কায়দায়।

ফন্ ব্রাখেল আমাকে নিয়ে যাননি। খবর দিয়ে আমি একাই একদিন সুটকেস নিয়ে কর্নেল ডুটেন্হফারের বাড়ি পৌঁছলুম।

ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল তার চেহারা আগেই দেখা থাকলে ফন্ ব্রাখেলের প্রস্তাবে আমি রাজি হতুম কি না সন্দেহ। বাড়ি তো নয় সে এক রাজপ্রাসাদ। এ বাড়িতে তো অন্তত শ-খানেক লোকের থাকার কথা কিন্তু তাকিয়ে দেখি দোতলার মাত্র দু-তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা। সামনে প্রকাণ্ড লন্। পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘণ্টা বাজালুম। মিনিট তিনেক পরে যখন ভাবছি আবার ঘণ্টা বাজাব কি না তখন দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

গহরজান যখন পানের পিক গিলতেন তখন নাকি গলার চামড়ার ভিতর দিয়ে তার লাল রঙ দেখা যেত। যে-রমণীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম তাঁর চামড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখচ্ছবি দেখে মনে হল তিনি যেন সকালবেলাকার শিশির দিয়ে গড়া। জর্মনিতে পান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার মনে হল ইনি পান খেলে নিশ্চয়ই পিকের রঙ এঁর গলার চামড়ায় ছোপ লাগাবে। চুল যেন রেশমের সুতো, ঠোঁট দুখানি যেন প্রজাপতির পাখা, ভুরু যেন উড়ে-যাওয়া পাখি, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে সন্দেহ হয় ইনি দাঁড়িয়ে আছেন না হাওয়ায়

www.pathagar.com

ভাসছেন। প্রথম দিনেই যে এ সব কিছু লক্ষ করেছিলুম তা নয়; কিন্তু আজ যখন পিছনপানে তাকাই তখন তাঁর ওই চেহারাই মনে পড়ে।

ইংরেজিতে বোধহয় একেই বলে ডায়াফনাস্; 'আস্বচ্ছ' বললে ঠিক মানে ধরা পড়ে না।

কতক্ষণ ধরে হাবার মতো তাকিয়ে ছিলুম জানিনে, হঠাৎ শুনলুম 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত), আপনার আগমন শুভ হোক্। আমি ফ্রাউ (মিসেস) ডুটেন্‌হফার।'

ভাগ্যিস ভারী মালপত্র ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির হাতে আগেই সমঝে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তা না হলে মাল নিয়ে আমি বিপদে পড়তুম। এরকম অবস্থায় চাকর দাসী কেউ-না-কেউ আসে কিন্তু কেউ যখন এল না তখন বুঝতে পারলুম ডুটেন্‌হফারদের দুরবস্থা কতটা চরমে পৌঁচেছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডজনখানেক হল পেরুলুম— কোথাও একরত্তি ফার্নিচার নেই, দোর জানালায় পর্দা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম, এককালে নিশ্চয় বিস্তর ছবি ঝোলানো ছিল, মেঝের অবস্থা দেখে বুঝলুম এ-মেঝের উপর কখনও কোনও জুতোর চাট পড়েনি— জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল। কঙ্কাল থেকে পূর্ণাবয়ব মানুষের যতখানি ধারণা করা যায় দেয়ালের হুকের সার, ছাতের শেকলের গোছা, দরজা-জানালার গায়ে-লাগানো পরদা-ঝোলানোর ডাণ্ডা থেকে আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা, বাজিঘরের ততখানি আন্দাজ করলুম।

শূন্য শ্মশান ভয়ঙ্কর, কিন্তু কঙ্কালের ব্যঞ্জনা বীভৎস। এ-বাড়িতে থাকব কী করে? চুলোয় যাক প্রাশান জর্মান শেখা।

আন্দাজে বুঝলুম যে আমার জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বাড়ির প্রায় ঠিক মাঝখানে। ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার আমাকে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বজরার মতো খাট, কিন্তু ঘরখানাও বিলের মতো। নৌকোয় চড়া অভ্যাস না-হওয়া পর্যন্ত বিলের মাঝখানে নৌকোয় ঘুমুতে যে-রকম অসহায় অসহায়, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে সে খাটে শুয়ে আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল।

দুপুরে খাবারঘরে গিয়ে দেখি বেন্‌কুয়েট টেবিলে তিনজনের জায়গা। টেবিলের এক মাথায় কর্তা, অন্য মাথায় গিন্নি, মাঝখানে আমি। একে অন্যকে কোনও জিনিস হাত বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই বলে তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। মাস্টার্ড, সস মাথায় থাকুন, গোলমরিচেরও সন্ধান নেই। বুঝলুম পাঁড় প্রাশানের বাড়ি বটে; আড়ম্বরহীনতায় এদের রান্নার সামনে আমাদের বালবিধবার হবিষ্যান্নও লজ্জায় ঘোমটা টানে। কিন্তু ওসব কথা থাক, এরকম ধারা মশলার বিরুদ্ধে জেহাদ আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি।

ভেবেছিলুম বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শুয়ারের মতো হোঁৎকা, টমাটোর মতো লাল, অসুরের মতো চেহারা, দুশমনের মতো এই-মারি-কি-তেই-মারি অর্থাৎ সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে প্রাশান বিভীষিকা, কিন্তু যা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু ইয়োরোপে নেই।

www.pathagar.com

এ যেন নর্মদা-পারের সন্ন্যাসী, বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না-বসে চেয়ারে বসেছেন। দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে— শিরদাঁড়া খাড়া, চেয়ারে হেলান দেননি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্কমুখ, আর সেই শুকনো মুখ আরও পাংশু করে দিয়েছে দু খানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় এতটুকু খাঁজ খায়নি আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মতো। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নিচে, চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা, নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল। সে-চোখে যেন এতটুকু লুকোনো জিনিস নেই। যত বড় অবিশ্বাস্য কথাই এ লোকটা বলুক-না কেন, এর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অবিশ্বাস করার জো নেই।

খেতে খেতে সমস্তক্ষণ আড়-নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন চোখের দিকে, সেই বিষণ্ন ঠোঁটের দিকে আর চিন্তাপীড়িত ললাটের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছি। তখন চোখে পড়ল তাঁর খাবার ধরন। চোয়াল নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, খাবার গেলার সময় গলায় সামান্যতম কম্পনের চিহ্ন নেই।

পরনে প্রাশান অফিসারদের য়ুনিফর্ম তো নয়ই, মাথার চুলও কদম-ছাঁট নয়। ব্যাক্‌ব্রাশ করা চক্‌চটে প্ল্যাটিনামব্লন্ড চুল।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় মনে হল এঁর বয়স। চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর হতেও বাধা নেই। বয়সের আন্দাজ করতে গিয়েই বুঝলুম নর্মদা-পারের সন্ন্যাসীর সঙ্গে এঁর আসল মিল কোন্‌খানে।

এত অল্প খেয়ে মানুষ বাঁচে কী করে, তা-ও আবার শীতের দেশে? সুপ খেলেন না, পুডিং খেলেন না, খাবার মধ্যে খেলেন একটুকরো মাংস— শ্যামবাজারের মামুলি মটন-কট্‌লেটের সাইজ— দুটো সেদ্ধ আলু, তিনখানা বাঁধাকপির পাতা আর এক স্লাইস রুটি। সঙ্গে ওয়াইন, বিয়ার, জল পর্যন্ত না।

আহারে যত-না বিরাগ তার চেয়েও তাঁর বেশি বিরাগ দেখলুম বাক্যালাপে। নতুন বাড়িতে উঠলে প্রথম লাঞ্চের সময় যে-সব গতানুগতিক সম্বর্ধনা, হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা, সিঁড়ির পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে খবরদারি সে সব তো কিছুই হল না— আমি আশাও করিনি— আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রতা-দুরন্ত কৌতূহল, এসব কোনও মন্তব্য বা প্রশ্নের দিক দিয়ে হের ওবের্স্ট (কর্নেল মহাশয়) গেলেন না। আমিও চুপ করে ছিলুম, কারণ আমি বয়সে সক্কলের ছোট।

খাওয়ার শেষের দিকে যখন আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি যে, ডুটেন্‌হফারদের জিভে হয় ফোস্কা নয় বাত, তখন হের ওবের্স্ট হঠাৎ পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেক্সপিয়রের কোন্ নাট্য আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?'

আমার পড়া ছিল কুল্লে একখানাই। নির্ভয়ে বললুম, 'হ্যামলেট।'

'গ্যোটে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্প।'

'একসঙ্গে গ্যোটে পড়ব?'

www.pathagar.com

আমি আনন্দের সঙ্গে, অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালুম। মনে মনে বললুম, 'দেখাই যাক্-না প্রাশান রাজপুত কী রকম কালিদাস পড়ায়। হের ওবের্স্টের চেহারাটি যদিও ভাবুকের মতো, তবু কুলোপানা চক্কর হলেই তো আর দাঁতে কালবিষ থাকে না।

ফ্রাউ ডুটেন্হফার বললেন, 'ভদ্রলোক জর্মন বলতে পারেন।'

'তাই নাকি?' বলে সেই যে ইংরেজি বলা বন্ধ করলেন তার পর আমি আর কখনও তাঁকে ইংরেজি বলতে শুনিনি।

লাঞ্চ শেষ হতেই হের ওবের্স্ট উঠে দাঁড়ালেন। জুতোর হিলে হিলে ক্লিক্ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্ত্রীকে, তার পর আমাকে 'বাও' করে আপন ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাপের বয়সী লোক, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এরকম 'বাও' করে বসবে কী করে জানব বলো। আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে বার বার 'বাও' করে তার খেসারতি দেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মনে মনে মাদামের সামনে বড় লজ্জা পেলুম। পাছে তিনিও আবার কোনও একটা নতুন এটিকেট চালান সেই ভয়ে— যদিও আমার কোনও তাড়া ছিল না— আমি দু মিনিট যেতে না-যেতেই উঠে দাঁড়ালুম, মাদামকে কোমরে দু ভাঁজ করে 'বাও' করে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলুম— হিলে হিলে ক্লিক্টা আর করলুম না, জুতোর হিল্ রবারের ছিল বলে।

চারটের সময় কফি খেতে এসে দেখি হের ওবের্স্ট নেই। মাদাম বললেন, তিনি অপরাহ্নে আর কিছু খান না। মনে মনে বললুম, বাব্বা, ইনি পওহারি বাবার কাছে পৌঁছে যাবার তালে আছেন।

ডিনারে ওবের্স্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ্ আর এক কাপ চা— তা-ও আর পাঁচজন জর্মনের মতো— 'বিনদুধে'!

চাচা থামলেন। তার পর গুনগুন করে অনুষ্টুপ ধরলেন,

'এবমুক্তো হৃষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত।'

তার পর বললেন, 'আমি গুড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি জয় করিনি, নিদ্রাই আমাকে জয় করেছেন, অর্থাৎ আমি ইন্সমনিয়ায় কাতর। কাজেই সংযমী না-হয়েও "যা নিশা সর্বভূতানাং" তার বেশিরভাগ আমি জেগে কাটাই। রাত তিনটের সময় শুতে যাবার আগে জানালার কাছে গিয়ে দেখি কর্তার পড়ার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

দেরিতে উঠি। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেলুম, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিলুম লোহার নালে নালে এমনি বম্শেল্ ক্লিক্ করে যে, মাদাম আঁৎকে উঠলেন। মনে মনে বললুম, 'হিন্দুস্থানিকি তমিজ ভি দেখ লিজিয়ে।'

ওবের্স্টকে জিগ্যেস করলুম, 'আপনি কি অনিদ্রায় ভোগেন?' বললেন, 'না তো।' আমি কেন প্রশ্নটা শুধালুম সে সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল না-দেখিয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দশটায় গ্যোটে-পাঠ।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি আমায় গ্যোটে পড়িয়েছিলেন, দুটি শর্ত প্রথম দিনই আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে। তিনি কোনও পারিতোষিক নেবেন না, আর আমার পড়া তৈরি হোক আর না-হোক, ক্লাস কামাই দিতে পারব না।

www.pathagar.com

মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শেখা কাকে বলে জানো? বুঝিয়ে বলছি। আমরা দেশকালপাত্রে বিশ্বাস করি; গুরুর যদি শরীর অসুস্থ থাকে, ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, পালা-পরবে যদি কোথাও যেতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের যদি অনটন হয়, শিক্ষক অথবা ছাত্রের যদি পড়া তৈরি না-থাকে, গুর্বীর যদি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সংক্রান্ত কোনও বিশেষ প্রয়োজন হয়— এবং তখনকার গম-বরাদ্দের (রেশনিঙের) দিনে তার নিত্য নিত্য প্রয়োজন হত— তা হলে অনধ্যায়। কিন্তু প্রাশান মিলিটারি-মার্গ অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবদুর্বিপাকে বিশ্বাস করে না; আমি বুকে কফ নিয়ে এক ঘণ্টা কেশেছি, ক্লাস কামাই যায়নি, হিন্ডেনবুর্গ হের ওবের্স্টকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ক্লাস কামাই যায়নি। একটি বৎসর একটানা গ্যোটে, আবার গ্যোটে এবং পুনরপি গ্যোটে। তার অর্ধেক পরিশ্রমে পাণিনি কণ্ঠস্থ হয়, সিকি মেহন্নতে ফিরদৌসিকে ঘায়েল করা যায়।

অথচ পড়ানোর কায়দাটা ন-সিকে ভটচার্যি। গ্যোটের খেই ধরে বাইমার, বাইমার থেকে ট্যুরিঙেন্, ট্যুরিঙেন্ থেকে পূর্ণ জর্মনির ইতিহাস; গ্যোটের সঙ্গে বেটোফেনের দেখা হয়েছিল কার্লসবাডে— সেই খেই ধরে বেটোফেনের সঙ্গীত, বাগনারে তার পরিণতি, আমেরিকায় তার বিনাশ। গ্যোটে শেষ বয়সে সরকারি গেহাইমরাট্ খেতাব পেয়েছিলেন, সেই খেই ধরে জর্মনির তাবৎ খেতাব, তাবৎ মিলিটারি মেডেল, গণতন্ত্রে খেতাব তুলে দেওয়াটা ভালো না মন্দ সেসব বিচার, এককথায় জর্মন দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যোটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।

আর এ সবকিছু ছাড়িয়ে যেত তাঁর আবৃত্তি করার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সে ইন্দ্রজালের মোহ বোধহয় আমার এখনও কাটেনি; আমি এখনও বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়— যে-শ্রদ্ধা, যে-অনুভূতি, যে-সংজ্ঞা নিয়ে ডুটেন্‌হফার গ্যোটে আবৃত্তি করতেন— তা হলে ঈপ্সিত ফললাভ হবেই হবে।

পূর্ণ এক বৎসর রোজ দু ঘণ্টা করে এই গুণীর সাহচর্য পেলুম কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর নিজের জীবন অথবা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তিনি কখনও একটি কথাও বলেননি। কেন তিনি মিলিটারি ছাড়লেন, লুডেনডর্ফের আহ্বানে জর্মনিতে নতুন দল গড়াতে কেন তিনি সাড়া দিলেন না (কাগজে এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হত), পেন্সন্ কেন তিনি ত্যাগ করলেন, না-করে পারিবারিক তৈলাঙ্কন তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত না— এ সব কথা বাদ দাও, একদিনের তরে ঠাট্টাচ্ছলেও তাঁকে বলতে শুনিনি প্রথম যৌবনে তিনি সোয়া দু বার না আড়াইবার প্রেমে পড়েছিলেন অথবা ছাত্রাবস্থায় মাতাল হয়ে ল্যাম্পপোস্টকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে কান্নাকাটি করেছিলেন কি না।

পূর্ণ এক বৎসর ধরে এই লোকটির সাহচর্য পেয়েছি, তাঁর সংযম দেখে মুগ্ধ হয়েছি— মদ না, সিগরেট না, কফি না; বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত-বাতায়ন নিরিন্ধন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা, আত্মসম্মান রক্ষার্থে পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন, আহারে বিরাগ, ভাষণে অরুচি, দন্তহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ, গুড়াকেশ— সবকিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে আমি নিজের অজানায় তাঁকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলুম। ডুটেন্‌হফারের শিষ্যত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণ করে আমি যে দস্তানা, ওভারকোট, টাই কলার ছাড়লুম, আজও তা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করিনে। কিন্তু কিসে আর কিসে তুলনা করছি!'

চাচা বললেন, 'শুধু একটা জিনিসে হের ওবের্স্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিনে জিনিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জাতিভেদের কথা ওঠে। আমি মুসলমান, তার ওপর ছেলেবেলায় দু হাত তফাতে দাঁড়িয়ে বামুন পণ্ডিতকে স্লেট দেখিয়েছি, কৈশোরে হিন্দু-হস্টেলে বেড়াতে গিয়ে ঢুকতে পাইনি, জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়ার কথা নয়। তার-ই প্রকাশ দিতে হের ওবের্স্ট জাতিভেদের ইতিহাস, তার বিশ্লেষণ, বর্তমান পরিস্থিতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এমনি তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা কতকগুলি কথা বললেন যে আমার উষ্মার চোদ্দ আনা তখনি উবে গেল। দেখলুম, শুধু যে তিনি মনুসংহিতার জর্মন অনুবাদ ভালো করে পড়েছেন তা নয়, গুহ্য ও শ্রৌতসূত্রের তাবৎ আচার-অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন— অবশ্য সংস্কৃতে নয়, হিলেব্রান্টের জর্মন অনুবাদে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী, বৈজ্ঞানিক পরশপাথর দিয়ে বিচার করলে তার কতটা গ্রহণীয় কতটা বর্জনীয়, বিজ্ঞান যেখানে নীরব সেখানে কিংকর্তব্য এসব তো বললেনই, এবং যেসব সমস্যায় তিনি স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে-সবগুলোও বিশেষ উৎসাহে আমার সামনে উপস্থিত করলেন।

অথচ কী বিনয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন— প্রাশান কৌলীন্য যেন দম্ভপ্রসূত না-হয়। প্রাশান কৌলীন্য জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবি করে না, তার দাবি শুধু এইটুকু যে তার বিশেষত্ব আছে, সে-বিশেষত্বটুকুও যদি পৃথিবী স্বীকার না-করে তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু অন্ততপক্ষে পার্থক্যটুকু যেন স্বীকার করে নেয়। হের ওবের্স্ট তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি সেইটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সে-পার্থক্যের জন্য 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে।

এবং সেই পার্থক্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দেখতে হবে রক্তসংমিশ্রণ যেন না-হয়।

নিটশের সুপারম্যান?

না, না। শুধু বড় হওয়ার জন্য বড় হওয়া নয়, শুধু 'সুপার' হওয়ার জন্য 'সুপার' হওয়া নয়। প্রাশান আদর্শ হবে ত্যাগের মধ্য দিয়ে, আত্মজয়ের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার।

এবং যদি দরকার হয়, তার জন্য সংগ্রাম পর্যন্ত করা। সেবা করার জন্য যদি দরকার হয় তবে যে সব অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ তার অন্তরায় হয় তাদের বিনাশ করা।

আমার কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকল। সেবার জন্য সংগ্রাম, বাঁচবার জন্য বিনাশ?

হের ওবের্স্ট বলতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন? সেইটে বার বার পড়তে হয়, বুঝতে হয়। ভুললে চলবে না, জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।'

আমি প্রথম দিনের আলোচনার পরই বুঝতে পেরেছিলুম হের ওবের্স্টের সঙ্গে তর্ক করা আমার ক্ষমতার বহু বহু উর্ধ্বে কিন্তু এই 'সেবার জন্য সংগ্রাম' বাক্যটা আমার কাছে বড়ই আত্মঘাতী, পরস্পরবিরোধী বলে মনে হল। রক্ত-সংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণবিসর্জন,

www.pathagar.com

এ-ও যেন আমার কাছে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার কোন্ কোন্ জায়গায় বাধছে হের ওবের্স্ট-র কাছে সেগুলোও অজানা ছিল না।

লক্ষ করলুম, এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে। কিন্তু স্বল্প হলে কী হয়, শব্দের বাছাই, কল্পনার ব্যঞ্জনা, যুক্তির ধাপ এমনি নিরেট ঠাসবুনুনিতে বক্তব্যগুলোকে ভরে রাখত যে সেখানে সূচ্যগ্র ঢোকাবার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। এবং আরও লক্ষ করলুম যে একমাত্র রক্তসংমিশ্রণের ব্যাপারেই তিনি যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

বিষয়টি যে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে সেটা বুঝতে পারলুম একদিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন তিনি আমার ঘরে এসে বললেন, 'এত রাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না; আমাদের আলোচনার সময় একটি কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটি হল "সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি যিনি সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, একমাত্র তারই অধিকার সেবার ভার গ্রহণ করার, সেবার জন্য সংগ্রাম করার"।'

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না-করে হিল্‌ক্লিকের সঙ্গে 'বাও' করে বেরিয়ে গেলেন।

এত রাত্রে এসে এইটুকু বলার এমন কী ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল?

হের ওবের্স্টের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, বাড়ির লনে পাইচারি করেছি, পৎস্‌দাম পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে চাষাদের বাড়িতে খেয়েছি, পুরনো বইয়ের দোকানে প্রাচীন মাসিক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, অধিকাংশ সময় তিনি চুপ, আমিও চুপ। তাঁকে কথা বলাতে হলে প্রাশান ঐতিহ্যের প্রস্তাবনা করাই ছিল প্রশস্ততম পন্থা। একদিন শুধালুম, 'ফ্রান্সের সঙ্গে আপনাদের বনে না কেন?'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'না-বনাই ভালো। এরকম ধ্বংসমুখ দেশ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। প্যারিসের উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস দেখেছেন? কোন্ সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?'

আমি বললুম, 'বার্লিনেও 'কাবারে' আছে।'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'বার্লিন জর্মনি নয়, প্রাশার প্রতীক নয়, কিন্তু প্যারিস ফ্রান্স এবং ফ্রান্স প্যারিস।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যে-সমস্যা মানুষের মনকে অহরহ আন্দোলিত করে শেষ পর্যন্ত সে-সমস্যা নিজের জীবনে, নিজের পরিবারের জীবনে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই নিয়ে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একদিন না-একদিন আলোচনা করে। হের ওবের্স্টকে কখনও আলোচনার সে দিকটা মাড়াতে দেখিনি।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারকে আমি অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প-কাহিনী বলতুম। হের ওবের্স্টের তুলনায় যদিও তাঁর সঙ্গে দেখা হত কম, তবু তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বেশি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হের ওবের্স্টের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, না-জেনে হয়তো আমি এমন বিষয়ের কথা পাড়ব যাতে তাঁর আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশ্বাস তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন— তাই এ-প্রশ্ন শুধালাম।'

ফ্রাউ ওবের্স্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখের ভাব থেকে মনে হল তিনি মনে মনে 'বলি কি বলি না' করছেন। শেষটায় ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের পরিবারের

www.pathagar.com

কথা কখনও পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে গেছে, আমাদের মেয়ে—'

কথার মাঝখানে ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার হঠাৎ দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। এই বেকুব গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতো-পেটা করলুম। অতটা বুদ্ধি কিন্তু তখনও ছিল যে এসব অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয় মাত্র। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রাশানরা হয়তো তখনও হিল্ ক্লিক করে।

বড় ছেলে মরে যাওয়াতে বয়স্ক চাষাকে একদম ভেঙে পড়তে দেখেছি। তার তখন দুঃখ সে মরে গেলে তার খেত-খামার দেখবে কে। সভ্যতা কুলটুরের পয়লা কাতারের শহরে তারই পুনরাবৃত্তি দেখলুম ডুটেন্‌হফার পরিবারে। এত ঐতিহ্য, এত সাধনা, এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব এসে শেষ হবে এই ডুটেন্‌হফারে?

তাই কি এত কৃচ্ছ্রসাধন, রক্তসংমিশ্রণের বিরুদ্ধে এত তীব্র হুঙ্কার? যে বর্ষায় সফল বৃষ্টি হয় না সেই বর্ষাতেই কি দামিনীর ধমক, বিদ্যুতের চমক বেশি?

তাই হের ওবের্স্টের পড়াশুনোরও শেষ নেই। সভ্য অসভ্য বর্বর বিদগ্ধ দুনিয়ার তাবৎ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজগঠন, ধর্মনীতি পড়েই যাচ্ছেন, পড়েই যাচ্ছেন। শীতের রাতে আগুন না-জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি, বসন্তে বেখেয়ালে বৃষ্টিতে জবজবে হয়ে বাড়ি ফেরা, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবস বিদেশি মুসলমানকে প্রাশান ধর্মের মূল তত্ত্বে ওকিবহাল করার অন্তহীন প্রয়াস, হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন্ নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো কোণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।

কিন্তু আমার সামনে তিনি কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেননি। এসব আমার নিছক কল্পনাই হবে।

এক বৎসর ঘুরে এল। আমি ততদিনে পুরো পাক্কা প্রাশান হয়ে গিয়েছি। চেয়ারে হেলান না-দিয়ে বসি, সুপে গোলমরিচের গন্ধ পেলে ঝাড়া পনেরো মিনিট হাঁচি, একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করতে পারি, তিন দিন না-ঘুমুলেও চলে— যদিও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার নিদ্রাকৃচ্ছ্রতা তখন অনেকটা সেরে গিয়েছে— কাঠের পুতুলের মতো খট খট করে হাঁটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আমার জর্মন উচ্চারণ শুনে কে বলবে আমি ভাত-খেকো, নেটিব, কালা-আদমি। সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও খানিকটে হল যে হের ওবের্স্টের হৃদয় বলে যদি কোনও রক্তমাংসে গড়া বস্তু থাকে তবে তার খানিকটে আমি জয় করতে পেরেছি।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনের প্রাশান-পর্বকে তার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিল।

কলেজ থেকে ফিরেছি। দোরের গোড়ায় দেখি একটি যুবতী পেরেমবুলেটরের হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। চেহারাটি ভারি সুন্দর, হুবহু হের ওবের্স্টের মতো। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই। আমিও দাঁড়ালুম, প্রাশান এটিকেট যদিও সে-অবস্থায় কাউকে সেখানে দাঁড়াতে কড়া বারণ করে। তবুও যদি কেউ দাঁড়ায় তবে সেই প্রাশান এটিকেটেরই অলঙ্ঘ্য আদেশ, হের ওবের্স্ট তাকে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনি এটিকেট লঙ্ঘন করলেন— সেই প্রথম আর সেই শেষ।

www.pathagar.com

আমি তখন আর প্রাশান না। আমার মুখোশ খসে পড়েছে। আমি ফের কালা-আদমি হয়ে গিয়েছি। আমি নড়ব না।

মেয়েটি কী বললেন বুঝতে পারলুম না।

হের ওবের্স্ট বললেন, 'তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমার সঙ্গে যোগ-সূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করবে না। তাই আর একবার, শেষবারের মতো বলছি, তুমি যদি আবার এরকম চেষ্টা করো, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার সন্ধানের বাইরে যেতে হবে।'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। ছুটে গেলুম ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের কাছে। বললুম, 'আপনার মেয়ে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আপনার স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে সদর দরজার দিকে চললুম। করিডরে শুনি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, দেখি, হের ওবের্স্ট ফিরে আসছেন। আমি তখন ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটলুম মেয়েটির সন্ধানে। তাঁকে পেলুম বাড়ির সামনের রাস্তায়। তখনও কাঁদছেন । তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম, তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। ঋজু, শক্ত, প্রাশান-হাতে হের ওবের্স্টের লেখা। আমার বুক কেঁপে উঠল। খুলে পড়লুম—

'আপনার কর্তব্যবুদ্ধি আপনাকে যে-আদেশ দিয়েছিল আপনি তাই পালন করেছেন। আমি তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এর পর আপনার সঙ্গে আমার আর কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে না।

আপনার বাড়ি পেতে কোনও কষ্ট হবে না-জেনেই বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে আমার বক্তব্য জানালুম।'

হের ওবের্স্টকে ততদিনে এতটা চিনতে পেরেছিলুম যে, তাঁর হৃদয় থাক আর না-ই থাক, তাঁর প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না। পরদিন সকালবেলা ডুটেন্‌হফারদের বাড়ি ছাড়লুম। হের ওবের্স্টের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করিনি। ফ্রাউ কপালে চুমো খেয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আড্ডা এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কে যেন জিগ্যেস করল— সকলের হয়ে— 'কিন্তু মেয়েটির দোষ কী ছিল?'

চাচা বললেন, 'হের ওবের্স্টের গোর দিতে যাই তার প্রায় বৎসরখানেক পরে। সেখানে শুনলুম, তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, এবং তিনি জাতে ফরাসি।'

মুখুয্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর অধ্যাপক কী বলছিল রে? বর্ণসঙ্কর-ফঙ্কর আবোল-তাবোল কথা? বর্ণসঙ্করের প্রতি দরদ দেখিয়েছিলুম বলে হের ওবের্স্ট তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীকে অকাতরে অপাঙ্‌ক্তেয় করলেন।

এবং নিজে? অর্ধ-অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে না-তাড়ালে হয়তো তিনি আরও বহুদিন বাঁচতেন। তিনি আর কোনও পেয়িং-গেস্ট নিতে রাজি হননি। একে নিরম্বু উপবাসে মৃত্যু বলা চলে না সত্যি, কিন্তু এরও একটি পদবি থাকা উচিত। কী বলো গোঁসাই?'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা বলল, 'শেষ ট্রেন মিস করেছি।'

চাচা বললেন, 'চ, প্রাশান কায়দায় পাঁচ মাইল ডবলমার্চ করা দেখিয়ে দিই।'

www.pathagar.com

মা-জননী

যুদ্ধের পূর্বে লন্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডাল-রুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদবাকি সমস্ত কন্টিনেন্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের রু্য দ্য সমোরারের 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লন্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন কারণ ১৯২৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনও হিটলার বার্লিনে কল্কে পাননি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এককোণে বাঙালিদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ সূয্যি রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে-বাইরে তাঁর প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনও আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিনি কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে খয়রাতে হাতিম-তাই আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইংরুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালির দোষ এবং গুণ দুই-ই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সূয্যি রায় চুক্‌চুক্ করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডি-কিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট্ ব্রাউন আর ব্রুনেট্ চুলের তফাৎটা ঠিক কোন্ জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন এমন সময় আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে', গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা— লাস্ট ট্রেন মিস্ করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মতো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কী রে, কী হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বয়স সতের হয় কি না-হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কি দেশে কি বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্প বয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সূয্যিমামা' না-থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাস করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বলল, 'আমার ল্যান্ডলেডি আর তার মেয়েতে কী ঝগড়াটাই-না লেগেছে যদি দেখতেন। মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিগ্যেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে?'

www.pathagar.com

'চল্লিশ হয়নি বোধহয়।'

'মেয়ের?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল। এতে তোর এত বেকুব বনার কী আছে রে? মা-মেয়ে যদি একসঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধে হবে না?'

মৌলা বলল, 'কী ঘেন্না! মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কী ঘেন্না, মায়ে-মেয়ে এই নিয়ে লড়াই। মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকোলের উপর লাফিয়ে পড়ল। একদল বলে বাচ্চার জন্য মায়ের ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশি, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা আর একান্ন পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার ওপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারি', কাজেই সে যে মা-মেয়ে সক্কলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা-যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নরূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেননি। কথাকাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা-বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে-মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কী হে রায় সায়েব? তুমিও এ-কথা বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্টে দিয়ে বলো-না কেন, জর্মনিতেও একদিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশিরভাগ ল্যান্ডলেডিই বিধবা, আর যাদের বয়স ষোলর উপরে তারাই-বা বর জোটাবে কোত্থেকে? আরও বহুদিন ধরে চলবে কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদন। ১৪-১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন্ হিসেবে?'

গোঁসাই বললেন, কিন্তু—'

চাচা বললেন, "তবে শোনো।

কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসরখানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকা-পয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশি শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্নাটা কোন্ চাকরি নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরিজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের— এমন সময়ে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্ৎসেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় লবাব-পুত্তুর কী ভেবে?"

"তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়ট' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গারাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।"

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানাতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়— 'বিলক্ষণ।'

www.pathagar.com

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাইটে কবিতায়—

'কাইনেন্ ট্রোপ্‌ফ্‌ষেন্ ইন্ বেষার্ মের্,
উন্‌ট্ ডাস্ বয়টেল্ শ্লাপ্ উন্‌ট্ লের্ ॥

গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
ট্যাঁক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার ॥'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ-নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া-থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইন-ল্যান্ডে। বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজি হলুম। দু দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।

মৌলা শুধাল, 'যেখান থেকে "ও দ্য কলন" আসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তার পর কলনে গাড়ি বদল করে বন্ন, বন্ন থেকে গোডেসবের্গ্। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর্ হয়ে গেল। ভারি ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি— বার্লিনের তুলনায় সোঁদরবন।'

'হঠাৎ-নবাবই' বটে। না-হলে জর্মনির আপন খাসা মের্ৎসেডেজ থাকতে রোল্‌স্ কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নিকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যা-ই হোক, আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু জনাই ইয়া লাশ— কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নি হুইপট্ ক্রিম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নির পা দু খানা ফাইলেরিয়ায় ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোলবালিশের মতো একাকার। দু জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন— ছোট্ট মুখ দু খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনওগতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়ে-জুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নিকে ঠেলেন, গিন্নি কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তাঁরা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে দু জনেই ঘাবড়ে যান— পাছে কোনও ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না-থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তা হলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরি হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ— যেন গ্রিক ভাস্করশাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনও জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না আর সানবাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধানের রঙ ধরেছে, চোখদুটি আমাদেরই শরতের আকাশের মতো গভীর আসমানি।

www.pathagar.com

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী— রোগীর নার্স। গিন্নি আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরই শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটুকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা'।

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা।'

রায় বললেন, 'চোপ।'

চাচা কোনও কথায় কান না-দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।'

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথমদর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনিভাবে তাকিয়েছিল যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত-না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশি, গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা— কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই— একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারও কথা শোনার সময়ও এমনভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার ওপর গানের ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন;— গ্যোটে, হাইনে, ম্যোরিকে, রুয়কের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেন্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে সব গান সে কখনও কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনও আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়েছে তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনও এমেচারের গলায় শুনিনি।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরেই লক্ষ করলুম, কথা বলার মাঝখানে সিবিলা আচমকা কেমনধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি-কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি— সিবিলা কিন্তু দেখতে পায়নি। ভাবলুম, নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে?

এমন সময় একদিন গিন্নি আমায় খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্রমহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সবকিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে, গিন্নি খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা! পাঁচ মাস। আর বেশিদিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়নি। আমি গিন্নিকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নি বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কী? এ-অবস্থায় চাকরি তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

গিন্নির আন্দাজ ভুল; কর্তা খবরটা শুনে দু হাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েননি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেননি। প্রথমে ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, 'সিবিলার সঙ্গে

www.pathagar.com

খোলাখুলি কথাবার্তা না-বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মতো কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে তবে বড় উপকার হয়। অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আমি রাজি হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা-গিন্নি দু জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কী করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি বুঝতে পারলুম। এদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে গ্যোটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে ঠাসা জালে-পড়া স-বৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন 'পা ছুড়ে ছুড়ে জাল ছেঁড়ো'; ও বলছে 'ছোড়াছুড়ি করলে বাচ্চা হয়তো জখম হবে।'— ইনি জিগ্যেস করছেন, 'বাচ্চার বাপ কে?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনও লাভ নেই, সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরিব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কেঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।

চাচা স্পর্শকাতর বাঙালি, কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশি, বাবা খুশি। দু দিন আগে নির্মমভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলে, সে মিষ্টি হাসে— কী রকম লজ্জা, খুশি আর গর্বে মেশানো। ছোটবোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় দু বেলা গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।'

আর এ-মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিঙ-হোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কী গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনও লাভ নেই। বিপদআপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কী মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান-গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করেছিল!

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল।

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, কোনও পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয় কিন্তু জর্মনির সে দুর্দিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে— আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই!

www.pathagar.com

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিঙ-হোম্ বলে, সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড্ দখল করে সে শুধু আসন্ন-প্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেননি। আমাকে পর্যন্ত দু-তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিঙ-হোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভুঁড়ি গিরে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল।

সবকিছু জানতে পেয়ে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভান করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এরচেয়ে ভালো ওতরাতো না। ক্নুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়।' সিবিলার মতো ভিতরে-বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠল।

এমন সময় কর্তা— কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু, শিক্ষিত পরিবার কিন্তু আমাদের এজেন্ট বলল 'পার্টি'— অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী— কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা করবে না, যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নতুন নয়, কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না-হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে তা হলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মতো ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিঙ-হোমে যাননি। সবকিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজি।

মনস্থির করতে সিবিলার দু দিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘণ্টা তার কী করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই একসঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব-বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার; সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোনও কেতাবে লেখা নেই, কোনও বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রাঙ্ক-কলে ট্রাঙ্ক কলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবেন। 'পার্টি'র ওয়েট নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াক্কড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট নার্সকেও না-দেখতে পায়।

যেদিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা সে-দিন দুপুরবেলা কার্লের গলা দিয়ে একঝলক রক্ত উঠল। ছ মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তার পর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কী-একটা রসিকতায় হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবেচিন্তে রসিকতাখানা তৈরি

www.pathagar.com

করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো। আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা-গিন্নি এতদিন ধরে যে-আদর আপ্যায়ন করেছেন তার বদলে যদি সে-সন্ধ্যায় আমি কর্তার বদলে সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না-যেতুম তা হলে নিছক নিমক-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। আমি নার্সিঙ-হোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নি নিজের থেকে আরও কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিঙ-হোম থেকে স্টেশন যেতে হলে দুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিইনি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামকা বেশি জানাজানি না-হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি; মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সেদিকে তাকাইনি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি— ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানিনে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক?' আমি আমার সাধ্যমতো তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরও গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কী করে জানলুম তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে-সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে-প্রশ্ন একবারও শুধাল না তখন বুঝতে পারলুম, তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য হয়ে উঠছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়— যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন্ দিকে, কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ওই তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনও খেলনা নেই।' তাই তো, কর্তা, আমি দু জনেই এদিকে একদম খেয়াল করিনি। কিন্তু এক মাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

একগাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না-যেতেই সিবিলা বলল, 'ওই তো জামা-কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামালুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকল, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনও বাছবিচার না, দাম জিগ্যেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিক তো', আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশি দেরি নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন।'

www.pathagar.com

আরও দশ পা। সিবিলা হুকুম করল, 'থামান।'

এবারে কী কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান', সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেবে পড়ে আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে-দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মতো এদিক-ওদিক তাকায়— সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো দু মিনিট বেশি খোলা রাখতে পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্রলাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লিজ, জায়েন জি ফেরনুন্‌ফ্‌টিষ্‌, এ কী করছেন? গাড়ি ধরব কী করে?' সিবিলা কোনও কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম, 'এতসব জিনিসের কী প্রয়োজন?'

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তার পর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।

চাচা বললেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তার পর আমি আর বাধা দিইনি। যায় যাক্ দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধহয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিগ্যেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনও পাওনা আছে? আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলল, 'পাঁচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে।

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেসবের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম, কোনও কথা না-বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর— '। আমি কোনও কথা না-বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন্ জায়গায় দাঁড়ালে সেকেন্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরও পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। এক মুহূর্তের তরে সবকিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন; আমাদের পুরুষরা তো পারে না।'

www.pathagar.com

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেস তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে আমার দু-হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাহা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই, বিকৃত কণ্ঠে বলল—

'আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ,— না, না, মা মেরির না— আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক।

পোর্টার হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কাম্‌রার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরেসুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ করল কি না বলতে পারিনে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আমি বাধা দিলুম না।'

তীর্থহীনা

ভারতবর্ষের লোক এককালে লেখাপড়া শেখবার জন্য যেত কাশী তক্ষশিলা। মুসলমান আমলেও কাশী-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি, ছাত্রের অভাবও হয়নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরবি-ফারসি শিক্ষারও দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ আর রামপুরে গড়ে উঠল। ইংরেজ আমলে সব কটাই নাকচ হয়ে গিয়ে শিক্ষা-দীক্ষার মক্কা-মদিনা হয়ে দাঁড়াল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ। ভটচায-মৌলবী কোন্ দুঃখে কাশী-দেওবন্দ উপেক্ষা করে ছেলে— এমনকি মেয়েদেরও— বিলেত পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার আলোচনা করে আজ আর লাভ নেই।

কিন্তু ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। 'অসহযোগী' ছাত্রদের কেউ কেউ বিলেতে না গিয়ে গেল বার্লিন। এদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে শেষটায় ১৯২৯-এ এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যার ওপর ভর করে একটা রেস্তোরাঁ চালান সম্ভবপর হয়ে উঠল। তাই বার্লিনে 'হিন্দুস্থান হৌসে'র পত্তন।

সেদিন 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডা ভালো করে জমছিল না। কোত্থেকে এক পাদ্রিসায়েব এসে হাজির। খোদায় মালুম কে তাকে বলেছে, এখানে একগাদা হিদেন ঝামেলা লাগায়। প্রভু খ্রিস্টের সুসমাচার শুনতে না-শুনতেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রভুর স্মরণ নেবে ও সুবে বার্লিনিস্থানে পাদ্রিসায়েবের জয়জয়কার পড়ে যাবে। অবশ্যি তাঁর ভুল ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগেনি। গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ, আর এ-দুনিয়ার তাবৎ সঙ্গীতই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। কাজেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তিনি ধর্মবাবদে খানিকটা ওকিবহাল। বললেন, 'সায়েব,

www.pathagar.com

খ্রিস্টধর্ম যে উত্তম ধর্ম তাতে আর কী সন্দেহ কিন্তু আমাদের কাছে তো শুধু এই ধর্মটাই ভোট চাইছে না, হিন্দু-মুসলমান আরও দুটো ডাঙর কেন্ডিডেট রয়েছে যে। গীতা পড়েছ?'

তখন দেখা গেল পাদ্রি কুরান পড়েনি, গীতার নাম শোনেনি, আর ত্রিপিটক উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেল।

ঘণ্টাখানেক তর্কাতর্কি চলেছিল। ততক্ষণে ওয়েট্রেস পাশের একটা বড় টেবিলে আড্ডার ডাল-ভাত-চচ্চড়ি সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রিকে দাওয়াত করলেন হিদেন্-খানা চেখে দেখতে। সায়েব বিজাতীয় আহারের দিকে একটিবার নজর বুলিয়েই অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কেটে পড়ল।

চাচা বললেন, 'দেখলি, অচেনা রান্না পরখ করে দেখবার কৌতূহল যার নেই সে যাবে অজানা ধর্মের সন্ধানে। গোঁসাই, তুমি বৃথাই শক্তিব্যয় করছিলে।'

সূয্যি রায় মাস্টার্ড পেতলে নিয়ে কাসুন্দির মতো করে লুচির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, 'ব্যাটা গ্যোটেও পড়েনি নিশ্চয়। গ্যোটে বলেছেন, 'যে বিদেশ যায়নি সে কখনও স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পায়নি। ধর্মের বেলাও তাই'।

চাচা বললেন, 'কিন্তু অনেক কঠিন। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বিদেশে যাওয়ার জন্য স্থূল ট্রেন রয়েছে, স্থূলতর জাহাজ রয়েছে, আর টমাস কুক্‌রা তো আছেই। বিদেশে নিয়ে যাবার জন্য ওরাই সবচেয়ে বড় আড়কাঠি অর্থাৎ মিশনরি। আর এতই পাক্কা মিশনরি যে ওরা সক্কলের পকেটে হাত বুলিয়ে দু পয়সা কামায়ও বটে। কিন্তু ধর্মের মিশনরিদের হল সবচেয়ে বড় দেউলে প্রতিষ্ঠান।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বলল, 'কিন্তু কী দরকার বাওয়া এসব বখেড়ার? বার্লিন শহরটা তো ধর্ম বাদ দিয়েও দিব্যি চলছে।'

চাচা বললেন, 'বাদ দিতে চাইলেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। শোন।

আমি যখন রাইল্যান্ডের গোডেস্‌বের্গ শহরে ছিলুম তখন ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে আমার অল্প অল্প পরিচয় হতে আরম্ভ হল। না হয়ে উপায়ও নেই। বার্লিনের হৈ-হুল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে আর রাইনল্যান্ডের গির্জার সংগীত তামাম দেশটাকে বন্যায় ভাসিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দু'য়েকটি তান—'

এ তো তা-ও নয়। এখানে সমস্ত দেশব্যাপী সঙ্গীতবন্যা আর তার মাঝখানে আমি ক্যাথলিক নই বলে শাখামৃগের মতো একটা গাছের ডগায় আঁকড়ে ধরে বসে প্রাণ বাঁচাব এ ব্যবস্থা আমার কিছুতেই মনঃপূত হল না,— তার চাইতে বাউলের উপদেশই ভালো, 'যে জন ডুবলো সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

সমস্ত সপ্তাহের অফুরন্ত কাজ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বার্লিনের লোক খানিকটে ঠাণ্ডা করে সারা রবির সকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু রাইনের জীবন বিলম্বিত একতালে। তাই রবির সকাল রাইনের দ্রষ্টব্য বস্তু।

www.pathagar.com

কাচ্চা-বাচ্চারা চলেছে রঙ-বেরঙের জামা কাপড় পরে, কতকগুলি করছে কিচির-মিচির, কতকগুলি বা মা-বাপের কথামতো গির্জার গাম্ভীর্য জোর করে মুখে মাখবার চেষ্টা করছে, মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সিতে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এ-দিক ও-দিক করে নিচ্ছে, গ্রামভারী গাঁও-বুড়োরা রবিবারের নেভি-ব্লু স্যুট পরে চলেছেন গিন্নিদের সঙ্গে ধীরে মন্থরে, আর যেসব অথর্ব বুড়ো-বুড়ি সপ্তাহের ছ দিন ঘরে বসে কাটান তাঁরা পর্যন্ত চলেছেন লাঠিতে ভর করে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে, অথবা হুইল-চেয়ারে বসে ছেলে-ভাইপোর মোলায়েম ঠেলা খেয়ে খেয়ে— বাচ্চারা যেরকম-ধারা পেরেম্বুলেটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয়। জোয়ানদের ভিতর গির্জায় যায় অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু যারা যায় তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্ত ভাব— এরা গির্জার কাছ থেকে এখনও অনেক কিছু আশা করে, ধর্ম এখনও তাদের কাছে লোকাচার হয়ে যায়নি।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তায় কারবারি ভিড় নেই। শহর-গ্রাম শান্ত, নিস্তব্ধ। তাই শোনা যাচ্ছে গির্জার ঘণ্টা— জনপদ, হাটবাট, তরুলতা, ঘরবাড়ি সবই যেন গির্জার চূড়ো থেকে ঢেলে দেওয়া শান্তির বারিতে অভিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

চাচা থামলেন। বোধ করি বার্লিনের কলরবের মাঝখানে রাইনের সে ছবির বর্ণনা তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল। খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এহ বাহ্য। ক্যাথলিক ধর্ম ক্রিশ্চানের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু ঠাঁই পেয়েছে জানিনে, কিন্তু গির্জার ভিতরে তার যে রূপ সে না দেখলে, না শুনলে বর্ণনা দিয়ে সে-জিনিস বোঝাবার উপায় নেই।

মানুষ তার হৃদয়, তার চিন্তাশক্তি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার শোকনৈরাশ্য দিয়ে বিরাট ব্রহ্মকে আপন করে নিয়ে কত রূপে দেখেছে তার কি সীমা-সংখ্যা আছে? ইহুদিরা দেখেছে য়েহোভাকে তাঁর রুদ্ররূপে, পারসিক দেখেছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের প্রতীকরূপে, ইরানি সুফি তাঁকে দেখেছে প্রিয়ারূপে, মরমিয়া বৈষ্ণব তাঁকে দেখেছে কখনও কৃষ্ণরূপে কখনও রাধারূপে আর ক্যাথলিক তাঁকে দেখেছে মা-মেরির জননীরূপে।

তাই মা-মেরির দেবী-মূর্তি লক্ষ লক্ষ নরনারীর চোখের জল দিয়ে গড়া। আর্ত পিপাসার্ত বেদনাতুর হিয়া যখন পৃথিবীর কোনওখানে আর কোনও সান্ত্বনার সন্ধান পায় না, তখন তার শেষ ভরসা মা-মেরির শুভ্র কোল। যে মা-মেরি আপন দেহজাত সন্তান কণ্টকমুকুটশির যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পলে পলে মরতে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে, তিনি কি এই হতভাগ্য কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়বেদনা বুঝতে পারবেন না? নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি আজ বসে আছেন দিব্য সিংহাসনে— তাঁর অদেয় কিছুই নেই, মানুষের অশ্রুবারি সপ্তসিন্ধু হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হানা দিলেও তিনি সে-সপ্তসিন্ধু মুহূর্তের ভিতরেই করাঙ্গুলি নির্দেশে শুকিয়ে দিতে পারেন। তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ক্যাথলিক গির্জায় গির্জায়,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণী জাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যিশু। মহিমাময়ী মা-মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

www.pathagar.com

কত হাজারবার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। এই "আভে-মারিয়া" উপাসনামন্ত্র খ্রিস্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের মেন্ডেল্‌জোনকে পর্যন্ত যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তারই ফলে মেন্ডেল্‌জোন সুর দিয়েছেন মেরিমন্ত্রকে। ক্যাথলিকরা সেই সুরে মেরিমন্ত্র গেয়ে বিশ্বজননীকে আহ্বান করে অষ্টকুলাচলশিরে, সপ্তসমুদ্রের পারে পারে।

কত লক্ষবার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। পুরুষের সবলকণ্ঠে, বৃদ্ধার অর্ধস্ফুট অনুনয়ে, শিশুর সরল উপাসনায় মিলে গিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সে মন্ত্র তখন আর শুধু ক্যাথলিকদের নিজস্ব প্রার্থনা নয়, সে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব আস্তিক, সর্ব নাস্তিক।

হঠাৎ মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে সমস্ত গির্জা ভরে ওঠে যন্ত্রধ্বনিতে। বিরাট অর্গান সুরের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে গির্জার শেষ কোণ, ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে-গম্ভীর যন্ত্ররব, আর তার সঙ্গে গেয়ে ওঠে সমস্ত গির্জা সম্মিলিত কণ্ঠে—

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।'

সেই ঊর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সঙ্গীতের প্রতীক ঊর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। মানুষের যে-প্রার্থনা যে-বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্রকোলের সন্ধানে ঊর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্যসিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

চাচা চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন। তার পর চোখ মেলে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোঁসাই, রবিঠাকুরের সেই গানটা গাও তো,

'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী।'

গোঁসাই গুনগুন্ করে গান গাইলেন। গাওয়া শেষ হলে চাচা বললেন, 'গির্জার ক্যাথলিক ধর্মসঙ্গীত তোমরাও শুনেছ কিন্তু তার করুণ দিকটা কখনও লক্ষ করেছ কি না জানিনে।

একদিন যখন আমি এই "আভে মারিয়া" সঙ্গীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চিলের মতো উপরের দিকে উঠে যাচ্ছি— বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই— তখন হঠাৎ শুনি আমার পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চেয়ে দেখি একটি মেয়ে চোখের জলে প্রেয়ার-বুক্-রাখার হাইবেঞ্চ আর তার পায়ের কাছে খানিকটে জায়গা ভিজিয়ে দিয়েছে। অর্গান আর পাঁচশো গলার তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটি আপন কান্না কেঁদে নিচ্ছে।

পূব-বাংলার ভাটিয়ালি গানে আছে— রাধা ভেজাকাঠ জ্বালিয়ে ধুঁয়ো বানিয়ে কৃষ্ণ-বিরহের কান্না কাঁদতেন। শাশুড়ি-ননদী জিগ্যেস করলে বলতেন, ধুঁয়ো চোখে ঢুকেছে বলে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। শুনেছি বাঙালি মেয়েও নাকি নির্জনে কাঁদবার ঠাঁই না-পেলে স্নানের ঘরে কল ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে হাউহাউ করে কাঁদে।

গির্জায় মেয়েটির কান্না দেখে আমি জীবনে প্রথম বুঝতে পারলুম, রাধার কান্না, বাঙালি মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে ফেটে বেরোয়।

www.pathagar.com

তখন বুঝতে পারলুম, গির্জা থেকে বেরুবার সময় যে অনেক সময় দেখেছি এখানে ওখানে জলের পোঁচ সে ছাতার জল নয়, মেঝে ধোওয়ার জলও নয়, সে জল চোখের জল।

কুরান শরীফে আছে কুমারী মরিয়ম (মেরি) যখন গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন তখন লোকচক্ষুর অগোচরে গিয়ে খেজুরগাছ জড়িয়ে ধরে তিনি লজ্জায় দুঃখে আর্তনাদ করেছিলেন, "ইয়া লায়তানি, মিত্তু কবলা হাজা— হায়, এর আগে আমি মরে গেলুম না কেন? মানুষের চোখের থেকে মন থেকে তা হলে আমি নিস্তার পেতুম।"

লোকচক্ষুর অগোচরে যাবারও যাদের স্থান নেই তাদের জন্য ভিজে কাঠের ধুঁয়ো আর স্নানের ঘরের কল খুলে দেওয়া।

তাই সর্ব-অসহায় সর্ব-বিপন্না নরনারীর চোখের জল মুক্তার হার হয়ে দুলছে মা-মেরির গলায়, তারই নাম "আভে মারিয়া" মন্ত্র— 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী"।'

গোঁসাই ভালো কীর্তন গাইতে পারেন; সহজেই কাতর হয়ে পড়েন। বললেন, 'চাচা, আর না।'

চাচা বললেন, 'মেয়েটিকে চিনতে পারলুম। কার্লকে এক্স্‌রে করাতে গিয়ে ডাক্তারের ওয়েটিং-রুমে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। এরও যক্ষ্মা। তবে কি নিরাময় হবার জন্য কাঁদছিল? কে জানে?'

চাচা বললেন, 'তার পর এক মাস হয়ে গিয়েছে, এমন সময় নাস্তিক উইলির সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমার গির্জা যাওয়া নিয়ে সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মূল তত্ত্ব তার অজানা ছিল না। উইলি 'মুক্তপুরুষ' কিন্তু আর পাঁচজনের জন্য যে ধর্মের প্রয়োজন সে-কথা সে মানত। আমায় জিগ্যেস করল আমি য়ুডাস টাডেয়াসের তীর্থে যাবার সময় তার মাসিমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কি না? আমি শুধালুম— য়ুডাস টাডেয়াস তীর্থ সাপ না ব্যাঙ তার কোনও খবরই যখন আমার জানা নেই তখন সে তীর্থে আমার যাবার কোনও কথাই ওঠে না। শুনে উইলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, "সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম শোনোনি আর ক্যাথলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম।"

তার পর উইলি আমায় সালঙ্কারে বুঝিয়ে দিল, রাইন-নদীর ওপারে হাইস্টার বাখার রোট। সেখান থেকে প্রায় আধমাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। সে তীর্থের দেবতা বল, পীর বল, বড়কর্তা হচ্ছেন সেন্ট য়ুডাস টাডেয়াস। বড় জাগ্রত পীর। ভক্তিভরে ডাকলে পরীক্ষা তো নিশ্চিত পাস হবে, যথেষ্ট ভক্তি থাকলে জলপানিও পেতে পার। আর যদি মেয়েছেলে ঠাকুরকে ডাকে তবে সে নির্ঘাত বর পাবে— আশি বছরের বুড়ির পক্ষে বাইশ বছরের বর পাওয়াও নাকি ঠাকুরের কৃপায় সসিজ্‌-বিয়ার (অর্থাৎ ডালভাত)।

বুঝলুম ঠাকুর খাসা বন্দোবস্ত করেছেন। নদীর এ-পারের বন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোকরারা যাবে তাঁর কাছে পরীক্ষা পাসের লোভে, মেয়েরা যাবে বরের লোভে,— দু দলে তীর্থে দেখা হবে। তার পর কন্দর্প ঠাকুর তো রয়েছেনই টাডেয়াস্‌ ঠাকুরের সহকর্মী হয়ে স্বর্গের একসিকিউটিভ কমিটিতে। অর্থাৎ এ তীর্থে যে মেয়ে পশ্চাৎপদ নয় তার কপালে সপ্তপদী আছেই আছে।

www.pathagar.com

উইলি পইপই করে বুঝিয়ে দিল, তীর্থ না-করে ক্যাথলিক ধর্মের মূলতত্ত্বে কেউ কখনও প্রবেশ করতে পারেনি— উইলির নিজস্ব ভাষায় বলতে গেলে, ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারে নিমজ্জিত তা তীর্থে না-গিয়ে বোঝা যায় না। যিশুর ক্রস নিয়ে মাতামাতি, পোপকে বাবাঠাকুর বলে কলুর বলদের মতো ঠুলি পরে তাঁর চতুর্দিকে ঘোরা তীর্থযাত্রার কুসংস্কারের কাছে নস্যি।

তা হলে তো যেতে হয়।

পাড়ার পাদ্রিসায়েবকে যখন আমার সুমতির খবর দিলুম তখন তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। মনে হল, আমার যখন ধর্মে এত অচলা ভক্তি তখন যে আমি জব্বর পরবটাতে গরহাজির থাকব না তা তিনি আগের থেকেই ধরে নিয়েছিলেন।

গোডেসবের্গ থেকে আমরা জন তিরিশেক দল বেঁধে পাদ্রিসায়েবের নেতৃত্বে ট্রাম ধরে বন্ন পৌঁছলুম। বেরবার সময় কার্লের মা আমার হাতে তুলে দিলেন প্রেয়ার-বুক্ বা উপাসনা-পুস্তিকা আর একগাছা রোজারি বা জপ-মালা। বন্ন পৌঁছে দেখি সেখানেই তীর্থের ঝামেলা লেগে গিয়েছে। এক গোডেসবের্গেরই বিস্তর চেনা-অচেনা লোককে দেখতে পেলুম। এক আশি বছরের বুড়িকে দেখে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলুম— আমার বয়স তখন বাইশ। হয়তো উইলি ভুল বলেনি। পালাই পালাই করছি এমন সময় পাদ্রিসায়েব আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী আর তার মায়ের কাছে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপও হল— ভুল বললুম, পরিচয় হল, কারণ সামান্যতম সৌজন্যের মৃদুহাস্য বা অভ্যর্থনা পর্যন্ত সে করল না।

উইলির মাসি ইতোমধ্যে লা-পাত্তা। খবর নিয়ে শুনলুম, পীরের দর্গায় জ্বালাবার জন্য মোমবাতি কিনতে গিয়েছেন। সে কি কথা? বিলিতি পীরের খাসা ইলিকটিরি রয়েছে, মোমবাতির কী প্রয়োজন? আমাদের না-হয় সাপের দেশ, বিজলি-বাতিও নেই— পিদিম মশাল না-হলে পীরের অসুবিধা হয়। উইলি ঠিকই বলেছে, ধর্ম মাত্রই মোমবাতির আধা-আলোর কুসংস্কারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে, বিজলির কড়া আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

মাসির আবার কড়া নজর। মোমবাতি কেনার ঠেলাঠেলিতেও আমার ওপর চোখ রেখেছেন। জিগ্যেস করলেন, গ্রেটের সঙ্গে কী করে পরিচয় হল। তার পর মাসি যা বললেন তার থেকে গ্রেটের কান্নার অর্থ পরিষ্কার হল। গোসাঁইয়ের পদাবলীতে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা নামের নানা নায়িকার পরিচয় আছে, এ বেচারি তার একটাতেও পড়ে না। এ মেয়ে বালবিধবার চেয়েও হতভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। পরে খবর পাওয়া গেল পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য গ্রেটেকে সে বর্জন করেছে। বালবিধবার অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকে, তার প্রেম অবমানিত হয়নি।

মাসি বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, পুরো দু বৎসর আমরা কেউ বুঝতে পারিনি গ্রেটের প্রাণে কতটা বেজেছে। মেয়েটা চিরকালই হাসি-তামাশা করে সময় কাটাত— দু বছর তাতে কোনও হেরফের হল না। তার পর হল যক্ষ্মা। তখন বোঝা গেল, যে-আপেলের ভিতরে পোকা সে আপেলটারই বাইরের রঙের বাহার বেশি।'

www.pathagar.com

চাচা বললেন, 'আমি বাঙাল দেশের লোক। যা-তা নদী আমার চোখে চটক লাগাতে পারে না। তবু স্বীকার করি, রাইন নদী কিছু ফেলনা নয়। দু দিকে পাহাড়, আর মাঝখান দিয়ে রাইন সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দু পাড়ে যেন দু খানা সবুজ শাড়ি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সে শাড়ি দু খানা আবার খাঁটি বেনারসি। হেথায় লাল ফুলের কেয়ারি হোথায় নীল সরোবরের ঝলমলানি, যেন পাকা হাতের জরির কাজ।

আর সেই শাড়ির উপর দিয়ে আমাদের ট্রাম যেন দুষ্টু ছেলেটার মতো কারও মানা না শুনে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের আলোছায়া সবুজ শাড়িতে সাদা-কালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভিতর চাঁপারঙের ট্রামের আসা-যাওয়া— সমস্ত ব্যাপারটা যেন বাস্তব বলে মনে হয় না; মনে হয় হঠাৎ কখন রাইন সুন্দরীর ধমকে দুষ্টু ছেলেগুলো পালাবে, আর সুন্দরী তাঁর শাড়িখানা গুটিয়ে নিয়ে সবুজের লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেবেন।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হলুম মোকামে পৌঁছে, ট্রাম থেকে নেমে সেখানে রাইনের দিকে তাকিয়ে। দেখি রাইনের বুকের উপর ফুটে উঠেছে দুটি ছোট ছোট পল্লব-ঘন দ্বীপ। তার পেলব সৌন্দর্য আমার মনে যে তুলনাটি এনে দিল, নিতান্ত বেরসিকের মনেও সেই তুলনাটাই আসত। তাই সেটা আর বলছি না— সর্বজনগ্রাহ্য তুলনা রসিয়ে বলতে পারেন যিনি যথার্থ গুণী— শিপ্রাবল্লভ কালিদাস এরকম একজোড়া দ্বীপ দেখতে পেলে মেঘদূতকে আর অলকায় পাঠাতেন না, এইখানেই শেষবর্ষণ করতে উপদেশ দিতেন।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সূয্যি রায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাখার রোট থেকে টাডেয়াস্ তীর্থ আধমাইল দূরে। এই পথটুকু নির্মাণ করা হয়েছে জেরুজালেমের "ভিয়া ডলোরেসা" বা "বেদনা-পথের" অনুকরণে। খ্রিস্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ জেরুজালেমের যে-ঘরে হয় সেখান থেকে তাঁর কাঁধে ভারী ক্রস চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁকে ক্রসের সঙ্গে পেরেক পুঁতে মারা হয়। এ পথটুকুর নাম "ভিয়া ডলোরেসা"। ক্যাথলিক মাত্রেরই আশা, জীবনে যেন অন্তত একবার সে ওই পথ বেয়ে ক্রুশভূমিতে উপস্থিত হতে পারে— যেখানে প্রভু যিশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কণ্টক-মুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

কিন্তু জেরুজালেম যাওয়ার সৌভাগ্য বেশি ক্যাথলিকের হবে না বলেই তার অনুকরণে ক্যাথলিক জগতের সর্বত্র 'বেদনা-পথ' বানানো হয়। জেরুজালেমে এ পথের যেখানে শুরু তাকে বলা হয় প্রথম স্টেশন (পুণ্যভূমি) আর ক্রুশভূমিতে চতুর্দশ স্টেশন। এখানে তারই অনুকরণে চৌদ্দটি স্টেশনের প্রথমটি হাইস্টারবাখার রোটের কাছে আর শেষটি টাডেয়াস্ তীর্থের গির্জার ভিতরে।'

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাখার রোটে সেদিন রাইনল্যান্ডের বহুদূরের জায়গা থেকে বিস্তর লোক এসে জড়ো হয়েছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে টাডেয়াস্ তীর্থে যাবে বলে। ছোট রেস্তোরাঁখানাতে বসবার জায়গা নেই দেখে আমি গাছতলায় বসে পড়েছি— গ্রেটে আর তার মা কোনওগতিকে দুটো চেয়ার পেয়ে বেঁচে গেছেন। হঠাৎ দেখি আমাদের পাদ্রিসায়েব গোডেসবের্গের যাত্রীদলের তদারক করতে করতে আমার কাছে এসে হাজির।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক একটু নার্ভাস টাইপের— অর্থাৎ সমস্তক্ষণ হন্তদন্ত, কিছু একটা উনিশ-বিশ হলেই কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যায়।

ধপ করে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমি খানিকক্ষণ বাদে জিগ্যেস করলুম, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে গ্রেটের তীর্থযাত্রায় বেরুনো কি ঠিক হল?'

পাদ্রিসায়েবের মাথায় ঘাম দেখা দিল। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'জানেন মা-মেরি; গ্রেটের মায়ের শেষ আশা যদি টাডেয়াসের দয়া হয় আর তার বর জোটে। ওই তো একমাত্র পন্থা পুরনো প্রেম ভোলবার। তা না হলে ও মেয়ে তো বাঁচবে না।' পাদ্রিসায়েব চোখ বন্ধ করে মা-মেরির স্মরণে উপাসনা করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী!'

জিরিয়েজুরিয়ে আমরাও শেষটায় রওনা দিলুম তীর্থের দিকে। লম্বা লাইন— সকলের হাতে উপাসনা পুস্তিকা আর জপমালা। পাদ্রিসায়েব চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী' আর যাত্রীদল বার বার ঘুরে-ফিরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সর্বশেষে ভক্তিভরে বলে,

'এই পাপীতাপীদের দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

তার পর আমরা এক-একটা করে সেইসব স্টেশন (পুণ্যভূমি) পেরুতে লাগলুম। কোনওটাতে পাদ্রিসায়েব চেঁচিয়ে বলেন, 'হে প্রভু, এখানে এসে ক্রসের ভার সইতে না পেরে তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলে,' আর সমস্ত তীর্থযাত্রী করুণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'হে প্রভু, তোমার লুটিয়ে পড়াতেই আমাদের পরিত্রাণ হল।' কোনও পুণ্যভূমির সামনে পাদ্রিসায়েব বলেন, 'এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল তোমার জননী মা-মেরির। দূর থেকে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এবার তিনি তোমার কাছে আসতে পেরেছেন কিন্তু কথা কইবার অনুমতি পাননি। তোমার দিকে তিনি তাকালেন— সে তাকানোতে কী পুঞ্জীভূত বেদনা, কী নিদারুণ আতুরতা!' যাত্রীদল এককণ্ঠে বলে উঠল, 'মৃত্যুর চেয়েও ভালোবাসা অসীম শক্তির আধার— স্টার্ক বী ডের টোট্ ইস্ট্য়া ডি লীবে।' কোনও পুণ্যভূমিতে পাদ্রিসায়েব বলেন, 'এখানে তাপসী ভেরোনিকা তাঁকে বস্ত্রখণ্ড এগিয়ে দিলেন, যিশু মুখ মুছলেন, আর কাপড়ে তাঁর মুখের ছবি ফুটে উঠল।' যাত্রীদল বলে, 'আমাদের হৃদয়ের ওপর, হে প্রভু, তুমি সেই রকম ছবি এঁকে দাও।'

যাত্রীদল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আর প্রতি পুণ্যভূমির সামনে সবাই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে। পাদ্রিসায়েব পুণ্যভূমির স্মরণে চিৎকার করে তার বর্ণনা পড়েন, যাত্রীদল নম্রকণ্ঠে সেই ঘটনাকে প্রতীক করে প্রাণের ভিতর তার গভীর অর্থ ভরে নেবার চেষ্টা করে।

বনের ভিতর ঢুকলুম। দু দিকে উঁচু পাইনগাছ ঠায় দাঁড়িয়ে। আমরা যেন মহাভাগ্যবান নাগরিকদল চলেছি রাজরাজেন্দ্র দর্শনে, আর এরা হতভাগ্যের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্লব দুলিয়ে কপালে করাঘাত করছে, না এরা চামরব্যজন করে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে? প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জরণ মিশে গিয়েছে পাইনপল্লবের মর্মরের সঙ্গে আর জমে-ওঠা শুকনো পাইনপাতার গন্ধ মিশে গিয়েছে যাত্রীদলের হাতের ধূপাধারের গন্ধের সঙ্গে।

www.pathagar.com

খ্রিস্ট আর মা-মেরির বেদনাকে কেন্দ্র করে এই যাত্রীদল, বিশ্বসংসারের তাবৎ ক্যাথলিক আপন দুঃখ-কষ্টের সান্ত্বনা খোঁজে, দুর্বলতার আশ্রয় খোঁজে, আপন নির্ভরের সন্ধান করে। রাধার বিরহবেদনায় বৈষ্ণব সাধু ভগবানকে না-পাওয়ার হাহাকার শুনতে পায়; সুফি সাধকের কান্নার গানও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রিয়াবিরহের বেদনাকে কেন্দ্র করে।'

চাচা বললেন, 'গ্রেটের দিকে আমি মাত্র একবার তাকিয়েছিলুম অতি কষ্টে, সাহস সঞ্চয় করে। দেখি, সে চোখ বন্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছে, তার মা তার হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তার দু চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

চাচা বললেন, 'আমার ভক্তি কম। তাই বোধহয় আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিলুম দুপুরবেলাকার সাদা মেঘ অপরাহ্ণের শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো কালো ওভারকোট পরতে আরম্ভ করেছে। দশম কি একাদশ পুণ্যভূমির সামনে হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি— জর্মনে যাকে বলে "বল্কেনব্রুখ" অর্থাৎ মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ছাতা-বরসাতি অল্প লোকেই সঙ্গে এনেছিল— এবার প্রাণ যায় আর কি! ভাগ্যিস সেখান থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য যে সব রেস্তোরাঁ তার প্রথমটা অতি কাছে পড়েছিল। তবু রেস্তোরাঁতে গিয়ে যখন ঢুকলুম তখন আমাদের অধিকাংশই জবুথবু। পাদ্রিসায়েব গ্রেটেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দু খানা বরসাতি দিয়ে। তার মা ছাতা ধরেছিলেন আর পাদ্রিসায়েব গ্রেটেকে বুকের ভিতরে যেন গুঁজে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। পাদ্রিদের শরীর তাগড়া— যিশুখ্রিস্টের এত বড় গির্জা যখন তাঁদের কাঁধের উপর থেকে পড়ে ভেঙে যায়নি তখন গ্রেটে তো তার কাছে চরকাকাটা বুড়ির সুতো।

"রথ দেখা আর কলা-বেচা" না কচু। তাতে হয় ধর্ম আর অর্থ। কিন্তু যদি বলা হত 'রথ দেখা আর প্রিয়ার কণ্ঠালিঙ্গন' তা হলে হয় ধর্ম আর কাম, আর তাতেই আছে আসল মোক্ষ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে তত্ত্বটা মালুম হল।

রেস্তোরাঁ এতই বিশাল যে সেটাকে নৃত্যশালা বলাই উচিত। দেখি শ-খানেক ছোঁড়াছুঁড়ি, বুড়োবুড়ি ধেই ধেই করে নাচছে, বিয়ারের ফোয়ারা বইছে আর শ্যাম্পেনে শ্যাম্পেনে ছয়লাপ। আর সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের দল ভিজে কাকের মতো ঢুকতেই চিৎকার করে সবাই অভিনন্দন জানাল। ধাক্কাধাক্কি ঠাসাঠাসি করে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল, গায়ে পড়ে আমাদের জন্য পানীয় কেনা হল, আহা, আমরা যেন সব লঙ লস্‌ট ব্রাদার্স— বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরিয়ে-পাওয়া ভাই।

এতে চটবার কী আছে, বল? ধর্মকর্ম করতে গেলেই যে মুখ গুমশো করে সবকিছু করতে হবে সে কথা লেখে ধর্মবিধির কোন্ ধারায়? এমনকি আদালতেও দেখোনি যেখানে খুনের মোকদ্দমা হচ্ছে সেখানেও জজ-ব্যারিস্টাররা ঠাট্টামস্করা করেন।

গ্রেটের মা, গ্রেটে, পাদ্রিসায়েব আর আমি একখানা টেবিল পেয়ে গেলুম জানালার কাছে। বাইরে তখন বৃষ্টি আর ঝড়, আর জানালার খড়খড়ানি থেকে বুঝতে পারছি ঝড় বেড়েই যাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম রাস্তা জনমানবহীন, একহাঁটু জল জমে গিয়েছে।

তাতে কার কী এসে যায়। গান ফুর্তি তো চলছে। 'ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক ব্র্যুডারলাইন— পিয়ো, পিয়ো বঁধুয়া, পিয়ো আরবার' শতকণ্ঠে গান উঠছে, পিয়ো পিয়ো বঁধুয়া। এরা সব গান গাইতে পারে ভালো,— গির্জেয় এদের ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার অভ্যাস আছে। যে শিবলিঙ্গ

পুজোর জন্য দেবতা হন তাঁকে দিয়ে মশারির পেরেক ঠুকলে তিনি কি আর গোসা করে বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেন? রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, আমাদেরই বাগানের ফুল "কেহ দেয় দেবতারে, কেহ প্রিয়জনে।" দু জনকে দিতেও তিনি আপত্তি করতেন না নিশ্চয়ই।

পাদ্রিসায়েব আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিগ্যেস করে যেতে লাগলেন। আমাদের তিন মাসের পরিচয়ের মধ্যে একদিন একবারের তরেও তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল দেখাননি। আজ এই শরাবখানায় হঠাৎ যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম। দরদী মানুষ; গ্রেটের মন ভোলাবার জন্য সবকিছু করতেই রাজি আছেন। আমিও কলকাতাতে যে হাতি-ট্যাক্সি পাওয়া যায় এবং তার ভাড়া দিতে হয় হাতিকে কলা খাইয়ে, সে-কথা বলতে ভুললুম না। বোধ করি গ্রেটেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার সম্মান রাখার জন্য দু-একবার হেসেছিল। একবার আমায় জিজ্ঞেসও করল আমি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কী কী পড়েছি? আমি অবাক হয়ে তাকে জিগ্যেস করলুম সে কিছু পড়েছে কি না। ততক্ষণে তার মন আবার অন্য কোন্ দিকে চলে গিয়েছে। দু বার জিগ্যেস করার পর শুধু বলল "হুঁ"। বুঝলুম হতভাগিনী শান্তির সন্ধানে অনেক দুয়ারেই মাথা ঠুকেছে।

সেখানেই ডিনার খাওয়া হল। এ জলঝড়ে তীর্থ মাথায় থাকুন, বাড়ি ফেরার কথাই কেউ তুলল না। শেষ ট্রাম ছাড়ে দশটায়। রাত তখন এগারোটা।

হঠাৎ গ্রেটে পাদ্রিসায়েবকে শুধাল, 'ক-টা বেজেছে?'

পাদ্রিসায়েব একেই নার্ভাস লোক তার ওপর এই জলঝড়ে তাঁর সবকিছু ঘুলিয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট পর পর জানালা দিয়ে দেখছিলেন বৃষ্টি কমবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না— আমি প্রতিবারেই ভেবেছি তীর্থযাত্রীর শেষরক্ষা করার জন্য সায়েবের এই ছটফটানি।

গ্রেটের প্রশ্ন শুনে তিনি কোনও উত্তর না-দিয়ে দরজা খুলে সেই ঝড়ের মাঝখানে বেরিয়ে পড়লেন। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোকে দেখলুম, বাতাসের ঠেলায় পাইনগাছগুলো কাত হয়ে এ ওর গায়ে মাথা কুটছে, আর পাদ্রিসায়েব কোমরে দু ভাঁজ হয়ে কোনও অজানার সন্ধানে চলেছেন।

আমি ফের টেবিলে এসে বসলুম। মা-মেয়ে দু জনই চুপ। আমার মুখ দিয়েও কোনও কথা বেরুচ্ছিল না।

এভাবে কতক্ষণ কাটল জানিনে। ঘণ্টাখানেক হতে পারে— অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক। পাদ্রিসায়েব ফিরে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের একটি লোম পর্যন্ত শুকনো নয়। বললেন, 'জলঝড়ের জন্য কাউকে খুঁজে পেলুম না, গির্জে বন্ধ করে সবাই চলে গিয়েছে। আর এ জলে তুমি যেতেই-বা কী করে?'

পাদ্রিসায়েব আরও কী যেন বলছিলেন, টাডেয়াসকে সব জায়গা থেকেই স্মরণ করা যায়, তিনি অন্তর্যামী— এরকম ধারা কিছু, কিন্তু তাঁর কথার মাঝখানে হঠাৎ গ্রেটে উঠে দাঁড়াল। জলঝড়ের ভিতর দিয়েও শব্দ এল গির্জার বারোটার ঘণ্টা। গ্রেটে শুনতে পেয়েছে, মন দিয়ে শুনেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তোমাকে তখনই বলেছিলুম, আমি আসব না। তবু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে এলে। ওই শুনলে বারোটা বাজার ঘণ্টা?

www.pathagar.com

পরব শেষ হল। য়ুডাস টাডেয়াস্ আমাকে তাঁর তীর্থে যেতে দিলেন না। তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি জানতুম, আমি জানতুম, এরকমই হবে। এখন আমি কোথায় যাবো গো, মাগো, হে মা-মেরি—'

গ্রেটের গলা থেকে ঘড়ঘড় করে কী রকম একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল। পাদ্রিসায়েব জড়িয়ে না-ধরলে সে পড়ে যেত।'

চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না। শেষটায় বয়সে সকলের ছোট গোলাম মৌলা জিগ্যেস করল, 'মেয়েটার আর কোনও খবর নেননি?'

চাচা বললেন, 'না, তবে মাস দুই পরে আরেকদিন গির্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি গ্রেটের মা। পরনে কালো পোশাক।'

বেলতলাতে দু-দুবার

বার্লিন শহরে 'হিন্দুস্তান হৌসের' আড্ডা সেদিন জমি জমি করে জমছিল না। নাৎসিদের প্রতাপ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনও আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশি হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজদের পিঠে দু-চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ-আড্ডার কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু-একটা মূর্খ নাৎসি নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক-বাঁকা নীল-চোখো কাশ্মীরিকে তারা নাকি দু-একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে।

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা এ সব বাবদে নাৎসিদের চেয়েও অসহিষ্ণু। বলল, 'আমরা যে পরাধীন সে-কথা সবাই জানে। তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া?' এক ব্যাটা নাৎসি সেদিন আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল, 'তোমরা তো পরাধীন, তোমরা এসব নিয়ে ফপরদালালি কর কেন?' নাৎসিদের তর্ক করার কায়দা অদ্ভুত।'

পুলিন সরকার বলল, 'তা তুই বললি না কেন, পরাধীন বলেই তো, বাওয়া, ভারতবর্ষে কলকজা বেচে আর ইনসিওরেন্স কোম্পানি খুলে দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো। ভারতবর্ষের লোক তো আর হটেন্‌টট নয় যে, স্বরাজ পেলেও কলকজা বানাতে পারবে না! জানিস, সুইটজারল্যান্ডে এখন জাপানি ঘড়ি বিক্‌কিরি হয়।'

বিয়ারের ভেতর থেকে সূয্যি রায় বললেন,

নাই তাই খাচ্ছো
থাকলে কোথা পেতে?
কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে।

কাটা ন্যাজের ঘা-তে যে মাছিগুলো পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছিল তারাও তাই নিয়ে গরুটাকে কটু-কাটব্য করেনি। নাৎসিদের বুদ্ধি ওই রকমেরই। যে হাত খাবার দিচ্ছে সেইটেকেই

www.pathagar.com

কামড়ায়। নাৎসিদের তুলনায় ইংরেজ সম্বন্ধীরা ঘুঘু— ভারতবর্ষের পরাধীনতাটার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন বাড়ির ছোট বউ। মাঝে মাঝে গলাখাঁকারি দেয় বটে কিন্তু তিনি যে আছেন সে-কথাটা কথাবার্তায় চালচলনে আকসারই অস্বীকার করে যায়।

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। তাঁর ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই জিগ্যেস করল, 'চাচা যে রা কাড়ছেন না?'

চাচা চোখ না-খুলেই বললেন, 'আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

সবাই অবাক। গোঁসাই জিগ্যেস করল, 'সে কী কথা'? নাৎসিরা তো দাবড়াতে আরম্ভ করেছে মাত্র সেদিন। এর মাঝে কিছু একটা হলে তো আমরা খবর পেতুম।'

কথাটা সত্য। চাচার গলাবদ্ধ কোট, শ্যামবর্ণ চেহারা, আর রবিঠাকুরী বাবরি বার্লিন শহরের হাই-কোর্ট। যে দেখেনি তার বাড়ি পদ্মার হে-পারে। চাচার ওপর চোটপাট হলে একটা 'আন্তর্জাতিক' না হোক 'অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি' হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

চাচা বললেন, 'তোরা তো দেখছিস নাৎসিদের দ্বিজত্ব। তাদের পয়লা জনম হয়েছিল মিউনিকে। আমি তখন—'

জব্বলপুরের শ্রীধর মুখুয্যে অভিমানভরে বলল, 'চাচা, আপনি কি আমাদের এতই বাঙাল ঠাওরালেন যে আমরা পুচশের (Putsch) খবরটা পর্যন্ত জানিনে?'

চাচা বললেন, 'এহ্ বাহ্য, আমি তারও আগেকার কথা বলছি। এই ভুশুণ্ডি সূষ্যি রায় আর আমি তখন মিউনিকে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম। মিউনিক বললে ঠিক কথা বলা হল না। আমরা থাকতুম মিউনিক থেকে মাইল পনেরো দূরে, ছোট্ট একটা গ্রামে— ডেলি প্যাসেঞ্জারি করলে সব দেশেই পয়সা বাঁচে। আমি থাকতুম এক মুদির বাড়িতে। নিচের তলায় দোকান, উপরে তিন ছেলে, এক মেয়ে, আর আমাকে নিয়ে মুদির সংসার।

মুদির সংসারটির দুই মহৎ গুণ ছিল— কাচ্চা-বাচ্চা-বাপ-মা সকলেরই ঠাট্টা-মস্করার রসবোধ ছিল প্রচুর আর ওস্তাদি সঙ্গীতের নামে তারা অজ্ঞান। বড় ছেলে অস্কার বাজাত বেয়ালা, মেয়ে করতাল-ঢোল, বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবের্ট চেল্লো। কাজকর্ম সেরে দু দণ্ড ফুরসৎ পেলেই কনসার্ট— কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-মস্করা।

কিন্তু এদের মধ্যে আসল গুণী ছিল অস্কার। তবে তার গুণের সন্ধান পেতে আমার বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল— কারণ অস্কারকে পাওয়া যেত দুই অবস্থায়। হয় টং মাতাল, নয় মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধা। তখন সে প্রধানত আমাকে লক্ষ্য করেই বলত,

'ডু ইন্ডার, ওরে ভারতবাসী কালা শয়তান, তোরা যে মদ খাসনে সেইটেই তোদের একমাত্র গুণ। তোর সঙ্গে থেকে থেকে আর কাল রাত্রির বাইশ গেলাসের পর'—

মেয়ে মারিয়া আমাকে বলল, 'বাইশ না বিয়াল্লিশ জানল কী করে? পনেরোর পর তো ও আর হিসাব রাখতে পারে না।'

মা বলল, 'তাই হবে। কাল রাত্রে চারটের সময় অস্কার বাড়ি ফিরে তো হড়হড় করে সব বিয়ার গলাতে আঙুল দিয়ে বের করে নিচ্ছিল। বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল তাতে কোনও ফাঁকি নেই তো। বমি করছিল বোধহয় মেপে দেখবার জন্য।'

www.pathagar.com

অস্কার বলল, 'ওসব কথায় কান দিও না হে ইন্ডার (ভারতীয়)। দরকারও আর নেই। আমি এই সর্বজনসমক্ষে মা-মেরির দিব্যি কেটে বললুম, আর কখ্খনও মদ স্পর্শ করব না। মদ মানুষকে পরের দিন কীরকম বেকাবু করে ফেলে এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল। বাপ রে বাপ, মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে!'

ভিজে পট্টিতেও আর কুলোল না। অস্কার কল খুলে মাথাটি নিচে ধরল।

সেখান থেকেই জলের শব্দ ডুবিয়ে অস্কার হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে বিয়ারে ফাঁকি দিয়ে পয়সা মারবে কে শুনি? হুঁঃ! বক্সিং-এর পয়লা প্রাইজের কথা কী মদওয়ালা ভুলে গিয়েছে? তার হোটেলের বাগানেই তো, বাবা, ফাইনালটা হল। ব্যাটার নাকটা এমনিতেই থ্যাবড়া, আমার বাঁ-হাতের একখানা সরেস আন্ডার-কাট খেলে সে-নাক মিউনিক-বার্লিন সদর রাস্তার মতো ফেলেট হয়ে যাবে না?'

কথাটা ঠিক। বিয়ারওয়ালা বরঞ্চ ইনকামট্যাক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে— 'আভে মারিয়া' মন্ত্র কমিয়ে-সমিয়ে ভগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেঘরে সে দেয়ই, না-হলে সময়মতো দোকান খুলবে কী করে?— কিন্তু বিয়ার নিয়ে অস্কারের সঙ্গে মস্করা ফস করে কেউ করতে যাবে না।

ঢকঢক করে এক গেলাস নেবুর সরবৎ খেয়ে অস্কার বলল, 'মাথার ভেতর যেন অ্যারোপ্লেনের প্রপেলার চলছে, চোখের সামনে দেখছি গোলাপি হাতি সারে সারে চলছে, জিবখানা যেন তালুর সঙ্গে ইস্ক্রু মারা হয়ে গিয়েছে, কানে শুনছি মা যেন বাবাকে ঠ্যাঙাচ্ছে।'

মুদি বলল, 'ভালো হোক মন্দ হোক, আমার তো একটা আছে, তুই তো তা-ও জোটাতে পারলিনে।'

অস্কার কান না-দিয়ে বলল, 'কিন্তু আর বিয়ার না। মা-মেরি সাক্ষী, পীর মেরিগিয়ুস সাক্ষী, কালা শয়তান ইন্ডার সাক্ষী, আর বিয়ার না।'

অস্কারকে সকালবেলা যে কোনও মদ্য-নিবারণী সভার বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া যায়। সন্ধের সময় বিয়ারের জন্য সে আল কাপোনের ডাকাতদলের সর্দারি করতে প্রস্তুত। আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম, 'অস্কার, এই নিয়ে তুমি সাতাশিবার মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করেছ।'

অস্কার বলল, 'যাঃ! তুই সাতাশি পর্যন্ত গুনতেই পারিসনে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা সাতাশি। তুই তো তাদেরি একজন। ওখানে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এদেশে এসেছিস। তুই সাতাশিতে ঘুলিয়ে ফেলেছিস।'

মুদির মা বলল, 'অস্কার চাকরি পেয়েছে আঠারো বছর বয়সে। সেই থেকে প্রতি রাত্রেই বিয়ার, ফি সকাল মদ ছাড়ার শপথ। এখন তার বয়স বাইশ। সাতাশিবার ভুল বলা হল।

অস্কার বলল, 'ওই যাঃ। বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম, আজ আমাদের কারখানার সালতামামি পর্ব— বিয়ার পার্টি। চাকরির কথায় মনে পড়ল। কিন্তু না, না, না, আর বিয়ার না। দেখো, ইন্ডার আজ যদি পার্টির কোনও ব্যাটা আসে তবে তুমি ভারতীয় কায়দায় তাকে নরবলি দেবে।'

চাচা বললেন, 'আমি আজও বুঝতে পারিনে অস্কার এই পট্টিবাঁধা মাথা নিয়ে কী করে প্রেসিশন মেশিনারির কাজ করত। মদ খেলে তো লোকের হাত কাঁপে, চোখের সামনে

www.pathagar.com

গোলাপি হাতি দেখে। অস্কার এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ তা হলে দেখতই-বা কী করে আর বানাতই-বা কী কৌশলে? এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারত বলে তাকে মাত্র দু ঘণ্টা কারখানায় খাটতে হত। মাইনেও পেত কয়েক তাড়া নোট। তাই দিয়ে খেত বিয়ার আর করত দান-খয়রাত। দ্বিতীয়টা হরবকত। মৌজে থাকলে তো কথাই নেই, পট্টিবাঁধা অবস্থায় ও মোটর সাইকেল থেকে নেবে বুড়ি দেশলাইওয়ালির কাছ থেকে একটা দেশলাই কিনে এক ডজনের পয়সা দিত।

অস্কার ছিল পাঁড় নাৎসি। আমাকে বলত, 'এ সব ভিখিরি আতুরকে কেন যে সরকার গুলি করে মারে না এ-কথাটা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারিনে। সমস্ত দেশের কপালে আছে তো কুল্লে তিন মুঠো গম। তারই অর্ধেক খেয়ে ফেললে এ বুড়ি, ও কানী, সে খোঁড়া। সোমথ জোয়ানরা খাবে কী, দেশ গড়বে কী দিয়ে? শ্লেজকে যখন নেকড়ে তাড়া করে তখন দুটো দুবলা বাচ্চা ফেলে দিয়ে বাঁচাতে হয় তিনটে তাগড়াকে। সব কটাকে বাঁচাতে গেলে একটাকেও বাঁচানো যায় না। কথাটা এত সোজা যে কেউ স্বীকার করবে না, পাছে লোকে ভাবে লোকটা যখন এত সোজা কথা কয় তখন সে নিশ্চয়ই হাবা।'

আমি বললুম, 'তিনটেকে বাঁচাতে গিয়ে দুটোকে নেকড়ের মুখে দিয়ে যদি অমানুষ হতে হয় তবে না-ই বাঁচল একটাও।'

অস্কার যেন ভয়ঙ্কর বেদনা পেয়েছে সেরকম মুখ করে বললে, 'বললি? তুইও বললি? তুই-না এসেছিস এদেশে পড়াশোনা করতে! এদেশের পণ্ডিতদের জুড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই তুই এখানে এসেছিস। এ পণ্ডিতের জাতটা মরে যাক এই বুঝি তোর ইচ্ছে? বল দিকিনি বুকে হাত দিয়ে, এই জর্মন জাতটা মরে গেলে পৃথিবীটা চালাবে কে? পণ্ডিত, কবি, বীর এ জাতে যেমন জন্মেছে—'

আমি বললুম, 'থাক থাক। তোমার ওসব লেকচার আমি ঢের ঢের শুনেছি।'

অস্কার মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। তোকে এসব শুনিয়ে কোনও লাভ নেই। তুই মুসলমান, তোরা কখনও ধর্ম বদলাসনে, যা আছে তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকিস। চ, একটা বিয়ার খাবি?'

আমি পিনিয়ন থেকে নেমে বললুম, 'গুড বাই। আর দেখো তুমি সোজা বাড়ি যেও। আমি লোকাল ধরব।'

অস্কার বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। তোমাকে তো আর নিত্যি নিত্যি আমি লিফট দিতে পারিনে। কারখানায় পরীরা সব ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছে আমার ওপর, কাউকে লিফট দিইনে বলে। প্রেমট্রেম সব বন্ধ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'এ কথাটা এতদিন বলনি কেন? আমি তোমাকে পই পই করে বারণ করিনি আমার কখন ক্লাস শেষ হয় না-হয় তার ঠিক নেই, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

অস্কার বলল, 'তোমার জন্য আমি আর অপেক্ষা করলুম কবে? সামনের শরাবখানায় ঢুকি এক গেলাস বিয়ারের তরে। জানালা দিয়ে যদি দেখা যায় তুমি বেরিয়ে আসছ তা হলে কি তোমার দিকে তাকানোটাও বারণ? বেড়ালটাও তো কাইজারের দিকে তাকায়, তাই বলে কি কাইজার তার গর্দান নেন নাকি?'

www.pathagar.com

চাচা বললেন, 'অস্কারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আর ওই ছিল তার অদ্ভুত পরোপকার করার পদ্ধতি। 'ভিখিরিটাকে তিনটে মার্ক দিলে কেন?' অস্কার বলবে, 'ব্যাটা বেহেড মাতাল, তিন মার্কে টং নেশা করে গাড়িচাপা হয়ে মরবে এই আশায়।' 'আমাকে নিত্যি নিত্যি লিফ্‌ট দেবার জন্য তুমি অপেক্ষা কর কেন?' 'সে কী কথা? আমি তো বিয়ার খেতে শরাবখানায় ঢুকেছিলুম।' 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছ কেন?' 'তাই দিয়ে বন্দুক-পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তার পর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' আমি একদিন বলেছিলুম, 'মিশনারিরা যে আফ্রিকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে যায় সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' অস্কার বলল, 'তা হলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারি নিগ্রোরা খাবে কী? মিশনারির মাংস উপাদেয় খাদ্য!'

চাচা বললেন, 'কিন্তু এসব হাইজাম্প-লংজাম্প শুধু মুখে মুখে। অস্কার নাৎসি আন্দোলনের বেশ বড় ধরনের কর্তা আর নাৎসিদের নিয়ে যতই রসিকতা করুক-না কেন, আর কেউ কিছু বললে তাকে মার-মার করে তাড়া লাগাত। আমার সঙ্গে এক বৎসর ধরে যে এত বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সেইটি পর্যন্ত সে একদিন অকাতরে বিসর্জন দিল ওই নাৎসিদের সম্বন্ধে আমি আমার রায় জাহির করেছিলুম বলে।

রান্নাঘরে সকালবেলা সবাই জমায়েত। সেদিন ছিল রবিবার— সপ্তাহে ওই একটিমাত্র দিন আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতুম, আর ছ দিন যে যার সুবিধেমতো।

মেয়ে মারিয়া পাঁচজনের উপকারার্থে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। অস্কার মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধছিল আর আপন মনে মাথা নেড়ে নিজেকে বোঝাচ্ছিল, বিয়ার খাওয়া বড় খারাপ। মারিয়া হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ খবরটা মন দিয়ে শুনুন, হের ডক্টর।' 'পাটেনকির্শেনে হৈ হৈ রৈ রৈ, নাৎসি গুণ্ডা কর্তৃক ইহুদিনী আক্রান্ত। প্রকাশ, ইহুদিনী রাস্তায় নাৎসি পতাকা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। নাৎসিরা তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পতাকার সামনে মাথা নিচু করতে আদেশ করে। সে তখনও নারাজি প্রকাশ করাতে নাৎসিরা তাকে মার লাগায়। পুলিশ এসে পড়ায় নাৎসিরা পালিয়ে যায়। তদন্ত চলছে।'

চাচা বললেন, 'আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, নাৎসি গুণ্ডারা কী করে না-করে আমার তাতে কী?'

অস্কার আমার দিকে না-তাকিয়ে বলল, 'জাতির পতাকার সম্মান যাঁরা বাঁচাতে চায় তারা গুণ্ডা?'

আমি কিছু বলার আগেই বুড়ো বাপ বলল, 'ওটা জাতির পতাকা হল কী করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।'

আমি বললুম, 'ঠিক এবং জাতীয় পতাকাকে কেউ অবহেলা করলে তাকে সাজা দেবার জন্য পুলিশ রয়েছে, আইন-আদালত রয়েছে। বিশেষ করে একটা মেয়েকে ধরে যখন পাঁচটা ষাঁড়ে মিলে ঠ্যাঙায় তখন সেটা গুণ্ডামি না-হলে গুণ্ডামি আর কাকে বলে?'

অস্কার আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি তা হলে ইহুদিদের পক্ষে?'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'অস্কার, অত সিরিয়াস হচ্ছ কেন? আমি ইহুদিদের পক্ষে না বিপক্ষে সে প্রশ্ন তো অবান্তর।'

অস্কার বলল, 'প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদিরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।'

চাচা বললেন, 'এর পর আমার আর কোনও কথা না বললেও চলত। কিন্তু মানুষ তো সবসময় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ওঠা-বসা করে না, আর হয়তো অস্কার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল, কোনও একটা যুৎসই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তো আর্য জাতি রয়েছে এবং তারা জর্মনদের চেয়ে ঢের বেশি খানদানি এবং কুলীন। আর্যদের প্রাচীনতম সৃষ্টি চতুর্বেদ ভারতবর্ষেই বেঁচে আছে। গ্রিস-রোমে যা আছে তার বয়স বেদের হাঁটুর বয়সেরও কম। জর্মনির, ফ্রান্সের তো কথাই ওঠে না— পরশু দিনের সব চ্যাংড়ার পাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় তত্ত্বকথা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য-অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। আমাদের দেশে বর্ণসঙ্কর সবচেয়ে কম হয়েছে কাশ্মীরে— আর ভারতীয় সভ্যতায় কাশ্মীরীদের দান ট্যাঁকে গুঁজে রাখা যায়। এবং আমার বিশ্বাস যেসব গুণী জর্মনিকে বড় করে তুলেছেন তাঁদের অনেকেই খাঁটি আর্য নন।'

আমাকে কথা শেষ না-করতে দিয়ে অস্কার হুঙ্কার তুলে বলল, 'আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সব বাস্টার্ড?'

চাচা বললেন, 'আমি তো অবাক। কিন্তু ততক্ষণে আমার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিছু না-বলে চুপ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। সেই অবসরে গোলাম মৌলা বলল, 'আমার সঙ্গেও ঠিক এইরকম ধারাই তর্ক হয়েছিল কিন্তু আমি তো ভারতীয় সভ্যতার অতশত জানিনে, তাই ওরকম টায় টায় তুলনা দিয়ে তর্ক করতে পারিনি। কিন্তু নাৎসিরা রাগ দেখায় একই ধরনের।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী প্রয়োজন ছিল তর্ক করার? বিশেষ করে যখন জানি, যত বড় সত্য কথাই হোক মানুষ আপন কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য সেটাকেও বিসর্জন দেয়। তার ওপর অস্কার জানেই-বা কী, বোঝেই-বা কী? মানুষটা ভালো, তর্ক করে আনাড়ির মতো, আর আগেও তো বলেছি তার হাইজাম্প, লংজাম্প তো শুধু মুখেই।'

আমি আর অস্কার বাড়ির সকলের পয়লা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোতুম। পর দিন খেতে বসে দেখি অস্কার নেই। র‍্যাকে তার বরসাতি আর হ্যাটও নেই। বুঝলুম আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। মনে কীরকম খটকা লাগল। দু দিনের ভিতরই কিন্তু ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে গেল— অস্কার আমাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুনলুম মুদি আর তার মা আমার পক্ষ নিয়ে অস্কারকে ধমক দিয়েছেন। অস্কার কোনও উত্তর দেয়নি কিন্তু আমি রান্নাঘরে থাকলে সেখানে আসে না।

www.pathagar.com

মহা বিপদগ্রস্ত হলুম। বাড়ির বড় ছেলে আমার সঙ্গে মন কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, আর-সবাই সে সম্বন্ধে সচেতন, অষ্টপ্রহর অস্বস্তিভাব, বুড়োবুড়ি আমার দিকে সব সময় কীরকম যেন মাফ-চাই ভাবে তাকান— মরুক গে, কী হবে এখানে থেকে।

বুড়োবুড়ি তো কেঁদেই ফেললেন। মারিয়া আমার কাছে ইংরেজি পড়ত। সে দেখি জিনিসপত্র প্যাক করছে। বলল, 'চললুম কিছুদিনের জন্য মাসির বাড়ি।' দুসরা ছেলে হুবের্ট কথা কইত কম। আমাকে ম্যুনিকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল, 'আশ্চর্য, অস্কারের মতো সহৃদয় লোক নাৎসিদের পাল্লায় পড়ে কীরকম অদ্ভুত হয়ে গেল দেখলে?' আমি আর কী বলব।

চাচা বললেন, 'তার পর ছ মাস কেটে গিয়েছে। বান্ধব বর্জন সবসময়ই পীড়াদায়ক— সে বর্জন ইচ্ছায় করো আর অনিচ্ছায়ই ঘটুক। তার ওপর বড় শহরে মানুষ যে-রকম নিঃসঙ্গ অনুভব করে তার সঙ্গে গ্রামের নির্জনতার তুলনা হয় না। গ্রামের নিত্যিকার ডালভাত অরুচি এনে দেয় সত্যি, তবু সেটা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর পাঁচজনের শেরি-শ্যাম্পেন খাওয়া দেখার চেয়ে অনেক ভালো। দিনের ভেতর তাই অন্তত পঞ্চাশ বার 'দুত্তোর ছাই' বলতুম আর বুড়োবুড়ির কাছে ফিরে যাওয়া যায় কি না ভাবতুম। কিন্তু জানো তো, বড় শহরে স্থান যোগাড় করা যেমন কঠিন, সেখানে থেকে বেরুনো তার চেয়েও কঠিন।

করে করে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। একদিন বাসায় ফিরে দেখি বুড়োবুড়ি আর মারিয়া আমার বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কী ব্যাপার? র্যোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা। আমাদের যেমন ঈদ দুর্গোৎসবের সময় আত্মীয়স্বজন দেশের বাড়িতে জড়ো হয় এদের বাৎসরিক মেলার সময়ও ওই রেওয়াজ। বুড়োবুড়ি, মারিয়া তাই আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।

আমার মনের ভেতর কী খেলে গেল সেইটে যেন বুঝতে পেরেই মারিয়া বলল, 'অস্কারের সঙ্গে এ কদিন আপনার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। ছুটি নিয়ে এ কদিন সে অষ্টপ্রহর বিয়ার খায়। আপনাকে দেখলেও চিনতে পারবে না।'

বুড়ি বললেন, 'অস্কারকে একটা সুযোগ দিন আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার। মেলার সময়ই তাই তো আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়।'

মেলার পর্ব সব দেশে একইরকম। তিন মিনিট নাগরদোলায় চক্কর খেয়ে নিলে, ঝপ্ করে দুটো পানের খিলি মুখে পুরলে (দেশভেদে চকলেট), দুটো সস্তা পুতুল কিনলে, গণৎকারের সামনে হাত পাতলে, না-হয় ইয়ারদের সঙ্গে গোট পাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসলে (দেশভেদে ফষ্টিনষ্টি করলে)। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যে ঘন ঘন পটপরিবর্তন সম্ভব হয় না সেইটে মেলার সময় সুদে-আসলে তুলে নেওয়া। যে মেলা যত বেশি মনের ভৌল ফেরাবার পাঁচমেশালি দিতে পারে সে-মেলার জৌলুশ তত বেশি। তাই বুঝতে পারছ, বড় শহরে কেন মেলা জমে না। যেখানে মানুষ বারো মাস মুখোশ পরে থাকে সেখানে বহুরূপী কল্কে পাবে কেন?

তবে দেশের মেলার সঙ্গে এদেশের মেলার একটা বড় তফাত রয়েছে। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেলা ঝিমিয়ে আসে, তখন দেশে শুরু হয় যাত্রাগান কিংবা কবির

www.pathagar.com

লড়াই। এদেশে শুরু হয় মদ আর নাচ। ছোটখাটো গ্রামে তো প্রায় অলঙ্ঘ্য রেওয়াজ, প্রত্যেক মদের আড্ডায় অন্তত একবার ঢুকে এক গেলাস বিয়ার খাওয়ার। কারও দোকান কট্ করা চলবে না, তা ততক্ষণে তুমি টং হয়ে গিয়ে থাকো আর নাই থাকো।

আমরা যে-রকম উচ্ছৃঙ্খলতায় সুখ পাই, জর্মনরা তেমনি আইন মেনে সুখ পায়। মুদি-মুদিবউ তাই আমাকে নিয়ে এই নিয়ম প্রতিপালন করে করে শেষটায় ঢুকলেন তাঁদেরই বাড়ির পাশের গ্রামের সবচেয়ে বড় শরাব-খানায়। রাত তখন এগারোটা হবে। ডান্স হলের যা সাইজ তাতে দু-পাঁচখানা চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। আশপাশের দশখানা গ্রামের ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ি ধেই ধেই করে নাচছে, আর শ্যাম্পেন-ওয়াইন যা বইছে তাতে সমস্ত গ্রামখানাকে সম্বৎসর জমিয়ে রেখে আচার বানানো যায়। দেশলাই ঠুকতে ভয় হয় পাছে হাওয়ার এলকোহলে আগুন ধরে যায়, সিগার-সিগারেটের ধুঁয়ো দেখে মনে হয়, দেশের গোয়ালঘরের মশা তাড়ানো হচ্ছে।

বুড়োবুড়ি পাড়ার মুরুব্বি। কাজেই তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।

বুড়োবুড়ি আইন মেনে এক চক্কর নেচে নিলেন। বয়স হয়েছে, অল্পেই হাঁপিয়ে পড়েন। তবু পায়ের চিকন কাজ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারলুম, এঁদের যৌবনে এঁরা আজকের দিনের ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে ঢের ভালো নেচেছেন। আর মারিয়ার তো পো-বারো। সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে যে লোফালুফি লেগে যাবে, সে-কথা নাচের মজলিসে না-এসেই বলা যায়।

ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছে। মজলিস গুলজার। সবাই মৌজে। তখনও লোকজন আসছে— এত লোকের যে কোথায় জায়গা হচ্ছে খোদায় মালুম, আল্লাই জানেন। এমন সময় একজোড়া কপোত-কপোতী আমাদেরই টেবিলের পাশে এসে জায়গার সন্ধানে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তখন সত্যি একখানা চেয়ারও খালি নেই। বুড়োবুড়ি তাদের ডেকে বললেন, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আপনারা আমাদের জায়গায় বসতে পারেন।' আমি উঠে দাঁড়ালুম। বুড়ি বললেন, 'সে কী কথা? আপনি থাকবেন। না-হলে মারিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসবে কে?' আমার বাড়ি যাবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এর পর তো আর আপত্তি জানানো যায় না। জর্মনি মধ্যযুগের প্রায় সব বর্বরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু শক্ত সমর্থ মেয়েরও রাত্রে রাস্তায় একা বেরুতে নেই এ বর্বরতাটা কেন ছাড়তে পারে না বুঝে ওঠা ভার।

কপোত-কপোতী চেয়ার দুটো পেয়ে বেঁচে গেল। কপোতীটি দেখতে ভালোই, মারিয়ার সঙ্গে বেশ যেন খাপ খেয়ে গেল। আমি তাদের মধ্যিখানে বসেছিলুম— আহা, যেন দুটি গোলাপের মাঝখানে কাঁটাটি।'

চাচার কথায় বাধা দিয়ে গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আত্মনিন্দা করবেন না। বরঞ্চ দুটো কাঁটার মাঝখানে গোলাপটি। আর কিছু না-হোক, সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে ইন্ডার হিসেবে নিশ্চয়ই আপনাকে মাইডিয়ার-মাইডিয়ার দেখাচ্ছিল।'

চাচা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। ওই বিদেশি চেহারার যে চটক থাকে তাই নিয়ে বাধল ফ্যাসাদ।

নাচের মজলিসে বিশেষ করে একই টেবিলে তো আর ব্যাকরণসম্মত পদ্ধতিতে ইন্ট্রডাকশন্ করে দেবার রেওয়াজ নেই। কপোতীটি বিনা আড়ম্বরে শুধাল, 'আপনি কোন

www.pathagar.com

দেশের লোক?' উত্তর দিলুম। তার পর এটা, ওটা, সেটা এমনকি ফষ্টিটা-নষ্টিটা, অবশ্যি সন্তর্পণে, যেন ফুলদানির ফুলের ভিতর দিয়ে থ্রু দ্য ফ্লাওয়ার্স।

ওদিকে দেখি কপোতটি এ জিনিসটা আদপেই পছন্দ করছে না।

আমি ভাবলুম, কাজ কী হ্যাঙ্গামা বাড়িয়ে। দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিলুম না, যেন শুনতে পাইনি। কিন্তু মারিয়াটা ঘড়েল মেয়ে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে আর নষ্টামির ভূত চেপেছে তার ঘাড়ে, হয়তো শ্যাম্পেনও তার জন্য খানিকটা দায়ী। সে আরম্ভ করল মেয়েটাকে উসকাতে। বলল, 'জানেন, ইনি আমার দাদা হন।'

মেয়েটি বললে, 'তা কী করে হয়। ওঁর রঙ বাদামি, চুল কালো, উনি তো ইন্ডার।'

মারিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'ওই তো! উনি যখন জন্মান, মা-বাবা তখন কলকাতার জর্মন কনসুলেটে কর্ম করতেন। কলকাতার লোক বাংলা ভাষায় কথা কয়। দাদাকে জিগ্যেস করুন উনি বাংলা জানেন কি না।'

মেয়েটি হেসে কুটি কুটি। বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর জর্মন বলাতে কেমন যেন একটু বিদেশি গোলাপের খুশবাই রয়েছে।' মেরেছে! বিদেশি ওঁচা এ্যাকসেন্ট হয়ে দাঁড়াল, গোলাপি খুশবাই!

চাচা বললেন, 'আমি মারিয়াকে দিলুম ধমক। দিয়ে করলুম ভুল। বোঝা উচিত ছিল মারিয়ার স্কন্ধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত ড্যাং ড্যাং করে নাচছে। শ্যাম্পেনকে ঝাঁকুনি দিলে তার বজ্‌বজ্‌ বাড়ে বই কমে না। মারিয়া মরমিয়া সুরে কপোতীর কাছে মাথা নিয়ে গিয়ে বলল, 'আর উনি এ্যাসা খাসা নাচতে পারেন! আমাদেরই ওয়ালট্‌স নাচ— আর তার ওপর থাকে ভারতীয় জরির কাজ। আইন, ৎসুয়াই, দ্রাই— আইন, ৎসুয়াই, দ্রাই,— তার সঙ্গে ধা, ধিন, না; ধা, তিন, না; ডাডরা— না?'

চাচা বললেন, 'পাঁচপীরের কসম, আমার বাপ-ঠাকুর্দা চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও নাচেনি। মুখে গরম আলু পড়াতে হয়তো নেচেছে, কিন্তু সে তো ওয়ালট্‌স নয়। মেয়েটাও বেহায়ার একশেষ। মারিয়াকে বলল, 'তা উনি যে নাচতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কী? কীরকম যেন সাপের মতো শরীর।' বলে চোখ দিয়ে যেন আমার গায়ে এক দফা হাত বুলিয়ে নিল।'

চাচা বললেন, 'ওঃ! এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ওদিকে ছেলেটাও চটে উঠেছে। আর চটবে নাই-বা কেন? বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে নাচের মজলিসে ফুর্তি করতে। সে যদি আরেকটা মদ্দার সঙ্গে জমে যায় তবে কার-না রাগ হয়? কপোত দেখি বাজপাখির মূর্তি ধরতে আরম্ভ করছে। তখন তাকিয়ে দেখি তার কোটে লাগানো রয়েছে নাৎসি পার্টির মেম্বারশিপের নিশান। ভারি অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম।

মারিয়া তখন তার-সপ্তকের পঞ্চমে। শেষ বাণ হানল, 'একটু নাচুন-না, হের ডক্টর!'

আমাদের দেশে যেমন বাচ্চা মেয়ের নাম 'পেঁচির মা', 'ঘেঁচির মা' হয়, আপন বাচ্চা জন্মাবার বহু পূর্বে, ম্যুনিক অঞ্চলে তেমনি ডক্টরেট প্রসব করার পূর্বেই পোয়াতী অবস্থাতেই আত্মীয়স্বজন ডাকতে আরম্ভ করে, 'হের ডক্টর।' আমার তখনও ডক্টরেট পাওয়ার ঢের বাকি কিন্তু আত্মজনের নেকনজরে আমি য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হার্ড-বয়লড 'হের ডক্টর' হয়ে গিয়েছিলুম। মারিয়ার অবশ্য এই বেমোকায় 'হের ডক্টর' বলার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যে অজ পাড়াগাঁয়ের মেলাতে বসে থাকলেই

www.pathagar.com

মানুষ কিছু কামার-চামার হতে বাধ্য নয়— আমি রীতিমতো খানদানি মনিষ্যি, 'হের ডক্টর'— বাংলা কথা।

মেয়েটি তখন কাতর হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলল, 'হে— র— ড— ক্— ট— র!'

চাচা বললেন, 'আমি মনে মনে বললুম, দুত্তোর তোর 'হের ডক্টর', আর দুত্তোর তোর এই মারিয়াটা।' মুখে বললুম, 'মারিয়া, আমি এখ্‌খুনি আসছি।' বলে, দিলুম চম্পট।

চাচা বললেন, 'তোরা তো ম্যুনিকে যাসনি, কাজেই জানিসনে মানুষ সেখানে কী পরিমাণ বিয়ার খায়। তাই সবাইকে যেতে হয় ঘন ঘন বিশেষ স্থলে। আমি এসব জিনিস খাইনে, কিন্তু তাই নিয়ে তো মারিয়া আর তর্কাতর্কি জুড়তে পারে না।'

চাচা বললেন, 'বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কষে ঠাণ্ডা বাতাস বুকের ভেতর নিয়ে সিগার-সিগরেটের ধুঁয়ো যতটা পারি ঝেঁটিয়ে বের করলুম। মারিয়াটা যে এত মিটমিটে শয়তান কী করে জানব বল। কিন্তু মারিয়ার কথায় মনে পড়ল, ওকে ফেলে তো বাড়ি যাওয়া যাবে না। বুড়োবুড়ি তা হলে সত্যই দুঃখিত হবেন। ভাববেন, এই সামান্য দায়টুকু আমি এড়িয়ে গেলুম। কিন্তু ততক্ষণে একটা দাওয়াই বের করে ফেলেছি। শরাবখানার ঠিক মুখোমুখি ছিল আরেকটি ছোটাসে ছোটা বিয়ার ঘর। সেখানে কফিও পাওয়া যায়। অধিকাংশ খদ্দের ওখানে ঢুকে 'বারে' দাঁড়িয়েই ঝপ করে একটা বিয়ার খেয়ে চলে যায়, আর যারা নিতান্ত নিরামিষ তারা বসে বসে কফিতে চুমুক দেয়। স্থির করলুম, সেখানে বসে কফি খাব, আর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখব। যদি মারিয়া বেরোয় তবে তক্ষুনি তাকে ক্যাঁক করে ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি না-বেরোয় তবে ঘণ্টাখানেক বাদে মারিয়ার তত্ত্বতালাশ করব। শ্যেনও ততক্ষণে ফের কবুতর হয়ে যাবে আশা করাটা অন্যায় নয়।'

চাচা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপস্! কী মারাত্মক ভুলই-না করেছিলুম সেই বিয়ারখানায় ঢুকে। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতে দেখি সেই কপোতী শরাবখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তার পর ঢুকল সেই বিয়ারখানাতে। আমার তখন আর লুকোবার বা পালাবার পথ নেই। আমাকে দেখে মেয়েটির মুখে বিদ্যুৎ-চমকানো-গোছ হাসির ঝিলিক মেরে উঠল। ঝুপ করে পাশের চেয়ারে বসে বলল, 'একটু দেরি হল। কিছু মনে করনি তো?' বলে দিল আমার হাতে হাত, পায়রার বাচ্চা যেরকম মায়ের বুকে মুখ গোঁজে।

বলে কী! ছন্ন না মাথা খারাপ? আপন মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝলুম, এরকম ধারা চলে এসে অন্য জায়গায় বসাটা হচ্ছে এদেশের প্রচলিত সঙ্কেত। অর্থটা 'সপত্ন (অর্থাৎ পুং-সতীন) ব্যাটাকে এড়িয়ে চলে এস বাইরে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' তাই সে এসেছে।

মেয়েটা আমার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিন্তু, ভাই, তুমি কায়দাটা জানো ভালো। টেবিলে তো ভাবখানা দেখালে আমাকে যেন কেয়ারই করো না।' বলে আমার গালে দিল একটি মিষ্টি ঠোনা।'

চাচা বললেন, 'আমি তখন মরমর।' ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ভুল করেছেন। আমায় মাফ করুন।' মেয়েটা তখন একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার এই

www.pathagar.com

প্রাচ্যদেশীয় টানা-ঠ্যালা কায়দা থামাও। আমার সময় নেই। তো এতক্ষণে আমার বন্ধুর সন্দেহ হয়েছে আর হঠাৎ এখানে এসে পড়বে। তা হলে আর রক্ষে নেই। তোমার ফোন নম্বর কত বল। আমি পরে কন্ট্রাক্ট করব। তখন তোমার সবরকম খেলার জন্য আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

বাঁচালে! নম্বরটা দিলেই যদি মেয়েটা চলে যায় তা হলে আমিও নিষ্কৃতি পাই। পরের কথা পরে হবে। নম্বর বলতেই মেয়েটা দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি দিয়ে চট করে সিগারেটের প্যাকেটে নম্বরটা টুকে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুশমন এসে ঘরে ঢুকল।

তার চেহারা কপোতের মতো তো নয়ই, বাজপাখির মতোও নয়, মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে, যেন চীনা ড্রাগন।

আর সে কী চিৎকার আর গালাগালি! আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেব্বাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। একই টেবিলে ওয়াইন খেয়ে, বন্ধুত্ব জমিয়ে এরকম ব্ল্যাকমেলিং, ব্যাক্স্টাবিং— আল্লা জানেন, আরও কতরকম কথা সে বলে যাচ্ছিল। সমস্ত বিয়ারখানার লোক তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছে। আমি হতভম্বের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটা তার আস্তিন ধরে টানাটানি করে বার বার বলছে, 'হান্স্, হান্স্ চুপ কর। এখানে সিন কর না। ওঁর কোনও দোষ নেই— আমিই—'

কনুই দিয়ে মেয়েটার পেটে দিল এক গুঁত্তা। চেঁচিয়ে বললে, 'হটে যা মাগি'— অথবা তার চেয়েও অভদ্র কী একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল আমার ঠিক মনে নেই। চটলে নাৎসিরা মেয়েদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে সেটা না-দেখলে বোঝবার উপায় নেই। হারেমে বুখারার আমির তাদের তুলনায় কলসি-কানার বোস্টম। গুঁতো খেয়ে মেয়েটা কোঁক্ করে, অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল।

এই বকাবকি আর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন আস্তিন গুটোয় আর বলে, 'আয়, এর একটা রফারফি হওয়া দরকার। বেরিয়ে আয় রাস্তার বাইরে।'

চাচা বললেন, 'আমি তো মহাবিপদে পড়লুম। অসুরের মতো এই দুশমনের হাতে দুটো খেলেই তো আমি উসপার্। ক্ষীণকণ্ঠে যতই প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করি যে, ফ্রলাইনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, আমার মনে কোনওরকম মতলব নেই, ছিল না, হওয়ার কথাও নয়, সে ততই চেঁচায় আর "কাপুরুষ" বলে গালাগাল দেয়।'

আড্ডার চ্যাংড়া সদ্য গোলাম মৌলা শুধাল, 'আর কেউ মূর্খটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল না যে, আপনি নির্দোষ?'

চাচা বললেন, 'তুই এদেশে নতুন এসেছিস তাই এ সব ব্যাপারে মরাল অথবা ইমরাল কোডের খবর জানিসনে। এদেশে এসব বর্বরতাকে বলা হয়, 'অন্যলোকের ঘরোয়া মামলা' Personal matter. এরা আসলে থাকে বিন্‌টিকিটে মজা দেখবে বলে।'

চাচা বললেন, 'ততক্ষণে অসুরটা আবার নাৎসি বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে। "যত সব ইহুদি আর বাদ-বাকি কালা-আদমি নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জত নষ্ট করে ফেললে, এই করেই বর্ণসঙ্কর (অবশ্য একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল) হয়, এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে, অথচ জর্মনির আজ এমন দুরবস্থা যে এরকম অত্যাচারের প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করতে পারছে না।” বিশ্বাস করবে না, দু-একজন ততক্ষণে তার কথায় সায় দিতে আরম্ভ করেছে আর আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি দুনিয়ার সবচেয়ে মিটমিটে শয়তান, আর কাপুরুষস্য কাপুরুষ।

মাফ চেয়ে নিলে কী হত বলতে পারিনে, কিন্তু মাফ চাইতে যাব কেন? আমি দোষ করিনি এক ফোঁটা, আর আমি চাইতে যাব মাফ। ভয় পাই আর নাই পাই, আমিও তো বাঙাল। আমার গায়ের রক্ত গরম হয় না? দুনিয়ার তাবৎ বাঙালদের মানইজ্জত বাঁচাবার ভার আমার ওপর নয় জানি, কিন্তু এই বাঙালটাই-বা এমনকি দোষ করল যে লোকে তাকে কাপুরুষ ভাববে?’

চাচা বললেন, ‘আমি বললুম, এসো তবে, যখন নিতান্তই মারামারি করবে বলে মনস্থির করেছ, তবে তাই হোক্!’ মনে মনে বললুম দুটো ঘুষি সইতে পারলেই চলবে, তার পর তো নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাব।

এ সময় হুঙ্কার শুনতে পেলুম, ‘এই যে! সব ব্যাটা মাতাল এসে একত্তর হয়েছে হেথায়। এস, এস, আরেক পাত্তর হয়ে যাক, মেলার পর্বে—’

চাচা বললেন, ‘তাকিয়ে দেখি অস্কার। একদম টং। এক বগলে খালি বোতল, আরেক বগলে ডানা-কাটা পরী। পরীটিও যেন শ্যাম্পেনের বুদ্বুদে ভর করে উড়ে চলেছেন। সেই উৎকট সঙ্কটের মাঝখানেও-না ভেবে থাকতে পারলুম না, মানিয়েছে ভালো।

অস্কারকে দুনিয়ার কুল্লে মাতাল চেনে। আমার কথা ভুলে গিয়ে সবাই তাকে উদ্বাহু হয়ে ‘আসতে আজ্ঞা হোক’, ‘বার-এ দাঁড়াতে আজ্ঞা হোক’ বলে অকৃপণ অভ্যর্থনা জানালো।

ওদিকে আমার মোষটা বাধা পড়ায় চটে গিয়ে আরও হুঙ্কার দিয়ে বলল, ‘তবে আয় বেরিয়ে।’

তখন অস্কারের নজর পড়ল আমার দিকে। আমাকে যে কী করে সে-অবস্থায় চিনতে পারল তার সন্ধান সুস্থ লোক দিতে পারবে না। পারবেন দিতে অস্কারের মতো সেই গুণী যিনি মৌজের গৌরীশঙ্কর চড়ে জাগরণসুষুপ্তিস্বপ্নতূরীয় ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁছতে পারেন। কাইজারের জন্মদিনের কামানদাগার মতো আওয়াজ ছেড়ে বলল, ‘ওই রেঃ। ওই ব্যাটা কালা ইন্ডার, মিশ্ শয়তানও এসে জুটেছে। যেখানেই যাও, শয়তানের মতো সব জায়গায় উপস্থিত। বিয়ার ধরেছিস নাকি? এক পাত্তর হয়ে যাক্। আজ তোকে খেতেই হবে। মেলার পর্ব।’

ষাঁড় আবার হুঙ্কার ছেড়েছে। অস্কার তার দিকে তাকিয়ে আর তার আস্তিন-টানা মারমুখো তসবির দেখে আমাকে শুধাল, ‘ইনি কিনি বটেন?’

আমি হামেহাল ‘জেন্টিলম্যান’। শাস্ত্রসম্মত কায়দায় পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু দুশমন অস্কারকে চেঁচিয়ে বলল, ‘তুমি বাইরে থাকো, ছোকরা। এর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।’

অস্কার প্রথমটায় এরকম মোগলাই মেজাজ দেখে একটুখানি থতমত খেয়ে গেল। খালি বোতলটায় একটা টান দিয়ে অতি ধীরে ধীরে মিনিটে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, ‘এর— সঙ্গে— আমার বোঝাপড়া— আছে? কেন বাবা, এত রাগ কিসের? এই পরবের বাজারে? তা ইন্ডারটা ঝগড়াটে বটে। হলেই-বা। এস, বেবাক ভুলে যাও। খেয়ে নাও এক পাত্তর। মনে রঙ লাগবে, সব ঝগড়া কপ্পুর হয়ে যাবে।’

www.pathagar.com

বলে জুড়ে দিল গান। অনেকটা রবিঠাকুরের 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে' গোছের।

দুশমন ততক্ষণে আমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এসেছে।

'হাঁ হাঁ কর কী, কর কী?' বলে অস্কার তাকে ঠেকালো। অস্কার আমার সপত্নের চেয়ে দু মাথা উঁচু। আমাকে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? নাৎসিদের ফের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?'

আমি যতটা পারি বোঝালুম। শেষ করলুম, 'কী মুশকিল!' বলে।

অস্কার বলল, 'তা আমি কি তোর মুশকিল আসান নাকি, না তোর ফ্যুরার। আর দেখছিস-না ও আমার পার্টির লোক।' আমি হাল ছেড়ে দিলুম।

কিন্তু অস্কারকে বোঝা ভার।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেই ষাঁড়কে জিগ্যেস করল, 'ইন্ডারটা তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেছিল?' আমি বললুম, 'ছিঃ অস্কার!'

সপত্ন বলল, 'চোপ!'

অস্কার শুধাল, 'চুমো খেয়েছিল?'

আমি বললুম, 'অস্কার'।

সপত্ন বলল, 'শাট আপ্!'

তখন অস্কার সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটিকে দু হাত দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড় করিয়ে বললে, 'খাসা মেয়ে।' তার পর বলা নেই কওয়া নেই তাকে জড়িয়ে ধরে বমশেলের মতো শব্দ করে খেল চুমো।

সবাই অবাক! আমিও। কারণ অস্কারকে ওরকম বেহেড মাতাল হতে আমিও কখনও দেখিনি। কিন্তু আমারই ভুল।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে ফেলে সে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সেই ছোকরার। একদম সাদা গলায় বলল, 'দেখো বাপু, আমার বন্ধু ইন্ডারটি তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেনি, চুমোও খায়নি। তবু তুমি অপমানিত বোধ করে তাকে ঠ্যাঙাতে যাচ্ছিলে। ও রোগা টিঙটিঙে কি না। ওঃ, কী সাহস! আমি তোমার বান্ধবীকে চুমো খেয়েছি। এতে তোমার জরুর অপমান বোধ হওয়া উচিত। আমিও সেই মতলবেই চুমোটা খেলুম। তাই এসো, পয়লা আমাকে ঠ্যাঙাও, তার পর না-হয় ইন্ডারটাকে দেখে নেবে।'

হুলস্থূল পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই। ছোকরা পড়ে গেল মহা বিপদে। অস্কারের সঙ্গে বক্সিং লড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। গেল বছরই এ অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওই সামনের শরাবখানাতেই। ছোকরা পালাতে পারলে বাঁচে কিন্তু অস্কার নাছোড়-বান্দা। আর পাঁচজনও কথা কয় না— এরকম রগড় তো পয়সা দিয়েও কেনা যায় না। সব পার্সনাল ম্যাটার কি না!

কিন্তু আমি বাপু ইন্ডার, কালা আদমি। আমি ছুটে গিয়ে ডাকলুম পুলিশ। ফিরে দেখি ছোকরা মুখ বাঁচাবার জন্য মুখ চুন করে কোট খুলছে আর শার্টের আস্তিন গুটোচ্ছে। অস্কার যেন খাসা ভোজের প্রত্যাশায় জিভ দিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ শব্দ করছে।

পুলিশ নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধা দিল। ট্যাক্সি ডেকে কপোত-কপোতীকে বিদেয় করে দিল। অস্কার বলল, 'ওরে কালা শয়তান, কোথায় গেলি? আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

www.pathagar.com

বান্ধবী সোহাগ ঢেলে শুধালেন, 'আপনি কোন দেশের লোক।' পয়লা কপোতীও ঠিক এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল।

আমি দিলুম চম্পট। অস্কার চেঁচিয়ে শুধাল, 'যাচ্ছিস কোথায়?' আমি বললুম, 'আর না বাবা। এক রাত্তিরে দু-দুবার না।'

কাফে-দে-জেনি

রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবলুম যাই কোথায়? হোটেলে? তা-ও কী হয়! খাস প্যারিসের বাসিন্দা ছাড়া আর তো কেউ কখনও তিনটের আগে শুতে যায় না। আমার এক রুশ বন্ধুকে প্যারিসে সকাল হওয়ার আগে কখনও বাড়ি ফিরতে দেখিনি। রাত তিনটে-চারটের সময় যদি বলতুম, 'রবের, চল, বাড়ি যাই' সে বেড়ালছানার মতো আমার কোটের আস্তিন আঁকড়ে ধরে বলত, 'এই অন্ধকারে? তার চেয়ে ঘণ্টাতিনেক সবুর করো, উজ্জ্বল দিবালোকে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়ে বাড়ি ফিরব। আমি কি নিশাচর, চৌর, না অভিসারিকা? অত সাহস আমার নেই।'

জানতুম মঁ পার্নাস বা আভেন্যু রশোসূয়ারের কোনও একটা কাফেতে তাকে পাবই। না পেলেও ক্ষতি নেই, একটু কফি খেয়ে, এদিক-ওদিক আঁখ মেরে 'নিশার প্যারিসের' হাতখানা চোখের পাতার উপর বুলিয়ে নিয়ে আধা-ঘুমো আধা-জাগা অবস্থায় হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়ব।

জুনের রাত্রি। না-গরম, না-ঠাণ্ডা। প্লাস দ্য লা মাদ্‌লেন দিয়ে থিয়েটারের গানের শেষ রেশের নেশায় এগিয়ে চললুম। গুন্‌গুন্ করছি :

তাজা হাওয়া বয়—
    খুঁজিয়া দেশের ভুঁই।
ও মোর বিদেশি যাদু
    কোথায় রহিলি তুই।*

ভাবছি রাধার চেয়ে কৃষ্ণের প্রেম ছিল ঢের বেশি ফিকে। অথচ ত্রিস্তানের প্রেম কি ইজলদের চেয়ে কম ছিল? না, জর্মনরা অপেরা লিখতে পারে বটে, ইতালীয়েরা গাইতে পারে বটে, কিন্তু ফরাসিরা রস চাখতে জানে বটে। বলেও, 'খাবার তৈরি করা তো রাঁধুনির কর্ম, খাবেন গুণীরা। আমরা অপেরা লিখতে যাব কোন দুঃখে?'

---

* কবিতাটির এ কটি ছত্র ইলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতায় আছে :

"Frisch weht der wind
    Der Heimat zu
Mein iriches kind
    Wo Weilst Du?"

www.pathagar.com

দেখি, হঠাৎ কখন এক অজানা রাস্তায় এসে পড়েছি। লোকজনের চলাচল কম। মোটরের ভেঁপু প্রায় বাজেই না। চঞ্চল দ্রুত জীবনস্পন্দন থেকে জনহীন রাস্তায় এসে কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করলুম। একটু জিরোলে হত। তার ভাবনা আর যেখানেই থাক প্যারিসে নেই। কলকাতায় যে-রকম পদে পদে না-হোক বাঁকে বাঁকে পানের দোকান, প্যারিসেও তাই। সর্বত্র কাফে। প্রথম যেটা চোখে পড়ল সেটাতেই ঢুকে পড়লুম।

মাঝারি রকমের ভিড়। নাচের জায়গা নয়। ক্যানেস্তারা ব্যান্ড বা রেডিও'র বাদ্যি-বাজনা নেই দেখে সোয়াস্তি অনুভব করলুম। একটা টেবিলে জায়গা খালি ছিল। শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা, কালো টুপিতে সোনালি হরফে 'ল্য মাতাঁ' লেখা— চোখ বন্ধ করে সিগারেটে দম দিচ্ছেন, সামনে অর্ধশূন্য কফির পেয়ালা। আমি একটু মোলায়েম সুরে বললুম, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন—'। 'তবে এই টেবিলে কি অল্পক্ষণের জন্য বসতে পারি?' এই অংশটুকু কেউ আর বলে না। গোড়ার দিকটা শেষ না-হতেই সবাই বলে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।' কিন্তু ল্য মাতাঁর হরকরা দেখলুম সে দলের নন। আমার বাক্যের প্রথমার্ধ শেষ করে যখন 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ' শোনবার প্রত্যাশায় থেমেছি, তিনি তখন চোখ মেলে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার অনুরোধ শব্দে শব্দে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন— তবে?— তবে কী?' এ হেন অপ্রয়োজনীয় অবান্তর প্রশ্ন আমি হিল্লি-দিল্লি-কলোন্-বলোন্ কোথাও শুনিনি। কী আর করি, বললুম, 'তবে এই টেবিলে অল্পক্ষণের জন্য বসি।' ল্য মাতাঁ বললেন, 'তাই বলুন, তা না-হলে আপনি যে আমার গলাকাটার অনুমতি চাইছিলেন না কী করে জানব? যারা সকল্পন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না, তারা ভাষার কোমর কাটে। মানুষের গলা কাটতে তাদের কতক্ষণ? বসুন,।' বলে ল্য মাতাঁ চোখ বন্ধ করে সিগারেটে আরেক-প্রস্ত দীর্ঘ দম নিলেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ না-মেলেই আস্তে আস্তে বললেন, যেন কোনও ভীষণ প্রাণহরণ উচাটন মন্ত্র জপে যাচ্ছেন, 'ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা, তা-ও আবার আমার সামনে।'

আমি বে-বাক অবাক! এ আবার কোন রায়বাঘা সাহিত্যরথী রে বাবা! কিন্তু রা কাড়তে হিম্মৎ হল না, পাছে ভাষা নিয়ে ভদ্রলোক আরেক দফা একতরফা রফারফি করে ফেলেন। আধঘণ্টা-টাক কেটে যাওয়ার পর ল্য মাতাঁ ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ঘুম ভাঙালেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফরাসি জানেন বলে মনে হচ্ছে।' কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়, তথ্য নিরূপণও নয়। আমি তাই বিনীতভাবে শুধু 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' গোছ একটা শব্দ তথ্য বের করলুম। অত্যন্ত শান্তস্বরে ল্য মাতাঁ বললেন, 'ভাষা সৃষ্টি কী করে হল তার সমাধান সাধনা নিষ্ফল। এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিলোলজিস্ট এসোসিয়েশনের ছিল বলেই তাদের পয়লা নম্বর আইন, তাদের কোনও বৈঠকে ভাষার সৃষ্টিতত্ত্ব, গোড়াপত্তন নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। তবু অনায়াসে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির আদিম প্রভাতে মানুষের ভাষা ছিল না, পশুপক্ষীর যেমন আজও নেই। আজও পশুপক্ষীরা কিচির-মিচির করে ভাব প্রকাশ করে। মানুষ কিন্তু 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' করে না!'

লোকটার বেআদবি দেখে আমি থ' হয়ে গেলুম। ল্য মাতাঁ জিগ্যেস করলেন, 'ফের্না রুমোর নাম শুনেছেন?' গোস্‌সা হয়ে, বেশ উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'শুনিনি।'

www.pathagar.com

'শুনিনি!' ল্য মার্তাঁ অতি বিজ্ঞের অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, জানেন না, অথচ কী গর্ব যে জানেন না। এই গর্ব যেদিন লজ্জা হয়ে সর্ব-অস্তিত্বকে খর্ব করবে, সেদিন সে লজ্জার জ্বালা জুড়োবেন কোন পঙ্ক দিয়ে? ও রেভোয়া।' বলে ল্য মার্তাঁ গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না-পেরে লোকটার কথা খানিকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম। তার পর আপন মনেই বললুম, 'দুত্তোর ছাই, মরুক গে।' একটা খবরের কাগজের সন্ধানে ওয়েটারকে ডেকে বললুম, 'কোনও একটা বিকেলের কাগজ, সকালেরটা বেরিয়ে থাকলে তাই ভালো।' ওয়েটার খানিকক্ষণ হাবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বিদেশি, মসিয়ো, তাই জানেন না, আমাদের ক্লিয়াঁতেল-গাহকরা সবাই জিনিয়স। কাফের নাম 'কাফে দে জেনি'— 'প্রতিভা কাফে'। এন্‌রা কেউ খবরের কাগজ পড়েন না। তবে সবাই মিলে একটা সাপ্তাহিক বের করেন— গ্রিক ভাষায়। তার একখণ্ড এনে দেব? আমি বললুম 'থাক।' এসিরিয়ন কি ব্যাবিলনিয়ন যে বলেনি সেই অন্তত এ পুরুষের ভাগ্যি।

ততক্ষণে দেখি আরেকটি ভদ্রলোক ল্য মার্তাঁর শূন্য চেয়ারখানা চেপে বসেছেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আপনি বুঝি ফের্না র‍্যুমোর বন্ধু?' আমি জিগ্যেস করলুম, 'ফের্না র‍্যুমো কে?' ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন? এই যার সঙ্গে কথা বলছিলেন—' হালে পানি পেলুম। হাল মালুম হল। বললুম, 'না, এই প্রথম আলাপ।' 'ও, তাই বলুন। আমার নাম পল রনাঁ। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলুম।' 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমার নাম ইরশাদ চৌধুরী।' শুধালুম, 'মসিয়ো কি গ্রিক খবরের কাগজ পড়েন?' রনাঁ উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাদের কাগজটার কথা বলছেন তো? না, আমি গ্রিক জানিনে। কিন্তু ওয়েটারটা জানে। আঁরিকে ডাকব? সে আপনাকে তর্জমা করে শুনিয়ে দেবে। তবে তার ফরাসি বোঝাও এক কর্ম।'

গোলকধাঁধাটি আমার কাছে আরও পেঁচিয়ে যেতে লাগল। জিগ্যেস করলুম, 'মসিয়ো র‍্যুমো কি ল্য মার্তাঁয় কাজ করেন? রনাঁ বললেন, 'পেটের দায়ে। এক কাপ কফি মেরে সে তিন দিন কাটাতে পারে। কিন্তু চার দিনের দিন? বছর দশেক পূর্বে তার একটা কবিতা বিক্রি হয়েছিল। পয়সাটা পেলে ভালো করে এক পেট খাবে। হালে যে কবিতাটা 'ল্য মেরক্যুরে' পাঠিয়েছিল, তারা সেটার কোঠা ঠিক না-করতে পেরে বিজ্ঞাপন ভেবে মলাটে ছাপিয়েছে। কিন্তু টাকার দুঃখ এইবার তার ঘুচল বলে। বাস্তাইয়ের জেলে ফাঁসুড়ের চাকরিটা খালি পড়েছে। র‍্যুমো দরখাস্ত করেছে। খুব সম্ভব পাবে। ফাঁসি দেওয়াতে ওয়াকিবহাল হয়ে যখন নতুন কবিতা ঝাড়বে তখন আর সব চ্যাংড়াদের ঘায়েল করে দেবে।'

জিগ্যেস করলুম, 'আপনি কিছু লেখেন?'

'লেখাপড়াই ভুলে গিয়েছি, তা লিখব কী করে?'

'লেখাপড়া ভুলে গিয়েছেন মানে?'

'মানে অত্যন্ত সরল। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকায় নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে হয়। কবিতা, গান, নাচ এক কথায় আর সব কিছু তখন শুধু অবান্তর নয়,

www.pathagar.com

জঞ্জাল। নদী যদি তরঙ্গের কলরোল তোলে তবে কি তাতে সুন্দরী ধরার প্রতিচ্ছবি ফোটে? ঝাড়া দশটি বছর লেগেছে, মোশয়, ভাষা ভুলতে। এখন ইস্তক রাস্তার নামও পড়তে পারিনে, নাম সইও করতে পারিনে। বেঁচে গেছি। জীবনের প্রথম প্রভাতে মানুষ কী দেখেছিল চোখ মেলে?— যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কলুষ-কালিমামুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে? তাই দেখি, তাই আঁকি।'

লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বললুম, 'সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ তার অনুভূতির প্রকাশ কি 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' করে করেনি?' দেখলুম রনাঁ বড় মিষ্টি স্বভাবের লোক। বাধা পেয়ে বাঘা জিনিয়সের মতো তেড়ে এলেন না। পুরুষ্টু গালে টোল লাগিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'র‍্যুমো বলেছে তো? ও তার স্বপ্ন। আর স্বপ্ন মানেই তো ছবি। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই। এমনকি সে ছবিতে রঙও নেই, কম্পজিশন নেই। সে বড় নবীন ছবি, সে বড় প্রাচীন ছবি। সে তো আত্মদর্শন, ভূমাদর্শন।'

জিগ্যেস করলুম, 'সে ছবি বুঝবে কে? তাতে রস পাবে কে? আমাদের চোখের ওপর যে হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতার পলেস্তরা।'

রনাঁ বড় খুশি হলেন। মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'লাখ কথার এক কথা বললেন, মসিয়ো। তাই বলি প্রাচ্যদেশীয়রা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি অসভ্য, অর্থাৎ সভ্য। চিরকাল মুক্তি সন্ধান করেছে বলে তাদের চোখ মুক্ত। চলুন, আপনাকেই আমার ছবি দেখাব।' জানালার পাশে বসেছিলেন, পর্দাটা সরিয়ে বললেন, 'এই আলোতেই আমার ছবি দেখার প্রশস্ততম সময়।'

বৃথা আপত্তি করলুম না। বাইরে ভোরের আলো ফুটছে।

রাস্তায় চলতে চলতে রনাঁ বললেন, 'আদিম প্রভাতের সৃষ্টি দেখতে হলে প্রদোষের অর্ধনিমীলিত চেতনার প্রয়োজন।'

তেতলার একটি ঘরে ঢুকলুম। ডাক দিলেন, 'নানেৎ।'

ঘরের চারদিকে তাকাবার পূর্বে নজর পড়ল নানেতের দিকে। সোফায় অর্ধশায়িতা কিশোরী না যুবতী ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। একগাদা সোনালি চুল আর দুটি সুডৌল বাহু। রনাঁ আলাপ করিয়ে দিলেন, 'মসিয়ো ইরশাদ, নানেৎ— আমার মডেল, ফিয়াঁসে, বন্ধু। নানেৎ, জানালাগুলো খুলে দাও।'

চারদিকে তাকিয়ে আমার কী মনে হয়েছিল আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ছবি আর ছবি। আগাগোড়া যেন ক্যানভাসে মোড়া। শোফাতে, মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন অতি নবীন না বহু প্রাচীন তালগোল পাকানো বস্তুপিণ্ড, না জ্বরের বেঘোরে ঘোরপাক খাওয়া আধা-চেতনার বিভীষিকার সৃষ্টি? পাঁশুটে, তামাটে, ঘোলাটে, ধোঁয়াটে এ কী?

হঠাৎ কানে গেল, রনাঁ ও নানেতে যেন আলাপ হচ্ছে।

'নানেৎ।'

'মন আমি (বন্ধু)।'

'দেখছ?'

'তুমি ছাড়া কী কেউ কখনও এমন সৃষ্টির কল্পনা করতে পারত?'

www.pathagar.com

'নানেৎ।'

'প্যারিস, পৃথিবী তোমাকে রাজার আসনে বসাবে।'

'না বন্ধু, আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে। নানেৎ মা শেরি (প্রিয়তমে)।'

'মন আমি।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলুম। দেখি প্রভাতসূর্য ইফেল মিনারের কোমরে পৌঁচেছে। চোখাচোখি হতে যেন স্বপ্ন কেটে গেল।

'রবেরের মুখে তাই— '

হামেশাই,

'নিশার প্যারিসে কভু, হাবা ওরে, বলি তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই।'

বিধবা-বিবাহ

আমাদের পুজো-সংখ্যা ইংরেজের ক্রিসমাস স্পেশালের অনুকরণে জন্মলাভ করেছিল কি না সে-কথা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরেজি স্পেশালের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাস সংখ্যাগুলোতে থাকে অসংখ্য ছেলেমানুষি গল্প আর এন্তার গাঁজা— বছরের আর এগারো মাস ইংরেজ হাঁড়িপানা মুখ করে থাকে বলে ওই একটা মাস সে মুখের সব লাগাম ছিঁড়ে ফেলে যা-খুশি তাই বকে নেয়। আমাদের পুজো সংখ্যায় এ সব পাগলামি থাকে না। তাই ভেবে পাইনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশানো এদেশের আজগুবি গল্পগুলো ঠাঁই পাবে কোথায়, কোন মোকায়?

এতদিন ইংরেজের নকল করতে বাধো বাধো ঠেকত। ভয় হত পাছে লোকে ভাবে 'খানবাহাদুরির' তালে আছি। এখন পুজোর গাঁজায় দম দিয়ে দু-চারখানা গুল ছাড়তে আর কোনও প্রকারের বাধা না-থাকারই কথা। অবশ্য সত্যি-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।

বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজি রাও-এর কথা এদেশের অনেকেই জানেন। ইনি বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মৌলানা মুহম্মদ আলীকে এবং এদেশ থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত অ্যাম্বেডকরকে বেছে নিয়ে বরোদার উন্নতির জন্য নিয়োগ করেন। এককালে 'প্রবাসী'তে এর সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। বরোদারাজ্যের দু-একজন বৃদ্ধের মুখে আমি শুনেছি, অরবিন্দ বাংলাদেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাতে নাকি সয়াজি রাও-এর গোপন সাহায্য ছিল।

ইনি আসলে রাখাল-ছেলে। বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে পর, ইনি তাঁর নিকটতম আত্মীয় বলে এঁকে দূর মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গুজরাতের বরোদারাজ্যের গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলর কাছাকাছি। বরোদার তখন এমনি দুরবস্থা যে দিবা-দ্বিপ্রহরে নেকড়ে বাঘ শহরের আশপাশ

www.pathagar.com

থেকে মানুষের বাচ্চা ধরে নিয়ে যেত— সরকারি চাকুরেদের বছর তিনেকের মাইনে বাকি থাকত বলে দেশটা চলত ঘুষের ওপর, আর তাবৎ বরোদা স্টেটের ঋণ নাকি ছিল ত্রিশ কোটি টাকার মতো।

সয়াজি রাও প্রায় বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। সারদা অ্যাক্ট পাস হবার বহু পূর্বেই তিনি নিজে জোর করে আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন, খয়রাতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালান, হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি খোলার বন্দোবস্ত করেন ও মরার সময় স্টেটের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা রেখে যান। বরোদা শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কলকাতাকে হার মানায়, সে পাল্লা দেয় বোম্বাই-বাঙালোরের সঙ্গে।

এই মহারাজাই দিল্লির দরবারে ইংরেজ রাজার দিকে পিছন ফিরে, ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গটগট করে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে তাঁর গদি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অরবিন্দের ব্যাপারে ইংরেজ তাঁর ওপর এমনিতেই চটা ছিল তার ওপর এই কাণ্ড— এরকম একটা অজুহাত ইংরেজ খুঁজছিলও বটে। এ ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং সয়াজি রাও লিখেছেন, 'ইংরেজ আমাকে গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল 'বাই গিভিং দি ডগ্ এ ব্যাড্ নেম্'।' তিনি দরবারে হিজ ম্যাজেস্টিকে কতটা অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কিন্তু ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য তিনি যে লাখ পনেরো ঘুষ দিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে সব মুনিই একমত। ব্রিটিশ প্রেসেরও চাপ নাকি ভালো করে তেল ঢাললে ঢিলে হয়ে যায়।

এসব কথা থেকে সাধারণ লোকের ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে সয়াজি রাও খাণ্ডার বিশেষ ছিলেন। তা তিনি ছিলেনও, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ— শুধু রাজরাজড়াদের ভিতরেই নয়, জনসাধারণের পাঁচজন বিদগ্ধ লোককে হিসেবে নিলেও।

সার ভি.টি. কৃষ্ণমাচারীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ইনি কিছুদিন পূর্বেও জয়পুরের দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন ও উপস্থিত কোথায় যেন আরও ডাঙর নোকরি করেন। ইনি যখন বরোদার দেওয়ানরূপে আসেন তখন তিনি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং আর কিছু পারুন আর না-ই পারুন, একথা সত্যি, বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর টনসিল আর জিভে প্যাঁচ খেয়ে যেত। এখনও সে উৎপাতটা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

শুনেছি তিনি যখন বরোদায় এলেন তখন 'সয়াজি বিহার ক্লাব' তাঁকে একখানা যগ্যির দাওয়াত দিলে। স্বয়ং মহারাজ উপস্থিত। শহরের কুতুবমিনাররা সব বোম্বাই বোম্বাই লেকচর ঝাড়লেন, ভি.টি'র মতো মানুষ হয় না, এক অ্যাডাম হয়েছিলেন আর তার পর ইনি, মধ্যিখানে স্রেফ সাহারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুতুবরা ভি.টি'-কে সপ্তম-স্বর্গে চড়িয়ে দিয়ে যখন থামলেন তখন,—

কৃষ্ণমাচারী-পানে সয়াজি রাও হাসিয়া করে আঁখিপাত।
চোখের পর চোখ রাখিয়া মূক কহিল ওস্তাদজি,
ভাষণ ঝাড়ো এবে উম্‌দা ভাষণ, ভাষণ এরে বলে ছি।

www.pathagar.com

ভি.টি'র শত্রুরা বলে তাঁর পা নাকি তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। অসম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক, তিনি অতি কষ্টে, নিতান্ত যে ধন্যবাদ না-দিলেই নয়, তাই বলে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

সর্বশেষে মহারাজার পালা। বুড়ো বলতেন খাসা ইংরেজি। অতি সরল এবং অত্যন্ত চোস্ত— সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বিবর্জিত।

সামান্য দু-একটা লৌকিকতা শেষ করে সয়াজি রাও বললেন, 'দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে বরোদা রাজ্য চালনা উপলক্ষে আমি বহু মহাজনের সংস্রবে এসেছি এবং তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আমি কিছু-না-কিছু শিখে আমার জীবন সমৃদ্ধশালী করেছি। এই দিওয়ানের কাছ থেকে শিখলুম বাকসংযম।'

শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণ কী করেছিলেন রামায়ণে নিশ্চয়ই তা সালঙ্কার বর্ণনা আছে— পাঠক সেটি পড়ে নেবেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সয়াজি রাও-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পাভলোভা এদেশে আসার বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভরতনাট্যম উত্তর ভারতে চালু করবার জন্য একটা আস্ত 'ট্রুপ' নিয়ে বিস্তর জায়গায় নাচ দেখিয়েছিলেন। উত্তর ভারত তখনও তৈরি হয়নি বলে দক্ষিণ-কন্যাদের সে-নৃত্যের কথা আজ সবাই ভুলে গিয়েছে।

বরোদার 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট' দেশ-বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না। এ স্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না যে, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র।

সয়াজি রাও-এর অনুরোধেই শিল্পী নন্দলাল বসু বরোদার 'কীর্তি মন্দিরের' চারখানি বিরাট প্রাচীরচিত্র এঁকে দিয়েছেন। নন্দলাল এত বৃহৎ কাজ আর কোথাও করেননি।

নিচের কিংবদন্তীটি পড়ে পাছে কেউ ভাবেন সয়াজি রাও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাই তাঁর বহু কীর্তি থেকে এই সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিতে বাধ্য হলুম।

গল্পটি আমাকে বলেছিলেন পূর্ববাংলার এক মৌলবি সায়েব— খাস বাংলা ভাষায় বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দের বগ্হার দিয়ে। সে ভাষা অনুকরণ করা আমার অসাধ্য। গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত তার হুবহু নকল দিতে পারে না।

নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো ব্রহ্মটান দিয়ে বললেন— 'এই বরোদা শহরে কত আজব রকমের বেশুমার চিড়িয়া ওড়াউড়ি করছে তার মধ্যিখানে সয়াজি রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি নিজে তো সিঙি, অমুক ব্যাটা গাধা, অমুক শালা শুয়োর, অমুক হারামজাদা বিচ্ছু, আর আমি নিজে তো একটা আস্ত মর্কট, না হলে এদেশে আসব কেন?— এসব মজুত থাকতে চিড়িয়াখানা বানাবার মতলব বোধকরি জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য, যদি বড্ড বেশি তেড়িমেড়ি করে তবে খাঁচা থেকে বের করে বড় বড় নোকরি তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

বাইরের জানোয়ারগুলোর জ্বালায় অস্থির হলে আমি হামেশাই চিড়িয়াখানায় যাই। খুদখেয়ালি অর্থাৎ আত্মচিন্তার জন্য জায়গাটি খুব ভালো। তা সেকথা যাক।

সয়াজি রাও বহু জানোয়ার এনেছেন বহু দেশ ঘুরে। পৃথিবীটা তিনি কবার প্রদক্ষিণ করেছেন, তার হিসাব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় হল হাবশি দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে।

আমাদের দেশের লোক সাদা চামড়ার ভক্ত। যে যত কালো সাদা চামড়ার প্রতি তার মোহ তত বেশি, ইয়োরোপে নাকি কালো চামড়ার আদর ঠিক সেই অনুপাতে। একমাত্র হাবশিরাই শুনেছি আপন চামড়ার কদর বোঝে। তাই সায়েবদের দিকে তারা তাকায় অসীম করুণা নিয়ে— আহা, বেচারিদের ও-রকম ধবল কুষ্ঠ হয় কেন?

সয়াজি রাও-এর রঙ কালো। হাবশি রাজা প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললেন, আমাদের মহারাজার খানদান অতিশয় শরীফ। কোনও রকমের বদ্-জাত ধলা খুন তার কুলজি-ঠিকুজিতে কভি-ভি দাখিল হতে পারেনি। এ খুনের জন্য আমির-ওমরাহ্, নোকর-খিদমৎগার আপন খুন বহাতে হামেহাল হরবকত হাজির।

হাবশি-রাজ সয়াজি রাও-এর দরাজদিলের নিশানও ঝট্পট পেয়ে গেলেন। জাহাজেই রাজার জন্মদিন পড়েছিল— সয়াজি রাও তাঁকে একখানা খাসা কাশ্মীরি শাল ভেট দিলেন। হাবশি সে-শাল পেয়ে খুশির তোড়ে বে-এক্তেয়ার। জাহাজময় ঘুরে-ফিরে সবাইকে সে-শাল দেখালেন, লাল দরিয়ার গরমিকে একদম পরোয়া না-করে সেই লাল শাল গায়ে দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন। চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক্ তিনি শালখানা কাপ্তান সায়েবের হাতে জিম্মা দিলেন।

হাবশি-রাজাও কিছু নিকৃষ্ট মনুষ্য নন। সয়াজি রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কী সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনও ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বে আছেই-বা কী? দুশ্চিন্তায় হাবশি রাজার কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব! আমি মিশরে থাকার সময় বিস্তর হাবশি দেখেছি। তারা খানদানি নয়— তাদের মুখই আরও কালো করা যায় না, খুদ হাবশিরাজের কথা বাদ দিন।'

মৌলবি সায়েব রাগ করে বললেন, 'ঝকমারি! হাজার দফা ঝকমারি তোমাদের মতো বদরসিককে গল্প বলা। পঞ্চম জর্জের রঙ তো ফর্সা তবে কি ভয় পেলে তাঁর রঙ আরও ফর্সা হয় না?'

আমি 'আলবৎ আলবৎ' বলে মাপ চাইলুম।

মৌলবি সায়েব বললেন, 'শেষটায় হাবশিরাজ মহারাজের সেক্রেটারির সঙ্গে ভাব জমিয়ে বহুৎ সওয়াল-জবাব করলেন আর মনে মনে একটা ভেট ঠিক করে নিলেন।

সে বৎসর গরম পড়েছিল বেহদ্। লু চলেছিল জাহান্নামের হাওয়া নিয়ে, আর আকাশ থেকে ঝরেছিল দোজখের আগুন। 'সয়াজি সরোবরের' বেবাক নিলুফরি পানি খুদাতালা বেহেশত বাসিন্দাদের জন্য দুনিয়ার মাথট হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন, আর বরোদার জৈনরা পাখিদের জন্য গাছে গাছে জল রেখেছিল হাজারো রুপিয়া খর্চা করে। শুকনো গরমের জুলুমে আমার দাড়ি-গোঁফ পর্যন্ত পট পট করে ফেটে যাচ্ছিল। এমন সময় শহরময় খবর

www.pathagar.com

রটল, হাবশি বাদশাহ হাইলে সেলাসিস মহারাজা সয়াজি রাওকে একজোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন— তাঁর মুল্লুকের সবচেয়ে বড় জানোয়ার। 'হিজ হাইনেস সয়াজি রাও মহারাজ সেনা-খাস-খেল বাহাদুর, ফরজন্দ-ই-দৌলত-ই-ইনকলিসিয়া, শমশের জঙ্গ বাহাদুরের কদমের ধুলো কিস্মৎ এদের নেই, তবু যদি মহারাজ মেহেরবানি করে এদের গ্রহণ করেন, তবে হাবশি বাদশাহ বহুৎ, বহুৎ খুশ হবেন।'

সেই গরমের মাঝখানে খবরটা রটল আগুনের মতো। আর গুজব রটল ধুঁয়োর মতো, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। কেউ বলে, 'ওরকম জোড়াসিংগি লন্ডন শহরের মতো চিড়িয়াখানাতেও নেই', কেউ বলে, 'হাবশি বাদশা খাস ফরমান দিয়ে মানুষের মাংস খাইয়ে খাইয়ে এদের তাগড়া করিয়েছেন', কেউ বলে, 'এদের গর্জনের চোটে জাহাজের তাবৎ লস্কর-সারেঙ বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে।' আরও কত আজগুবি কথা যে রটল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সয়াজি রাও যে খুশি হয়েছিলেন সে সংবাদটাও শহরে রটল। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের ওপর হুকুম হল হাবশি সিংগির জন্য খাস হাবেলি তৈরি করবার। কামাররা সব লেগে গেল খাঁচা বানাতে— দিনভর দমাদ্দম লোহা পেটার শব্দ শুনি, আর শহরের ছোঁড়ারা তখন থেকেই খাঁচার চতুর্দিকে ঝামেলা লাগিয়ে মেহমানদের তসবির-সুরৎ নিয়ে খুশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্য। সেখান থেকে তারে খবর এল মেহমানরা কোন গাড়িতে বরোদা পৌঁছবেন। সেদিন শহরের ছ-আনা লোক স্টেশনে হাজিরা দিল— হুজুরদের পয়লা নজরে দেখবার জন্য। হাবেলিতে যখন তাদের ঢোকানো হল, তখন শহরের আর বড় কেউ বাদ নেই। সয়াজি মহারাজ শুনলেও গোসা করবেন না বলে বলছি, খুদ তাঁকে দেখবার জন্যও কখনও এরকম ধারা ভিড় হয়নি।

আমিও ছিলুম। আর যা দেখলুম তার সামনে দাঁড়াবার মতো আর কোনও চিজ আমি কখনও দেখিনি। আমার বিশ্বাস এ-জোড়া সিংগি দেখার পর আর কেউ খুদাতালায় অবিশ্বাস করবে না। তোমরা কী সব বল না, নেচার নেচার— সব কিছু নেচার বানিয়েছে'—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি তো কখনও বলিনি।'

মৌলবি সাহেব ট্যারচা হাসি হেসে বললেন, 'সিংগি-দুটোর সামনে কাউকে আমি বলতেও শুনিনি। তোমাদের ওই নেচার কোন কোন জিনিস পয়দা করেছেন জানিনে কিন্তু এরকম সিংগি বানানো তাঁর বাপেরও মুরদের বাইরে।

কী চলন, কী বৈঠন, ক্যা পশম, ক্যা গর্দন! পায়ের নখ থেকে দুমের লোম পর্যন্ত সব কুছ গড়া হয়েছে, স্রেফ এক চিজ দিয়ে— তাকৎ! খুদার কেরামতি বুঝবে কে, তাই তাজ্জব মেনে বার বার তাঁকে জিগ্যেস করি, 'এ-রকম মাতব্বরকে তুমি এ-দুনিয়ার রাজা না-করে মানুষের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিলে কেন?'

সিংগি-জোড়াকে দেখবার জন্য আহমদাবাদ, আনন্দ, ভরোচ, সুরট এমনকি বোম্বাই থেকে লোক আসতে লাগল। ফুল ফুটলে কেউ লক্ষ করে, কেউ করে না, চাঁদ উঠলে কেউ

www.pathagar.com

খুশি হয়, কেউ তাকায় না, কিন্তু এ জোড়া সিংগি দেখে মনে মনে এদের পায়ে তসলিম দেয়নি, এরকম লোক আমি কখনও দেখিনি।

তবে আমি নিজে এদের দেখেছি সবচেয়ে বেশি। কোঁচড় ভরে ছোলাভাজা নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি এই রাজা-রানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাঁদের ভাষা বুঝিনি এ কথা সত্য, কিন্তু একটা হক বাৎ আমি তাঁদের ঘোঁতঘোঁতানি থেকে সাফ সাফ বুঝে নিয়েছিলুম, সেটা হচ্ছে এই— হিন্দুস্তান মুল্‌ক্‌টা হুজুরদের বিলকুল পছন্দ হয়নি।

তাই যেদিন ফজরের নামাজ পড়ার পর শুনতে পেলুম সিংগিটা মারা গিয়েছে তখন আশ্চর্য হলুম না বটে কিন্তু পাগলের মতো ছুটে গেলুম চিড়িয়াখানায় আর পাঁচজনেরই মতো। ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি, দেখি এর-ই মাঝে জলসা জমে গিয়েছে। সবাই মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এক হাট লোকের সকলেরই বড় ব্যাটা মারা গিয়েছে।

আর সিংহরাজ শুয়ে আছেন পুবদিকে মুখ করে। আহা হা, কী জৌলুস, কী বাহার! দেখে চোখ ফেরাতে পারলুম না। জ্যান্ত অবস্থায় চলাফেরার দরুনই হোক অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, তার সম্পূর্ণ শরীরের পরিমাণটা যেন আমার চোখে ঠিক ধরা দেয়নি, আজ স্পষ্ট দেখতে পেলুম কতখানি জায়গা নিয়ে হুজুর শেষ-শয্যা পেতেছেন। মনে মনে বললুম, আলবৎ আলবৎ। এই শেষশয্যা দেখেই কবি ফিরদৌসি, তাঁর 'শাহনামা' কাব্যে সোহরাবের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করেছেন।

আর সিংগিনী! সে বোধহয় তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সিংহের চতুর্দিকে চক্কর লাগাচ্ছে, তার গা শুঁকছে আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনও মহারানি ব্যাপারটা না-বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে সওয়াল করছেন।

বিহানের পয়লা সোনালি রোদ এসে পড়ল সিংহের কেশরে। শাহান-শাহ বাদশার সোনার তাজে যেন খুদাতালা আপন হাতে গলা-সোনা ঢেলে দিলেন। সে তসবিরে চোখ ভরে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।

বরোদা শহর শোকে যেন নুয়ে পড়ল। যেখানে যাও, ওই এক কথা, আমাদের সিংহ গত হয়েছেন।

সেদিন স্কুল-কলেজ বসল না, ছেলে-ছোকরারা খাঁচার সামনে বসে আছে,— চুপ করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে কারও মুখে কথাটি নেই। আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করল।

সিংগির লাশ বের করতে গিয়ে ম্যানেজারের জিভ বেরিয়ে গেল। সিংগিনী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। খাবার লোভ দিয়ে যে তাকে পাশের খাঁচায় নিয়ে এ-খাঁচা থেকে লাশ বের করা হবে তারও উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কী কৌশলে মুশকিল ফৈসালা হল জানিনে, আমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।

তার পর আরম্ভ হল সিংগিনীর গর্জন আর দাবড়ানো। সমস্ত দিন খাঁচার ভিতর মতিচ্ছন্নের মতো চক্কর খায় আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাঁচার দেয়ালে দেয় ধাক্কা। এরকম খাঁচা ভাঙবার মতলব আগে কখনও সিংহ-সিংহী কারও ভিতরেই দেখা

www.pathagar.com

যায়নি। এখন সিংগিনী খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু বেড়ে গেছে খাঁচাটাকে ভাঙবার চেষ্টা। সেই দুর্বল শরীর নিয়ে কখনও সমস্ত তাগদ দিয়ে খাঁচায় দেয় ধাক্কা, কখনও শিকগুলোকে খামচায়, আর কখনও লাফ দিয়ে তেড়ে এসে মারে জোর গোত্তা। সে কী নিদারুণ দৃশ্য!

সয়াজি রাও খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, 'বাঢ়িয়া, উম্‌দা হাবশি সিংহ যোগাড় করার জন্য আদিস আব্বাবার সঙ্গে যোগাযোগ কর, কিন্তু সাবধান হাবশিরাজ যেন খবর না-পান তাঁর দেওয়া সিংহ মারা গিয়েছে। আর ততদিনের জন্য কাঠিয়াওয়াড় থেকে একটা দিশি সিংহ আনবার ব্যবস্থা কর। সে-ও যেন উম্‌দাসে উম্‌দা হয়, রুপেয়া কা কুছ পরোয়া নাহি।'

সয়াজি রাও বাদশার দয়ার শরীর, তাঁর লোমে লোমে মেহেরবানি। খুদাতালা তাঁর জিন্দেগি দরাজ করুন, হরেক মুশকিল আসান করুন— বরোদার সিংহই বুঝতে পারে হাবশি সিংগিনীর দর্দ।

এক মাস বাদে বর এলেন কাঠিয়াওয়াড় থেকে। এ এক মাস আমি চিড়িয়াখানায় যাইনি। পাঁচজনের মুখে শুনলুম, সিংগিনীর দিকে তাকানো যায় না— তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে।'

মৌলবি সায়েব গল্প বন্ধ করে জানালার দিকে কান পেতে বললেন, 'আজান পড়ল। তাড়াতাড়ি শেষ করি।

দুলহাকে যখন খাঁচায় পোরা হবে তখন 'চার আঁখে' মিলবার তসবির দেখার জন্য আমি আগেভাগেই খাঁচার সামনে গিয়ে হাজির হলুম। সিংগিনীর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এল। অসম্ভব রোগা দুবলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেজ কমেনি এক রত্তিও।

কাঠিয়াওয়াড়ের দামাদ এলেন হাতি-টানা গাড়িতে করে। তিনিও কিছু কম না। কিন্তু হাবশি সিংগির যে তসবির আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল তাঁর তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌশন। সিংহ হিসেবে খাবসুরৎ, কিন্তু দুলহা হিসেবে না-পাস।

খাঁচার দরজা দিয়ে দামাদ ঢুকলেন আস্তে আস্তে। সিংগিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এমন এক অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যে, আমি তার কোনও মানেই করতে পারলুম না।

তার পর যা ঘটল তার জন্যে আমরা কেউ তৈরি ছিলুম না। হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে, খাঁচা ইস-পার উস-পার হয়ে পড়ল এসে সিংগির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিন কিংবা চার-খানা বিরাশি শিক্কার থাবড়া! কাঠিয়াওয়াড়ি দামাদ ফৌত! বিলকুল ঠাণ্ডা!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী কথা?'

মৌলবি সায়েব বললেন, 'একলহমায় কাণ্ডটা ঘটল। কেউ দেখল, কেউ না।'

আমি বললুম, 'একটা লড়াই পর্যন্ত দিলে না?'

মৌলবি সায়েব বললেন, 'না'।

আমি বললুম, 'তার পর?'

মৌলবি সায়েব বললেন, 'তার পর আর কিছু না। আমি এখন চললুম, গল্পে মেতে গেলে আমার আর কোনও হুঁশ থাকে না।'

www.pathagar.com

দরজার কাছে গিয়ে মৌলবি সায়েব থামলেন। বললেন, 'হুঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।

খবরটা সয়াজি রাও-এর কাছে পৌঁছে দিতে কেউই সাহস পান না। শেষটায় তাঁর খাস পেয়ারা শহর-কাজী আর ধর্মাধিকারী নাড্‌কর্নিকে ধরা হল। তাঁরা যখন খবরটা দিলেন তখন মহারাজ নাকি একদম কোনও রকমেরই চোটপাট করলেন না। উল্টো নাকি মুচকি হাসি হেসে বললেন,

'আমি যখন বিধবা-বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম তখন তোমরাই-না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানি বিধবা— তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক— নতুন বিয়ে করতে চায় না। হাবশি সিংগিনী এদেরও হার মানালে যে!'

রাক্ষসী

আরাম-আয়েশ ফুর্তি-ফার্তির কথা বলতে গেলেই ইংরেজকে ফরাসি শব্দ ফরাসি ব্যঞ্জনা ব্যবহার করতে হয়। 'জোয়া দ্য ভিভ্‌র' (শুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকার আনন্দ), 'বঁ ভিভ্‌র' (আরামে আয়েশে জীবন কাটানো) 'গুরমে' (পোশাকি খুসখানেওয়ালা), 'কনেস্যর' (সমঝদার, রসিকজন) এসব কথার ইংরেজি নেই। ভারতবর্ষে হয়তো এককালে ছিল, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছিল— মৃৎশকটিকা, মালতীমাধব নাট্যে আরাম-আয়েশের যে চৌকস বর্ণনা পাওয়া যায় তার কুল্লে মাল তো আর গুল-মারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না— আজ নেই এবং তার কারণ বের করার জন্যও ঘেরণ্ড সংহিতা ঘাঁটতে হয় না। রোগশোক অভাব-অনটনের মধ্যিখানে 'গুরমে' হওয়ার সুযোগ শতকে গোটেক পায় কি না সন্দেহ— তাই খুশ-খানা, খুশ-পিনা বাবদের বেবাক ভারতীয় কথাগুলো ভাষা থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে, নতুন বোল-তানের প্রশ্নই ওঠে না।

তবু এই 'বঁ ভিভ্‌রের' কায়দাটা এখনও কিছু জানে পশ্চিম ভারতের পার্সি সম্প্রদায়। খায়-দায়, হৈ-হুল্লোড় করে, মাত্রা মেনে ফষ্টিনষ্টি ইয়ার্কি-দোস্তি চালায় এবং তার জন্য দরকার হলে 'ঋণং কৃত্বা' নীতি মানতেও তাদের আপত্তি নেই। 'তাজ' হোটেলে বসে মাসের মাইনে এক রাত্তিরে ফুঁকে-দেনে-ওলা বিস্তর পার্সি বোম্বাইয়েই আছে। আর গোলাপি নেশায় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে কোনও পার্সি ছোকরা যদি ল্যাম্প-পোস্টটাকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে ঝপাঝপ গণ্ডাদশেক চুমো খেয়ে ফেলে তা হলে তার বউ হয় স্ন্যাপশট তোলে, নয় 'চ, চ বাইরাম, তোর নেশা চড়েছে' বলে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরদিন ক্লাবে বসে বউ 'পাগলা বাইরামের' কীর্তি-কাহিনীতে বেশ একটুখানি নুন-লঙ্কা লাগিয়ে মজলিস গরম করে তোলে, আর বাইরামের বাপ গল্প শুনে মিটমিটিয়ে হাসে, ব্যাটার 'এলেম' হচ্ছে দেখে আপন ঠাকুরদার স্মরণে খুশি হয়ে দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

গাওনা-বাজনায় ভারি শখ। একদল বেটোফেন-ভাগনার নিয়ে মেতে আছে, আরেকদল বরোদার ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদি করে, আর 'লাল্লা লাল্লা লা' গান গেয়ে নাকি বহু পার্সি বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে নেমে এসেছে।

অন্য কোনও সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ সব কথা বলতে আমি সাহস পেতুম না, কিন্তু পার্সিদের ঈষৎ রসবোধ আছে, তা সে সূক্ষ্মই হোক, আর স্থূলই হোক। আলাপ জমাতেও ভারি ওস্তাদ। বিদেশিকে খাতির করে ঘরে নিয়ে যায়, বাড়ির আর পাঁচজনকে নতুন চিড়িয়া দেখাবে বলে তাকে কাঠি বানিয়ে সবাই মিলে তার চতুর্দিকে চর্কিবাজির নাচন তুলবে বলে।

তাই বরোদা পৌঁছবার তিন দিনের ভিতরই রুস্তম দাদাভাই ওয়াডিয়া গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপচারী করলেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে বুড়ো বাপ, বউ, তিন ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিনই পার্সি সম্প্রদায়ে ধান্‌সাক্ (আমাদের লুচিমণ্ডা) খাবার নেমন্তন্ন পেলুম। এবং সেদিনই খানা শেষে বললেন, 'আসছে রোববার সন্ধেয় বোমানজি নারিমানের দু ছেলের নওজোত। আপনার নেমন্তন্ন রয়েছে। আসবেন তো?'

আমি তো অবাক। এ দুনিয়ার পার্সি বলতে আমি মাত্র এই ওয়াডিয়া পরিবারকেই চিনি। বোমানজি নারিমান লোকটি কে, এবং আমাকে নেমন্তন্ন করতে যাবেই-বা কেন? আমি বললুম, 'নারিমানকে তো চিনিনে।'

ওয়াডিয়া বললেন, 'চিনে আপনার চারখানা হাত গজাবে নাকি (পার্সিরা ইয়ার্কি না-করে কথা কইতে পারে না)? খাওয়ায় ভালো— সেইটে হল আসল কথা। এই নিন আপনার কার্ড— ও দিয়েও আপনার চারখানা হাত গজাবে না। আপনি ভাববেন না আমি নারিমানের দোরে ধন্না দিয়ে এ কার্ড বের করেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের জমে গিয়েছে নারিমান সেটা নিজের থেকেই জানতে পেরে কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। না-পাঠালে অবশ্যি আমি একটুখানি নল চালাতুম— আপনার মতো গুণীকে বাদ দিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম— 'আমি গুণী!'

ওয়াডিয়া বললেন, 'বাঁধা ছালার দাম পঁচিশ লাখ। দু দিন বাদে সব শালা (পার্সিরা এই শব্দটি প্রায় সব কথার পিছনেই লাগায়) আপনাকে চিনে নেবে, কিছু ভয় নেই। তদ্দিন দু পেট খেয়ে নিন। নারিমানের ছেলেদের নওজোতের পরে আসছে সোরাবজির মেয়ের বিয়ে, তার পর আসছে—'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'নওজোত পরব কী?'

বললেন, 'এলেই দেখতে পাবেন, হিন্দুদের যেমন 'পৈতে' হয়, পার্সিদের তেমনি 'নওজোত'। শুধু 'কস্তি' অর্থাৎ পৈতেটা বাঁধতে হয় কোমরে আর সঙ্গে পরতে হয় একটি ছোট্ট ফতুয়া— তার নাম সদরা। এই 'কস্তি' 'সদরা' দুয়ে মিলে হয় পার্সিদের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।'

ওয়াডিয়ার বউ রৌশন বললেন, 'যত সব সিলি স্যুপারস্‌টিশন্‌স!'

রুস্তম বললেন, 'লং লিভ্ সচ্ স্যুপারস্‌টিশন্‌স। এদেরই দৌলতে দু মুঠো খেয়ে নিই। শালা বোমানজির পেটে বোমা মারলেও সে এক পেট খাওয়ায় না। তার বাপ শালা (সবাই শালা) বিয়ে করেছিল বিলেতে, শ্যাম্পেনটা কেকটা ফাঁকি দেবার জন্য।'

www.pathagar.com

পার্সিদের পাল্লায় পড়লে বুঝতেন। রোববার বিকেলবেলা রুস্তম বউ, বেটাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি করে আমার বাড়িতে উপস্থিত— পাছে আমি ফাঁকি দিই।

গাড়িতে বসে বললেন, 'পার্সিদের কী নাম দিয়েছে আর সব গুজরাতিরা জানেন? 'কাগড়া' অর্থাৎ ক্রো। তার প্রথম কারণ, আমরা কালো কোট টুপি পরি, দ্বিতীয় কারণ পাঁচটা পার্সি একত্র হলেই কাকের মতো কিচির-মিচির করি, তৃতীয় কারণ কাকের মতো খাদ্যাখাদ্য বিচার করিনে— জানেন তো আর সব গুজরাতিরা শাকখেকো—, চতুর্থ কারণ আমাদের নাকটা কাকের মতো বাঁকানো আর শেষ কারণ মরে গেলে কাকে আমাদের মাংস খায়।' তার পর হো-হো করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'গুজরাতিদের রসবোধ নেই, সবাই জানে, কিন্তু এ রসিকতাটা মোক্ষম।'

আমি বললুম, 'সব হিন্দুই একবার স্মোক করে, সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাক আর না-ই থাক, সেটা জানেন?'

বললেন, 'কীরকম?'

'তাদের তো পোড়ানো হয়, দেন্ দে স্মোক।'

রৌশন বললেন, 'তবু ভালো, শকুনির ছেঁড়াছেঁড়ির চেয়ে স্মোক্ করা ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'কেন? চারটে শকুনি যদি এক পেট খেতে পায় তাতে আপত্তিটা আর কী? এই আপনাদের বোমানজি যদি জ্যান্ত অবস্থায় কাউকে খাওয়াতে না-চায় তবে না হয় মরে গিয়েই খাওয়াল।'

রৌশন বললেন, 'আপনি জানেন না, তাই বলছেন। বোম্বায়ে টাওয়ার অব সায়লেন্সের আশপাশের কোনও বাড়িতে কখনও বাসা বাঁধলে জানতেন। একটা শকুনি হয়তো একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগল তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা আপনার পায়ের কাছে কিংবা মাথার উপরে। ভেবে দেখুন তো অবস্থাটা। তিন বছরের বাচ্চার মুণ্ডু, গলাটা ছিঁড়েছে শকুনে—'

আমি বললুম 'থাক্ থাক্।' কিন্তু আশ্চর্য ওয়াডিয়ার বাচ্চাদুটো শিউরে উঠল না কিংবা মাকে এসব বীভৎস বর্ণনা দিতে বারণ করল না। অনুমান করলুম, এরা ছেলেবেলা থেকেই এ-বিষয়ে অভ্যস্ত।

নওজোত অনুষ্ঠান হচ্ছিল একটা প্ল্যাটফর্মের উপর। সাদা জাজিমে মোড়া। দুটি আট-ন বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে, আর চারজন 'দস্তুর' (পুরোহিত) আবেস্তা, পহলবি ভাষায় গড়গড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। এককালে যজ্ঞোপবীত দেবার সময় পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন যজ্ঞোপবীতের দায়িত্ব কী, আজ যে সে উপবীত ধারণ করতে যাচ্ছে তার অর্থ মায়ের কোল আর খেলাধুলো তার জন্য শেষ হল, সে আজ সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এখন কটা ছেলে এসব বোঝে তা জানিনে, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, 'নওজোত'ও উপনয়নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে— যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিসফিস করে কথা বলতে মানা নেই। আমি রুস্তমকে আমার গবেষণামূলক তত্ত্বচিন্তাটি অতিশয় গাম্ভীর্য সহকারে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, 'আপনার তাতে কী, আমারই-বা তাতে কী? রান্নাটা ভালো হলেই হল।'

www.pathagar.com

বুঝলুম 'ইতর জনের জন্য মিষ্টান্ন'— প্রবাদটি সর্বদেশে প্রযোজ্য।

নওজোত শেষ হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে নামল ঝমঝম বৃষ্টি। অকালে এরকম বৃষ্টির জন্য কেউ তৈরি ছিলেন না। নিমন্ত্রিত-রবাহূত সবাই ছুটে গিয়ে উঠলেন বাড়ির বারান্দায়। তার পর বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে, একদল ড্রইংরুমে, আরেক দল ডাইনিং রুমে। আত্মীয়-কুটুমরা বেড-রুমে ঢুকলেন। আমাকে রুস্তম নিয়ে গেলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, বোধহয় বাচ্চা দুটোর পড়ার ঘর।

আমরা জনা-বারো সেই কুঠুরিতে কাঁঠাল-বোঝাই হয়ে বসলুম। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এক বুড়ো পার্সি দুবগলে দুবোতল মদ নিয়ে। আমরা কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান নিরামিষ ছিলুম, আমাদের জন্য এল আইসক্রিম, লেমনেড।

বুড়ো একটা বোতল ছেড়ে দিলেন মজলিসের জন্য। অন্য বোতলটা নিজে টানতে লাগলেন নির্জলা। বিলেতে পালাপরবে, ঘরেবাইরে সর্বত্রই মদ খাওয়া হয়, তাই আমি এন্তার মদ খাওয়া দেখেছি কিন্তু দশ মিনিট যেতে না-যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যক্তি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পেশাদারি ব্রাহ্মণের পাইকারি বহ্বান্ন ভক্ষণের মতো এঁর পাইকারি পান দ্রষ্টব্য বস্তু।

মদ খেলে কেউ হয়ে যায় ঝগড়াটে, কেউ-বা আরম্ভ করে বদ রসিকতা, কেউ করে খিস্তি, কেউ হয়ে যায় যিশুখ্রিস্ট— দুনিয়ার তাবৎ দুঃখকষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চায়, আর সবাইকে গায়ে পড়ে টাকা ধার দেয়। পরের দিন অবশ্য চাকরের ওপর চালায় চোট-পাট, ভাবে (পার্সি হলে) ওই শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে।

আমি গিয়েছিলুম এক কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসব বলে। বোতলটি আধঘণ্টার ভিতর শেষ করে বুড়ো এসে বসলেন আমারই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে স্থান করে দিলুম। বুড়ো শুধোলেন, 'আপনি এ শহরে নতুন এসেছেন?' আমি কীর্তিটা অস্বীকার করলুম না। বললেন, 'তাই ভাবছেন আমি মাতাল।'

বুঝলুম ইনি যিশুখ্রিস্ট টাইপ নন, ইনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডলিন টাইপ— অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত। বললুম, 'কই, আপনি তো দিব্য আর পাঁচজনের মতো কথা কইছেন।'

বললেন, 'এক বোতলে আমার কিছু হয় না, পাঁচ বোতলেও কিছু হয় না, দশ বোতলেও না— যদিও অতটা কখনও খেয়ে দেখিনি।'

সত্যি লোকটার গলা সাদা, চোখের রঙ থেকেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় না— বুড়ো বয়সের ঘোলা চোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না। পাকা বাঁশে তেল লাগলেও একই রঙ।

বললুম, 'তা হলে না-খেলেই পারেন।'

বললেন, 'খাই না তো, হঠাৎ ওরকম অকালে বৃষ্টি না-নামলে।'

মদ খাওয়ার নানা অজুহাত বাজারে চালু আছে। এটা নতুন। বৃষ্টির জলের সঙ্গে নামল বটে কিন্তু ধোপে টিকবে না। বললুম, 'হুঁ'।

'আপনিও খেতেন।'

'? ? ? ?'

'সে অবস্থায় পড়লে।'

www.pathagar.com

আমি শুধালুম, 'কোন অবস্থায়?' তার পর বললুম, 'কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কেন? বিশেষত আপনার ধর্মে যখন ও জিনিস বারণ নয়।'

'আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কারণ আর সবাই জানে—'

আমি বললুম, 'তা হলে বলুন।'

বললেন, 'রুস্তম বলছিল, আপনি নাকি পুব-ভারতের লোক, পার্সিদের আচার-ব্যবহার পালা-পর্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টাওয়ার অব সায়লেন্স কাকে বলে জানেন?'

আবার 'মৌন শিখর'! বললুম, 'আজই প্রথম শুনেছি।'

বললেন, 'কুয়োর মতো গোল করে গড়া হয়। আর দেয়ালের ভিতরের দিকে বড় বড় শেলফের মতো কুলুঙ্গি বা 'নিশ্' কাটা থাকে। সেগুলোর উপর মড়াকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বোম্বাই-টোম্বাই অঞ্চলে বিস্তর শকুনি ওঁত পেতে বসে থাকে, তিন মিনিটের ভিতর হাড্ডিগুলো ছাড়া সব কিছু সাফ করে দেয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে এসব দেখবার হুকুম নেই। একমাত্র 'শববাহক'-ই ভিতরে যায়। এই যে নওজোতের সময় 'দস্তুর'দের দেখলেন তেমনি পার্সিদের ভিতরে বিশেষ 'শববাহক' সম্প্রদায় আছে। টাওয়ার অব সায়লেন্সের ভিতর যা কিছু করার তারাই সব করে। এমনকি 'দস্তুর'দেরও ভিতরে যাওয়া বারণ।

আমার জন্ম মধুগাঁয়ে, সেখানেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি। মধুগাঁও সি-পি-তে। আপনি কখনও যাননি? তা হলে বুঝতেন গ্রীষ্মকালে সেখানে কীরকম গরম পড়ে। আর সে গরম একদম শুকনো— বোন ড্রাই। দেয়ালের কেলেন্ডার বেঁকে যায়, বইয়ের মলাট বাঁকতে বাঁকতে কেতাব থেকে খসে পড়ে, টেবিলটা পর্যন্ত পিঠ বাঁকিয়ে বেড়ালটার মতো লড়াইমুখো হয়ে ওঠে। এমনকি মানুষেরও রস-কষ শুকিয়ে যায়। হাতাহাতির ভয়ে গরমের দিন একে-অন্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় নিক্তি-মেপে।

সেই গরমে মারা গেল এক আশি বছরের হাড্ডিসার বুড়ি। আমার ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যুবতী— বোকা ছোঁড়ারা তখনই তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঝরাপাতা', 'কুকুরের জিভ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকোতে শুকোতে শেষ পর্যন্ত রইল চামড়ায় জড়ানো খানকয়েক হাড্ডি। আর স্বভাব ছিল এমনি খিটখিটে যে আমরা পারতপক্ষে তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতুম না। বিশ্বাস করবেন না, বেটি বারান্দায় বসত একগাদা নুড়ি নিয়ে। কেউ ভুলেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বুড়ি সেই নুড়ি ছুড়তে আরম্ভ করত তাগ করে— আর সে কী মোক্ষম তাগ। 'প্র্যাকটিস মেক্স্ পার্ফেক্ট' রচনায় এক ছোঁড়া বুড়ির উদাহরণ দিয়ে আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পেয়েছিল।

বুড়ির ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না, প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছাড়া। কিন্তু কুকুরটার ওপর তো আর বুড়ির শেষ ক্রিয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারটা পড়ল আমাদের ঘাড়েই। মহাবিপদে পড়ল মধুগাঁয়ের পার্সি সম্প্রদায়।

'এককালে মধুগাঁয়ে বিস্তর পার্সি বসবাস করত বলে তারা শহরের মাইলখানেক দূরে ভালো টাওয়ার অব সায়লেন্স বানিয়েছিল। আপন 'শববাহক'ও জন আষ্টেক ছিল। কিন্তু সে হল সত্তর-আশি বৎসরের কথা। ইতোমধ্যে পার্সি সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশ-বারোটি পরিবারে। তাই মৃত্যুর হার এসে দাঁড়িয়েছে বছরে এক কিংবা তার

www.pathagar.com

চেয়েও কম। টাওয়ার অব সায়লেন্সের শকুনগুলো পর্যন্ত পালিয়েছে না-খেয়ে মর-মর হয়ে। মানুষের বুদ্ধি শকুনের চেয়ে বেশি তাই 'শববাহকের' দল শকুনগুলোর বহুপূর্বেই মধুগাঁও ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তাই সমস্যা হল বুড়িকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? এসব ব্যাপারে পার্সিরা বামুনদের চেয়ে তিনকাঠি বেশি গোঁড়া।' 'শববাহক' না-হলে তো চলবে না— বরঞ্চ পার্সি সম্প্রদায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তিন দিন কাটিয়ে দেবে তবু 'শববাহক' ভিন্ন কেউ মড়া ছুঁতে পারবে না।

টেলিগ্রাম করা হল এক আঁটা— চতুর্দিকের পার্সিদের কাছে, পার্সি-ধর্ম লোপ পায়, পার্সি-ঐতিহ্য গেল গেল, তোমরা সব আছো কী করতে, চারটে 'শববাহক' না পেলে মধুগাঁও উচ্ছন্ন যাবে, সৃষ্টি লোপ পাবে।

শববাহকেরা শেষটায় এল। এক ছোকরা 'দস্তুর' তখনও মিসিং লিঙ্কের ন্যাজের মতো বসি-বসি করে মধুগাঁয়ের পশ্চাদ্দেশে ঝুলছিল, সে মন্তর-ফন্তরগুলো সেরে দিলে— হোলি জিসসই জানেন তার কতটা শুদ্ধ কতটা ভুল।

সেই মার্চ মাসের আগুনের ভিতর দিয়ে চারটে শববাহক, 'দস্তুর' জি আর আমারই মতো আরও দুই মূর্খ গেলুম টাওয়ার অব সায়লেন্সে। গেটের কাছে শববাহক ছাড়া আর সবাইকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার ছায়ায় একটু কম গরম হই। সান্ত্বনা এইটুকু যে শববাহকেরা রেকর্ড টাইমের ভিতর বেরিয়ে এল। গেটে তালা মেরে আমরা সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে এলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর যদি কখনও ওই হতভাগা টাওয়ারে যেতে হয় তবে যাব, শেষবারের মতো, শববাহকদের কাঁধে চেপে।

কিন্তু খুদার কেরামতির কে ভেদ করবে বল? তিন মাস যেতে না-যেতে মরলেন আমার বিধবা পিসি— বাবা বিদেশে, মা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছেন। বাড়িতে সোমত্থ আর কেউ নেই। আমি পাগলের মতো শববাহকের সন্ধানে দুনিয়ার চেনা-অচেনা সবাইকে তার করলুম। মে মাসের অসহ্য গরম পড়েছে আকাশ ভেঙে— মধুগাঁয়ে যে ক-ফোঁটা বৃষ্টি হয় সে জুলাই মাসে, তার পূর্বে ও-মুল্লুকে কখনও মেঘ করেনি, বৃষ্টি ঝরেনি। ধরণী যে ঠাণ্ডা হবেন তার কোনও আশা-ভরসা নেই জুলাই মাস পর্যন্ত। 'দস্তুর'টিও ইতোমধ্যে ন্যাজটার মতো খসে পড়েছেন, তারই-বা সন্ধান পাই কোথায়?'

'ভাগ্যিস, আমি ইস্কুলমাস্টার। আমার ছেলেরা ছুটল এদিক-ওদিককার শহরে। তারা সব হিন্দু, দু-একটি মুসলমান— কিন্তু গুরুর দায় বুঝতে পেরে কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউ লোকাল ধরে এমনি লাগা লাগল যে মনে হল তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লিক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন, সবকিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ছেলেদের বললুম, 'বাবারা আমায় বাঁচালে। কিন্তু আর না। তোমাদের আর সঙ্গে আসতে হবে না। আর শোনো, এই গরমে যদি টাওয়ার যেতে-আসতে আমি মরি তা হলে আমাকে পুড়িয়ে ফেল, না-হয় গোর দিও।'

আমি বললুম, 'সে কী কথা?'

আমার কথা যেন আদপেই শুনতে পাননি সেইরকমভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কড়াইয়ে গরম তেল ফুটছে আর আমি তারই ভিতর সাঁতার কেটে কেটে টাওয়ারের দিকে চলেছি। এক পা ফেলি আর ভাবি এ-দুনিয়ায় এই শেষ পা-ফেলা, পরের

www.pathagar.com

কদমেই দেখব জাহান্নামের বুকিং আপিসের সামনে 'কিউয়ে' পৌঁছে গিয়েছি— স্বর্গে যাওয়ার হলে ভগবান এই কড়াই-ভাজার প্র্যাক্‌টিস কপালে লিখবেন কেন?

টাওয়ার অব সায়লেন্সের সামনে এসে বসে পড়েছি। 'দস্তুর'জির শেষ মন্ত্রোচ্চারণ আমার কানে এসে পৌঁচচ্ছে যেন কোনও দূরদূরান্ত থেকে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখান দিয়ে যেন কিছু দেখছি, কিছু শুনছি, শববাহকেরা ক্লান্ত শ্লথ গতিতে মড়া নিয়ে টাওয়ারের ভিতর ঢুকল।

তার পরমুহূর্তেই আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এল, টাওয়ারের ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে। সে চিৎকারে ছিল মাত্র একটা জিনিস—ভয়। যারা চিৎকার করল তারাই যে শুধু ভয় পেয়েছে তা নয়, সে চিৎকার যেন স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'আর কারও নিস্তার নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে চারজন শববাহকের দু-জন পাগলের মতো হাত-পা ছুড়ে ছুড়ে এদিক ওদিক টাল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। একজন আমাদের দিকে তাকিয়েই একমুখ ফেনা বমি করে পড়ল 'দস্তুর'জির পায়ের কাছে। আরেকজন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই-রকম টাল খেয়ে খেয়ে যে কোনদিকে চলল সে জানে না। 'দস্তুর'জিও একবার তার দিকে তাকান আরেকবার তাকান ভিরমি-যাওয়া লোকটার দিকে। টাওয়ারের ভিতর থেকে আর কোনও শব্দ আসছে না, কিন্তু যে পাগলটা ছুটে চলেছে সে চিৎকার করে করে যেন গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে— সে কী অমানুষিক বীভৎস কণ্ঠস্বরের বিকৃত পরিবর্তন।

'দস্তুর'জি আর আমি এমনি হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি যে আমাদের মাথায় কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই খেলছে না, পা-দুটো যেন মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি বললে অল্পই বলা হল, কারণ অদ্ভুত এক ভীতি আমাকে তখন অসাড় করে ফেলেছে।

কতক্ষণ এ-রকম ধারা কাটল আমার মনে নেই। আস্তে আস্তে মাথা সাফ হতে লাগল, কিন্তু ভয় তখনও কাটেনি। 'দস্তুর'জি বললেন, আর দুটো 'শববাহকে'র কী হল? তারা বেরুচ্ছে না কেন? আমার মনেও সেই প্রশ্ন, উত্তর দেব কী?

'দস্তুর'জি ও আমার দু জনেরই ভিতরে যাওয়া বারণ। 'দস্তুর'জির কর্তব্যবোধ হয়েছে না কি, কে জানে, বললেন, 'চলুন, ভিতরে যাই।'

আমার এখনও মনে হয়, 'দস্তুর'জি তখন সম্পূর্ণ সম্বিতে ছিলেন না। আমি জানি আমি নিশ্চয়ই ছিলুম না। তাঁর পিছনে পিছনে কোন সাহসে ভর করে গেলুম বলতে পারব না। আমি এ বিষয়ে বহু বৎসর ধরে আপন মনে তোলপাড় করেছি। খুব সম্ভব যুগ যুগ ধরে 'দস্তুর'জিদের হুকুম তামিল করে করে আমরা সাধারণ গৃহী বিপদকালে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এখনও তাঁদের অনুসরণ করি।

ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই দেখি—'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'কী, কী?'

আমার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে-রকম আমি আপনার দিকে তাকালুম ঠিক সেইরকম তাকিয়ে আছে টাওয়ারের দেওয়ালের একটা শেলফের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে, ঘাড় আমাদের দিকে ফিরিয়ে সেই হাড্ডি-সার বুড়ি,

www.pathagar.com

যাকে আমরা তিন মাস আগে এই টাওয়ারে রেখে গিয়েছিলুম, গায়ের চামড়া আরও শুকিয়ে গিয়েছে, আর— আর, চোখের কোটর দুটো ফাঁকা, কালো দুই গর্ত। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।'

হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কেউ আমাকে একটা বোতল দেবে না, নাকি রে।'

অথবা ওইরকম কিছু একটা আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কী করে যে এ-রকম ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে সে কথা জিগ্যেস করবার মতো হিম্মৎ বুকে বেঁধে উঠতে পারছিনে, পাছে আরও ভয়ঙ্কর কোনও-এক বিভীষিকা তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

হঠাৎ যেন আমার প্রতি ভদ্রলোকের দয়া হল। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলছি।'

'যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমার উপর কে যেন বালতি বালতি জল ঢালছে। তার পর বুঝলুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার চতুর্দিকে স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

সেই যে শববাহক পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল তাকে ওরকম অবস্থায় একা দেখতে পেয়ে ছেলেরা আমাদের সন্ধানে এখানে এসে পৌঁচেছে।

যে দু জন শববাহক ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তারা আর কখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি। যে বাইরে এসে ভিরমি গিয়েছিল সে পরে সুস্থ হল বটে কিন্তু তার মাথা এখনও সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি— আর যে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তাকে এখনও পাগলা গারদে বেঁধে রাখা হয়েছে। একমাত্র 'দস্তুর'জিই এই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

অথচ ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার বোঝা গেল। বুড়ি ছিল হাড্ডি-সার, গায়ে একরত্তি চর্বি ছিল না, যেটুকু মাংস ছিল তা না-থাকারই শামিল। তিন মাসের গরমে বুড়ি শুটকি হয়ে এমনি এক অদ্ভুত ধরনের বেঁকে গিয়েছিল যেন পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসেছে— শুধু চোখ দুটো একদম উপে গিয়েছে। সর্বশরীরের কোথাও এতটুকুও আঁচড় নেই— আপনাকে আগেই বলেছি, মধুগাঁও থেকে সব শকুন বহুদিন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল।

এক সাধুর কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম। কিন্তু অকালে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখনও বোতল বোতল মদ খেয়ে ছবিটা মগজ থেকে মুছে ফেলতে হয়।'

পাদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না-পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল— সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না-খেয়ে মারা গেলেন।

www.pathagar.com

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা, যাঁরা কোনওগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনও কোনও ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাসির চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু একথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু-যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনও পরান্ন ভক্ষণ করেননি— পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা— ঘৃণা বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজি হতেন— অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনার 'দোলা-লাগা' 'পাখি-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভালো খেলা— সেদিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পরমুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত-না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের উপর পা দুখানা তুলে ঘুমুতেন সবচেয়ে বেশি। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না-করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে-কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম আর পণ্ডিতমশাইকে খুশি করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ওই বিষয়টি নতুন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; ওই 'দোলা লাগা, পাখি-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার ওপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখা-মৃগ', 'দ্রাবিড়-সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না-করে তিনি আমাকে সাধারণত সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল-অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না-করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না-হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনও মনস্থির করতে পারিনি যে, সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশি হয়েছে।

www.pathagar.com

পণ্ডিতমশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত— অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না-এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্র বারের মতো স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দুখানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তার পর যে-কোনও একটা অজুহাত ধরে আমাদের একচোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনও অজুহাতই পেতেন না— ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়— সেদিন দু-চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে— কিন্তু বেশ জোরগলায়— আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মতো নিষ্ফল নয় কি?' তার পর কখনও আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যম-পত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনও প্রকারে সান্ত্বনা না-দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান— একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজও যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে-সময়ে আসামের চিফ-কমিশনার ছিলেন এন.ডি. বিটসন্ বেল। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন.ডি-তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বিটসন্ বেল্ অর্থ 'বাজায় ঘণ্টা'— দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাটসাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে— পদ্মর ভগ্নীপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা-চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

www.pathagar.com

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সক্কলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজির মতো তুর্কিনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সেদিকেই হেডমাস্টার— নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলি যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব কজনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কী হয়েছে?'

'দেখেই আয়-না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক, কখনও বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না-মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নতুন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কী বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতি, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মতো দেখাচ্ছিল), কেউ বললেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জি আবার ফিট-অফিট কী?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবি সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশচায, এরকম উমদা গেঞ্জি দু খানা তৈরি হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানি দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারও কপালে এরকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাসি নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেন্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবি-শার্ট পরেন না, কিন্তু লাটসায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরি কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিনমাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর-ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না-যেতেই পণ্ডিতমশাই দু হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান, ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনও ডান হাত, কখনও বাঁ-হাত দিয়ে

www.pathagar.com

চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনও মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মতো এখানে-ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবনভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার ওপর গেঞ্জি, সে-ও আবার একদম নতুন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনও করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব এ কী গব্ব-যন্তণা', কখনও এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন— লাটসায়েবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না-পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাটসায়েব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না-হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওর জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।'

আমি হাতজোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারও কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট— শেষটায় আমাকে ডোবাবি-না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না-করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি কিরে-কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তার পর লুপ্ত-দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক-পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনও বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম-ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মতো ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ— আর লাটসায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্ডিট্' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন— এই অনাদৃত পণ্ডিতশ্রেণি সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কীরকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না-দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃত-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা

www.pathagar.com

জন-দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাটসায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লিজ'। লাটসায়েব আমাদের বলল 'প্লিজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ— তখনও প্লিজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতে-টা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেললে— আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাটসায়েব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কী বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সবকিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়তো রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,— না-হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়তো একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাটসায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নতুন গেঞ্জির চুলকানির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু-তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনও গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারও দিকে না-তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা-মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাঁহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ— যোগারূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর— ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাটসায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাসি নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না। বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?'

বললুম, 'ওই যে বললুম, একগাদা, এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা-মেঘের গুরু গুরু ডাক আরও গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মতো অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই; জিগ্যেস করুন-না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ— রাত্র্যন্ধ হলেও না-হয় বুঝতুম। কেন? লাটসায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণশক্তি নিয়ে—'

www.pathagar.com

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেন্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কী বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ', বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপি। আমাকে অনেক সেলাম-টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা; লাটসায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাটসায়েবের সব খবর জানে, তোর মতো কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সাহেবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কী করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটা ও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তার পর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তার পর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'মদনমোহন কীরকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার— পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালোই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন্। মিম্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, তুই কীরকম আঁক শিখেছিস। বল্ তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তার পর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল্ তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ-পরিবার লাটসায়েবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান?

আমি হতবাক।

www.pathagar.com

'বল্ না।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

- মূর্খের মতো একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে— কেউ বাদ যায়নি— পণ্ডিতমশাই আত্মঅবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস-শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসাব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

পুনশ্চ

অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল প্যারিসে। কিন্তু এরকম ধারা ব্যাপার বার্লিন, ভিয়েনা, লন্ডন, প্রাগ যে কোনও জায়গায় ঘটতে পারত।

প্যারিসে আমার পরিচিত যে কয়টি লোক ছিলেন তাঁরা সবাই গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাসের দিনগুলো গ্রামাঞ্চল অথবা সমুদ্র-তীরে কাটাতে চলে গিয়েছেন। বড্ড একা পড়েছি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর গিমে ম্যুজিয়মে সমস্ত সময় কাটানো যায় না— প্যারিসের ফুর্তিফার্তি রঙ্গরস করা হয়ে গিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তিতে আর কোনও নতুন তত্ত্ব নেই। এসব কথা ভাবছি আর প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলেছি এমন সময় শুনি, 'বঁ সোয়ার মসিয়ো ল্য দক্তর।' তাকিয়ে দেখি ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ সুন্দরী যুবতীদের একজন। চেনা চেনা মনে হল কিন্তু চেষ্টা করেও নামটা স্মরণ করতে পারলুম না। অনেকখানি অভিমান মাখিয়ে সুন্দরী অনুযোগ করলেন, 'চিনতেই পারলেন না, অথচ প্যারিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেও আপনি আমাকে চিনতেন।' ঠাস করে মাস্টারমশায় চড় মারলে ছেলেবেলা যে-রকম মন্টোনিগ্রোর রাজধানীর নাম আচম্বিতে মনে পড়ে যেত ঠিক সেই রকম একঝলকে মনে পড়ে গেল দেশ থেকে মার্সেই হয়ে প্যারিস আসার সময় ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হ্যাট পূর্বেই তুলেছিলুম, এবারে বাও করে বললুম, 'হাজার অনুশোচনা, মনস্তাপ এবং ক্ষমা-ভিক্ষা, মাদমোয়াজেল শাতিন্নো।' কায়দাকানুন বাবদে প্যারিস-লক্ষ্ণৌ-এ বিস্তর মিল আছে। বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে নির্ভয়ে লক্ষ্ণৌ চালাবেন। পস্তাতে হবে না। ইতর ব্যাপারে 'যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট' হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতার ব্যাপারে 'আধিক্যে দোষ নেই'।

www.pathagar.com

মাদমোয়াজেল ক্ষমাশীলা। 'আঁশাতে (enchanted)।' বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি দস্তানা পরা হাত ঠোঁটের কাছে ধরলুম— শাস্ত্রে বলে চুমো খাবে, কিন্তু অল্প পরিচয়ে 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' সূত্রই প্রযোজ্য। মাদমোয়াজেল বললেন, 'মা-হারা শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?' আমি বললুম, 'ললাটঙ্ক লিখন', তিনি বললেন, 'চলুন, আমার সঙ্গে সিনেমায়।'

খেয়েছে! একে তো সিনেমা জিনিসটার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, তার ওপর ঈষৎ অনটনে দিন কাটাচ্ছি। একেবারে যে দরিয়ায় পড়েছি তা নয়, কিন্তু একটুখানি ইয়ে— অর্থাৎ কি না দু দণ্ড জলে গা ভাসাতে হলে যে গামছার প্রয়োজন মা-গঙ্গাই জানেন তার অভাব কিছুদিন ধরে যাচ্ছে। আনিটা-সিকিটা করব আর ফুর্তিও হবে এমন হিসাবি ব্যসনে আমি বিশ্বাস করিনে। তাই আমার গড়িমসি ভাব দেখে মাদমোয়াজেল বললেন, 'আমার কাছে দুখানা টিকিট আছে— 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার প্রশংসা শুনেছি।' আর এড়াবার পথ রইল না।

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এখনও তো ঘণ্টাখানেক বাকি। চলুন একটা কাফেতে।'

'চলুন।'

ক্রের বিবি যে পানীয়ের ফরমাইস দিলেন তার নাম আমি কখনও শুনিনি, ওয়েটারটা পর্যন্ত প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। আনতেও অনেক দেরি হল। সে পানীয় এলেনও অদ্ভুত কায়দায়। প্রকাণ্ড গম্বুজের মতো গেলাসের তলাতে আধ ইঞ্চিটাক ফিকে হলদে, খোদায় মালুম কী চিজ। আমি কফির অর্ডার দিলুম।

ক্রের দশ মিনিটেই সেই খোদায়-মালুম-কী শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, বড্ড গরম, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তখন ওয়েটার এসে আমাকেই বলল চল্লিশ ফ্রাঁ অর্থাৎ চার টাকার কাছাকাছি। বলে কী? ওই তিন ফোঁটা— যাকগে। ক্রের তখন ব্যাগ থেকে রুমাল বের করছিলেন; ব্যাগ বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আপনিই দেবেন, সে কী?' আমি বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আনন্দের কথা, হেঁ হেঁ।'

বেরিয়ে এসে ক্রের প্যারিসের পোড়া পেট্রলভরা বাতাসে লম্বা দম নিয়ে বললেন, 'বাঁচলুম। কিন্তু এখনও তো অনেক সময় বাকি। কোথায় যাই বলুন তো?'

দেশে থাকতে আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগতুম। সবসময় সব কথা শুনতে পাইনে।

ক্রের বললেন, 'ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে। সিনেমার কাছেই খোলা হাওয়ায় একটা রেস্তোরাঁ আছে। আপনার ডিনার হয়ে যায়নি তো?'

বাঙালির বদঅভ্যাস আমারও আছে। ডিনার দেরিতে খাই। তবু ফাঁড়া কাটাবার জন্য বললুম, 'আমি ডিনার বড় একটা—'

বাধা দিয়ে ক্রের বললেন, 'আমিও ঠিক তাই। মাত্র এক কোর্স খাই। সুপ না, পুডিং না। রাত্রে বেশি খাওয়া ভারি খারাপ। অগাস্টের প্যারিস ভয়ঙ্কর জায়গা।'

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা ফুটপাথে মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে গাহক কি না ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

www.pathagar.com

জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথ কত বেদনা পেয়ে লিখেছিলেন :

'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

নিশ্চয়ই ট্যাক্সি চড়ে গিয়েছিলেন, মিটার খারাপ ছিল এবং ভাড়াও আপন ট্যাঁক থেকে দিতে হয়েছিল। না-হলে গানটার কোনও মানেই হয় না। পায়ে হেঁটে গেলে দু মাইল চলতে যা খর্চা, দু লক্ষ মাইল চলতেও তাই।

বাহারে রেস্তোরাঁ। কুঞ্জে কুঞ্জে টেবিল। টেবিলে টেবিলে ঘন সবুজ প্রদীপ। বাদ্যিবাজনা, শ্যাম্পেন, সুন্দরী, হীরের আংটি আর উজির-নাজির কোটাল। আমার পরনে গ্রে ব্যাগ আর ব্লু ব্লেজার। মহা অস্বস্তি অনুভব করলুম।

ক্রের ওয়েটারকে বললেন, 'কিছু না, শুদ্ধু "অর দ্য ভর্"।'

'অর দ্য ভর্' এল। বিরাট বারকোষে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য খোপে খোপে সাজানো। সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুটার, টোস্ট-সওয়ার-কাভিয়ার, ইয়োগুর্ৎ (দই), চিংড়ি, স্টাফ্‌ট অলিভ, সিরকার পেঁয়াজ— এককথায় আমাদের দেশের সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তবে দাম হয়তো সাড়ে বত্রিশ শো গুণেরও বেশি হতে পারে।

একেই বলে 'এক কোর্স খাওয়া!' কোথায় যেন পড়েছি মোতিলালজি সাদাসিধে কুটির বানাতে গিয়ে লাখ টাকার বেশি খর্চা করেছিলেন। তালিমটা নিশ্চয় প্যারিসের 'এক কোর্স খাওয়া' থেকে পেয়েছিলেন।

ওয়েটার শুধাল, 'পানীয়?'

ক্রের ঘাড় বাঁদিকে কাত করে বললেন, 'নো', তার পর ডান দিকে কাত করে বললেন, 'উয়ি', ফের বাঁ দিকে 'নো' ফের ডান দিকে 'উয়ি'—

আমার 'দোলাতে দোলে মন', ফাঁসি না কালাপানি?

কালাপানি নয়, শেষ দোলা ডান দিকে নড়ল, অর্থাৎ লাল পানি।

ক্রের দু ফোঁটা ইংরাজিও জানেন। যে পানীয় অর্ডার দিলেন তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'ইৎ ইজ নৎ এ ড্রিন্‌ক বাৎ এ ড্রিম (স্বপ্ন) মিসয়ো, এ জিনিস ফ্রান্সের গৌরব, রসিকজনের মোক্ষ, পাপী-তাপীর জর্দন-জল।'

নিশ্চয়ই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক বাউলকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'যেজন ডুবলো, সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

তার পর সেই এক কোর্স খাওয়া শেষ হতে না-হতেই ওয়েটার এসে আমাদের বলল হঠাৎ এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁচেছে। সমস্ত রেস্তোরাঁয় আমরাই যে সবচেয়ে দামি দামি ফিনসি খাদ্য খাবার জন্য এসেছি, এ তত্ত্বটা সে কী করে বুঝতে পেরেছিল, জানিনে। মৃদঙ্গের তাল পেলে নাচিয়ে বুড়িকে ঠেকানো যায় না, এ সত্যও আমি জানি, কাজেই ক্রের যখন ফরাসি শক্তির উচ্ছ্বাসে গেয়ে তার এক ডজন অর্ডার দিলেন, তখন আমি এইটুকু আশা আঁকড়ে ধরলুম যে, যদি কোনও শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তো বেরোয় তবে তাই দিয়ে বিল শোধ করব।

ক্রের ঢেকুর তোলেননি। না-জানি কত যুগ ধরে তপস্যা করার ফলে ফরাসি জাতি একডজন শুক্তি বিনা ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসি সভ্যতাকে বারম্বার নমস্কার।

www.pathagar.com

প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল শোধ করলুম।

সে রাত্রে সিনেমায়ও গিয়েছিলুম। পাঁচ সিকের সিটে বসে 'অল কোয়ায়েট' বন্দুক-কামানের শব্দের মাঝখানেও ক্রেরের ঘুমের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। 'নাক ডাকা'টা বললুম না, গ্রাম্য শোনায় আর ফরাসি সভ্যতার দায় যতক্ষণ সে জাগ্রত আছে।

রাত এগারোটায় সিনেমা শেষে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখন ক্রের বললেন, 'কোথায় যাই বলুন তো, আমার সর্বাঙ্গ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'নৎরদামের গির্জেয়। সেই একমাত্র জায়গা যেখানে পয়সা খর্চা না-করেও বসা যায়', কিন্তু চেপে গেলুম। বললুম, 'আমাকে এই বেলা মাফ করতে হচ্ছে মাদমোয়াজেল শাতিন্নো। কাল আমার মেলা কাজ, তাড়াতাড়ি না-শুলে সকালে উঠতে পারব না।'

ক্রের কী বললেন আমি শুনতে পাইনি। ভদ্রতার শেষরক্ষা করতে পারলুম না বলে একটু দুঃখ হল। ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দশমীর বিসর্জনের মতো দেবীপূজার শেষ অঙ্গ। এত খর্চার পর সবকিছু 'এটুকু বাধায় গেল ঠেকি?' চাবুক কেনার পয়সা ছিল না বলে দামি ঘোড়াটাকে শুধু দানা-পানিই খাওয়ালুম, জিনটা পর্যন্ত লাগানো গেল না।

বাস-ভাড়া দিয়ে দেখি আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখানা স্যানডুইচ আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।

আমার কপাল— বাসের টায়ার ফাটল। আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

প্যারিসের হোটেলগুলো বেশিরভাগ সংযমী মহল্লায় অবস্থিত। সংযমীর বর্ণনায় গীতা বলেছেন সর্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন। তার পর সংযমী সেই নিশাতে কী করেন তার বর্ণনা গীতাতে নেই। আমার ডাইনে-বাঁয়ে যে জনতরঙ্গ বয়ে চলেছে, তাদের চেহারা দেখে তো মনে হল না তাঁরা পরমার্থের সন্ধানে চলেছেন। তবে হয়তো এরা অমৃতের সন্তান— অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছেন আর অমৃতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ঋষি বলেছেন, 'অমৃতাস্তি সুরালয়েষু' অথবা 'বণিতাধরপল্লবেষু'।

ভারতবর্ষের হিন্দু মূর্খ, সে কাশী যায়, মুসলমান মূর্খ, সে মক্কা যায়। ইয়োরোপীয় সংযমী মাত্রই অমৃতের সন্ধানে প্যারিস যায়।

প্যারিসে নিশাভাগে নারীবর্জিতাবস্থায় চলনে পদে পদে বণিতাধরপল্লব থেকে আপনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে 'বঁ সোয়ার মসিয়ো— আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক।' আপনি যদি সে ডাকে সাড়া দেন তবে— তবে কী হয় না-হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নেই, প্রয়োজনও নেই, এমিল জোলার মল্লিনাথও আমি হতে চাইনে। শরৎ চাটুয্যে যা লিখেছেন, তা আমার এখনও হজম হয়নি।

হোটেল আর বেশি দূরে নয়— মহল্লাটা ঈষৎ নির্জন হয়ে আসছে। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আপন অজানাতে একটা 'বঁ সোয়ারের' উত্তর দিয়েই বুঝতে পারলুম ভুল করে ফেলেছি। এক সন্ধ্যায় দুই সুন্দরী সামলানো আমার কর্ম নয়। আমার পূর্বপুরুষগণ একসঙ্গে চার সুন্দরী সামলাতে পারতেন। হায়, আমার অধঃপাত কতই গগনচুম্বী থেকে কতই অতলস্পর্শী।

www.pathagar.com

নাঃ, এঁর বেশভূষা দেখে মনে তো হচ্ছে না ইনি 'বসন্তসেনার' সহোদরা, যদিও 'দরিদ্র চারুদত্ত' আমি নিশ্চয়ই বটি। এরকম নিখুঁত সুন্দরী রাস্তায় বেরুবে কেন? তবে হ্যাঁ, তুলসীদাস বলেছেন, সংসার কী অদ্ভুত রীতিতে চলে দেখ, শুঁড়ি দোকানে বসে মদ বিক্রয় করে, সেখানে ভিড়েরও অন্ত নেই, আর বেচারি দুধওলাকে ঘরে ঘরে ফেরি দিয়ে দিয়ে দুধ বিক্রয় করতে হয়।' কিন্তু এ নীতি তো হেথায় খাটে না।

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না; কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছিনে।'

সুন্দরী স্মিত হাস্য করলেন, বীণার পয়লা পিড়িঙের মতো একটা ধ্বনিও বেরুল। সে হাসি এতই লাজুক আর মিঠা যে তক্খুনি চিনতে পারলুম যে এঁকে আমি চিনিনে। এরকম হাসি অতি বড় অরসিকও একবার দেখলে ভুলতে পারে না।

কী করি, এ যে আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। এ-সুহাসিনী রসের হাটের বসন্তসেনা নিশ্চয়ই নয়, তবে এরকম গায়ে-পড়ে আলাপ করল কেন? আর ভালো-মন্দ কোনও কিছু বলছেই-না কেন? এ কী রহস্য। নাঃ, কালই প্যারিস ছাড়ব। ক্রসওয়ার্ড আমি কাগজেই পছন্দ করি, জীবনে নয়।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বেচারি পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরলুম। শুধালুম, 'কী হয়েছে।' বলল, 'রাস্তার দোষ নয়, আমি বড্ড ক্লান্ত!'

আমি জানি আমার পাঠকরা আমাকে আর ক্ষমা করবেন না, বলবেন, 'ওরে হস্তীমূর্খ এক সন্ধ্যায় দু-দুবার ইত্যাদি।' তবু স্বীকার করছি আমি আবার সেই আহাম্মুকিই করলুম। কিন্তু এবার সোজাসুজি, প্যারিস-লক্ষ্ণৌকে তিন-তালাক দিয়ে। বললুম, 'আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একটা স্যানড্রুইচ আর পাঁচটি সিগারেটের দাম। কোনও কাফেতে গিয়ে একটু জিরোবেন?'

বলল, 'আমি শুধু কফি খাব।'

কাফেতে বসিয়ে বললুম, 'কফি স্যানড্রুইচ খেয়ে বাড়ি যান।'

কিছু বলল না, আপত্তিও জানাল না।

কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হল এর দুর্বলতা না-খেতে পেয়ে।

প্রেম অন্ধ কিন্তু প্যারিস তো প্রেমিক নয়। তবে সে এ-সুন্দরীকে উপোস করতে দিচ্ছে কেন? কিন্তু সে রহস্য সমাধানের জন্য একে প্রশ্ন করা বর্বরতা তো বটেই, তাই নিয়ে আপনমনে তোলপাড় করা অনুচিত। পৃথিবীর অনাহার ঘোচাবার দাওয়াই যখন আমার হাতে নেই তখন রোগের কারণ জেনে কী হবে?

হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ, আমি বে—'

আমি বললুম, 'চুপ, আমি কিছু শুনতে চাইনে।'

বলল, 'তাই vous (আপনি) না বলে tu (তুমি) বললুম। তবে নতুন নেবেছি। কাল রাত্রে প্রথম। কিন্তু কেউ আমার কাছে ঘেঁষল না সাহস করে, আমার চেহারা তো ওরকম নয় আমি জানি। আমিও কাউকে সাহস করে 'বঁ সোয়ার' বলে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি।'

মানুষের দম্ভের সীমা নেই। স্থির করেছিলুম, কোনও প্রশ্ন শুধাব না, তবু নিজের কথা জানাতে ইচ্ছে করল। বললুম, 'আজ আমাকেই কেন 'বঁ সোয়ার' বললেন?'

www.pathagar.com

'বোধহয় বিদেশি,— না, কী জানি কেন। ঠিক বলতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাক্, আমি সত্যি কিছু শুনতে চাইনে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রে যে করেই হোক আমাকে খদ্দের যোগাড় করতেই হবে। আজ সকালেই ল্যান্ডলেডি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল।'

রাত ঘনিয়ে আসছে, আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আপনি বাড়ি যান আর নাই-যান, আমার সঙ্গে বসে থাকলে তো আপনার—। জানেন তো, পুরুষের সঙ্গে বসে আছেন দেখলে কেউ আপনার কাছে আসবে না। রাতও অনেক হয়েছে। এখন মাতালের সংখ্যা বেড়েই চলবে।'

কেঁপে ওঠেনি, কিন্তু তার মুখখানি একটু বিকৃত হল।

কোনও কথা কয় না। বড় বিপদে পড়লুম, বললুম, 'আমি তা হলে উঠি?'

বলল, 'কেন? আমার সঙ্গে বসতে চাও না?'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে বললুম, 'না, না, তা নয়। আপনাকে সত্যি বলছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে থাকলে আপনার সময় যে বৃথায় যাবে।'

বলল, 'তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে।'

কাতর হয়ে বললুম, 'প্লিজ, জিনিসটা ওরকম ধারা নেবেন না।'

'তা হলে তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে কেন?'

আমি বললুম, 'প্লিজ, প্লিজ, এসব কথা বাদ দিন।'

বলল, 'কেউ তো খাওয়ায় না। না, তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সত্যি ভালো লাগছে।'

এই দুঃখ-বেদনার মাঝখানেও এর সাহচর্য, সৌন্দর্য যে আমাকে টানছিল সে-কথা অস্বীকার করে আপন দাম বাড়াতে চাইনে।

বলল, 'আর জানো, তুমি চলে গেলেই আমাকে 'বঁ সোয়ারের' পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে। আমি আর সাহস পাচ্ছিনে।'

হায় অরক্ষণীয়া, তুমি কী করে জানলে প্যারিস কত রূঢ়, কত নিষ্ঠুর।

বললুম, 'আজ তা হলে থাক্ না। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি। কোথায় থাকেন বলুন তো?'

'কাছেই, লাভনির হোটেলের পাশের গলিতে।'

খুশি হয়ে বললুম, 'তা হলে চলুন, আমি লাভনিরেই থাকি।'

রাস্তায় চলতে চলতে সে আমার বাহু চেপে ধরল। হাতের আঙুল কোনও ভাষায় কথা বলে না বলেই সে অনেক কথা বলতে পারে। তার কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা বুঝেও বুঝতে চাইলাম না। হঠাৎ মেয়েটার কেমন যেন মুখ খুলে গেল; বোধহয় সে রাত্রে 'বঁ সোয়ার' বলার বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে। বলতে লাগল, পয়সা রোজগারের কত চেষ্টা সে করেছে, কত চাকরি সে পেয়েছে, তার পর যারা চাকরি দিয়েছে তারা কী চেয়েছে, কী রকম জোর করেছে, সে পালিয়েছে, আরও কত কী?

আর কী অদ্ভুত সুন্দর ফরাসি ভাষা। থাকতে না-পেরে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি এত সুন্দর ফরাসি বলেন।'

www.pathagar.com

ভারি খুশি হয়ে গর্ব করে বলল, 'বাঃ। দোদে পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যে।'

তাই বলো। আলফঁস দোদের মতো কটা লোক ফরাসি লিখতে পেরেছে।

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে অনেক কথা বলে ফেলল।

হোটেল পেরিয়ে মেয়েটির বাড়ি যেতে হয়। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।' বলল, 'না।' আমি বললুম, 'সে কী?' উত্তর না-পেয়ে বললুম, 'তা হলে বন্ ন্যুই,— শুভরাত্রি— তুমি এইটুকু একাই যেতে পারবে।'

শেকহ্যান্ড করার জন্য তার হাত ধরেছিলুম। সে হাত ছাড়ল না। মাথা নিচু করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।'

আমাকে বোকা বলুন, মেয়েটিকে ফন্দিবাজ বলুন, যা আপনাদের খুশি, কিন্তু আমার ধর্ম সাক্ষী আমি তাকে খারাপ বলে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারলুম না। বললুম, 'আমার সামর্থ্য নেই যে তোমাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভগবান যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তাকে বাঁচাতে পারলে যে কোনও লোক ধন্য হবে।' 'ভগবান' শব্দটা প্যারিসের পথে বড় বেখাপ্পা শোনাল।

মেয়েটি মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, 'কী হবে বৃথা উপদেশ দিয়ে। তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। ডাগর ডাগর দু চোখ আমাকে কী বলল সে কথা আজও ভুলিনি। আমার দিকে ও-রকম করে আর কেউ কখনও তাকায়নি।

তার পর আস্তে আস্তে সে আপন বাড়ির দিকে রওনা হল।

আমি মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখলুম, তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজরানীর মতো সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হল, ভুল করেছি। মানুষ সাহায্য করতে চাইলে সর্বাবস্থায়ই সাহায্য করতে পারে। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, এত সোজা কথাটা কাল রাত্রে বুঝতে পারলুম না কেন।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে মেয়েটির— কী মূর্খ আমি নামটি পর্যন্ত জিগ্যেস করিনি— সন্ধানে বেরুতে যাবার মুখে হোটেলের পোর্টার আমাকে একটি ছোট পুলিন্দা দিল।

খুলতেই একখানা চিঠি পেলুম ;

'বন্ধু, তোমার কথাই মেনে নিলুম। আজ পাঁচটার ট্রেনে আমি গ্রামে চললুম। সেখানেও আমার কেউ নেই। তবু উপবাসে মরা প্যারিসের চেয়ে সেখানেই সহজ হবে। বিনা টিকিটেই যাচ্ছি।

তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই, এই সুয়েটারটি ছাড়া। ভগবানেরই দয়া, তোমার গায়ে এটা হবে।

জ্যুলি।'

www.pathagar.com

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরোচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি, আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর-জানালা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানালা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চূড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বার বার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কী? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাইটে ডাক্তার— ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না-খেলে এক সপ্তায়'।

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী। আমি শুধালুম, 'সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুবসম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দু খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যার! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানি ভিয়েনিজ কায়দায় কোমরে দু ভাঁজ হয়ে, বাও করে বাঁ-হাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদান করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন— হাঁ-টা লেগে গিয়েছে দু কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

www.pathagar.com

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা-মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশি দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়তো একটু-আধটু কমে। আমি কখনও পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ— নমুনা হিসেবে বিনাপয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন, সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনও বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কান্ট-হেগেলের দেশ। বললুম, 'অ'।

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাকচোখ দিয়ে এবার আর রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন-দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়তো একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘণ্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর লাতিন নাম জানিনে; 'হাতি' হল 'এলেফান্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।'

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশপানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হানি আর ঘণ্টা গালাগাল হয় কী করে। একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রান্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্‌স্ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রান্ডি খাব বলে।

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এককোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিধে বেশভূষা,— গরিব বললেও চলে— আর তাই বোধহয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সি দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কীরকম নীল হয়— তারই মতো সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনও গিয়েছেন? না। তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রুপালি প্রজাপতির কী রাগিণী। তারই মতো তাঁর ব্লন্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না। তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

www.pathagar.com

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে একটিমাত্র বর্ণনা কজায় এনেছি সেইটেও যদি না-বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক থ্রিলেগেড্ রেস্। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তা হলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যেরকম লাজুক মেয়ের মতো এঁকেবেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার ওপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। কারণ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সেসব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন— আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি, আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা, সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনও এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনার দেশের লোক এখনও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনও করতে পারিনি, কী করে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন-না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকিবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবে নাই-বা কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়তো অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়তো মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিংবা এ-ও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এসব কোনওকিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না-করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ মেয়ে না-হলে আমার চলবে না। আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্?

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি— কোন্ অজুহাতে কোন্ অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনও হদিস পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কী প্রকারে। প্রবাদে আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়— প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তার ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার-কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায় আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট— এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না-মেনে যায় না, এ লোকটা এসব পাগলামি করছে কী করে।

www.pathagar.com

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন্ কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়তো কোনও-একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কী আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সিটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরও প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এ তো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেন্ট।'

বললেন, 'তাতেই-বা কী লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মতো অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকাল না। ওঁকে ডেকে হবে—'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তার পর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটী, গণ্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সিট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনও গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করালেন। এ কি আপনার ইন্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, কত লোক কত কামরা থেকে উঠল নামল কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনও— (কটুবাক্য) নামল না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুটপাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়তো পায়। আমি লাঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে— আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়; দুত্তোর, তারও উপায় নেই— উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে— এ পরেছে ক্রেপ-সোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না-হলে তরুণ-তরুণী মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো

www.pathagar.com

নিয়ে একই টেবিলে— মুখোমুখি। হে মা-মেরি, নত্র দাম্ গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশোটা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনও সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনও ফিকিরই জুটল না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু হাত না হয়ে দুলক্ষ যোজনও হতে পারত— কোনও ফারাক হ'ত না।

'জানালা দিয়ে একঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেঁতলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা-মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটল। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "দাঁড়ান আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি।"

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ। তার পর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সমস্ত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না, না', 'আপনি কেন মিছে মিছে,' 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' 'উঃ, বড্ড লাগছে', 'এতেই হবে,' 'ব্যস্ ব্যস' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মতো সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কী রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনও রাইনল্যান্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনও বর্ণনা দেব না।

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে-না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনও প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয়, তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে? মেয়েটি বোধহয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যান্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়তো-বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশির ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন্ সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই বলুন।'

আমি গুন্ গুন্ করে বললুম,

> 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
> হায় ভীরু প্রেম হায় রে।'

ডাক্তার বললেন, 'খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যর; জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

www.pathagar.com

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন আন্টি-সেপ্টিক্ আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তার পর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে-চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনও নুনটা এগিয়ে দি, কখনও ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনও-বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না; ওহে খানসামা,— এদিকে', ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।'

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারি ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনল, দু-একবার ব্লাশ্ করল, সে যা গোলাপি— আপনি কখনও, না, থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরিব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টান্ট এসে জানাল রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'এখখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনও ভূমিকা না-দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিকে নাবলুম এক বস্ত্রে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্ বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়— হবেও-বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে-মুখে এমন সব নতুন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনও শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

'আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে "বিষাদ" কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ'?

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্।'

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখামাত্র আপন অজান্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশি ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে— লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না, কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনও হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে। বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু মুঠো খেতে দেয়, পরতে দেয়, ব্যস্‌। কলেজের ফিজটি পর্যন্ত বেচারি যোগাড় করে মাস্টারি করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ি এমনি নজরবন্দ করে রেখেছে যে চকিতা হরিণীর মতো সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়, ওই বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, 'এ কি বুখারার হারেম, না তুর্কি পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লিজ, প্লিজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশি সে কক্‌খনও কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনেরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারও এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে, কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরুতে রাজি হয় না— পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না-পেরে বললুম, তোমার পিসির কি কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার ওপর নজর রাখছে?' উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লিজ, প্লিজ।'

'যা-কিছু আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা-আত্মীয়তা সব ওই কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন্‌-টিনের ভিতর মাছের মতো। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলব।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিংবা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশি কারণ সেখানে দৈবাৎ, কৃচিৎ কখনও এভা তার ছোট্ট জুতাটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

'তার মাধুর্য আপনাকে কী করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কী করে বোঝাই?

www.pathagar.com

'হয়তো তার চেনা কোনও এক ছোকরা স্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস; আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর! টেবিলের উপর রাখা আমার হাতদুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মতো কাছে টেনে আনতে পারি।

'শেষটায় আর সইতে না-পেরে একদিন এভাকে কিছু না-বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ও রকম কাছে থেকে না-পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে— আমার নার্ভস একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না— তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে হ্যাঁ, আপনাদের নিটশেই বলেছেন, 'কড়া না-হলে প্রেম মেলে না'।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতাম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকল।

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনও জিনিস নেই— ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতি হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সেরকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল :

'বেশি লিখব না— আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি তোমার ইচ্ছামতো তোমায়-আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তার পর বিদায়! যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনও পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।"

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস হয় আপনার; যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ-রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজি হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন আপন ঘরে?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন, সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে'।

www.pathagar.com

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনও পড়িনি। সে কথা থাক।'

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম, বুধবার দিন সন্ধের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ চিংড়িটার মতো লাল হয়ে যখন বেরুলুম তখন আর হাতে বেশি সময় নেই। অথচ গরম টাব থেকে ওরকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরুলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না-করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনও ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে— মা-মেরির ওপর ভরসা করে যে এ যাত্রায় সর্দিটা না-ও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, "দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম"।'

ডাক্তার বললেন, 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নিচে— আপনাদের পাগলা ফারেন্‌হাইটের হিসাবে বত্রিশের ঢের নিচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগল তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবদ্ধ করে রেখে দিল।

'তিন মিনিট যেতে না-যেতে নামল মুষলধারে— বৃষ্টি নয়— সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি— হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

'কী করি, কী করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরল— বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার ওপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো— বেচারির মাত্র ওই একজোড়াই সম্বল।

'কোনও কথা না-বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সেখানে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মতো হলদে, তার টকটকে লাল ঠোঁটদুটি ব্লু-ডানয়ুবের মতো ঘন বেগুনি-নীল— ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট-ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক-খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন; পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল্ ফাটাচ্ছি।

'কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে— এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, "দরজা খোল"।

www.pathagar.com

'পিসি!'

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরোলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মতো বীভৎস এক বুড়ি ঘরে ঢুকে আমার দিকে না-তাকিয়েই এভাকে বলল, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি।'

'সঙ্গে সঙ্গে আর কী সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না' 'কেলেঙ্কারি', 'শোবার ঘরে পরপুরুষ', 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার', এইসব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ি আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ গজি পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

'আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ির দুই বাহু দু হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম,

"আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ্। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।"

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরি সাক্ষী, আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব এতদিন করিনি পাছে সে "না" বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কী করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মতো তাকাল— এক বিঘৎ চওড়া হাঁ করে। পাকা দু মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তার পর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশির পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরও বীভৎস। মুখের কুঁচকানো, এবড়ো-খেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরও বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কী যেন বলল ঠিক বুঝতে পারলুম না। তার পর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

'এভা তখনও অচৈতন্য।

'বুড়ি ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশির পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব— এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

'মনে হল বুড়ো খুশি হয়েছে এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুররাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ্ কট্‌লেট্ এল। হৈহৈ রৈরৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মতো। বুড়ি এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশিটাই-না হ'ত।

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, "জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার ওপর একটু নজর রেখো।"

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী— হ্যাঁ, সুন্দরী বটে।

www.pathagar.com

এক লহমায় আমি নর্থ সি'র ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি রোদে রুপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীলা দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যান্ডের শ্যামালিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সবকিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নিচু করে ফরাসিস্ কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলিপ্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে শেষপর্যন্ত বাংলা ভাষাই হবে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনও কোনও সন্দেহ ছিল না এবং একথাও নিঃসন্দেহে জানি যে যদিও এখনকার মতো বাংলার দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে তবু উর্দুওয়ালারা আবার সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া করে উঠতে পারেন। আমরা যে এতদিন এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিনি তার প্রধান কারণ বাংলা-উর্দু-দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক রঙ ধরে নিয়ে দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সে অবস্থায় সুস্থ মনে, শান্ত চিত্তে বিচার করার প্রবৃত্তি কোনও পক্ষেরই ছিল না। আবহাওয়া এখন ফের অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে; এইবেলা উভয়পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখে নিলে ভবিষ্যতের অনেক তিক্ততা এবং অর্থহীন দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

উর্দুওয়ালাদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই : পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান অভিন্ন রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যে ভাষা প্রচলিত পূর্ব পাকিস্তানে যদি সে-ভাষা প্রচলিত না থাকে তবে রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে আমরা বলি, পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে বাংলা ভুলিয়ে উর্দু শিখিয়ে যদি কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেওয়া সম্ভবপর হত তা হলে যে এ বন্দোবস্ত উত্তম হত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন, এ কাজ কি সোজা? উত্তরে আমরা বলি এ কাজ অসম্ভব।

কেন অসম্ভব এ প্রশ্ন যদি শোধান তবে তার উত্তর দু রকমের হতে পারে। প্রথমরকমের উত্তর দেওয়া যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে। আমরা যদি একথা সপ্রমাণ করতে পারি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও এহেন কাণ্ড ঘটেনি এবং যতবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে তবে হয়তো অনেকেই স্বীকার করে নেবেন যে, অসম্ভব কর্ম সমাধান করার চেষ্টা করে মূর্খ, বলদকে দোয়াবার চেষ্টা সেই করে যার বুদ্ধি বলদেরই ন্যায়।

ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে উদাহরণ দেব না। উর্দুওয়ালারা এসব জায়গার উদাহরণ মেনে নিতে স্বভাবতই গড়িমসি করবেন। তাই উদাহরণ নেব এমন সব দেশ থেকে যেসব দেশকে সাধারণত 'পাক' অর্থাৎ 'পবিত্র' অর্থাৎ ইসলামি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এসব দেশের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি উর্দুওয়ালাদের জানার কথা, না জানলে জানা উচিত।

আরব ও ইরানের (পারস্যের) মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন যে এ দু দেশের মাঝখানে কোনও তৃতীয় দেশ নেই। অর্থাৎ আরবদেশের পূর্ব সীমান্তে যেখানে আরবি ভাষা এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই ফারসি ভাষা আরম্ভ হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও যেখানে আরবি ভাষা শেষ হয়েছে সেখান থেকেই তুর্কি ভাষা আরম্ভ হয়েছে।

www.pathagar.com

সকলেই জানেন খলিফা আবু বকরের আমলে মুসলিম আরবেরা অমুসলিম ইরান দখল করে। ফলে সমস্ত ইরানের লোক আগুন-পূজা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম হয়। মুসলিম শিক্ষাদীক্ষা মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রভূমি তখন মদিনা। কেন্দ্রের ভাষা আরবি এবং যে ভাষাতে কুরান নাজিল অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন, হজরতের বাণী হাদিসরূপে সেই ভাষায়ই পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করার বাসনায় ইরানে আরবি ভাষা প্রবর্তিত করার ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা জানি বহু ইরানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে, আরবি শিখে, মুসলিম জগতে নাম রেখে গিয়েছেন। আরও জানি পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আব্বাসিদের আমলে আরবি রাষ্ট্রকেন্দ্র ইরানের আরও কাছে চলে এসেছিল। ইরাকের বাগদাদ ইরানের অত্যন্ত কাছে ও আব্বাসি যুগে বহু ইরানি বাগদাদে বসবাস করে উচ্চাঙ্গের আরবি শিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত ইরানদেশে তখন আরব গবর্নর, রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, পাইক-বরকন্দাজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ইরানের সর্বত্র তখন আরবি মক্তব-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি, আরবিশিক্ষিত মৌলবি-মৌলানায় ইরান তখন গমগম করত।

তবে কেন তিনশত বৎসর যেতে-না-যেতে ফারসি ভাষা মাথা খাড়া করে উঠল? দশম শতাব্দীর শেষভাগে দেখতে পাই, ফারসি ভাষার নবজাগরণের চাঞ্চল্য সমস্ত ইরানভূমিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গল্প শুনি, ফিরদৌসিকে নাকি ফরমাইশ দেওয়া হয়েছিল ইরানের প্রাকমুসলিম সভ্যতার প্রশস্তি গেয়ে যেন কাব্য রচনা করা হয়, এবং ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (মুহিম্) ফরমাইশ, সে কাব্য যেন দেশজ ফারসি কথায় রচিত হয়, তাতে যেন আরবি শব্দ বিলকুল ঢুকতে না পারে। গল্পটি কতদূর সত্য বলা কঠিন। কারণ ফিরদৌসির মহাকাব্যে অনেক আরবি কথা আছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আর আরবি ভাষা যে কোনও কারণেই হোক, দেশের আপামর জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারেনি বলেই ফারসির অভ্যুত্থান হল।

তার পর একদিন ফারসি ইরানের রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল।

উর্দুওয়ালারা হয়তো উত্তরে বলবেন যে ইরান শিয়া হয়ে গেল বলেই সুন্নি আরবের সঙ্গে কলহ করে ফারসি চালাল। এ উত্তরে আছে লোকঠকানোর মতলব। কারণ ঐতিহাসিকমাত্রই জানেন ফিরদৌসির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গজনির সুলতান মাহমুদ এবং তিনি ছিলেন এতই কট্টর সুন্নি যে তিনি সিন্ধুদেশের হাজার হাজার করামিতাকে (ইসমাইলি শিয়া) কতল-ই-আমে অর্থাৎ পাইকারি হননে—ফিনারিজহান্নম বা পরলোকে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই বোঝা গেল যে এই আরবিবিরোধী ফারসি আন্দোলনের পশ্চাতে শিয়া-সুন্নি দুই সম্প্রদায়ই ছিলেন।

না-হয় ইরান শিয়াই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তুর্কির বেলা কী? তুর্কির আপামর জনসাধারণ সুন্নি এবং শুধু যে সুন্নি তাই নয়, হানিফি সুন্নিও বটে। ইরানেরই মতো একদিন তুর্কিতেও আরবি চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সে চেষ্টা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত তুর্কি ভাষাই তুর্কের রাষ্ট্রভাষা হল। উর্দুওয়ালাদের স্মরণ থাকতে পারে যে কয়েক বৎসর পূর্বে তুর্কি ও ইরান উভয় দেশে জোর জাতীয়তাবাদের ফলে চেষ্টা হয় তুর্কি ও ফারসি থেকে বেবাক আরবি শব্দ তাড়িয়ে দেওয়ার। আমরা এ ধরনের উগ্রচণ্ডা জাতীয়তাবাদ ও ভাষা 'বিশুদ্ধিকরণ' বাইয়ের পক্ষপাতী নই; তবুও যে ঘটনাটির কথা উর্দুওয়ালাদের স্মরণ করিয়ে দিলুম তার একমাত্র কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র যতই মূল্যবান হোক না কেন, তার জন্য মানুষ সবসময় সবকিছু বিসর্জন দিতে রাজি হয় না। (এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও একটি কথা বলে

www.pathagar.com

রাখা ভালো— পাছে উর্দুওয়ালারা আমাদের নীতি ঠিক বুঝতে না পারেন— আমরা ভাষা 'শুদ্ধিকরণে' বিশ্বাস করি না বলেই বাংলা থেকে সংস্কৃত শব্দ তাড়াতে চাইনে। তা হলে সেই পাগলামির পুনরাবৃত্তি করা হবে মাত্র; আজকের দিনে কে না বুঝতে পারে ফোর্ট উইলিয়ামি পণ্ডিতরা বাংলা থেকে আরবি-ফারসি শব্দ বর্জন করে কী আহাম্মুকিই না করেছিলেন।)

উর্দুওয়ালারা হয়তো প্রশ্ন শুধাবেন, তা হলে মিশরে আরবি চলল কী করে? মুসলমান বিজয়ের পূর্বে মিশরের ভাষা তো আরবি ছিল না। তার উত্তর এই যে, মিশর জয়ের পর লক্ষ লক্ষ আরব মিশরে বসবাস আরম্ভ করে ও কালক্রমে দেশের আদিম অধিবাসী ও বিদেশিতে মিলে গিয়ে যে ভাষা গড়ে ওঠে তারই নাম মিশরি আরবি। সংমিশ্রণ একটি কথা দিয়েই সপ্রমাণ করা যায়; যদিও আরবিতে 'জিম' হরফের উচ্চারণ বাংলার 'জ'-এর মতো, তবু মিশরিরা উচ্চারণ করে 'গ'-এর মতো। 'জবল'কে বলে 'গবল', 'নজিব'কে বলে 'নগিব', অল্পশিক্ষিত লোক 'ইজা জা' নস্‌র্‌উল্লা' না বলে বলে 'ইজাগা'— ইত্যাদি। অন্যদিক দিয়ে মিশরি ফল্লাহিন (চাষা) ও আরবি বেদুইনের মধ্যে দেহের গঠন, চামড়ার রঙ ইত্যাদিতে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই।

এতগুলো উদাহরণ দেবার পরও যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তবে তার সামনে একটি ঘরোয়া উদাহরণ পেশ করি। পাঠান মোগল (এমনকি ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে) যুগে এদেশে শুধু কেন্দ্রে নয়, সুবাগুলোতে পর্যন্ত ফারসি ছিল রাষ্ট্রভাষা। তবু কেন সে ভাষা দেশজ হিন্দি বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে মেরে ফেলে নিজে অজরামর হয়ে কায়েমি খুঁটি গাড়তে পারল না? উর্দুওয়ালারা হয়তো বলবেন, 'ইংরেজ ফারসি উচ্ছেদ করে দিল তাই।'

কিন্তু সে উচ্ছেদের ব্যবস্থা তো পাঠান-মোগলরাই করে গিয়েছিলেন। পাঠান আমলের বিখ্যাত কবি আমির খুসরৌ ফারসিতে উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করে গিয়েছিলেন অথচ দূরদৃষ্টিবলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেষপর্যন্ত ফারসি এদেশে চলবে না, দেশজ ভাষা পুনরায় আপন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ তত্ত্বটা ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ফারসি ও তখনকার দেশজ ভাষা হিন্দি মিশিয়ে কবিতা রচনার এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করে গিয়েছিলেন। নিচের উদাহরণটি উর্দুওয়ালাদের জানবার কথা :

> "হিন্দুবাচ্চেরা ব্‌ নিগর্‌ আজব্‌ হুস্‌ন্‌ ধরত হৈ।
> দর্‌ ওয়ক্‌তে সুখন গুফ্‌তন্‌ মুহ ফুল ঝরত হৈ ॥
> গুফ্‌তম্‌ বিয়া কে বর্‌ লবেতো বোসে বাগিরম্‌
> গুফ্‌ৎ আরে রাম ধরম নষ্ট করত হৈ ॥"

হিন্দু তরুণ কী অপূর্ব সৌন্দর্যই-না ধারণ করে। যখন কথা বলে তখন মুখ হতে ফুল ঝরে— বললুম, আয় তোর ঠোঁটে একটি চুমো খাব— বললে, আরে রাম! ধর্ম নষ্ট করত হায়—

এই এক্‌স্‌পেরিমেন্টের ফলেই দেখতে পাই শাহজাহানের আমলে উর্দু ভাষা সৃষ্টি হয়েছে ও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই ফারসি আস্তে আস্তে হটে গিয়ে উর্দুর জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। আজকের দিনে পরিস্থিতিটা কী? ফারসির লীলাভূমি দিল্লি-লক্ষ্ণৌয়ে এখন সাহিত্য সৃষ্ট হয় উর্দু ভাষাতে, ফারসি সেখানে আরবি এবং সংস্কৃতের মতো 'মৃত ভাষা' বা 'ডেড ল্যান্‌গুইজ'।

www.pathagar.com

হয়তো উর্দুওয়ালারা বলবেন, উর্দুতে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ থাকায় তিনি পদে উঠে গেছেন। এর উত্তর বলি, ফারসি যেরকম বিস্তর আরবি শব্দ গ্রহণ করেও ফারসিই থেকে গিয়েছে, উর্দুও সেইরকম বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণ করা সত্ত্বেও উর্দুই থেকে গিয়েছে, সে এই দেশের দেশজ ভাষা। বিদেশি শব্দের প্রাধান্য অপ্রাচুর্য নিয়ে ভাষার বর্ণ, গোত্রের বিচার হয় না। পূর্ববঙ্গের আলিম-ফাজিলগণ যখন অকাতরে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করে বাংলায় 'ওয়াজ' বা 'পাবলিক লেকচর' দেন তখন সে-ভাষা আরবি, ফারসি বা উর্দু নামে পরিচিত হয় না, সে ভাষা বাংলাই থেকে যায়।

ঘোড়াটি আমার ভালোবাসিত গো শুনিতে আমার গান
এখন হইতে সে ঘোড়াশালেতে বাঁধা রবে দিনমান।
জিনি তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতারবাসিনী সাকি
লীলাচঞ্চলা রঙ্গনিপুণা শিবিরে এসেছি রাখি।
ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার ইয়ার পাইবে সাকি
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শব্দের প্রাচুর্য-অপ্রাচুর্যভেদে যদি ভাষার বংশবিচার করতে হয় তা হলে বলতে হবে এই কবিতার চতুর্থ ছত্র সংস্কৃত, পঞ্চম ছত্র আরবি-ফারসি ও গোটা কবিতাটা খোদায় মালুম কী। কিন্তু উপস্থিত এ আলোচনা মুলতুবি থাক— উর্দু কী হিসেবে 'পাক' ও বাংলা 'না-পাক' সে আলোচনা পরে হবে।

এ প্রসঙ্গে উর্দুওয়ালাদের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন : ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত ফারসি-উর্দু এদেশে চালু ছিল। শাহজাহানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বেশুমার মৌলবি-মৌলানা, আলিম-ফাজিল দেওবন্দ রামপুর থেকে উর্দু শিখে এসে এদেশে উর্দুতে ওয়াজ ঝেড়েছেন, উর্দুতে 'গুফ্‌তগু' করেছেন; মনে পড়েছে ছেলেবেলায় দেখেছি উদ্ধত অর্বাচীন তরুণ যখনই তর্কে মোল্লাদের কাবু করেছে তখনই তাঁরা হঠাৎ উর্দুতে কথা বলতে আরম্ভ করে (আজ জানি সে উর্দু কত ন্যক্কারজনক ভুলে পরিপূর্ণ থাকত) আপন যুক্তির অভাব অথবা দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন এবং চাষাভুষার কাছে মুখ বাঁচিয়েছেন। সেকথা থাক, কারণ এমন মৌলবি-মৌলানার সংস্পর্শেও এসেছি যাঁদের সঙ্গে তর্কে হেরেও আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আসল প্রশ্ন : এইসব আলিম-ফাজিলগণ বাংলা দেশের শিক্ষা ও কৃষ্টি নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার হাতে পেয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এদেশের আপামর জনসাধারণকে 'নাপাক' বাংলা ভুলিয়ে ফারসি বা উর্দু চালাতে সক্ষম হলেন না কেন? ইংরেজি স্কুল তখন ছিল না, সংস্কৃত টোল তখন অনাদৃত, আরবি-ফারসি-উর্দু শিখলে তখন উমদা উমদা নোকরি মিলত, বাদশাহ-সুবাদারের মজলিসে শিরোপা মিলত, মনসব মিলত, আর আরবি-ফারসির জরিয়ায় বেহেস্তের দ্বার তো খুলতই। ইহলোক-পরলোক উভয় লোকের প্রলোভন সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমান নাপাক বাংলায় কেন কথাবার্তা বলল, জারিমর্সিয়া রচনা করল, ভাটিয়ালি-পিরমুর্শিদি, আউলবাউল, সাঁইদরবেশি গান গাইল, কেচ্ছা-সাহিত্য তৈরি করল, রাধার চোখের পানি নিয়ে 'বিদাত'

www.pathagar.com

কবিতা পর্যন্ত লিখল? এবং একথাও তো জানি যে মৌলবি-মৌলানারা এসব লোকসাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, তাঁরা বার বার ফতোয়া দিয়েছেন যে এসব সাহিত্য 'বিদাত', 'নাজাইজ', 'কুফ্‌র', 'শির্‌ক্‌'। তৎসত্ত্বেও এগুলো এখনও খেয়াঘাটে, বাথানে, চাষার বাড়িতে পড়া হয়, এসব বই এখনও ছাপা হয়, হাটবারে বটতলায় বিক্রয় হয়।

শুধু তাই? পাঠান বাদশাহরা পয়সা খরচ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত, রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করালেন। বাদশাহদের দরবারে বিস্তর আলিম-ফাজিল ছিলেন। তাঁরা তখন নিশ্চয়ই এই 'ফুজুল', 'বিদাত', 'ওয়াহিয়াত', 'ইসরাফের' বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত তো তত্ত্বকথা এই যে, আজ পর্যন্ত এদেশে পরাগল খান, ছুটি খানের নাম রয়ে গিয়েছে বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে।

কিন্তু আমাদের আসল প্রশ্নটা যেন ধামাচাপা পড়ে না যায়। উর্দুওয়ালাদের কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন : বাংলাদেশের কৃষ্টিজগতে প্রায় ছয়শত বৎসর একাধিপত্য করেও তাঁরা যখন উর্দু চালাতে পারেননি তখন বর্তমান যুগের নানা কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব, বহু নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বাংলাসাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে বিজড়িত মুসলমান-হিন্দুকে তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে উর্দু চালানো কি সম্ভবপর?

আরব-ইরান পাশাপাশি দেশ, এক দেশ থেকে আরেক দেশে গমনাগমনে কোনও অসুবিধা ছিল না, উর্দুর তুলনায় আরবি বহু পূতপবিত্র ভাষা ও সে ভাষা ইসলামের তাবত দৌলত ধারণ করে; তৎসত্ত্বেও যখন ইরানে আরবি চলল না তখন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বহুশত ক্রোশ দূরে— মাঝখানে আবার এমন রাষ্ট্র যার সঙ্গে এখনও পুরা সমঝাওতা হয়নি, যে পশ্চিম পাকিস্তানেও আবার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত— সেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একজোট হবেই-বা কী করে আর একে অন্যকে উর্দু শেখাবেই-বা কী প্রকারে? এ তো দু পাঁচজন মাস্টারের কথা নয়, আমাদের দরকার হবে হাজার হাজার লোকের। আর হাজার নবাগতকে পোষবার ক্ষমতা যদি পূর্ব পাকিস্তানের থাকতই তবে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হতভাগ্য মুসলমানদের কি পূর্ব পাকিস্তান এতদিনে আমন্ত্রণ করে চোখের জল মুছিয়ে দিত না, মুখে অন্ন তুলে ধরত না?

হয়তো উর্দুওয়ালারা বলবেন যে, সমস্ত দেশকে উর্দু শেখানো তাঁদের মতলব নয়; তাঁদের মতলব প্রাইমারি স্কুলে অর্থাৎ গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শেখানো এবং হাইস্কুল ও কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে উর্দু চালানো।

তাই যদি হয় তবে ফল হবে এই যে, হাইস্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত গুণী-জ্ঞানীরা কেতাব লিখবেন উর্দুতে। তাতে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস থাকবে, সে ঐতিহ্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের নবীন রাষ্ট্র কী করে গড়ে তুলতে হবে তার কায়দাকানুনের বয়ান থাকবে, আল্লা-রসুলের বাণী সেসব কেতাবে নতুন করে প্রচারিত হবে এবং এসব তাবত দৌলতের ভোগী হবেন উর্দু জাননেওলারা। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৮০/৯০ জন চাষা-মজুর; তাদের শিক্ষাসমাপ্তি যে পাঠশালা পাসের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে সেকথাও নিশ্চয়ই জানি এবং তারা এসব কেতাব পড়তে পারবে না। এই শতকরা আশিজনের ওপর যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হবে তার আদর্শ নতুন, আকাঙ্ক্ষা নতুন এবং সে আদর্শে পৌঁছানোর জন্য যেসব বয়ান উর্দু ভাষাতে লেখা হবে তারা সেসব পড়তে সক্ষম

www.pathagar.com

হবে না। অর্থাৎ শতকরা আশিজন কোনওকিছু না জেনেশুনে আদর্শ রাষ্ট্র গড়াতে উঠেপড়ে লেগে যাবে।

এ বড় মারাত্মক ব্যবস্থা, এ বড় অনৈসলামিক কুব্যবস্থা। প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী মৌলবি-মৌলানাকে যত দোষ দিতে চান দিন, কিন্তু এ দোষ তাঁদের জানী দুশমনও দিতে পারবেন না যে তাঁরা ধনী এবং গরিবের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা করেছিলেন। ধনীর ছেলেকে তাঁরা যেমন আরবি-ফারসি-উর্দু শিখিয়েছিলেন, গরিবের ছেলেকেও ঠিক সেই কারিকুলামের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি পাকচক্রে পূর্ব পাকিস্তানকে কোনওদিন উর্দু গ্রহণ করতেই হয় এবং স্বীকার করে নিতেও হয় যে আমাদের সাহিত্য এবং অন্যান্য সৃষ্টি উর্দুতেই হবে, তবে তাঁরা পাঠশালায়ও উর্দু চালাবেন। দেবভাষা ও গণভাষা বলে পৃথক পৃথক বস্তু স্বীকার করা ইসলাম-ঐতিহ্য পরিপন্থী।

পাকিস্তান বড়লোকের জন্য নয়, গরিবের হক পাকিস্তানে বেশি।

ইংরেজও 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা করে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ কৃষি রিপোর্ট বের করত ইংরেজি ভাষায় এবং চাষাভুষাদের শেখাত বাংলা! বোধহয় ভাবত বাঙালি 'মাছিমারা' কেরানি যখন ইংরেজি না জেনেও ইংরেজি দলিলপত্র নকল করতে পারে তখন ইংরেজি-অনভিজ্ঞ চাষাই-বা ইংরেজিতে লেখা কৃষি রিপোর্ট, আবহাওয়ার খবরাখবর পড়তে পারবে না কেন? এই পাগলামি নিয়ে যে আমরা কত ঠাট্টা-মশকরা করেছি সেকথা হয়তো উর্দুওয়ালারা ভুলে গিয়েছেন কিন্তু আমরা ভুলিনি। তাই শুধাই, এবার কি আমাদের পালা? এখন আমরা কৃষি রিপোর্ট, বাজারদর, আবহাওয়ার খবরাখবর বের করব উর্দুতে আর চাষিদের শেখাব বাংলা! খবর শুনে ইংরেজ লন্ডনে বসে যে অট্টহাসি ছাড়বে আমরা সিলেটে বসে তার শব্দ শুনতে পাব।

উর্দুওয়ালারা বলবেন, 'ক্ষেপেছ? আমরা উর্দু কৃষি রিপোর্ট বাংলাতে অনুবাদ করে চাষার বাড়িতে পাঠাব।'

উত্তরে আমরা শুধাই : সে অনুবাদটি করবেন কে? কৃষি রিপোর্টের অনুবাদ করা তো পাঠশালা-পাসের বাংলা বিদ্যে দিয়ে হয় না। অতএব বাংলা শেখানোর জন্য হাইস্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সক্কলকে স্কুল-কলেজে বাংলা উর্দু দুই-ই বেশ ভালো করে শিখতে হবে (কৃষি-রিপোর্ট ছাড়া উর্দুতে লেখা অন্যান্য সৎসাহিত্যও তো বাংলাতে তর্জমা করতে হবে); ফলে দুই কুলই যাবে, যেমন ইংরেজ আমলে গিয়েছিল— না শিখেছিলুম বাংলা লিখতে, না পেরেছিলুম ইংরেজি ঝাড়তে।

ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানিতে যে উচ্চশিক্ষার এত ছড়াছড়ি, সেখানেও দশ হাজারের মধ্যে একটি ছেলে পাওয়া যায় না যে দুটো ভাষায় সড়গড় লিখতে পারে। আরব, মিশরের আলিম-ফাজিলগণও এক আরবি ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানেন না।

না হয় সবকিছুই হল কিন্তু তবু মনে হয়, এ বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি— যে রিপোর্ট পড়নেওয়ালার শতকরা ৯৯ জন জানে বাংলা, সে রিপোর্টের মূল লেখা হবে উর্দুতে! ব্যবস্থাটা কতদূর বদখত বেতালা তার একটা উপমা দিলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে : যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে উপস্থিত শ-খানেক রুটি-খানেওয়ালা পাঞ্জাবি আছেন অতএব তাবৎ দেশে ধানচাষ বন্ধ করে গম ফলাও! তা সে আল-বাঁধা, জলে টইটম্বুর ধানক্ষেতে গম ফলুক আর না-ই ফলুক!

www.pathagar.com

উর্দুওয়ালারা তবু বলবেন, 'সব না হয় মানলুম, কিন্তু একথা তো তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না কেন্দ্রের ভাষা যে উর্দু সে সম্বন্ধে পাকাপাকি ফৈসালা হয়ে গিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের লোক যদি উর্দু না শেখে তবে করাচির কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁরা গাঁকগাঁক করে বক্তৃতা ঝাড়বেনই-বা কী প্রকারে, এবং আমাদের ছেলেছোকরারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাঙর ডাঙর নোকরিই-বা করবে কী প্রকারে?'

বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যত ছেলেবেলা থেকে যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন, উর্দু যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে আমরা কস্মিনকালেও পাল্লা দিয়ে পেরে উঠব না। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে উর্দুভাষীগণ হাসিঠাট্টা করবেই এবং সকলেই জানেন উচ্চারণের মশকরা-ভেংচানি করে মানুষকে সভাস্থলে যত ঘায়েল করা যায় অন্য কিছুতেই ততটা সুবিধে হয় না। অবশ্য যাদের গুরদা-কলিজা লোহার তৈরি তাঁরা এসব নীচ ফন্দি-ফিকিরে ঘায়েল হবেন না কিন্তু বেশিরভাগ লোকই আপন উচ্চারণের কমজোরি বেশ সচেতন থাকবেন, বিশেষত যখন সকলেই জানেন যে প্রথম বহু বৎসর ধরে উত্তম উচ্চারণ শেখবার জন্য ভালো শিক্ষক আমরা জোগাড় করতে পারব না, এবং একথাও বিলক্ষণ জানি যে একবার খারাপ উচ্চারণ দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করলে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে সে জখমি উচ্চারণ আর মেরামত করা যায় না। দৃষ্টান্তের জন্য বেশিদূর যেতে হবে না। পূর্ববঙ্গের উর্দুভাষাভাষী মৌলবি সাহেবদের উচ্চারণের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই তাঁদের উচ্চারণের দৈন্য ধরা পড়ে। সে উচ্চারণ দিয়ে পূর্ববাংলায় 'ওয়াজ' দেওয়া চলে কিন্তু যাঁদের মাতৃভাষা উর্দু তাঁদের মজলিসে মুখ খোলা যায় না। এমনকি দেওবন্দ-রামপুর ফের্তা কোনও কোনও মৌলবি সাহেবকে উচ্চারণ বাবতে শরমিন্দা হতে দেখেছি, অথচ বহুক্ষেত্রে নিশ্চয় জানি যে এঁদের শাস্ত্রজ্ঞান দেওবন্দ-রামপুরের মৌলানাদের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু এঁরা নিরুপায়, ছেলেবেলা ভুল উচ্চারণ শিখেছিলেন, এখনও তার খেসারতি ঢালছেন।

কিন্তু কী প্রয়োজন জান পানি করে ছেলেবেলা থেকে উর্দু-উচ্চারণে পয়লানম্বরি হওয়ায়? অন্য পন্থা কি নেই?

আছে। গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি সুইজারল্যান্ডে চারটি ভাষা প্রচলিত। তাঁদের পার্লামেন্টে সকলেই আপন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন। সেসব বক্তৃতা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। উর্দুওয়ালারা প্রশ্ন শুধাবেন : এসব বক্তৃতা অনুবাদ করে কারা?

সেই তত্ত্বটা এইবেলা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ধরুন, আপনার মাতৃভাষা বাংলা, আপনি উর্দুও জানেন। কিন্তু উর্দুতে বক্তৃতা দিতে গেলে আপনি হিমশিম খেয়ে যান। অথচ অল্প উর্দু জানা সত্ত্বেও যদি আপনাকে কোনও উর্দু বক্তৃতা বাংলায় তর্জমা করতে হয় তবে আপনি সেটা অনায়াসে করে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ফ্রান্স, জর্মনি, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সফর করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন তিনি দুনিয়ার বাহান্নটা ভাষায় বক্তৃতা দেননি? বক্তৃতা দিয়েছিলেন হামেশাই ইংরাজিতে। এবং অনুবাদকেরা আপন আপন মাতৃভাষায় সেসব বক্তৃতা অনুবাদ করেছিলেন।

মার্শাল বুলগানিন, আইসেনহাওয়ার, চার্চিল, মাও-সে-তুঙ, চিয়াং-কাই-শেক যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেন— আর চার্চিল তো মামুলি কথা বলতে গেলেও ওজস্বিনী

www.pathagar.com

বক্তৃতা ঝাড়েন— তখন সকলেই আপন আপন মাতৃভাষাতেই কথা বলেন। দোভাষী তর্জুমানরা সেসব আলাপ-আলোচনার অনুবাদ করেন।

এত বড় যে ইউনাইটেড নেশনস অরগেনাইজেশন (উনো), যেখানে দুনিয়ার প্রায় তাবৎ ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়; সে-ও চলে তর্জুমানদের 'মধ্যস্থতায়'।

পাঠক হয়তো বলবেন অনূদিত হলে মূল বক্তৃতার ভাষার কারচুপি অলঙ্কারের ঝলমলানি, গলা ওঠানো-নাবানোর-লম্ফঝম্ফ মাঠে মারা গিয়ে বক্তৃতা রসকষহীন সাদামাটা হয়ে বেরোয়, ওজস্বিনী বক্তৃতা তখন একঘেয়ে রচনা পাঠের মতো শোনায়। সেকথা ঠিক— যদিও প্রোফেশনাল এবং বিচক্ষণ তর্জুমান মূলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জৌলুস রাখতে সমর্থ হন— কিন্তু যখন সব বক্তারই বক্তৃতা অনূদিত হয়ে সাদামাটা হয়ে গেল তখন সকলেই সমান লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

গুণীরা বলেন, আলাপ-আলোচনা যেখানে ঝগড়া-কাজিয়ায় পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে কদাচ বিপক্ষের মাতৃভাষায় কথা বলবে না; তুমি একখানা কথা বলতে-না-বলতে সে দশখানা বলে ফেলবে। বিচক্ষণ লোক মাত্রই স্টেশনে লক্ষ করে থাকবেন যে হুঁশিয়ার বাঙালি বিহারি মুটের সঙ্গে কদাচ উর্দুতে কথা বলে না। আর মুটে যদি তেমনি ঘুঘু হয় তবে সে-ও বাংলা জানা থাকলেও আপন উর্দু চালায়। তবু তো বিহারি মুটেকে কিছুটা ভালো উর্দু জানা থাকলে ঘায়েল করা যায়, কিন্তু করাচিতে যেসব উর্দুভাষীদের মোকাবেলা করতে হবে তাঁদের উর্দুজ্ঞান পয়লানম্বরি হবে নিশ্চয়ই। প্রেমালাপের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে কোনও ভাষারই প্রয়োজন হয় না, টোটিফুটি উর্দু বললেও আপত্তি নেই। তুলসী দাস কহেন—

'জো বালক কহে তোতরি বাতা
সুনত মুদিত নেন পিতু আরু মাতা—

'বালক যখন আধা-আধা কথা বলে তখন পিতামাতা মুদ্রিত নয়নে (গদগদ হয়ে) সেকথা শোনেন'। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যগণ শুধু রসালাপ করার জন্য করাচি যাবেন না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে, দরকার বোধ করলে তাঁদের তো বাগ্‌বিতণ্ডাও করতে হবে।

কেন্দ্রের ডাঙর ডাঙর নোকরির বেলাও এই যুক্তি প্রযোজ্য। আমরা যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন, প্রতিযোগিতাত্মক পরীক্ষায় উর্দু-মাতৃভাষীর সঙ্গে কখনওই টক্কর দিতে পারব না। অথচ আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় পরীক্ষা দিই, এবং উর্দু-মাতৃভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেন তবে পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে। তখন প্রশ্ন উঠবে, বাঙালি ছেলেরা উর্দু না জেনে কেন্দ্রে নোকরি করবে কী করে? উত্তরে বলি, সিন্ধি বেলুচি ছেলে যে প্রকারে কেন্দ্রে কাজ করবে ঠিক সেই প্রকারে— তাদের মাতৃভাষাও তো উর্দু নয়। পাঠানেরা পশতুর জন্য যেরকম নাড়াচাড়া আরম্ভ করেছেন তাঁদের ওই একই অবস্থা হবে। অথবা বলব উর্দু-মাতৃভাষীরা যে কৌশলে বাংলাদেশে নোকরি করবেন ঠিক সেই কৌশলে। এ সম্বন্ধে বাকি বক্তব্যটুকু অন্য প্রসঙ্গে বলা হবে।

উর্দুওয়ালারা এর পরও শুধাতে পারেন, "আমরা যদি উর্দু না শিখি তবে কেন্দ্র থেকে যেসব হুকুম ফরমান, আইন-কানুন আসবে সেগুলো পড়ব কী করে?'

www.pathagar.com

উত্তরে বলি, 'তার জন্যে ঢাকাতে তর্জুমানদের ব্যবস্থা করতে হবে।' একথা শুনে উর্দুওয়ালারা আনন্দে লাফ দিয়ে উঠবেন। বলবেন, 'তবেই তো হল। তর্জুমানদের যখন উর্দু শেখাতেই হবে তখন তামাম দেশকে উর্দু শেখালেই পারো।'

এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। উদাহরণ না দিলে কথাটা খোলসা হবে না বলে নিবেদন করি, 'আরব, ফ্রান্স, জর্মনি, স্পেন, রুশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশে পাকিস্তানের লোক রাজদূত হয়ে যাবে। তাই কি পাকিস্তানের লোককে আমরা দুনিয়ার তাবৎ ভাষা শেখাই?'

একটা গল্প মনে পড়ল। স্বয়ং কবিগুরু সেটি ছন্দে বেঁধেছেন; তাই যতদূর সম্ভব তাঁর ভাষাতেই বলি—

কহিলা হবু "শুন গো গোবু রায়
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র?
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারও রক্ষা নাহি আর।"

মন্ত্রী তখন,

অশ্রুজলে ভাষায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে
যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে।

শেয়ানা উত্তর। কিন্তু রাজা মন্ত্রীর চেয়েও ঘড়েল তাই বললেন—

— কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব!

তখন নানা তরকিব নানা কৌশলে রাজার পা দু খানাকে ধুলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হল। সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে তামাম দুনিয়া সাফ করার প্রথম চেষ্টাতে যখন কোনও ফল হল না তখন 'একুশ লাখ ভিস্তি' দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা করা হল। তাতেও যখন কিছু হল না তখন—

কহিল, মন্ত্রী, "মাদুর দিয়া ঢাকো;
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো
কোথাও যেন না থাকে কোনও রন্ধ্র।"

রাজার কপাল ভালো বলতে হবে, কেউ যে তাঁর পা দু খানা কাটার ব্যবস্থা করলেন না। শেষটায় সমস্বরে—

কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।"

www.pathagar.com

তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

এত সোজা সমাধান? তাই তো বটে! এই করেই হল জুতা আবিষ্কার। তিনকুড়ি কেন্দ্রীয় সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শ-দুই চাকুরে, আরও শ-দুই তর্জুমানের উর্দু জানার প্রয়োজন [হিসেবটা অত্যন্ত দরাজ হাতে করা গেল]; তার জন্য চার কোটি লোককে উর্দু কপচাতে হবে!

না হয় পাঁচশো নয়, সাতশো নয়, পাঁচ হাজার লোকেরই উর্দু বলার প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পায়েই উর্দুর জুতা পরিয়ে দিই; এই ভলভলে কাদার দেশে চার কোটি লোককে জুতো পরাই কোন্ হস্তী-বুদ্ধির তাড়নায়?

রবীন্দ্রনাথের গল্পটি এইখানেই শেষ নয়; আমাদের কথাও এখানে ফুরোয় না। আমরা যখন এই জটিল সমস্যার সরল সমাধান বাৎলে দিই তখন—

কহিলা রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।"

মন্ত্রী কহে,

"বেটারে শূলে বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ।"

চামারের মতো সরল সমাধান যারা করতে যায় তাদের জন্য শূলের হুকুম জারি হয়। তাদের তখন নামকরণ হয় 'এনিমিজ অব দি স্টেট,' 'আজাঁ প্রভোকাতর'!!

ইতিহাস দিয়ে যদি-বা সপ্রমাণ করা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের মতো বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে কখনও তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে অন্য ভাষা শেখানো সম্ভবপর হয়নি, ইরান-তুর্কি প্রভৃতি দেশে এ প্রকারের চেষ্টা সর্বদাই নিষ্ফল হয়েছে, তবু একরকমের লোক যাঁরা আপন স্বাধিকার-প্রমত্ততায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে 'নাথিঙ ইজ ইমপসিবল' বুলি কপচান, এ সম্প্রদায়ের লোক যদি দেশের দণ্ডধর না হতেন তবে আমাদের ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজই আর পাঁচ-জনকে সত্যনিরূপণ করাতে সমর্থ হত। তাই প্রশ্ন, এসব দণ্ডধরদের সামনে অন্য কোন যুক্তি পেশ করা যায়, কী কৌশলে বোঝানো যায় যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে উর্দু চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ফারসিতে বলে 'জান-মাল', বাংলায় বলি 'ধন-প্রাণ'— মানুষ এই দুই বস্তু বড় ভালোবাসে; ইতিহাস যা বলে বলুক, এই দুই বস্তু যদি মানুষের হাত এবং দেহ ছাড়ার উপক্রম করে তবে দণ্ডধরেরা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন; হাতের পাখি এবং প্রাণপক্ষী বাঁচাবার জন্য তখন ঝোপের 'ইমপসিব্‌ল্' চিড়িয়ার তালাশি বন্ধ হয়ে যায়।

তাই প্রথম প্রশ্ন, ঝোপের উর্দু চিড়িয়া ধরতে হলে যে ফাঁদ কেনার প্রয়োজন তার খর্চার বহরটা কী?

www.pathagar.com

ধরা যাক আমরা পূর্ব পাকিস্তানের পাঠশালা, স্কুল, কলেজ সর্বত্র উর্দু চালাতে চাই। পূর্ব পাকিস্তানে ক হাজার পাঠশালা, ক জন গুরুমহাশয়, দ্বিতীয় শিক্ষক, স্কুলমাস্টার, কলেজ প্রফেসার আছেন জানি না, কিন্তু একথা নিশ্চয় জানি যে কেবলমাত্র পাঠশালাতেই যদি আজ আমরা উর্দু চালাবার চেষ্টা করি তবে আমাদের হাজার হাজার উর্দু-শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সেসব শিক্ষকরা আসবেন বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে। তাঁরা আঠারো কুড়ি-টাকার মাইনেতে পূর্ব বাংলার গাঁয়ে পরিবার পোষণ করতে পারবেন না। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের কিছু কিছু জমিজমা আছে, কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন, এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কী দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নিদারুণ কাহিনী বর্ণনা করার মতো শৈলী এবং ভাষা আমার কলমে নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হয় বেশি। মহাজনের রূঢ়বাক্য, জমিদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়-মনে আঘাত দেয় বেশি এবং উচ্চশিক্ষা কী বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। 'ইত্তেহাদ', 'আজাদ' মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহুস্থলে রোগমুক্ত হয়, হয়তো তার সবিস্তর বর্ণনাও কোনও রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তার পর যখন পুত্র অথবা কন্যা যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কী করেন, কী ভাবেন, আমাদের জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পণ্ডিতের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না 'স্বাস্থ্যনিবাস' সাপ না ব্যাঙ না কী, তখন তারা যক্ষ্মা-রোগকে কিস্মতের গর্দিশ বলেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

সুদূর যুক্তপ্রদেশ, বিহার থেকে যাঁরা উর্দু শেখাবার জন্য বাংলার জলেভেজা, কাদাভরা, পানাঢাকা, জ্বরেমারা পাড়াগাঁয়ে সপরিবার আসবেন তাঁরা মাইনে চাইবেন কত? আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে ফালতো জমিজমা আর নেই যে চাকরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লা-খেরাজ বা ব-খেরাজ ভূসম্পত্তি দিয়ে দেব আর তাঁরা সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে চন্দ্ রোজের মুসাফিরি কোনও সুরতে গুজার করে নেবেন। তাই তাঁদের মাইনে অন্ততপক্ষে কত হওয়া উচিত, আপনারা এবং আর পাঁচজন গাঁও-বুড়ারা, মাথা মিলিয়ে ধরে দিন। আমরা মেনে নেব।

যত কমই ধরুন না কেন, তার দশমাংশ দেবার মতো তাগদও পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর নেই (শুধু পূর্ব পাকিস্তানের কেন, এরকম পাগলা প্ল্যান চালাতে চাইলে ইংলন্ড-ফ্রান্সেরও নেই)। জমির সার, হালের বলদ, কলকজা কেনা সবকিছুর জন্য পয়সা খরচা বন্ধ করে এই কি এডুকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট করার মোকা!

এতক্ষণ 'ধনের' কথা হচ্ছিল, এখন প্রাণের কথাটা তুলি।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে তো আমাদের পাঠশালাগুলো ভর্তি করা হল। আটার অভাবে তাঁরা মাসোহারা পেয়েও অর্ধাহারী রইলেন। তা থাকুন, কিন্তু যেসব হাজার হাজার পাঠশালার বাংলা শিক্ষককে পদচ্যুত করে বিদেশিদের জায়গা করা হল তাঁরা যাবেন কোথায়? কোনও দোষ করেননি, 'এনিমিজ অব দি স্টেট' এঁরা নন, এঁদের বরখাস্ত করা হবে কোন্ হক্কের জোরে, কোন্ ইসলামি কায়দায়?

www.pathagar.com

পাকিস্তান সফল করেছেন কারা? গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের প্রোপাগান্ডা ছড়াল কে, সিলেটের প্লেবিসিটের সময় কুর্তা বিক্রয় করে নৌকা ভাড়া করল কারা, পোলোয় করে মরণাপন্ন ভোটারকে বয়ে নিয়ে গেল কার বেটা-বাচ্চারা?

এরাই লড়েছে পাকিস্তান-বিরোধীদের সঙ্গে। এরা কুর্সিনশীন, মোটর-সওয়ার পলিটিশিয়ান নয়। এরা লড়তে জানে। দরকার হলে এরা দলে দলে ঢাকার দিকে ধাওয়া করবে, সঙ্গে যাবে তাদের বাধ্য চাষা-মজুর। তাদের সংখ্যা কী হবে অনুমান করতে পারছিনে, কিন্তু শুনেছি এক ঢাকা শহরের বাংলাভাষী মুষ্টিমেয় ছাত্রসম্প্রদায়ের হাতেই বাংলা-উর্দু বাবদে কোনও কোনও দণ্ডধর কর্তাব্যক্তি লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়েছেন। ছাত্ররা শহরবাসী কিন্তু এরা 'গ্রাম্য'; এরা প্রাণের ভয় দেখাতে জানে। 'ধন' তো আগেই গিয়েছিল বিদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে, তখন আরম্ভ হবে 'প্রাণের' ওপর হামলা।

খুদা পানাহ্। আমরা এ অবস্থার কল্পনাও করতে পারিনে। আমাদের বিশ্বাস, কর্তাব্যক্তিরা তার বহু পূর্বেই 'কিতাবুমুবিন' দেখে 'সিরাতুল মুস্তাকিমের' সন্ধান পাবেন;— 'ওয়া আম্মাস্‌সইলা ফলা তনহর', অর্থাৎ 'সাইল (প্রার্থী)-দের প্রত্যাখ্যান কোরো না!'[১] এস্থলে 'সাইল' শব্দ আরবি অর্থে নিতে হবে, উর্দু অর্থে নয়, এবং তা হলে কথাটা আমাদের গরিব গুরুমহাশয়দের বেলাই ঠিক ঠিক খাটে।

হিটলার কুরানের এ আদেশ মানেননি। যে র্যোম ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের কর্মতৎপরতার দরুন তিনি জার্মানিতে তাঁর 'তৃতীয় রাষ্ট্র' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, দেড় বৎসর যেতে-না-যেতে তিনি র্যোম এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের গুলি করে মেরেছিলেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের কর্তাব্যক্তি কুতুবমিনাররা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন— এবং ইসলামে গণতন্ত্রের অর্থ 'হক্' ও 'সবর'-এর ওপর নির্ভর করা (ওয়া তাত্তাসাও বিল্ হক্কি, ও তত্তাসাও বিস্-সব্‌র)।

এ তো গেল পাঠশালার কথা। হয়তো উর্দুওয়ালারা বলবেন যে তাঁরা পাঠশালায় বাংলাই চালাবেন কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়াবেন উর্দু। দু রকম শিক্ষাব্যবস্থার অধর্ম ও কুফল আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি; আপাতত শুধু এইটুকু দ্রষ্টব্য যে স্কুল-কলেজে তাবৎ বিষয়বস্তু উর্দুর মাধ্যমিকে পড়াতে হলে উপস্থিত যেসব শিক্ষকরা এসব বিষয় পড়াচ্ছেন তাঁদের সকলকে বরখাস্ত করতে হবে এবং তাঁদের স্থলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার থেকে হাজার হাজার শিক্ষক আনাতে হবে।

কাজেই প্রথম প্রশ্ন, এসব মাস্টাররা কি অন্ন-হারা হওয়ার দুর্দৈবটা চোখ বুজে সয়ে নেবেন? প্রত্যেক অনুন্নত দেশের বেকার সমস্যার প্রধান অংশ সমাধান করে শিক্ষাবিভাগ,

---

১. এই পদের ওপর মৌলানা ইউসুফ আলীর টীকা : Then there are the people who come with Petitions,—who have to ask for something, They may be genuine beggars asking for financial help, or ignorant people asking for knowledge, or timid people asking for some lead or encouragement. The common attitude is to scorn them, or repulse them. The scorn may be shown even when alms or assistance is given to them. Such an attitude is wrong....Every petition should be examined and judged on its merits. (সুরা ৯৩ : ১০)

www.pathagar.com

কারণ তার হাতে বিস্তর চাকরি। পূর্ব পাকিস্তান সে সমস্যার সমাধান দূরে থাক, পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি শিক্ষকদের বরখাস্ত করে বাইরের থেকে লোক ডেকে সৃষ্টি করবেন বৃহৎ বেকার সমস্যা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক এবং কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা, পূর্ত-খনিজ-বৈদ্য-শাস্ত্র পড়াবার জন্য উর্দু-ভাষী শিক্ষক পাওয়া যাবে তো? ভুললে চলবে না যে পূর্ব পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ করে তবে সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তানেও ঠিক আমাদের কায়দায়ই উর্দু মাস্টার, প্রফেসরের চাহিদা ভয়ঙ্কর বেড়ে যাবে। ফলে যখন আমরা ঢাকার স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের যে মাইনো দিচ্ছি সে মাইনের চেয়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ দিতে হবে এইসব বহিরাগতদের। অত টাকা কোথায়? এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস উর্দুর মাধ্যমিকে উপরে লিখিত তাবৎ বিষয় পড়াবার মতো শিক্ষক বিহার যুক্তপ্রদেশে পাঞ্জাবে প্রয়োজনের দশমাংশও নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন, তাবৎ পাঠ্যপুস্তক উর্দুতে লেখবার জন্য গ্রন্থাকার কোথায়? প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দশমাংশ যখন বাজারে নেই তখন লেখকের দশমাংশও যে পাব না সে তথ্যও অবিসংবাদিত সত্য। কিছু বই লাহোর থেকে আসবে সত্য, কিন্তু বাংলার ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা তো লাহোরে লেখা হবে না এবং পূর্ব পাকিস্তানে এসব বিষয় লেখার লোক নেই। এবং যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, আমাদের পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের রুটি বহু বৎসরের জন্য নির্ঘাত মারা যাবে।

চতুর্থ প্রশ্ন, উর্দু ছাপাখানা, কম্পজিটর , প্রুফ-রিডার কোথায়? বাংলা প্রেস, প্রুফ-রিডাররা বেকার হয়ে যাবে কোথায়?

এবং সর্বশেষ দ্রষ্টব্য : পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের স্কুল-কলেজে এখনও উর্দু শিক্ষার মাধ্যমিক হয়নি। বিবেচনা করি, আস্তে আস্তে হবে। কিন্তু পাঞ্জাবিদের পক্ষে এ কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল হবে কারণ উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা। দরকার হলে কেঁদেককিয়ে তাঁরা উর্দুতে আপন আপন বিষয় পড়াতে পারবেন কিন্তু বাঙালি মাস্টার-প্রফেসারের পক্ষে উর্দু শিখে আপন কর্তব্য সমাধান করতে বহু বহু বৎসর লাগবে। ততদিন আমরা থ্রি-লেগেড রেস রান করি?— বিশেষ করে যখন কি না পূর্ব পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রাংশ করার জন্য আমাদের কর্তব্য (ফর্‌জ্ বললে ভালো হয়) উর্ধ্বশ্বাসে, ত্বরিতগতিতে সম্মুখপানে ধাবমান হওয়া।

উর্দুওয়ালারা যদি বলেন, 'আমরা স্কুল-কলেজে উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখাব, আজ যেরকম ফারসি, আরবি, সংস্কৃত অপশনাল সেকেন্ড ল্যান্‌গুইজ হিসেবে শেখাচ্ছি', তা হলে এ প্রস্তাবে যে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই শুধু তাই নয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে সায় দিই। প্রসঙ্গান্তরে সে আলোচনা হবে।

এ বিষয়ে আরেকটি কথা এইবেলা বলে নেওয়া ভালো। সাধারণত ওদিকে কেউ বড় একটা নজর দেন না। আমাদের প্রশ্ন, সব বিষয় পড়াবার জন্য যদি আমরা উর্দু শিক্ষক পেয়েও যাই, উর্দু শিক্ষয়িত্রী পাব কি? না পেলে আমাদের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা হবে, উর্দুওয়ালারা ভেবে দেখবেন কি? আমাদের কাছে পাকাপাকি খবর নেই, কিন্তু শুনতে পাই বাংলা শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই আমরা যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছি। (এস্থানে উল্লেখ করি শ্রীহট্ট শহরের মহিলা মুসলিম লীগ তথা অন্যান্য মহিলারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গত নভেম্বর মাস থেকে একটানা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'পাকিস্তান নবজাত

www.pathagar.com

শিশুর ন্যায় নবজাত রাষ্ট্র। মাতৃভাষারূপ মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য যে কোনও খাদ্য তার পক্ষে গুরুপাক হবে'।)

উর্দুওয়ালারা কেউ কেউ বলে থাকেন— 'অতশত বুঝি না, আমরা চাই, বাংলা ভাষার আজ যে পদ পূর্ব পাকিস্তানে আছে ঠিক সেইরকমই থাক, এবং ইংরেজির আসনটি উর্দু গ্রহণ করুক।' তার অর্থ এই যে উর্দু উচ্চশিক্ষার মাধ্যমিক (মিডিয়াম অব্ ইনস্ট্রাকশন্) হোক।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা শিক্ষার মাধ্যমিক করলে যে কী প্রাণঘাতী বিষময় ফল জন্মায় তার সবিস্তর আলোচনা না করে উপায় নেই।

প্রথম পৃথিবীর কোন শিক্ষিত সভ্য দেশ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে? ইংলন্ড, ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি, চীন, জাপান, রুশ, মিশর, ইরাক, তুর্কি, ইরান এমন কোন দেশ আছে যেখানকার লোক আপন মাতৃভাষাকে অবমাননা করে আপন দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে? আরবি পূতপবিত্র, ঐশ্বর্যশালিনী, ওজস্বিনী ভাষা; কিন্তু কই, তুর্কি, ইরান, চীন, জাভার কোটি কোটি লোকে তো আরবির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে না, বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রচর্চা করে না। তবে বাংলার বেলা এ ব্যত্যয় কেন? বাংলা ভাষাভাষী লোকসংখ্যা তো নগণ্য নয়। সংখ্যা দিয়ে যদি ভাষার গুরুত্ব নির্ণয় করি এবং সে নির্ণয়করণ কিছু অন্যায় নয়— তবে দেখতে পাই চীনা, ইংরেজি, হিন্দি-উর্দু, রুশ, জর্মন ও স্পেনিশের পরেই বাংলার স্থান। পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছয় কোটি (পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় সোয়া চার কোটি) এবং তার তুলনায় ভুবনবিখ্যাত ফরাসি ভাষায় কথা বলে সাড়ে চার কোটি, ইতালিয়ানে চার কোটি, ফারসিতে এক কোটি, তুর্কিতে সত্তর লক্ষ, এমনকি আরবিতেও মাত্র আড়াই কোটি। যে ভাষায় এত লোক সাহিত্যসৃষ্টি করবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করছে তাদের এতদিন চেপে রেখেছিল মৌলবি-মৌলানাদের আরবি-ফারসি-উর্দু এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজি। বাংলার সময় কি এখনও আসেনি, সুযোগ কি সে কোনওদিনই পাবে না?

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে এবং তার ফল কী সেকথাও ঐতিহাসিকদের অবিদিত নয়। ক্যাথলিক জগতে কেন্দ্র অর্থাৎ পোপের সঙ্গে যোগ রাখার প্রলোভনে (আজ পূর্ব পাকিস্তান করাচির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যেরকম প্রলুব্ধ) একদা ইয়োরোপের সর্বত্র লাতিনের মাধ্যমিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি জনসাধারণের মাতৃভাষার উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। এবং সে পাথর সরাবার জন্য লুথারের মতো সংস্কারক ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মতো নবীন সংস্কারপদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তী যুগে দেখতে পাই ফরাসি লাতিনের জায়গা দখল করেছে এবং তার চাপে দিশেহারা হয়ে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের মতো জর্মন সম্রাট মাতৃভাষা জর্মনকে অবহেলা করে ফরাসিতে কবিতা লিখেছেন এবং সে কবিতা মেরামত করবার জন্য ফরাসি গুণী ভলতেয়ারকে পৎসদামে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঠিক সেইরকম রাশিয়ারও অনেক বৎসর লেগেছিল ফরাসির নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে। আজ উর্দুওয়ালারা বাংলাকে যেরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন ঠিক সেইরকম জর্মন ও রুশ আপন আপন মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বহু বৎসর 'যশের মন্দিরে' প্রবেশ লাভ করতে পারেননি।

এসব উদাহরণ থেকে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিকরূপে গ্রহণ না করা হয় ততদিন শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তরের গুটিকয়েক লোকের

www.pathagar.com

সংস্কৃতিবিলাসের উপকরণ মাত্র এবং যেখানে পূর্বে শুধু অর্থের পার্থক্য মানুষে মানুষে বিভেদ আনত সেখানে 'উচ্চশিক্ষা' ও সংস্কৃতির পার্থক্য দুই শ্রেণির বিরোধ কঠোরতর করে তোলে।

এ দেশে যে ইসলামি শিক্ষা কখনও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তার প্রধান কারণ বাংলার মাধ্যমিকে কখনও শাস্ত্রচর্চা করা হয়নি। যে বস্তু মাতৃভাষায় অতি সহজ, অত্যন্ত সরল, বিদেশি ভাষায় সেই বস্তুই অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আরম্ভ হয় স্কুল থেকে পালানোর পালা এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীর গৃহের চাপের ফলেই এই দুই শ্রেণির ছেলে তখনও লেখাপড়া শেখে, কিন্তু অনুন্নত গরিব তখন ভাবে যে পরিবারে যখন কেউ কখনও লেখাপড়া শেখেনি তখন এ ছেলেই-বা পারবে কেন, বাপ-দাদার মতো এরও মাথায় গোবর ঠাসা।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষা দিলে যে দেশের কতদূর ক্ষতি হয় তার সামান্যতম জ্ঞান এখনও আমাদের হয়নি। সে শিক্ষাবিস্তারে যে তখন শুধু অজস্র অর্থ ব্যয় হয় তা নয়, সে শিক্ষা ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবশ করে তোলে, কল্পনাশক্তিকে পঙ্গু করে দেয় এবং সর্বপ্রকার সৃজনীশক্তিকে কণ্ঠরোধ করে শিক্ষার আঁতুড়ঘরেই গোরস্তান বানিয়ে দেয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি— আমার অভিজ্ঞতা কলেজের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরূপে অর্জিত— যে পশ্চিম ভারতের কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যদিও দু-এক দিক দিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ তবু স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যেমন তাদের বেশি তেমনি প্রকাশক্ষমতা, আত্মপরিচয় দানের নৈপুণ্য তাদের অনেক বেশি। তার একমাত্র কারণ কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আপন আপন মাতৃভাষায় মাধ্যমিকে লেখাপড়া করে আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে ইংরেজির মাধ্যমিকে। কার্ভের মেয়েরা সেই কারণে আপন মাতৃভাষায় নিঃসঙ্কোচ অবাধ গতিতে আপন বক্তব্য বলতে পারে; বোম্বাই, কলিকাতা, ঢাকার ছেলেরা না পারে বাংলা শিখতে, না জানে ইংরেজি পড়তে।

এ কাহিনীর শেষ নেই কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ শেষ করতে হবে। তাই পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করি তিনি যেন শিক্ষাবিভাগের কোনও পদস্থ ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা আলিম মৌলানা সখাওতুল আম্বিয়া প্রমুখ গুণীগণ আমার সম্মুখে বহুবার স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাসাতে যদি বাংলাভাষা সর্বপ্রকার বিষয় শিক্ষার মাধ্যমিক হত তবে আমাদের আরবি-ফারসির চর্চা এতদূর পশ্চাৎপদ হত না। এবং কৌতুকের বিষয় এই যে, যে উর্দুওয়ালারা বাংলাকে এত ইনকার-নফরৎ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন তাঁদেরও অনেকেই কঠিন বিষয়বস্তু যখন উর্দুতে বোঝাতে গিয়ে হিম্‌শিম্‌ খেয়ে যান তখন নোয়াখালি, সিলেটের গ্রাম্য উপভাষারই শরণাপন্ন হন।

এত সরল জিনিস উর্দুওয়ালাদের কী করে বোঝাই? কী করে বোঝাই যে পারস্যের লোক যখন ফারসির মাধ্যমিকে আরবি (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শেখে, তুর্কির লোক যখন তুর্কি ভাষার মাধ্যমিকে আরবি শেখে, তখন বাংলার লোক আরবি (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শিখবে উর্দুর মাধ্যমিকে কোন আজগুবি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তাড়নায়?

এ প্রসঙ্গের উপসংহারে শেষ কথা নিবেদন করি, মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক না করলে সে ভাষা কখনও সমৃদ্ধিশালী হবার সুযোগ পায় না।

www.pathagar.com

স্বরাজ এল পাকিস্তান হল কিন্তু হায়, গোস্বামী খাসলত (মনোবৃত্তি ও আচার-ব্যবহার) যাবার কোনও লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছিনে। এতদিন করতুম ইংরেজির গোলামি, এখন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছি উর্দুর গোলামি। খতম আল্লাহু অলা কুপুবিহিম ইত্যাদি। খুদাতালা তাদের বুকের উপর সিল এঁটে দিয়েছেন। (কুরান থেকে এ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করার কোনও প্রয়োজন হত না, যদি কোনও কোনও 'মৌলানা' বাংলা ভাষার সমর্থকদের 'কাফির' হয়ে যাওয়ার ফতোয়া না দিতেন)।

এইবার দেখা যাক, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে গ্রহণ করতে উর্দুওয়ালাদের আপত্তিটা কী?

তাঁদের প্রধান আপত্তি, বাংলা 'হেঁদুয়ানি' ভাষা। বাংলাভাষায় আছে হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু কৃষ্টির রূপ। পূর্ব পাকিস্তানি যদি সে ভাষা তার রাষ্ট্র ও কৃষ্টির জন্য গ্রহণ করে তবে সে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে নিবেদন, বাংলাভাষা হিন্দু ঐতিহ্য ধারণ করে সত্য, কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়। বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বুদ্ধদেব যেরকম একদিন বৈদিক ধর্ম ও তার বাহন সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তৎকালীন দেশজ ভাষায় (পরে পালি নামে পরিচিত) আপন ধর্ম প্রচার করেন, ঠিক সেইরকম বাংলাভাষার লিখিত রূপ আরম্ভ হয় বৌদ্ধ চর্যাপদ দিয়ে। পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যরূপ নেয় বৈষ্ণব পদাবলির ভিতর দিয়ে। আজ পদাবলি সাহিত্যকে হিন্দুধর্মের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু যে যুগে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত সে যুগে তাকে বিদ্রোহের অস্ত্রধারণ করেই বেরুতে হয়েছিল। তাই শ্রীচৈতন্য প্রচলিত ধর্ম সংস্কৃতে লেখা হয়নি, লেখা হয়েছিল বাংলায়। সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের যে অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয় তার পেছনে ছিলেন মুসলমান নবাবগোষ্ঠী। কেচ্ছা-সাহিত্যেরই সম্মান আমরা দিই— হিন্দুরা দেন না— এবং সে সাহিত্য হিন্দু ঐতিহ্যে গড়া নয়। এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলাগদ্যের পত্তন হয় তার অনুপ্রেরণা খ্রিস্টান সভ্যতা থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন কি না, সেকথা অবান্তর— তাঁর অবদান যে উপনিষদ-সংস্কৃতি ও ইয়োরোপীয় প্রভাবের ফলে গঠিত সেকথা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচলিত নতুন ধারাকে বৈদিক কিংবা সনাতন বলা ভুল, সে ধারা গণ-উপাসনার উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সে উৎসকে গোঁড়া হিন্দুরা কখনও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননি। স্বামী বিবেকানন্দের 'জাতীয়তাবাদে'র মূল বেদ উপনিষদ নয়।

উর্দুওয়ালারা বলবেন, 'এসব খাঁটি হিন্দু না হতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক না কেন, ইসলামি নয়।'

আমরা বলি, 'ইসলামি নয় সত্য কিন্তু এর ভেতরে যে ইনকিলাব মনোবৃত্তি আছে সেটি যেন চোখের আড়ালে না যায়। এই বিদ্রোহ ভাব বাংলায় ছিল বলে কাজী নজরুল ইসলাম একদিন আপন 'বিদ্রোহী' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'মরমিয়াপনার' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে যে নবীন কৃষ্টি গঠিত হবে সেটা এই বিদ্রোহ দিয়েই আপন বিজয় অভিযান আরম্ভ করবে।

এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে আরেকটি কথা বলি : উত্তরভারতের তাবৎ সংস্কৃতভাবাপন্ন ভাষার মধ্যে (হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি ইত্যাদি) বাংলাই সবচেয়ে অসংস্কৃত। হিন্দি, মারাঠি

www.pathagar.com

পড়বার বা বলবার সময় সংস্কৃত শব্দ খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণে পড়া এবং বলা হয়— 'পরীক্ষা' পড়া হয় 'পরীক্‌ষা', 'আত্মা' পড়া হয় 'আৎমা'— কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত শব্দ, এমনকি সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করার সময়ও উচ্চারণ করা হয় বাংলা পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে বাঙালি হিন্দু পর্যন্ত উর্দুভাষী মুসলমানের চেয়ে এককাঠি বাড়া। উর্দুভাষী মুসলমান তার ভাষার সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে খাঁটি সংস্কৃত কায়দায়, বাঙালি হিন্দু উচ্চারণ করে 'অনার্য' কায়দায়।

না-হয় স্বীকার করেই নিলুম, বাংলা 'হেদুঁয়ানি' ভাষা কিন্তু প্রশ্ন, এই ভাষা এতদিন ধরে ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান কি 'না-পাক', 'হিদুঁ' হয়ে গিয়েছে? পাকিস্তান-স্বপ্ন সফল করাতে কি পূর্ব পাকিস্তানের 'না-পাক' মুসলমানদের কোনও কৃতিত্ব নেই? পাকিস্তান-স্বপ্ন কি সফল হল লাহোর, লক্ষ্ণৌর কৃপায়? পূর্ব পাকিস্তানে যারা লড়ল তারা কি সবাই উর্দুর পাবন্দ আলিম-ফাজিল, মৌলানা-মৌলবির দল? না তো। লড়ল তো তারাই যারা উর্দু জানে না, এবং বাংলার জন্য আজ যারা পুনরায় লড়তে তৈরি আছে। এইসব লড়নেওয়ালারা এতদিনকার ইংরেজ আধিপত্য এবং হিন্দুপ্রভাবের ফলেও যখন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যায়নি, তখন পাকিস্তান হওয়ার পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলেই তারা রাতারাতি ইসলামি জোশ হারিয়ে পাকিস্তানের শত্রু বনে যাবে? এ তো বড় তাজ্জব কথা! বাংলাভাষার এত তাগদ?

দ্বিতীয় বক্তব্য আমরা ইতিহাস নিয়ে আরম্ভ করি। পূর্বেই বলেছি ফিরদৌসির আমলে ইরানের সর্বত্র আরবি প্রচলিত ছিল— ইরানের রাষ্ট্রভাষা ছিল আরবি। তখনকার দিনে যেটুকু ফরাসি প্রচলিত ছিল সে ছিল 'কাফির', অগ্নি-উপাসক, জরথুস্ত্রিদের ভাষা। সে ভাষায় একেশ্বরবাদের নামগন্ধ তো ছিলই না, তাতে ছিল দ্বৈতবাদের প্রচার, এককথায় সে ভাষা ছিল ন-সিকে ইসলাম-বিরোধী, 'কাফিরি'। তবু কেন সে ভাষা চর্চা করা হল, এবং সে চর্চা করলেন কারা? কাফিরি জরথুস্ত্রিরা করেনি, করেছিলেন আরবি জাননেওয়ালা মুসলমানেরাই। কেন?

তুর্কিতেও তাই। কেন?

এ দুটো খাঁটি ইসলামি দেশের উদাহরণ; এবার স্বদেশে সেই দৃষ্টান্তই খোঁজা যাক। পাঠান-মোগল যুগে এদেশে ফারসি বহাল তবিয়তে রাষ্ট্রভাষার রাজ-সিংহাসনে বসে দিশি ভাষাগুলোর ওপর রাজত্ব করত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ফারসির সঙ্গে দেশজ হিন্দি মিলিয়ে উর্দুভাষা কেন নির্মাণ করা হল? কিন্তু সেটা আসল প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন যে হিন্দিকে নিয়ে উর্দু বানানো হল সে ভাষা কি 'পাক' ছিল?

আমরা জানি সে ভাষায় তখন তুলসীদাসের রামায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক— এখনও তাই। সেই পুস্তকের আওতায় সমস্ত হিন্দিসাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং তাতে আছে ইসলামদ্রোহী কট্টর মতবাদ। বাল্মীকির রামায়ণে যে ব্যক্তি মানুষ, রাজা এবং বীর, তিনি তুলসীর রামায়ণে খুদ ভগবানের আসন তসরুপ করে বসে আছেন। ইসলামে মানুষকে আল্লার আসনে তোলা সবচেয়ে মারাত্মক কুফর।

আজকের বাংলা ভাষা সেদিনকার হিন্দির তুলনায় বহুগুণে পাক। আজ বাংলা সাহিত্যে যে ঈশ্বর গানে-কবিতায় নন্দিত হচ্ছেন তিনি সুফির মরমের আল্লাহ, হক্। তাঁর সন্ধান 'গীতাঞ্জলিতে'— সে পুস্তক তামাম পৃথিবীতে সম্মান লাভ করেছে।

এবার যে দৃষ্টান্ত পেশ করব সেটি সভয়ে এবং ঈষৎ অনিচ্ছায়। দৃষ্টান্তটি কুরানের ভাষা নিয়ে এবং এ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার হক্ আলিম-ফাজিলদের। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গোলাম

www.pathagar.com

মোস্তফা সাহেব যখন রসুলুল্লার জীবনী থেকে নজির তুলে পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমানকে 'পাঞ্জাবি প্রভুত্ব' বরদাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, (মক্কা হইতে মোহাজেরগণ যখন দলে দলে মদিনায় পৌঁছিতে লাগিলেন, তখন মদিনার আনসারগণ মক্কাবাসীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেন,) আজ তাহারা— পাঞ্জাবিরা— আমাদের দুয়ারে অতিথি। আমাদের কি উচিত নয় তাহাদের প্রতি একটু (!) সহানুভূতি দেখানো?'— (বিস্ময়বোধক চিহ্ন আমার) তখন আমিই-বা এমন কী দোষ করলুম?

আরবি ভাষায় কুরান শরিফ যখন অবতীর্ণ হলেন তখন সে ভাষার কী রূপ ছিল? সে ভাষা কি 'পাক' পবিত্র ছিল, না পৌত্তলিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল? আমরা জানি লাত, উজ্জা, মনাত প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রশস্তিতে সে ভাষা পরিপূর্ণ ছিল এবং একেশ্বরবাদ বা অন্য কোনও সত্যধর্মের (খ্রিস্ট অথবা ইহুদি) কণামাত্র ঐতিহ্য সে ভাষায় ছিল না।

পক্ষান্তরে আরবদেশে বিস্তর ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিলেন। হজরতের বহুপূর্বেই হিব্রুভাষা তওরিত, ('তোরা' এবং 'ওল্ড টেস্টামেন্ট') বুকে ধরে পবিত্র ভাষারূপে গণ্য হয়েছিল, এবং হিব্রুর উপভাষা আমারমেইকের মাধ্যমে মহাপুরুষ ইসা ইঞ্জিল ('এভানজেলিয়াম' অথবা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট') প্রচার করেছিলেন। কুরান অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে হিব্রুভাষা একেশ্বরবাদের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে, এবং বাইবেল-ভক্ত মাত্রেই জানেন সেই একেশ্বরবাদ, মৃত্যুর পরের বিচার, এর ফলস্বরূপ স্বর্গ অথবা নরক ইত্যাদি ইসলামের মূল বিশ্বাস (নবুওত ব্যতীত) প্রচারের ফলে হিব্রুভাষা সেমিতি ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

তবু কেন সে ভাষায় অবতীর্ণ না-হয়ে কুরান শরিফ পৌত্তলিকের ভাষায় নাজিল হলেন।

এ পরম বিস্ময়ের বস্তু এবং শুধু আমরাই যে আজ বিস্মিত হচ্ছি তা নয়, স্বয়ং মহাপুরুষের আমলেও বিস্ময় বহুমুখে সপ্রকাশ হয়েছিল।

কিন্তু সে বিস্ময়ের সমাধান স্বয়ং আল্লাহ্‌তালা কুরান শরিফে করে দিয়েছেন। পাছে বাংলা অনুবাদে কোনও ভুল হয়ে যায় তাই মৌলানা আব্দুলা য়ুসুফ আলীর কুরান-অনুবাদ থেকে শব্দে শব্দে তুলে দিচ্ছি। আল্লা বলেন,

'Had we sent this as
A Quran (in a language)
Other than Arabic, they would
Have said : 'Why are not
It's verses explained in detail?
What! (a Book) not in Arabic
And (a Messenger) an Arab?'

অর্থাৎ 'আমরা যদি আরবি ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় কুরান পাঠাতুম তা হলে তারা বলত এর বাক্যগুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলা হল না কেন? সে কী! (বই) আরবিতে নয় অথচ (পয়গম্বর) আরব!'

খুদাতালা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, আরব পয়গম্বর সে আরবি ভাষায় কুরান অবতরণের আধার হবেন সেই তো স্বাভাবিক, এবং অন্য যে কোনও ভাষায় সে কুরান পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা তো এর অর্থ বুঝতে পারছিনে।'

www.pathagar.com

কুরানের এই অঙ্গুলিনির্দেশ মতো চললেই বুঝতে পারব ভাষার কৌলিন্য-অকৌলীন্য অত্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন, আসল উদ্দেশ্য ধর্মপুস্তক যেন আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারে। বার বার কতবার কুরানে বলা হয়েছে, 'এ বই খোলা বই', 'এ বই আরবিতে অবতীর্ণ হল' যাতে করে সর্বসাধারণের জন্য এ বই সরল দিগ্‌দর্শক হতে পারে।

'সর্বসাধারণ সনাতন ধর্মের বাণী মাতৃভাষায় বুঝুক' এই মাহাত্ম্য যে কত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বব্যঞ্জক সেকথা আমরা এখনও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পূর্বাচার্যগণ এ বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মজ্ঞান যদি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চার বিলাসবস্তু না হয়ে আপামর জনসাধারণের নিত্য অবলম্বনীয় সখারূপে সপ্রকাশ হতে চায় তবে সে ধর্মশিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। কোনও বিদেশি ভাষা দ্বারা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, মাতৃভাষার সাহায্য নিতেই হবে, তা সে মাতৃভাষা পূতপবিত্রই হোক আর ওছা নাপাকই হোক। এ তত্ত্বটা ইরানের মনীষীরা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদা ইরানে আরবির বহুল প্রচার থাকা সত্ত্বেও 'নাপাক ফারসি' ভাষাকে ধর্মশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় মনীষীরা ঠিক সেই কারণেই এদেশে বিদেশি ফারসি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও 'না-পাক' হিন্দির সঙ্গে আরবি-ফারসি মিলিয়ে উর্দু নির্মাণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের মৌলবি-মাওলানারা সস্তায় কিস্তিমাত করতে চেয়েছিলেন বলেই দেশজ বাংলাকে ধর্মশিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করেননি— উর্দু দিয়ে ফাঁকতালে কাজ সারিয়ে নেবার চেষ্টাতেই ছিলেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে আজ এই খেসারত দিতে হচ্ছে যে 'নিজ বাসভূমে, পরবাসী হওয়ার' মতো নিজ মাতৃভাষায় যে কোনও কিছুরই চর্চা করতে পারেনি। যুক্তপ্রদেশ তথা পাঞ্জাবের মৌলবি-মাওলানাগণ যেরকম মাতৃভাষা উর্দুর সাহায্যে শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন, বাঙালি আলিমগণও যদি বাংলায় সেরকম শাস্ত্রচর্চা করে রাখতেন তা হলে সেই সূত্রপাতের খেই ধরে আজ বাঙালি মুসলমান নানা সাহিত্য নির্মাণ করে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত। এবং যখন দেখি যে বাঙালি আলিমগণ বাংলায় শাস্ত্রচর্চা না করে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখলেন তাঁরাই বাঙালি তরুণকে তার ধর্মশাস্ত্রের অজ্ঞতা নিয়ে তাচ্ছিল্য অবহেলা করেন তখন বিস্ময়ে বাক্যস্ফুরণ হয় না। আপন কর্তব্যচ্যুতি ঢাকবার এই কি সরলতম পন্থা? এবং, তাঁরা এ কথাটাও বুঝলেন না যে, বাঙালি হিন্দু, যেরকম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলাতে অনুবাদ ও প্রচার করার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, তাঁরাও বাংলায় ইসলামি শাস্ত্রের চর্চা করলে বাঙালি মুসলমানের কাছ থেকে সেরকম শ্রদ্ধাঞ্জলি পেতেন।

আবার বলি, এখনও সময় আছে। উর্দু-বাংলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সরল বাংলা (লিসানু-মুবীন) গ্রহণ করবেন, না আবার উর্দু দিয়ে ফোকটে কাজ সারবার তালে থাকবেন?

ধর্মজগতে পোপকে একদা এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর খাস-পেয়ারা লাতিন সর্বদেশের সর্বমাতৃভাষাকে পদদলিত করে—

> পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি—
> ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ী

www.pathagar.com

— করবে, না তিনি লুথারের প্রস্তাবমতো মাতৃভাষায় শাস্ত্রচর্চা করতে দেবেন? পোপ সত্যপথ দেখতে পাননি, তিনি ভুল করেছিলেন। ফলে খ্রিস্টজগৎ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

আজ যদি জোর করে পোপের ভ্রান্তাদর্শ অনুসরণ করে উর্দুওয়ালা পূর্ব পাকিস্তানের স্কন্ধে উর্দু চাপান তবে লুথারের মতো লোক পূর্ব পাকিস্তানে খাড়া হতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পাকিস্তান চান তাঁরা এই কথাটি ভেবে দেখবেন।

ভাষার 'পাকি' 'না-পাকি' সম্বন্ধে আমার শেষ দ্বিধাটি এইবার নিবেদন করি। আমরা যে এত তর্কাতর্কি করছি, কিন্তু নিজের মনকে কি একবারও জিগ্যেস করেছি 'পাকিস্তান' শব্দটির জন্ম কোথায়, সে জাতে 'পাক', না 'নাপাক'? 'পাক' কথাটা তো আরবি নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 'প' (অথবা 'পে') অক্ষরটি আরবি নয়, 'প' অক্ষরটি ফারসি অর্থাৎ প্রাচীন ইরানি, অর্থাৎ অগ্নি-উপাসক কাফিরদের শব্দ, এবং এই জেন্দা-আবেস্তার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত আছে সংস্কৃত 'পক্ক' শব্দ ('পাক্' শব্দটি সংস্কৃত নয়, কিন্তু আবেস্তা ও সংস্কৃত যমজ-ভাষা) এবং 'স্তান' কথাটি যে সংস্কৃত 'স্থানের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেকথাও সকলেই জানেন। দুটি শব্দই আরবি নয়, প্রাচীন ইরানি, এবং প্রাচীন ইরানি বাংলা অপেক্ষা কোনওদিক দিয়ে 'পাক' নয়। ভাষার দিক দিয়ে যদি সত্যই সম্পূর্ণ 'পাক' নাম দিতে হয় তবে তো পাকিস্তানকে 'বয়তুল মুকদ্দাসের' ওজনে 'মুমলকতুল মুকদ্দস' জাতীয় কোনও নাম দিতে হয়।

তাই বলি 'পাক' 'না-পাকের' প্রশ্ন শুধানো ইসলাম-ঐতিহ্য পরিপন্থী। কোনও মানুষকে না-পাক বলে যেমন তাকে কলমা থেকে বঞ্চিত করা যায় না, কোনও ভাষাকে ঠিক তেমনি 'না-পাক' নাম দিয়ে ইসলামি শিক্ষা-ঐতিহ্যের বাহক হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায় না। 'ছুৎ বাই' ইসলামি মার্গ নয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন, কেন্দ্রের চাকরি, কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতাদান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা কতদূর প্রতিবন্ধক হবে-না-হবে সে বিষয়ে আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে করা হয়ে গিয়েছে। বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে আর যেসব ছোটখাটো আপত্তি আছে তার অন্যতম ব্যবসাবাণিজ্য।

উর্দুওয়ালারা বলেন, 'ইংরেজি তাড়িয়ে দিলুম, উর্দু শিখলুম না, তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করব কী করে?'

এর উত্তর এতই সরল যে দেওয়াটা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন। ইংলন্ডের শতকরা ৯৯ জন ফরাসি জানে না, ফ্রান্সের ৯৯.৯ জন ইংরেজি জানে না, তৎসত্ত্বেও ব্যবসা চলে। তার চেয়েও সরল উদাহরণ আছে। মারোয়াড়িরা প্রায় একশো বৎসর ধরে বাংলাদেশ শুষে খাচ্ছে, আমাদের কাফনের কাপড় বিক্রি করে তারা মারোয়াড়ে তিনতলা বাড়ি বানায় কিন্তু সমস্ত মারোয়াড় দেশে বাংলা পড়াবার জন্য একটা স্কুল নেই, কোনওকালে ছিলও না। এসব তো হল খুচরা ব্যবসায়ের কথা। প্রদেশে প্রদেশে, দেশে দেশে ব্যবসায়ের যোগাযোগ হয় বড় বড় কারবারিদের মধ্যস্থতায়। দমস্কসে যে জর্মন ভদ্রলোক সিমেন শুকার্টের কলকব্জা বিক্রয় করতেন তিনি তড়বড় করে আরবি বলতে পারতেন— তাই বলে গোটা জর্মনির পাঠশালা-স্কুলে তো আরবি পড়ানো হয় না।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যে বড় বড় ব্যবসা হবে, সে হবে করাচির সঙ্গে। করাচির ভাষা সিন্ধি— কারবারি মহলে চলে ইংরেজি, সিন্ধি এবং কিঞ্চিৎ গুজরাতি। ব্যবসায়ের জন্য ভাষা শিখতে হলে তো আমাদের সিন্ধি শিখতে হয়।

www.pathagar.com

ব্যবসা যে করে ভাষার মাথাব্যথা তার। শিক্ষাবিভাগ এবং দেশের দায়িত্ব এইটুকু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে তার জন্য সামান্যতম বন্দোবস্ত করে দেওয়া। সেটুকু কেন, তার চেয়ে ঢের বেশি উর্দু আমরা পূর্ব পাকিস্তানে শেখাব। সেকথা পরে হবে।

এ জাতীয় খুঁটিনাটি আরও অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তা হলে মূল বক্তব্যে কখনওই পৌঁছানো যাবে না।

উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বের শেষ সমাধান করতে হলে বিচার-বিবেচনা আবশ্যক যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কী?— আশা করি এ কথা কেউ বলবেন না যে একমাত্র উর্দুর সেবা করার জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ কী সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত দেবার কোনও অর্থ হয় না। নানা গুণী যে নানা মত দিতেছেন তার মাঝখানে একটি সত্যকথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন— সে হচ্ছে এই যে পাকিস্তানকে সর্বপ্রথম সমৃদ্ধবান রাষ্ট্র করতে হবে।

তা হলেই প্রশ্ন উঠবে, সমৃদ্ধশালী হতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি সুপ্তাবস্থায় আছে কোন্‌খানে?

পাকিস্তান তথা ভারত ইউনিয়নের স্বাধীনতা যে সফল হল তার প্রধান কারণ গণআন্দোলন। যতদিন কংগ্রেস বলতে 'স্টেটসমেনের' ভাষায় 'ভদ্রলোক ক্লাস', যতদিন লীগ বলতে রামপুর-ভূপাল খানবাহাদুর-খানসায়েবদের বোঝাত ততদিন ইংরেজ 'স্বরাজ' এবং 'পাকিস্তানের' থোড়াই পরোয়া করেছে। কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে লীগের পশ্চাতে জনসাধারণ এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ লীগ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে সেদিন আর পাকিস্তানের দাবি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের শক্তি প্রয়োগে।

জনসাধারণের সেই শক্তি সেদিন বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। আজ সে শক্তি সুষুপ্ত এবং সেই শক্তি যদি পাকিস্তান গঠনে নিয়োজিত না হয় তবে পাকিস্তান কখনওই পূর্ণাবয়ব, প্রাণবন্ত রাষ্ট্ররূপে দুনিয়ার মজলিসে আসন নিতে পারবে না। মার্কসবাদের মূল সিদ্ধান্ত ঠিক কি না সে আলোচনা এ স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর, ইসলামের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, ইসলাম কোনও বিশেষ বর্ণ, জাতি বা শ্রেণিকে শ্রেষ্ঠত্বের আশীর্বাদ দিয়ে অজরামর করে তুলতে সম্পূর্ণ নারাজ।

যাঁরা ধর্মকে— তা সে ইসলামই হোক্ আর হিন্দুধর্মই হোক— রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালাতে চান তাঁদের উদ্দেশে আমার এস্থানে দু-একটি বক্তব্য আছে। ধর্মে বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ধর্ম যে এ দুনিয়ায় এখনও প্রচণ্ড শক্তির আধার সেকথা অস্বীকার করলে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতি পদে অপ্রত্যাশিত সংকটের সম্মুখে উপস্থিত হব। এই যে আমরা বার বার শুনতে পাই ইয়োরোপ নাস্তিক, ইয়োরোপীয় রাজনীতি ধর্মকে উপেক্ষা করে চলে, সে কথাটা কতদূর সত্য? ফ্রান্স-জর্মনিতে এখনও ক্রিশ্চান পার্টিগুলো কতটা শক্তি ধারণ করে সেকথা সবচেয়ে বেশি জানেন কম্যুনিস্টরা। ক্রিশ্চান ডেমোক্রেট, ক্যাথলিক সেন্টার এদের অবহেলা করে কোনও ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন চালানো এখনও ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালিতে অসম্ভব। এই তো সেদিন রাজনীতি-ক্ষেত্রে এখনও পোপের কত ক্ষমতা সেটা ধরা পড়ল ইতালির গণভোটে। পোপ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ যেদিন সশরীরে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আসরে নামলেন সেদিন কমরেড তল্লাত্তি প্রমাদ গুনলেন। শেষরক্ষার জন্য ধর্মহীন তল্লাত্তিকে পর্যন্ত বলতে হল, ভবিষ্যৎ ইতালীয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, বিষয়-আশয়ে কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না, এযাবৎ তাঁরা যেসব সুখসুবিধা উপভোগ করে আসছেন তার সবকটাই তাঁরা নিশ্চিত মনে উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু এ শ্মশান-চিকিৎসায়ও ফল হল না, তল্লাত্তির নির্মম পরাজয়ের কথা সকলেই জানেন। পোপ এই ভোট-মারে নেবে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, আমাদের শুধু এইটুকুই দেখানো উদ্দেশ্য যে ধর্ম এখনও বহু শক্তি ধারণ করে।

মৃত্যুর পর বেহেশত বা মোক্ষ দান করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিশেষত ইসলাম সংসারের সর্বস্ব ত্যাগ করে গুহা-গহ্বরে বসে নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করার ঘোরতর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে। আল্লাতা'লা কুরান শরিফে বার বার বলেছেন যে এই সংসারে তিনি নানারকম জিনিস মানুষকে দিয়েছেন তার আনন্দ বর্ধনের জন্য। তাই মুসলিম মাত্রই প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু, ইহলোকে আমাদের শুভ হোক, পরলোকে আমাদের শুভ হোক।' এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ইহলোকের মঙ্গল অতীব কাম্য, তাই প্রশ্ন ওঠে পার্থিব বস্তু কোন পদ্ধতিতে উপভোগ করব যাতে করে অমঙ্গল না হয়?

তাই বিশেষ করে ইসলামই পার্থিব বস্তুর ভাগবাটোয়ারা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কুরান শরিফ বার বার ধনবন্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন, এবং সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেন।

মহাপুরুষ মুহম্মদের (স.) সঙ্গে মক্কাবাসীদের দ্বন্দ্ব হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পার্থিব বস্তুর নবীন বন্টনপদ্ধতি নিয়ে। 'সাইল' অর্থ ভিখারি নয়, 'সাইল' বলতে আজকাল আমরা ইংরেজিতে 'হ্যাভ নট' বাক্যে যা বুঝি তাই। 'সাইলকে বিমুখ করো না' এই আদেশ মক্কার ধনপতিগণ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হয়নি, অথচ এই নবীন পদ্ধতি দুস্থ নিপীড়িত বিত্তহীনদের প্রাণে নতুন আশার বাণী এনে দিয়েছিল। ফলে দেখতে পাই মহাপুরুষের প্রথম শিষ্যদের ভেতর বিত্তহীন ও দাসের সংখ্যা বেশি।

ইহকাল-পরকালের মঙ্গল আদর্শ নিয়ে এই যে আন্দোলন সৃষ্ট হল তার বিজয় অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে আপন স্থান করে নিয়েছে— কিন্তু সে ইতিহাস আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটুকু দেখাতে চাই, মহাপুরুষের চতুর্দিকে যে বিরাট আন্দোলন ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হল সে আন্দোলন গণআন্দোলন। মহাপুরুষ যে নবীন আন্দোলন সফল করে তুললেন সে এই জনগণের সাহায্যে।

আজ পাকিস্তান যে বিরাট আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আন্দোলন জনগণ দিয়েই গঠিত হবে। এ আন্দোলনে থাকবে নতুন ধনবন্টন পদ্ধতি, নতুন ধনার্জন পন্থা, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক নির্বাচনপন্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য নির্মাণপ্রচেষ্টা— এককথায় প্রাচীন শোষণনীতি সমূলে উৎপাটন করে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ বিকাশ।

কিন্তু যদি জনগণ এ আন্দোলনে অংশীদার না হয় তবে সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হবে। জনসাধারণ যদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে এবং না বুঝতে পেরে আপন প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয়, অথবা প্রয়োজনমতো স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত না হয় কিংবা ধনপতিদের উৎকোচে বশীভূত হয়, অথবা দু চার আনা মজুরি বৃদ্ধিতেই যদি বৃহত্তর স্বার্থকে ত্যাগ করে তবে সম্পূর্ণ আন্দোলন নিষ্ফল হবে।

www.pathagar.com

এবং এস্থলে আমার কণ্ঠে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে আমি চিৎকার করে বলতে চাই, মাতৃভাষা বাংলার সাহায্য বিনা জনসাধারণকে এই বিরাট আন্দোলনের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে সচেতন এবং ওয়াকিবহাল করা যাবে না, যাবে না, যাবে না।

উর্দুওয়ালারা বলবেন, উচ্চশিক্ষা উর্দুর মাধ্যমিকে দেব বটে কিন্তু শিক্ষিতেরা কেতাব লিখবেন বাংলায়।

আমার বক্তব্য, ঠিক ওই জিনিসটেই হয় না, কখনও হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাই, ইংরেজ আমাদিগকে কখনও ইংরেজি বই লিখতে বাধ্য করেনি, তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গত একশত বৎসর ধরে যত উত্তম উত্তম ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, দর্শন সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে তার শতকরা ৯৫ খানা ইংরেজিতে কেন? জ্ঞানচর্চা করব এক ভাষায় আর তার ফল প্রকাশ করব অন্য ভাষায়, এই বন্ধ্যা-প্রসব কখনও কস্মিনকালেও হয় না। মানুষ যখন আপন মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করতে শেখে তখনই সে মাতৃভাষায় লিখতে শেখে।

অর্থাৎ ইংরেজি আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে। একদল উর্দুশিক্ষিত লোক উর্দুতে লেখাপড়া শিখবেন, বড় বড় নোকরি করবেন, বহিরাগত উর্দুভাষীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, আর বাদবাকি আমরা চাষাভুষো পাঁচজন যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকব।

তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিই হজরতের চতুর্দিকে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরে যে রাষ্ট্র-সংগঠন অভিযান আরম্ভ হয়েছিল তার মাধ্যমিক ছিল আপামর জনসাধারণের ভাষা— আরবি। বিদগ্ধ হিব্রুকে তখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল।

উর্দুওয়ালারা বলবেন— বাংলা জানলেই কি সব বাংলা বই পড়া যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বাংলা চালাই, এবং ফলে যদি সকল রকমের বই-ই বাংলাতে লেখা হয় তা হলেই কি আপামর জনসাধারণ সেসব বই পড়তে পারবে?

উত্তরে বলি, সকলে পারবে না, কিন্তু অসংখ্য লোক পারবে।

আমি যে শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছি তাতে দেশের শতকরা নব্বুইজন মাইনর, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়বে। এবং সে মাইনর-ম্যাট্রিকের শিক্ষাদান অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ের হবে। ইংরেজি বা উর্দুর জন্য জান পানি করবে না বলে তারা অতি উত্তম বাংলা শিখবে এবং ইংলন্ড, ফ্রান্স, মিশর, ইরানে যেরকম সাধারণ শিক্ষিত লোক মাতৃভাষায় লেখা দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক পড়তে পারে, এরাও ঠিক তেমনি দেশের উন্নততম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। দেশের তাবৎ লোকই যে উত্তম উত্তম পুস্তক পড়বে সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়— কারণ সকলেই জানেন জ্ঞানতৃষ্ণা কোনও বিশেষ শ্রেণি বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, এমনকি উচ্চশিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার ওপরও সে জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে না; কত বিএ, এমএ, পরীক্ষা পাসের পর চেকবই ছাড়া অন্য কোনও বইয়ের সন্ধানে 'সময় নষ্ট' করেন না, আর কত মাইনরের ছেলে গোগ্রাসে যা পায় তাই গেলে— কিন্তু মাতৃভাষা দেশের শিক্ষাদীক্ষার বাহন হলে কোনও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু অল্প চেষ্টাতেই দেশের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এর সত্যতা সপ্রমাণ হয় আরেকটি তথ্য থেকে— ইয়োরোপের বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক-আবিষ্কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না-করেও যশস্বী সৃষ্টিকার হতে সমর্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

তাই দেখতে হবে, মাতৃভাষার যে নির্ঝরিণী দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ, সেই নির্ঝরিণীই যেন বিশাল এবং বিশালতর হয়ে বিশ্ববিদ্যার অগাধ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়। মাঝখানে ইংরেজি বা উর্দুর দশ হাত শুকনো জমি থাকলে চলবে না।

বিশেষ করে উর্দুওয়ালা মৌলবি-মৌলানাদের একথাটি বোঝা উচিত। বাংলাতে ধর্মচর্চা না করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিম ধর্মের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ছাপা বই দেখলেই সে ভয়ে ভক্তিতে বিমূঢ় হয়ে যায়— তা সে গুল-ই-বাকাওলির কেচ্ছাই হোক আর দেওয়ান-ই-চিরকিন্‌ই হোক। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার জন্য তাকে শেখাতে হবে :

১। ইসলামের ইতিহাস[২] এবং বিশেষ করে শেখাতে হবে এই তথ্যটা যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব। আব্বাসি-ওম্মাই যুগের ভেতর দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি যে রূপ নিয়েছে সে রূপ পূর্ব পাকিস্তানে আবার নেবে না। অথচ ইসলামের গণতন্ত্রের খুঁটি এবং ধনবণ্টনে সমতার নোঙর জোর পাকড়ে ধরে থাকতে হবে।

২। শত শত বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করে ইয়োরোপ যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, মিশর দমস্ক আজ তাই শিখতে ব্যস্ত। প্রাচীন ঐতিহ্য যেরকম প্রশ্ন জিগ্যেস না করে গ্রহণ করা যায় না, ইয়োরোপীয় কর্ম এবং চিন্তাপদ্ধতি ঠিক সেইরকম বিনা-বিচারে গ্রহণ করা চলবে না।

৩। ইসলাম আরবের বাইরে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তথাকার দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলাকে গ্রহণ করে নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। ইরানের সুফিতত্ত্বের যশ কোন দেশে পৌঁছয়নি? তাজমহল এই করেই নির্মিত হয়েছে, উর্দু ভাষা এই পদ্ধতিতেই গড়ে উঠল, খেয়াল গান এই করেই গাওয়া হল, মোগল ছবি এই করেই পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভারতীয় ঐতিহ্য নগণ্য নয়, অবহেলনীয় নয়। পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের বংশধরগণ যেদিন নবীন রাষ্ট্রে আসন গ্রহণ করে সভ্যতা-কৃষ্টি আন্দোলনে যোগ দেবেন সেদিনই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থহীন তিক্ততার অবসান হবে। (এস্থলে অবান্তর হলেও বলি ঠিক, তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের অবহেলা করেও সে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না।) একথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে মামুন, হারুনের সময় যখন আরবেরা জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ঠিক তখনই তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে 'চরক' 'সুশ্রুত' 'পঞ্চতন্ত্র' আরবিতে অনুবাদ করেছিল, গজনির মাহমুদের আমলে ঐতিহাসিক আল-বিরুনি কী বিপুল পরিশ্রম করে সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছিলেন।

আরবেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় সভ্যতার অনুসন্ধানে এদেশে এল। আর আজ পূর্ব পাকিস্তানের লোক বাংলাভাষার গায়ে বৈষ্ণব নামাবলী দেখে ভড়কে যাচ্ছে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌?

---

২. পাকিস্তানকে theocratic রাষ্ট্র করার কথা উঠছে না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের নামে যে রাজনৈতিক ধাপ্পা, অর্থনৈতিক শোষণ চলে তার শেষ কোনওদিনই হবে না, যতদিন-না দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভারতীয় ইউনিয়ন সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযোজ্য :

www.pathagar.com

কত গবেষণা, কত সৃজনশক্তি, কত শাস্ত্রাশাস্ত্র বর্জন গ্রহণ, কত গ্রন্থ নির্মাণ, কত পুস্তিকা প্রচার, কত বড় বিরাট, সর্বব্যাপী, আপামর জনসাধারণ সংযুক্ত বিরাট অভিযানের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান!

এর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যোগাবে কে?

প্রধানত সাহিত্যিকগণ। এবং আমি বিশেষ জোর দিয়ে জানাতে চাই, সে সাহিত্য-সৃষ্টি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষাতে হতে পারে না।

আবার ইতিহাস থেকে নজির সংগ্রহ করি।

ফ্রান্স এবং ইংলন্ডে আঠারো মাইলের ব্যবধান। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ইংরেজ প্যারিসে বেড়াতে আসে। বায়রন-শেলি উত্তম ফরাসি জানতেন কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত তো একজন ইংরেজ ফরাসি-সাহিত্যে নাম অর্জন করতে পারেননি, আজ পর্যন্ত একজন ফরাসি ইংরেজি লিখে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। অথচ বাংলা-উর্দুতে যে পার্থক্য, ফরাসি-ইংরেজিতে পার্থক্য তার চেয়ে ঢের কম। ফ্রেডরিক দি গ্রেটের যুগে বার্লিন এবং ভিয়েনার শিক্ষিত লোকমাত্রই ফরাসি চর্চা করত (আমরা যতটা ইংরেজি করি তার চেয়ে ঢের বেশি), কিন্তু তবুও তো একজন জর্মন ভাষাভাষী ফরাসি লিখে নাম করতে পারেননি। তুর্গেনিয়েফ, তলস্তয়ের আমলে রুশ অভিজাত মাত্রই ফরাসি গভর্নেসের হাতে বড় হতেন, বাল্যকাল হতে ফরাসি লিখতেন (তলস্তয়ের রুশ-পুস্তকে যে পরিমাণ পাতার পর পাতা সির্ফ ফরাসি লেখা আছে সেরকম ইংরেজি-ভর্তি বাংলা বই আমাদের দেশে এখনও বেরোয়নি) কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন রুশ ফরাসিতে সার্থক সৃষ্টিকার্য করতে পারেননি।

অত দূরে যাই কেন? সাতশো বৎসর ফারসির সাধনা করে ভারতবর্ষের সাহিত্যিকেরা এমন একখানা বই লিখতে পারেননি যে বই ইরানে সম্মান লাভ করেছে। যে গালিব আপন ফারসির দম্ভ করতেন তাঁর ফারসি কবিতা ইরানে অনাদৃত, অপাঙ্‌ক্তেয়, অথচ মাতৃভাষায় লেখা তাঁর উর্দু কবিতা অজর অমর হয়ে থাকবে।

আরও কাছে আসি। মাইকেলের মতো বহুভাষায় সুপণ্ডিত দ্বিতীয় বাঙালি এদেশে জন্মাননি। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনও বাঙালি তাঁর মতো ইংরেজি লিখতে পারেননি, তবু দেখি আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনিও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এতটুকু আঁচড় কেটে যেতে পারেননি। অথচ অল্পায়াসে লেখা তাঁর 'মেঘনাদ' বাংলা সাহিত্য থেকে কখনও বিলুপ্ত হবে না।

আরও কাছে, একদম ঘরের ভেতর চলে আসি। লালন ফকিরও বলেছেন, 'ঘরের কাছে পাইনে খবর/খুঁজতে গেলেম দিল্লি শহর।' পূর্ব পাকিস্তানের আপন ঘরের মৌলবি-মৌলানারা যে শত শত বৎসর ধরে আরবি, ফারসি এবং উর্দুর চর্চা করলেন, এসব সাহিত্যে তাঁদের অবদান কী? গালিব, হালি, ইকবালের কথা বাদ দিন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন দুসরা দরজার উর্দুকবি দেখাতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব।

মৌলবি-মৌলানাদের যে কাঠগড়ায় দাঁড় করালুম তার জন্য তাঁরা যেন আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন। নওজোয়ানরা তাঁদের শ্রদ্ধা করুক আর না-ই করুক, আমি তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের ('হিন্দুস্তানের') বহু মৌলবি-মৌলানার সংস্রবে এসে আমার এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের আলিম সম্প্রদায় শাস্ত্রচর্চায় তাঁদের চেয়ে কোনও অংশে কম নন। যেখানে সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষা নিয়ে

www.pathagar.com

কারবার— যেমন মনে করুন আরবি— সেখানে পূর্ববঙ্গের আলিম অনেক স্থলেই 'হিন্দুস্তানের' আলিমকে হার মানিয়েছেন কিন্তু উর্দুতে সাহিত্যসৃষ্টি তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যে স্পর্শকাতরতা, সূক্ষ্মানুভূতি, হৃদয়াবেগ মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে সেসব তাঁদের আছে কিন্তু উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা নয় বলে তাঁদের সর্বপ্রচেষ্টা পঙ্গু, আড়ষ্ট ও রসবর্জিত হয়ে যে রূপ ধারণ করে তাকে সাহিত্য বলা চলে না। বিয়ের 'প্রীতি উপহারেই' তার শেষ হদ্।

অথচ দেখি, অতি যৎসামান্য আরবি-ফারসির কল্যাণে কাজী নজরুল বাংলা সাহিত্যে কী অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করলেন। মুসলমানও যে বাংলাতে সফল সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে সে তথ্য একা কাজী সাহেবই সপ্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাই পুনরায় বলি, মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ কখনও কোনও দেশে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি। আজ যদি আমাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা উর্দু স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবমান হয় তবে তার চরম অবসান হবে অনুর্বর মরুভূমিতে। সমস্ত ঊনবিংশ ও এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রগতির দিকে ছুটে চলল; অর্থাভাবে, শিক্ষার অভাবে, দুঃখের তাড়নায় বাঙালি মুসলমান সে কাফেলাকে এগিয়ে যেতে দেখল কিন্তু সঙ্গী হতে পারল না। এখনও কি সময় হয়নি যে সে তার সৃজনশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়?

অথচ দেখি, অশিক্ষিত চাষা এবং অর্ধশিক্ষিত মুন্সিমোল্লা আপন সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের লোকসাহিত্য যখন বিশ্বজনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল তখন দেশে-বিদেশে বহু রসিকজন তার যে প্রশংসা করলেন সে প্রশংসা অন্য কোনও দেশের লোকসাহিত্যের প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়নি। ভাষার বাজারে বহু বৎসর ধরে এ অধম বড় বড় মহাজনদের তামাক সেজে ফাই-ফর্মাস খেটে দিয়ে তাঁদের আড়তের সন্ধান নিয়েছে, এবং সে হলপ খেয়ে বলতে প্রস্তুত, লোকসাহিত্যের ফরাসি, জর্মন, ইতালি, ইংরেজি আড়তের কোনওটিতেই পূর্ববঙ্গ লোকসাহিত্যের মতো সরেস মাল নেই।

আমাদের ভাটিয়ালি মধুর কাছে ভল্‌গার গান চিটেগুড়— হাসন রাজা, লালন ফকির, সৈয়দ শাহনূরের মজলিশে এসে দাঁড়াতে পারেন এমন একজন গুণীও ইয়োরোপীয় লোকসাহিত্য দেখাতে পারবে না।

অথচ কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ, পূর্ববঙ্গের মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় কিছুই রচনা করতে পারলেন না! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত বলতে বোঝাত উর্দুসেবীগণ, তার পরের দুঃখ-দৈন্যের ইতিহাস তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। কাজেই যাঁরা শত শত বৎসর ফারসি এবং উর্দুর সেবা করে কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি, অন্তত তাঁদের মুখে একথা শোভা পায় না যে বাঙালি মুসলমান বাংলা সাহিত্যের সেবা করে সে ভাষাকে আপন করে নিতে পারেনি।

কিন্তু কার দোষ বেশি, আর কার দোষ কম সেকথা নিয়ে এখানে আর আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকু নিবেদন করি : যে দেশের চাষি-মাঝি ভুবনবরেণ্য লোকসঙ্গীত রচনা করতে পারল সেদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সফল সাহিত্য রচনা করতে পারবে না একথা কি কখনও বিশ্বাস করা যায়? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে কিন্তু না বলে উপায় নেই, তাই অতি সবিনয় নিবেদন করছি, খুদাতা'লা এ অধমের জন্য বহু দেশে রুটি

www.pathagar.com

রেখেছিলেন। আরব, মিশর, আফগানিস্তান, ফ্রান্স, জর্মনি প্রভৃতি নানা দেশে নানা পণ্ডিত নানা সাহিত্যিকের সেবা করে এ অধমের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে, পূর্ববঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির যে উপাদান আছে এবং পূর্ববঙ্গবাসীর হৃদয়মনে যে সামান আছে তার বদৌলতে একদিন সে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করবে।

সোয়া চার কোটি মানুষ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বহুশত বৎসর ধরে তাদের আতুর হিয়া প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে; কখনও ফারসি, কখনও উর্দুর মরুপথে তাদের ফল্গুধারা উষ্ণবাষ্পে পরিণত হয়ে গিয়েছে, আজ সেসব হৃদয় শুধু মর্মবাণীরই সন্ধানে নয়, আজ নবরাষ্ট্র নির্মাণের প্রদোষে তারা ওজস্বিনী ভাষায় দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়।

হাঙ্গেরির জাতীয় সঙ্গীতে আছে :

দেশের দশের ডাক শোনা ওই ওঠো ওঠো মাডিয়ার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হল না আর।

আমি বলি :

দেশের ভাষার ডাক শোনো ওই হে তরুণ বাংলার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হল না আর।

এই বিরাট সাহিত্য নির্মাণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি তরুণ যেন সাহস না হারায়। সে যেন না ভাবে যে উর্দু গ্রহণ করলে তার সব মুশকিল আসান হয়ে যেত। সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান বাবদে ইংরেজি ঢের বেশি মুশকিল আসান। উর্দুতে আছে অল্পবিস্তর মসলা-মাসাইলের কেতাব, এন্তার দোয়া-দরুদের বই। তুমি যে রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছ তার মালমসলা উর্দুতে যা পেতে সে জিনিস সৃষ্টি করতে তোমার পাঁচ বছরও লাগবে না। ইরান দেশ যেরকম একদিন ইরানি সভ্যতা নির্মাণ করে ফিরদৌসি, রুমি, হাফিজ, সাদি, খৈয়ামের জন্ম দিয়েছিল সেই রকম তুমিও সম্মুখে আদর্শ রাখবে পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন সভ্যতা গড়বার। ইরান আরবি এবং ফারসি দুই মিলিয়ে তার সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়েছিল, তুমি আরবি, বাংলা, ফরাসি, সংস্কৃত, উর্দু, ইংরেজি মিলিয়ে ব্যাপকতর এবং মধুর সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে।

অন্যান্য সম্প্রদায় যেন অযথা ভয় না পান। বৌদ্ধচর্যাপদের সূতিকাগৃহে যে শিশুর জন্ম, বৈষ্ণবের নামাবলী যে শিশুর অঙ্গে বিজড়িত, আরবি-ফারসির রুটি-গোস্ত যে শিশু বিস্তর খেয়েছে, 'গীতাঞ্জলি'র একেশ্বরের বন্দনা গেয়ে গেয়ে যে শিশু যৌবনে পৌঁছল, সে যুবক ইসলামের ইতিহাস চর্চা করলে কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। রাধাকৃষ্ণন, সুরেন দাশগুপ্ত যেসব দর্শনের কেতাব ইংরেজিতে লিখেছেন তাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে; মার্গোলিয়াত মুইর ইসলাম সম্বন্ধে যেসব গ্রন্থ ইংরেজিতে লিখেছেন তাতেও বিস্তর আরবি শব্দ আছে, তাই বলে ইংরেজি ভাষার জাত যায়নি। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে পরিমাণ যদি পুনরায় কাজে লাগে তা হলে আপত্তি কী? 'আলালের ঘরের দুলাল'ও তো বাংলা বই।

রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে সে যুগে গোঁড়া হিন্দুরা প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় যে

www.pathagar.com

নবচেতনার উৎপত্তি হয়েছিল তখনকার বিদগ্ধ (প্রধানত ব্রাহ্মণ) সমাজ সেটাকে গ্রহণ করতে চাননি, এবং রবীন্দ্রনাথ সনাতন ঐতিহ্যপন্থী নন বলে তাঁকে পর্যন্ত সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। আজ এসব সংগ্রামের কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যে এখন যদি মুসলিম-সংস্কৃতির (এবং সেইটেই যে তার একমাত্র প্রচেষ্টা হবে তা-ও নয়) আলোচনা হয় তা হলে বিচক্ষণ লোক বিভীষিকা দেখবেন না।

আমার মতো অজ্ঞ লোককে বহু হিন্দু-মুসলমান যখন বাংলাতে মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনুরোধ জানিয়ে থাকতে পারেন তখন যোগ্যজন এ কর্মে নিয়োজিত হলে যে বহুলোক তাঁকে আশীর্বাদ করবেন তাতে আর কী সন্দেহ?

পূর্ব পাকিস্তানে তা হলে উর্দুর স্থান কোথায়?

প্রথমত বলে রাখা ভালো যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার শিক্ষাপদ্ধতির কোনও তুলনাই হতে পারে না। উপস্থিত দেখতে পাই, স্কুলে চার বৎসর এবং কলেজে চার বৎসর একুনে আট বৎসর পড়েও সাধারণ ছাত্র চলনসই আরবি বা সংস্কৃত শিখতে পারে না। কাজেই যখন বলি উর্দু অপ্‌শনাল ভাষা হিসেবে ম্যাট্রিকের শেষের চার শ্রেণিতে পড়ানো হবে তখন উর্দুওয়ালারা যেন না-ভাবেন যে, ছাত্রদের উর্দু-জ্ঞান আমাদের গ্রাজুয়েটদের ফারসি-জ্ঞানেরই মতো হবে। কলেজেও উর্দুর জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকবে। একথা ভুললে চলবে না যে পাকিস্তানের কলেজে 'ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি' নামক এক বিশেষ বিষয়বস্তু পড়ানো হবে। মোগল স্থাপত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত যেরকম সকলেরই গর্বের বিষয় (কোনও ইংরেজ বা মার্কিন যখন তাজমহলের প্রশংসা করে তখন কোনও হিন্দু তো তাজমহল মুসলমানের সৃষ্টি বলে নিজেকে সে দায় থেকে মুক্ত করেন না, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে কোনও বাঙালি মুসলমানকে 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু' বলে নতশির হতে তো দেখিনি; অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলীতে ছবি আঁকেন, তাঁর শিষ্য নন্দলাল অজন্তা শৈলীতে, তাই বলে একথা কারও মুখে শুনিনি যে নন্দলাল গুরুর চেয়ে বড় চিত্রকর) ঠিক তেমনি উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শ্লাঘার সম্পদ। যেসব ছাত্র ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব অথবা আরবি-ফারসি সাহিত্য অধ্যয়ন করবে তাদের বাধ্য হয়ে উর্দুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। বেশিরভাগ রাজনৈতিক এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে জানেওয়ালা সদস্য এইসব বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রজীবনে সংযুক্ত থাকবেন বলে উর্দুর সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট পরিচয় হবে। যাঁরা ভাষা ব্যাপারে অসাধারণ মেধাবী তাঁরা হয়তো করাচিতে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দেবেন কিন্তু অধিকাংশ সদস্যকে কেন বাংলাতেই বক্তৃতা দিতে হবে এবং সেজন্য যে 'অসুবিধা' হবে সেটা কী করে সরাতে হবে তার আলোচনা প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই সবিস্তর করেছি।

কেন্দ্রের চাকরি সম্বন্ধে বক্তব্য, যেদিন পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তান থেকে ইংরেজি অন্তর্ধান করবে সেদিন পাঞ্জাবি মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রকারে চাকরি করবে পূর্ব পাকিস্তানের লোক ঠিক সেই প্রকারেই কেন্দ্রে চাকরি করবে। এবং একথা তো কেউ অস্বীকার করবেন না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে আমরা আরবি-ফারসির ভেতর দিয়ে উর্দুর সঙ্গে যুক্ত আছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়েও থাকব, কিন্তু পাঞ্জাবি-সিন্ধির সেরকম বাংলার সঙ্গে যুক্ত

হওয়ার কোনও ঐতিহ্য নেই। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা হারব কেন? কিন্তু এ বিষয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। উর্দুওয়ালারাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সকল অবস্থাতেই বাঙালির জন্য করাচিতে ওয়েটেজ থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ং উর্দুওয়ালারাই মেনে নিচ্ছেন যে আমরা প্রাণপণ উর্দু শিখলেও পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দুভাষাভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারব না। তাঁদের এই মেনে নেওয়াটা খুব সম্ভব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। আমরাও বলি, আমাদের আলিম-ফাজিলগণ যখন উর্দুতে যুক্তপ্রদেশের মৌলবিগণকে পরাজিত করতে পারেননি, তখন আমাদের মতো 'তিফ্‌লে মক্‌তব্', 'কমসিনদের' দিয়ে কোন জঙ্গ-ই-জবান্ জয় সম্ভবপর?

এ সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। পরাধীন এবং অনুন্নত দেশেই চাকরি নিয়ে মাথা ফাটাফাটি খুন-রেজি। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কৃষি-খনিজ, দুগ্ধ-ঘৃত উৎপাদন করে যে দেশ সমৃদ্ধশালী সে-দেশে চাকরি করে অল্প লোক, তাদের সম্মানও অনেক কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ অঙ্গুলি নির্দেশ করি চাটগাঁয়ের দিকে। পাকিস্তান হয়েছে মাত্র এক বছর— এর মাঝেই শুনতে পাই চাটগাঁয়ের কোনও কোনও বড় সরকারি কর্মচারী নোকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। দেশ সমৃদ্ধশালী হলে কটা লোক বিদেশ যায়, তা-ও আবার চাকরির সন্ধানেই? দেশের ভেতরেই দেখতে পাই, যে বৎসর খেত-খামার ভালো হয় সে বৎসরে শহরে বাসার চাকরের জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

মুসলিম ঐতিহ্যও চাকরির প্রশংসা করেনি, প্রশংসা করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। ইসলাম দেশদেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করেছে ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতায় এবং সদাগরদের ধর্মানুরাগে। এখনও মধ্য-আফ্রিকায় ক্রিশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে হাতির দাঁতের ব্যবসায়ী মুসলমান সদাগরেরা। ক্রিশ্চান মিশনারিরা সবাই মাইনে পায়, তারা চাকুরে। তাদের দুঃখের অন্ত নেই যে তারা সদাগরদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ কী সে সম্বন্ধে বিচার করার সময় উর্দুওয়ালারা একটা ভয়ঙ্কর জুজুর ভয় দেখান। তাঁরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ না করে তবে সে পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারই সুযোগে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানটিকে বিনা নুন-লঙ্কায় কপাৎ করে গিলে ফেলবে।

ভারতীয় ইউনিয়নে এবং পাকিস্তানে লড়াই হবে কি না, হলে কবে হবে এ আলোচনায় এত 'যদি' এবং 'কিন্তু' আছে যে সে আলোচনা যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু না হয়ে ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীর জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফলিত জ্যোতিষ জানিনে, উপস্থিত আমরা ধরে নিচ্ছি যে লড়াইটা লাগবে, কারণ সেটা ধরে না নিলে জুজুর ভয় ভাঙানো যাবে না। অন্ধকার ঘরে বাচ্চা ছেলেকে 'ভূত নেই' বললে তার ভয় যায় না, বরঞ্চ ভূত মেনে নিলেও আপত্তি নেই, যদি সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালানো হয়। তাই আলোর সন্ধানই করা যাক।

কে মিত্র, কে শত্রু সে কি ভাষার ওপরই নির্ভর করে? আমেরিকা, ফ্রান্স, রুশ লড়ল জর্মন, ইতালির বিরুদ্ধে। আমেরিকা, ফ্রান্স এবং রুশ তাই বলে কি একই ভাষায় কথাবার্তা কয়, না জর্মনি ইতালির ভাষাই-বা এক? আজ বলছি রুশের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা মার্কিন সাহায্য। আজ যদি উর্দুওয়ালাদের কায়দায় ফ্রান্সকে বলা হয়, তোমরা যদি ইংরেজি গ্রহণ না কর তবে তোমরা আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং রুশ ফ্রান্সটিকে বিনা মাস্টার্ডে কপাৎ করে গিলে ফেলবে, তা হলে কি ফ্রান্সের লোক মাতৃভাষা বর্জন করে মাথায় গামছা বেঁধে ইংরেজি শিখতে লেগে যাবে?

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে এক ভাষা হলেই তো হৃদ্যতা চরমে পৌঁছয় না। আমেরিকা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই লড়েছিল তখনও সে ইংরেজি বলত। আইরিশমেনের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাই বলে সে কি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েনি? পশতুভাষী মুসলিম পাঠানের একদল লড়ল সুভাষচন্দ্রের ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে জাপানের হয়ে, আরেকদল লড়ল ইংরেজের ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে তাদের হয়ে।

তার চেয়েও ভালো উদাহরণ আছে আরবদেশে। আরবের লোক কথা বলে আরবি ভাষায়, তারা সকলেই এক এক গোষ্ঠীর লোক (একবর্ণ), তারা সকলেই মুসলিম অথচ আজ সে দেশ (১) ইরাক, (২) সিরিয়া, (৩) লেবানন, (৪) ফিলিস্তিন, (৫) ট্রান্স-জর্ডন, (৬) সউদি আরব, (৭) ইয়েমেনে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত (এগুলো ছাড়া আরবি-ভাষাভাষী মিশর, টুনিস, আলজেরিয়া, মরক্কোও রয়েছে)।

এই সাত রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কষাকষির অন্ত নেই। ইবনে সউদ এবং মক্কার শরিফের মধ্যে যে লড়াই হয়েছিল সে তো আমাদের সকলেরই স্পষ্ট মনে আছে। তার জের এখনও চলছে আমির আব্দুল্লা এবং ইবনে সউদের শত্রুতার মধ্যে। আজ যে ফিলিস্তিন অসহায় হয়ে ইহুদির হাতে মার খাচ্ছে তার প্রধান কারণ এই যে ইবনে সউদ আর আব্দুল্লার মধ্যে ঠিক ঠিক মনের মিল হচ্ছে না। আরব লিগের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে— অথচ সকলেই জানেন যে উপযুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝাওতা হয়ে গেলে দশদিনের ভেতর ইহুদিদের রাজ্যলিপ্সা 'ফি নারি জাহান্নামে' পাঠানো সম্ভবপর হবে।

পক্ষান্তরে সুইজারল্যান্ডে তিনটি (চতুর্থটির লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম) ভাষা, বেলজিয়ামে দুইটি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় দুইটি, যুগোশ্লোভাকিয়ায় গোটা চারেক, কানাডায় দুইটি ইত্যাদি ইত্যাদি। সুইজারল্যান্ডের দৃষ্টান্ত বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। সেদেশের প্রধান দুই অংশ জর্মন এবং ফরাসি বলে। বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের ভাষা সাধারণত রপ্ত করতে পারে না (ভাষা শেখা বাবতে সুইস্‌রা বড়ই কাহিল), অথচ ফ্রান্স এবং জর্মনিতে যখন লড়াই লাগে তখন ফ্রেঞ্চ সুইস্‌রা একথা কখনও বলেনি যে তারা ফ্রান্সের হয়ে লড়বে, জর্মন সুইস্‌রাও অনুরূপ ভয় দেখায়নি। গত যুদ্ধে দু জনে মিলে নিরপেক্ষ ছিল এবং হিটলার জানতেন যে সুইস-জর্মন যদিও তাঁর জাতভাই, তবু তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

তাই বলি unity (ঐক্য) ও uniformity (সমতা) এক জিনিস নয়। সমতা হলেই ঐক্য হয় না। আর যারা সমতা চায় তাদের জেদ-বয়নাক্কার অন্ত নেই। আজ তারা বলবে ভাষায় সমতা চাই, পূর্ব পাকিস্তান উর্দু নাও; কাল বলবে পোশাকের সমতা চাই, শেলওয়ার কুর্তা পাগড়ি পরো; পরশু বলবে খাদ্যের সমতা চাই, মাছ-ভাত ছেড়ে গোস্ত-রুটি ধরো; তার পরদিন বলবে নৌকা বদ্‌খদ্ জিনিস, তার বদলে গরুর গাড়ি চালাও। তার পর যদি একদিন পূর্ব পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের বলে, দৈর্ঘ্যের সমতা হলে আরও ভালো হয়, লড়াইয়ের জন্য ইউনিফর্ম বানাতে তা হলে সুবিধে হবে, কিন্তু তোমরা বড্ড উঁচু, তোমাদের পায়ের অথবা মাথার দিকের ইঞ্চি তিনেক কেটে ফেল, তা হলেই হয়েছে!

ঐক্য বা ইউনিটি অন্য জিনিস। প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যখন সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ একই স্বার্থ, একই আদর্শের দিকে ধাবমান হয় তখনই তাকে বলে ঐক্য। তুলনা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, বীণার প্রত্যেক তারের আপন আপন ধ্বনি আছে— সব তার যখন

www.pathagar.com

আপন আপন বিশিষ্ট ধ্বনি সপ্রকাশ করে, একই সুরের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখনই সৃষ্ট হয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। সবকটা তারই যদি একধরনের বাঁধা হয় তবে বীণায় আর একতারায় কোনও তফাৎ থাকে না। সে যন্ত্র বিদগ্ধ সঙ্গীত প্রকাশ করতে অক্ষম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, কী প্রকারে এক আদর্শের রাখি বেঁধে সম্মিলিত করা যায় তার সাধনা করবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ। উপস্থিত শুধু আমরা এইটুকু বলতে পারি, পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে— এ জিনিস অত্যন্ত স্বাভাবিক, তার জন্য উর্দু ভাষাভাষীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই— এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বর্ণের কৌলীন্য যেমন শোষণের কারণ হতে পারে, ভাষার কৌলীন্যও ঠিক সেইরকম শোষণপন্থা প্রশস্ততর করে দেয়।

তারই একটি মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত নিন : তুর্কি একদা তাবৎ আরবখণ্ডের ওপর রাজত্ব করত। তুর্কি সুলতান সর্ব-আরবের খলিফাও ছিলেন বটে। তৎসত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্ত আরব ভূখণ্ড খলিফার জিহাদ ফরমান উপেক্ষা করে নসারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুর্কিকে পর্যুদস্ত করল। আমাদের কাছে এ বড় বিস্ময়ের কথা— খলিফার জিহাদ হুকুমের বিরুদ্ধে লড়া মানে তো কাফির হয়ে যাওয়া। যে আরবদের ভেতর দিয়ে ইসলাম প্রথম সপ্রকাশ হলেন তারা ধর্মবুদ্ধি হারাল?

তাই আমাদের সবিনয় নিবেদন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনও মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি গুণীরা সে আদর্শের সন্ধান করবেন। আমার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অত্যল্প কিন্তু নানা দেশের গুণীদের মুখে শুনেছি, নানা সৎগ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীনদুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের রাষ্ট্রভিত্তিও নির্মিত হবে চাষামজুরকে অন্ন দিয়ে, দুস্থকে সেবা করে, অজ্ঞকে জ্ঞানদান করে, এককথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গনি' (অভাবমুক্ত) করে, তা হলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ভিন্ন হওয়ার ভয় নেই।

সেই মহান আদর্শের দিকে উদ্দীপ্ত উদ্বুদ্ধ করতে পারে সতেজ সবল সাহিত্য। সে জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষাতে কেউ কখনও নির্মাণ করতে পারেনি। জনগণের মাতৃভাষা উপেক্ষা করে গণরাষ্ট্র কখনওই নির্মিত হতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য : যুদ্ধ কাম্যবস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বর্জনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বিত্তবান হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য। ইয়োরোপের তাণ্ডবলীলা থেকে আমরা কি কোনও শিক্ষাগ্রহণ করব না?

শিক্ষাগ্রহণ করি আর না-ই করি, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ভয় অহরহ বুকে পুষে সেই দৃষ্টিবিন্দু থেকে সর্বসমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা মারাত্মক ভুল। বাড়িতে আগুন লাগার ভয়ে অষ্টপ্রহর চালে জল ঢালা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়।

আজ যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মাতৃভাষা বর্জন করি তবে কাল প্রাণ যাওয়ার ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত রচনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রবাসীর চিঠি

শ্রীমান্ খসরু বাবাজিউ,

'সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল,
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা—'
আমার হল তাই;—
ছিলাম সুখে সিলেট জেলায় ঢুকল মাথায় পোকা
কাণ্ড দেখে বুঝল সবাই লোকটা গবেট বোকা।
বহুত দেশ তো দেখা হল খেলাম মেলাই ঘোল
চোখের জলে ভাসি এখন, খুঁজি মায়ের কোল।

চক্ষু বুজে বসে যখন ভাবি বরদায়
— দেহখানা বন্ধ ঘরে— দেশপানে মন ধায়
মেলাই ছবি আঁকি, মনের পটে বুলাই তুলি
দুঃখ কষ্ট এই ফিকিরে অনেক কিছুই ভুলি ॥

মনে হল আমি যেন পেরিয়ে বছর কুড়ি
ফিরে গেছি সিলেট আবার চড়ি খেয়াল-ঘুড়ি
বড়দিনের ছুটির সময় নাইব নদীর জলে
বালুর চড়ায় বসে আছি, গামছা নিয়ে গলে।
লালুমিয়ার দোকান থেকে খানিকটা নুন নিয়ে
ডান হাতে কুল, বাঁ হাতে নুন তাই মিলিয়ে দিয়ে
মঞ্জুসুধার সৃষ্টি যেন। নাই কিছুরই তাড়া
পরীক্ষা বা অন্য বালাই সামনেও নেই খাড়া
অলস চোখে দেখছি চেয়ে এপার ওপার যাওয়া
খেয়া নায়ের চিরন্তনী ঢিমে তেতাল বাওয়া।
মহাজনি নৌকা চলে গদাই লশ্‌করি
কমলানেবু বোঝাই করা; লোভ করে ফস করি
গণ্ডা দুয়েক সরিয়ে নেব, কিন্তু চাচা, শোনো

www.pathagar.com

চেষ্টা কবু কোরোনাকো লাভ তাতে নেই কোনও।
ব্যাটারা সব লক্ষ্মীছাড়া খায় না কেন গুলি,
কোনও বাঙাল নেইকো বসে চোখে দিয়ে ঠুলি।
যতই কেন বাড়াও না হাত মহা সন্তর্পণে
ব্যাটারা সব চালাক অতি বৈঠার ঘা অর্পণে।
থাক সে কথা, গামছা কাঁধে নাওয়ার বেলা যায়
আবার বলি বদ্ধ ঘরে দেশ পানে মন ধায়।
খসরু-পূর্ব[১] বছর সাতেক, বসন্ত কী শীতে,
তোমার মাইজ্‌লা ফুফুর[২] বিয়া হৈল চৌকিতে।
চৌকি আছে নবীগঞ্জের গায়ের সঙ্গে মিশে
সেখান থেকে কই পাঠালেন তোমার মেজ পিসে।
বাপ রে সে কী বিরাট বপু উদর আণ্ডাময়
মুখে দিলে মাখন যেন— জঠর ঠাণ্ডা হয়।
তোমার মা তো সেই দেশেরই যেথায় শুনি লোক
মাছ না পেলে ব্যাঙ-ভাজাতে ভোলে মাছের শোক।
শুধালে কি পাবে খবর তুমি তাঁহার কাছে
নউজ বিল্লা[৩]; সত্যি খবর তোমার বাবার আছে।
তামাম জাহান খোদার কাছে সব কিছু নেয় মাগি,
আমার পেটের আঁকুপাঁকু কই মাছেরই লাগি ॥
আরো একটা জিনিস খসরু সত্যি তোমায় বলি।
যার লাগিয়া তৈরি আমি জানটা দিতে বলি।
— ভাবনা শুধু জান্‌টা গেলে খাব কেমন করে
পেট আর জান্‌ তো একই দেহে, আছে একই ঘরে—
তোমার মায়ের দেশের জিনিস বড়ই চমৎকার
অর্ধ জগৎ ঘুরে আমি পাইনি জুড়ি তার—
চোঙ্গা-পিঠা,[৪] আহা চাচা বোলব তোমায় কী?
যখন ভাবি ইচ্ছা হয় যে 'রেজিগ্‌নেশন' দি।
ধ'রে সোজা পয়লা গাড়ি 'দেওর আইলে'[৫] দি ছুট
চাক্‌রি-বাঁধন, রাজার শাসন সবকিছু ঝুট্‌মুট।
নামটা সত্যি হলে পরে খাতির পাব মেলা

১. খসরু-পূর্ব— খ্রিস্টপূর্বের তুলনায়, অর্থাৎ খসরুর জন্মের বছর সাতেক পূর্বে।
২. মেজো পিসি।
৩. তওবা, তওবা!
৪. বাঁশের চোঙার ভিতর চাল ভরে সেই চোঙা আগুনে ঝলসে তৈরি একরকম পিঠে।
৫. 'দেওর আইল' অর্থাৎ 'দেবর এল', খসরুর মামার গ্রামের নাম।

www.pathagar.com

খানা-পিনা ধুম-ধামেতে কাটবে সারা বেলা।
চোঙ্গা-পিঠার সঙ্গে মালাই দেবে তোয়াজ করে।
নয়ত দেবে হরিণ-শিকার হয়ত আছে ঘরে।
করিমগঞ্জের হরিণ সে যে বড়ই খান্‌দানি।
খোরাক তাদের আমলকি ফল, ঝরনা-মিঠা পানি।
মহীমিয়ার বাবা ছিলেন বাঘা শিকারি
নুন আর মরিচ সঙ্গে নিয়ে— হাতির সোয়ারি—
পাহাড় ঘেঁষে চলে যেতেন গভীর বনের পাশ
হরিণ শিকার খেতেন স্রেফ্ ঝাড়া তিনটি মাস।
সঙ্গীবিহীন অন্ধ ঘরে আসন্ন সন্ধ্যায়
সুর্মা নদীর দেশের পানে উদাসী মন ধায় ॥
চটছো হয়ত মনে মনে ভাবছ একি হল
চাচার যেসব কাব্যি ছিল সব কিছু আজ ম'ল
খাবার কথা কয় যে খালি আর কি কিছু নেই!
তাও আছে; তোমার পাতে সন্তর্পণে দেই।

* * *

সিলেটের উত্তরেতে সোজা গিয়ে চলে
চৈত্র মাসে, মিঠা রোদে, উজায়ে সুরমা,
গেয়ে সারি, গান—
ধরিয়া পালের দড়ি করিবারে বারুণী'র স্নান
মেলা দৃশ্য দেখিয়াছি।
স্তূপীকৃত ধান মণ মণ
দুই পারে
তার পরে
কী রুপালি ঝিলিমিলি সোনালি ধানের
যেন যে হীরার মালা হাজার হাজার
— কাতার কাতার
হেমাঙ্গীর স্বর্ণবক্ষে।
দীর্ঘ শর্বরীর
শিশিরে করিয়া স্নান এলায়েছে দেহ
আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে।
অগভীর স্বচ্ছ জল
বালুর বুলায় দেহ।
সে জলে ডুবায়ে গা
দেখিয়াছি
তালহীন শব্দহীন মাছের নাচন,

www.pathagar.com

জলের নিচেতে।
উপরেতে নাচে রবিকর
হীরার নূপুর পরে।
হঠাৎ
কেন না জানি—
তলা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ওঠে ছোট মাছ
কটিখানি কাঁপাইয়া নটরাজ দোলে
জলের উপরে মারে ঘা—
যেন কোন খেয়ালি বাদশাহ
টাকা নিয়ে খেলে ছিনিমিনি।
কখনও বা দেখিয়াছি
দ'য়ে মজে গিয়ে
একপাল ছোট মাছ চক্রাকার ঘুরপাক খেয়ে
— গরবা নাচের ছাঁদে—
ইচ্ছা অনিচ্ছায়
অলখ মাদলে মেতে অজানা সে কিসের নেশায়
ক্রমে ক্রমে উঠে উপরেতে;—
মাছরাঙা স্টুকা ডাইভার
পার্ফেক্ট টাইমিঙ
পড়িল বিদ্যুৎ বেগে হল বজ্রাঘাত।
হুড়মুড় করে
এ ওর ঘাড়েতে পড়ে
মুহূর্তেই হল অন্তর্ধান।
হয়ত বলিতে তুমি
তাতেই বা কী?
এসবের বর্ণনার কী বা আছে বাকি?
হক্ কথা
তবু যতবার
বসিয়া বিদেশে
চোখ বুজে মনে করি যেন আমি সুর্মা উজিয়ে
বরদা'র অবিচার অত্যাচার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
চলিয়াছি
তখনই
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে,
মনে হয় জানি ঠিক জানি আমার দেশের
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামল বনানী

www.pathagar.com

পশ্চাতে তাহার নীলগিরি যবনিকা
তাহার উপরে লিখা
শুভ্রতার শিখা
রুপার ঝরনা
নীলের উপরে সে যে কী বিচিত্রা মিনা।
পদমূলে
প্রস্তরে উপলে
কলকল উচ্চহাস্য
হাসিছে খাসিয়া নারী পাঁচশো সাতশো।
মধুরের ধ্যানে আমি বার বার ডুবে
যে রাগিণী দেখিয়াছি চতুর্দিকে যার স্বপ্রকাশ—
কাব্যে ছন্দে রূপ তার মূর্তি আর হল না বিকাশ।
এ কি বিধাতার লীলা?
রূপে গন্ধে রসে শ্বাসে পরিপূর্ণ এ রমণী হল মূক শিলা
তাই কি শিলেট?
কাব্যে তার মাথা হেঁট!

* * *

কিন্তু চাচা মাফ করো, আজ কাজ আছে মোর মেলা
কাব্য-সাগর যেদিক পানে যায়নি জীবন-ভেলা—
চড়ায় লেগে আটকে আছে জোয়ার নাহি আসে
পুব হাওয়াও দেয়নি ঠেলা নৌকা নাহি ভাসে।
আগাগোড়া ভুলে ভরা জগা-খিচুড়ি
বয়স হ'ল হিসেব করে দেখি যে দুই কুড়ি।
চহল্ সালে উম্‌রে আজিজম্ গুজশৎ[৬]
কালাপানির গারদ মাঝে ভালে হানি দণ্ড।[৭]

---

৬. ইরানি কবি সাদির বিখ্যাত ছত্র। 'আমার জীবনের প্রিয় চল্লিশ বৎসর গেল, কিন্তু এখনও ছেলেমানুষি গেল না।' খসরু তখন ফারসি শিখেছিল বলে ছত্রটি তোলা হয়েছে।

৭. হাত।

যথা— বেকার-মোকা/বেমক্কা, খামকা, যত্রতত্র।
ওকিবহাল/ বিশেষজ্ঞ, Specialist
বেশুমার/ অসংখ্য
বে/ Without
শুমার/ Number, আদমশুমারি তুলনীয়
এলেম নব হাসিল/ নবজ্ঞান লাভ
বেশক/দ্বিধাহীন, অসংশয়
লেকিন্/কিন্তু

www.pathagar.com

তাই বলি
সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা।
সেই পীররে স্মরণ করে তোমার ছোট চাচা ॥

মৌচাক, কার্তিক ১৩৬০

ক্রিকেট

হুজুগে মেতে ক্রিকেট খেলা দেখিতে যদি চাও
মাথাটি মোর খাও—
গাড়োল-পানা প্রশ্ন মেলা ঝেড়ো না খালি খালি
খেলাটা যদি না বোঝো তবে দিয়ো না হাততালি
এলোপাতাড়ি বেগার-মোকা ক্যাবলা হবার মতো।
রয়েছে শত শত।
কায়দা-কেতায় ওকিব-হাল খেলার সমঝদার
শুধিয়ো নাকো ওদের মিছে প্রশ্ন বেশুমার।
শুধাও যদি মানা না শুনে, কী হবে ফল, বলি,
ট্যারচা-মুখো জবাব দিয়ে থামাবে ঢলাঢলি।
যেমন ধরো, জানো না কিছু শুধালে ভয়ে ভয়ে
যে গুণী পাশে আছে বসে— 'দিন তো মোরে কয়ে,
কাঠের ওই ডাণ্ডাগুলো, কী নাম হয় তার?'
পাশের যিনি হইবে মনে রাগত হন যেন
ঘ্যানরঘ্যান লাগিবে ভালো কেন!
বলেন তিনি মিনিট তিন থাকিয়া নিশ্চুপ
'উকেট কয়'। গলাতে যেন রয়েছে বিদ্রূপ।
হকচকিয়ে দিলে তো তুমি অনেক ধন্যবাদ;
খানিক পরে তবুও মনে হইল তব সাধ
এলেম নব হাসিল লাগি। কিন্তু তাতে ভয়
তেড়ে না যান এবার তিনি— গুণী তো নিশ্চয়—
থাকিয়া চুপ, ভাবিয়া খুব, গলাটি সাফ করে
চুলকে ঘাড় শুধালে মৃদু স্বরে
'উকেট কয়? বেশক্ কথা; লেকিন্, কন্ স্যার
ওসবগুলো হোথায় কেন কী হয় উপকার?

www.pathagar.com

কটমটিয়ে এবার গুণী তাকান তব পানে
বাসনা যেন প্রাণটি তব হানেন আঁখি-বাণে—
হুঙ্কারিয়া হাঁকেন শেষে, 'ওগুলো কার তরে?—
খেলাড়ি সব বসবে বসে ক্লান্ত হলে পরে।'

মৌচাক, বৈশাখ ১৩৬৭

বছর দুই পূর্বে আমি যখন ঢাকাতে আমার ছোট বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। আমার ভগ্নী আস্‌মা ঘড়িঘড়ি রেডিয়ো খুলে লেটেস্ট স্কোর শুনে নিচ্ছিল। আমি দু একটি প্রশ্ন শুধিয়েই বুঝে গেলুম আস্‌মা ক্রিকেটতত্ত্বে একদম অগা, অর্থাৎ আমার চেয়েও কম ক্রিকেট খেলা বোঝে। এ কবিতাটি তারই উদ্দেশে; এবং যেহেতু 'কবিতাটি' ঢাকায় রচিত তাই ঢাকাই বিদেশি শব্দ একটু বেশি রয়েছে।

প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার কেন?

পিলসুজ 'পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা,
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অতি অবহেলে
'মাভৈঃ' বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৬৯

উচ্ছে ভাজা সন্দেশ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, স্কুলের, এমনকি কলেজের গোড়ার দিকেও ছেলেমেয়েদের শেক্সপিয়র পড়ানো উচিত নয়। কারণ শেক্সপিয়রের ভাষা প্রাচীন দিনের। সে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক ইডিয়ম আজকের দিনের ইংরেজিতে আর ব্যবহার করা হয় না। ছেলেমেয়েরা সেটা না বুঝতে পেরে সেগুলো আপন লেখাতে লাগিয়ে দিয়ে একটা খিচুড়ি ভাষা তৈরি করে বসে। উচিত : প্রথম আধুনিক ইংরেজিটা শিখে নেওয়া এবং তার পর শেক্সপিয়র ইত্যাদি ক্লাসিকস্ পড়া। নিজের থেকেই ছেলেমেয়েরা অনুভব করবে কোনটা প্রাচীন দিনের শব্দ, এখন আর চলে না।

আমার মনে হয় বাংলার বেলায়ও এখন সেই অবস্থা। ধরে নিলুম, তোমার বয়স বারো-চোদ্দ। তুমি যদি বিস্তর বঙ্কিম পড়ো তবে বাংলা লেখার সময় তুমি এমন ভাষা শিখবে

www.pathagar.com

যেটা আজকের দিনে পণ্ডিতি-পণ্ডিতি, গুরুগম্ভীর মনে হবে। তাই আমার মনে হয়, এই বয়সে, রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখা বার বার পড়ে সেটা আয়ত্ত করে নেওয়া। আয়ত্ত করার অর্থ এ নয় যে তখন তুমি তাঁর মতো লিখতে পারছ। তা হলে তো আর কোনও ভাবনাই ছিল না। আমরা সবাই গণ্ডায় গণ্ডায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতুম। তার অর্থ, তুমি মোটামুটি জেনে গেছ, কী কী শব্দ কোন কোন ইডিয়ম ব্যবহার করলে কেউ বলতে পারবে না এগুলো প্রাচীন দিনের, এখন আর চলে না। এটা হয়ে যাওয়ার পর পড়বে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। বিশেষ করে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য'। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। আমি একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি : 'একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হত, তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।' কঠিন বাঙলা। কিন্তু কী সুন্দর! কী মধুর!!

তার পর বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর। কালীপ্রসন্নের মহাভারত এবং সর্বশেষে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। তারও পরে যদি নিতান্ত কোনও-কিছু না থাকে, বৃষ্টির দিন, বাড়ির থেকে বেরনো যাচ্ছে না, তবে পড়বে— বড় অনিচ্ছায় বলছি— সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু তিন সত্য দিয়ে বলছি, পয়সা খরচ করে না। ধার করে।

এ গল্পটা তো জানো? মার্কিন লেখক মার্ক টুয়েনের আপন লাইব্রেরিখানা নাকি সত্যিই দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমনকি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত— পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গুটাকয়েক শেল্‌ফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছ ঠিকই— কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্‌ফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেল্‌ফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

উপদেশ দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। সেটা তেতো। উচ্ছে ভাজা। কিন্তু সন্দেশ দিয়ে শেষ করলুম তো!

ক্লাইন এর্না

ক্লাইন এর্না জরমনির ছোট্ট একটি মেয়ে। আমাদের যেরকম গোপালভাঁড় দারুণ চালাক, এই মেয়েটি সেরকম ভীষণ বোকা। তবে, মাঝে মাঝে সে এমন কথা কয় যে তার উত্তর মেলা ভার। যেমন ধর, এর্নার মা বলছে, 'হেই ক্লাইন এর্না! বেড়ালের ন্যাজটা মিছে মিছে টানছিস কেন?' এর্না বলল, 'আমি টানছি কোথায়? কী যে বল মা! বেড়ালটাই তো খালি খালি টানছে। আমি তো সুদ্দু ন্যাজটা ধরে আছি।'

'ক্লাইন' মানে ছোট, ক্ষুদে। কিন্তু কারও কারও নাম বড় হয়ে যাবার পরও 'ছোট' থেকে যায়। আমাদের দেশেও তাই বাড়ির বড় বড় কর্তারা সব ওপারে চলে গিয়েছেন, কিন্তু 'ছোট (ক্লাইন) বাবুর' নাম 'ছোট বাবুই' রইল।

www.pathagar.com

ক্লাইন এর্না্র বেলাও তাই। আর এ গল্পটা আমার বিশেষ করে ভালো লাগে, কারণ গল্পটা আমাদের দেশেও চালু আছে। ... ক্লাইন এর্নার তখন একটুখানি বয়স হয়েছে। স্কুলে 'বয়-ফ্রেন্ড' জুটেছে। সে বলল, 'চল ক্লাইন এর্না। নৌকো ভাড়া করে আমরা ওই হোথাকার চর হেলিগোলান্ডে যাই। দু তিন টাকা লাগবে। সে আমার আছে। কী বল? লক্ষ্মীটি, না বলো না।'

আমাদের ক্লাইন এর্না সত্যি লক্ষ্মী মেয়ে। 'না' বলবে কেন? তদ্দণ্ডেই রাজি হয়ে গেল।

নৌকো ভাড়া করে বন্ধু শুধোল, 'ক্লাইন এর্না, তুমি দাঁড় ধরতে পার? আমি তা হলে বৈঠে বাই। নইলে—'

ক্লাইন এর্না বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড় ধরতে পারব না কেন? বাবার সঙ্গে কতবার নৌকোয় করে মাছ ধরতে গিয়েছি।'

ঘণ্টাখানেক বৈঠে ঠেলার পর ফ্রেন্ড বলল, 'ক্লাইন এর্না, একঘণ্টা তো হয়ে গেল। এখনও হেলিগোলান্ডে পৌঁছলুম না কেন? ওটা তো দেখাও যাচ্ছে না।'

'ক্লাইন এর্না বলল, 'অ। তাই বুঝি। আম্মো তো খেয়াল করিনি। নৌকো যে পাড়ে খুঁটিতে এখনও বাঁধা। আমি খেয়ালই করিনি।'

আমাদের দেশেও বলে, 'পুরা রাইত নাও বাইয়া দেখি, বাড়ির ঘাটেই আছি।' এর আসল অর্থ : মোদ্দা, সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয়, সেটা আগে না করলে বাদবাকি পণ্ডশ্রম।

বিদেশি ভাষা— ক্লাইন এর্না

স্বর্গত সুকুমার রায় একদা বলেছিলেন, 'কেই বা শোনে কাহার কথা, কই যে দফে দফে— গাছের ওপর কাঁঠাল দেখে তেল দিয়ো না গোঁফে।' অর্থাৎ মানুষ উপদেশ শুনতে মোটেই ভালোবাসে না। বিশেষ করে যারা ছেলেমানুষ। নিজের কথা যদি তুলি তবে নির্ভয়ে, কিন্তু ঈষৎ লজ্জাসহ বলব, আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলুম তখন কারওরই কোনও উপদেশে কান দিতুম না। একমাত্র মায়ের আদেশ উপদেশ— না সেকথা বাদ দাও, এখনও, এই পরিপক্ব বৃদ্ধ বয়সে আমার চোখে জল আসে। হ্যাঁ, কী বলছিলুম? বলছিলুম কী, তাই উপদেশ দিতে আমার বড়ই অনিচ্ছা। কিন্তু আজ কিছুটা দিতেই হচ্ছে। খুলে বলি। পরশু দিন আমার প্রতিবেশী একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে আমায় শুধোল, 'স্যর, এটা কি সত্য, ইউ অ্যান্ডারস্টেন্ড টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস?' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আই মিসআন্ডারস্টেন্ড মোর দেন টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস।' এর থেকেই বোঝা যায় যে, এ পাড়ায় আমার বদনাম আছে, আমি নাকি একাধিক ভাষা জানি। তাই ইংরেজি শেখা সম্বন্ধে দু একটি কথা এই সুবাদে বলে নিতে চাই। মাস্টারমশাইরা সর্বদাই বলে থাকেন, যে বই পড়বে তার কোনও শব্দ জানা না থাকলে অভিধান খুলে দেখে নেবে। এটা অবশ্যই টেকস্‌ট বই সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু ভেবে দেখ তো, তুমি যেসব কঠিন বাঙলা শব্দ শিখেছ, তার কটি অভিধান দেখে? যেসব বাঙলা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনী পড়ছ তাতে বার বার কঠিন শব্দ এখানে-ওখানে ঘুরে-ফিরে এসেছে এবং তারই ফলে শব্দগুলোর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছে। ইংরেজির বেলাও এই পদ্ধতি

www.pathagar.com

প্রযোজ্য।... এবং এই 'রেপিড রিডিং' জিনিসটি আরম্ভ করবে শারলক হোমস, আগাথা ক্রিসটি ইত্যাদির ডিটেকটিভ নভেল দিয়ে। সেগুলো এমনই ইন্‌টরেসটিং যে, হেসেখেলে বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে যাবে। যতক্ষণ অবধি গল্পটা বুঝতে পারছ, ততক্ষণ অভিধানের কোনও প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে আরও অল্পবিস্তর বলার আছে। উপস্থিত ভাষা নিয়ে আমাদের ক্লাইন এর্না'র একটা গল্প মনে এল।... ক্লাইন এর্না বিয়ে করেছে এক ইংরেজকে, কিন্তু হায়, এক বছর যেতে না যেতে তার বর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার পর তার একটি বাচ্চা হল। কিন্তু হায়, হায়, ছ দিনের দিন বাচ্চাটি মারা গেল। বেচারির কী কান্না, কী কান্না। তার মা তাকে অনেক প্রবোধবাক্য শোনানোর পর শেষটায় বলল, 'আর দ্যাখ, ক্লাইন এর্না, বাচ্চাটার বাপ তো ইংরেজ। মুখে কথা ফুটতেই সে ইংরেজি বলত। আমি তো ইংরেজি জানিনে। দিদিমা হয়ে তার এক বর্ণও বুঝতে পারব না— সেটা কি খুব ভালো হত?'

ক্লাইন এর্না

২

ক্লাইন এর্না গোয়ালঘরের সামনে বসে হোম-টাস্ক লিখছে। এমন সময় তার আদরের গাইটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুধাল, কী লিখছ, ক্লাইন এর্না?

চুলোয় যাক্‌। মোটরগাড়ি সম্বন্ধে লিখতে বলছে। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

গোগম্ভীর কণ্ঠে গাই বলল, আমি বলে যাই, তুমি লেখ। মোটরগাড়ি অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জানোয়ার। এদের বিকট বিকট দুটো দারুণ উজ্জ্বল চোখ থাকে। কিন্তু সে দুটো শুধু রাতের অন্ধকারেই জ্বলে ওঠে।... এরা যখন রাস্তার উপর দিয়ে হুশ হুশ করে যায় তখন সম্পূর্ণ অচেনার মতো একে অন্যের দিকে কোনও খেয়াল না করে চলে যায়। কিংবা দুম করে একে অন্যকে মারে মরণ-ধাক্কা। তখন দু জনাই মারা যায়। আশ্চর্য, এদের কোনও মধ্যপন্থা বা তৃতীয় পন্থা নেই।... এরা নিজেদের খাবার যোগাড় করতে পারে না। মানুষই এদের জল-তেল আরও কী যেন খেতে দেয়। আমার আশ্চর্য লাগে, ওরা মুখ দিয়ে ও অন্য দিক দিয়ে, দু দিক দিয়েই খায় কী প্রকার!... লোকে ভাবে, ওরা খুব তীব্রগতিতে চলতে পারে। আদৌ না। ওই সেদিন আমার এক বান্ধবী রাস্তা দিয়ে আপন গোয়ালে ফিরছিল। পিছন থেকে, অনেকক্ষণ ধরে ওদেরই একজন কোঁক-কোঁক, কোঁক-কোঁক করে চিৎকার করছিল, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারছিল না। অবশেষে আমার বান্ধবী যখন বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে তার বেডরুমে পৌঁছে গেল তখন বাবু এগোলেন।... ওরা রাস্তায় যা ফেলে যান সেটা ঘুঁটেকুড়োনি ঘৃণার চোখে দেখে।... শেষ প্রশ্ন— ওরা কি মোটেই কোনও বন্ধু-বান্ধব চায় না? সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওদেরই একজন রাস্তার পাশে কাঁটার বেড়া ভেঙে আমাদেরই মাঠের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গীসাথী মানুষরা ওকে ফেলে চলে গেল। আমি ভাবলুম, আহা বেচারি, একা একা রাত কাটাবে। একটুখানি সঙ্গ দিই। কোনও সাড়া পেলুম না।

তখন দেখি ওর চোখদুটোও জ্বলছে না। পরদিন সকালবেলা এল তার মা। বিরাট দেহ। দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল শহরপানে। আমি যখন তার মার সামনে দাঁড়িয়ে— নমস্কার, আসুন তবে, বললুম, তখন তিনি সুপ্রসন্ন কোঁক-কোঁক বলে উত্তর দিলেন। মা-টি মেয়ের চেয়ে ঢের ঢের ভদ্র।

গুরুদেব

প্রমথ চৌধুরীর মতো মনীষী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অনবদ্য ভাষায় লেখেন, তখন তা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের গৌরব এবং মহিমা তিনি পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবের গভীরতা, চিন্তার ঐশ্বর্য এবং রবীন্দ্র-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারি।

আমার লেখাও সফল হত যদি আমি কবি বা স্রষ্টা হতুম। কবির দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই হোক, আর তাঁর কাব্যালোচনাই হোক, কিঞ্চিৎ সৃজনী-শক্তি না থাকলে সে রচনা কবির বিরাট ব্যক্তিত্বের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বৈচিত্র্যহীনতার পরিচয়ই দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমার বড় সংকোচ বোধহয়। ভয় হয়, যত ভেবেচিন্তেই লিখি না কেন বিদগ্ধজনেরা পড়ে বলবেন, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেও এই ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় পেল না। এই অভিমত যে নিদারুণ সত্য তা আমি জানি; তাই স্থির করেছিলুম যে, কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে সহজ, সরলভাবে পেয়েছিলুম, সেকথা একেবারে অপ্রকাশিতই রাখব।

কিন্তু মুশকিল হল এই যে— কবি-প্রণামের রচনা-সংগ্রাহকগণ ও আমার নিজের দেশ 'শ্রীহট্ট'র অনেকেই জানেন যে, আমি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছি। এই সঞ্চয়িতার মধুকর যে আমার লেখা চেয়ে আমাকে পরম সম্মানিত করেছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি জানেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য; তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু আমার দেশবাসী প্রিয়জনকে কী করে বোঝাই যে, রবীন্দ্রনাথের ঘরের দেয়াল, আসবাব তাঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশি দেখেছে। আপনারা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বাদ দাও, তাঁর কাব্য আলোচনা কর। উত্তরে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই— সে তো সহজ কর্ম নয়।...তবে আর কিছু না হোক, এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধান বলুন; কালিদাস, শেলি, কিট্‌সের কাব্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন— আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জানা-অজানায় পঠিত— আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। জীবনের ক্রমবিকাশ-পথে নানাদিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু, সেই কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণ কতটুকুই-বা আমি করতে পারি? তাই এতদিন সে চেষ্টা করিনি।

www.pathagar.com

কিন্তু 'দেশে'র ডাকে তো নীরব থাকতে পারলাম না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যা আমি করতে পারিনি, আজ তাঁর জীবনান্তে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে ব্রতী হয়েছি।

একথা তো ভুলতে পারিনে যে, একদিন তাঁর চরণপ্রান্তে বসে আশীর্বাদ লাভ করেছি, তাঁর অজস্র অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ধন্য হয়েছি— সেই অপরিমেয় স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। তাই আজ অশ্রুসজল চিত্তে সকলের সঙ্গে কবিগুরুকে আমারও সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করছি।

* * *

১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' পড়তে যাই। বিদ্যালয়ের বিশাল প্রাসাদে পথ ভুলে 'ফনেটিক ইনস্‌টিট্যুটে'র বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হই। বহু ছাত্রছাত্রী ভিড় করে বসে আছে— বক্তৃতা শুরু হবার দেরি নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দেশবাসী কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে বসে পড়লুম। প্রোফেসার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অদ্যকার বক্তৃতা ফনেটিক বিজ্ঞানের অবতরণিকা। নানা ভাষায় নানা দেশের লোকের নানা উচ্চারণ আজ শোনানো হবে।' ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে দেয়ালে ম্যাজিক লেন্টর্নের ছবি ফেলা হল।...রবীন্দ্রনাথ!— সঙ্গে সঙ্গে কলের গান বেজে উঠল, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর :

Through ages India has sent her voice— অন্ধকার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ঋজুদীর্ঘ মূর্তির আলোকোদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি। কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের— না তপোবনের ঋষির— 'শৃন্বন্তু বিশ্বে',— ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন বাণী।

আবার আলো জ্বলল। অধ্যাপক বললেন, এমন গলা, ঠিক জায়গায় জোর দিয়ে অর্থ প্রকাশ করার এমন ক্ষমতা শুধু প্রাচ্যেই সম্ভব। পূর্বদেশে মানুষ এখনও 'বট'কে (শব্দব্রহ্ম) বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য, বাক্যের এমন ওজস্বিতা পশ্চিমে কখনও হয় না।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। ডাইনে তাকালুম, বাঁয়ে তাকালুম। ভাবটা এই, 'আলবৎ, ঠিক কথা, ভারতবাসীই শুধু এমন ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে।' ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রী সে সন্ধ্যায় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বসেছিলুম। আমার গুরুদেব ভারতবর্ষের, আমিও ভারতবাসী।

* * *

তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছিলুম ১৯২৭ সালে— জর্মনি যাওয়ার দুই বৎসর পূর্বে— কাবুলে।

ইউরোপ যাওয়ার জন্য অর্থ-সংস্থান করতে গিয়েছিলুম কাবুলে। ফরাসি ও ফারসি জানি বলে অনায়াসে চাকরি পেয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিশ্বভারতীই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ফরাসি, ফারসি, জর্মন একসঙ্গে শেখা যেত।

দুশো টাকা মাইনেতে গিয়েছিলুম; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কাবুল সরকার আবিষ্কার করলেন যে আমি জর্মনও জানি। মাইনে ধাঁ করে একশো টাকা বেড়ে গেল। পাঞ্জাবি ভায়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওজিরে মাওয়ারিফের (শিক্ষামন্ত্রী) কাছে ডেপুটেশন নিয়ে ধরনা দিয়ে বললেন, সৈয়দ মুজতবা এক 'অনরেকগনাইজড়' বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আমরা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ; এম.এ। আমাদের মাইনে শ-দেড়শো; তার মাইনে তিনশো, এ অন্যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের বন্ধু। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলেন ফারসিতে।*— 'জানো, বন্ধু, শিক্ষামন্ত্রী তখন কী বললেন?' খানিকক্ষণ চুপ করে জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বললেন— 'বিলকুল ঠিক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রিতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন— আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত— সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি সমগ্র প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।'

* * *

এসব অভিজ্ঞতা যে কোনওদিন হবে সে তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে তার ভিত্তিপত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনদশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন; তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন— শ্রীহট্টবাসীরূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।**

প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী পড়তে চাও?

আমি বললুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখতে চাই।

তিনি বললেন, নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কী?

আমি বললুম, মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিস বোধহয় ভালো করে শেখা যায় না।

গুরুদেব আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একথা কে বলেছে?

আমার বয়স তখন সতেরো— থতমত খেয়ে বললুম, কনান ডয়েল।

গুরুদেব বললেন, ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য নয়।

কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি, কিটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।

তার পর ১৯২২-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতনে টলস্টয়ের ভাবধারা হঠাৎ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল। আমরা বললুম, শান্তিনিকেতনে আমরা যে জীবনযাপন করছি সেটা বুর্জুয়া জীবন, বিলাসের জীবন। তাতে সরলতা নেই, সাম্য নেই, স্থৈর্য নেই। আমাদের উচিত সেই সহজ সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনা, মাটির টানে প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে ক্ষেত করা, ফসল ফলানো। আমাদের মতবাদ যখন প্রবল হয়ে বিদ্রোহের আকার ধরেছে, তখন একদিন গুরুদেব আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করলেন। নাস্তানাবুদ হয়ে আমরা আধঘণ্টার ভেতর চুপচাপ। সবশেষে তিনি বললেন, আমি জানি একতারা থেকে যে সুর বেরোয় তাতে সরলতা আছে কিন্তু সে সরলতা একঘেয়েমির সরলতা। বীণা বাজানো ঢের শক্ত। বীণাযন্ত্রের তার অনেক বেশি, তাতে জটিলতাও অনেক

* ("খ্রি দানিদ আগাজান, ওজিরে মাওয়ারিফ্ চি গুফতন্দ')।

** রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯১৯-এ শ্রীহট্ট শহরে। পূজ্যপাদ গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে তিনি শ্রীহট্টের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।

www.pathagar.com

বেশি। বাজাতে না জানলে বীণা থেকে বিকট শব্দ বেরোয় কিন্তু যদি বীণাটাকে আয়ত্ত করতে পার তবে বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় (হারমনি ইন্ মল্‌টিপ্লিসিটি) তা একতারার একঘেয়েমির সরলতার (মনটনস্ সিম্‌প্লিসিটি) চেয়ে ঢের বেশি উপভোগ্য। আমাদের সভ্যতা বীণার মতো, কিন্তু আমরা এখনও ঠিকমতো বাজাতে শিখিনি। তাই বলে সে কি বীণার দোষ, আর বলতে হবে যে একতারাটাই সবচেয়ে ভালো বাদ্যযন্ত্র।

আমার মনে হয় এইটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল সুর। চিরজীবন তিনি বহু-র ভেতর একের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সে সাধনা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক বৎসর শান্তিনিকেতনে আমি ছিলুম এক ঘরের নিচের তলায়। সেখান থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখতে পেতুম, গুরুদেব তাঁর জানালার পাশে বসে লেখাপড়া করছেন। সকালে চারটার সময় দুঘন্টা উপাসনা করতেন। তার পর ছ-টার সময় স্কুলের ছেলেদের মতো লেখাপড়া করতেন। সাতটা, আটটা, নটা, তার পর দশ মিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ— দশটা, এগারোটা, বারোটা। তার পর খেয়েদেয়ে আধঘন্টা বিশ্রাম। আবার কাজ— লেখাপড়া; একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা— কাজ, কাজ, কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন— বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন, অথবা গল্প-সল্প করতেন। তার পর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান— আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত! কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা। আর কী অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা!

আমি তখন নিতান্তই তরুণ। আমার থেকে যাঁরা প্রবীণ এবং জ্ঞানী তাঁরা গুরুদেবের জীবনের অনেক ইতিহাস জানেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টির নানা আলোচনা করবেন। তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছু অমর হয়ে থাকবে, অনেক কিছু লোপ পাবে।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান। জর্মনির 'লিডর' গান ইউরোপের গীতিকাব্যের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এমন সব গান 'লিডরে' আছে যার কথা দিয়েছেন গ্যেটের মতো কবি আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মতো সুনিপুণ সুরশিল্পী। আমার মনে হয়, তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান। কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টার প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির কণ্ঠে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কেউ যদি বলেন, না, চিরস্থায়ী তা হবে না— আমি তর্ক করব না। কারণ আর যা নিয়ে চলুক; গান নিয়ে, গীতি-কবিতা নিয়ে তর্ক চলে না। গানের আবেদন সরাসরি একেবারে মানুষের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। গান হৃদয়কে দোলা দেয়, অন্তরে জাগায় অনির্বচনীয় অনুভূতি;— যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে দু চারটি কথা বললাম। সে বিপুল সাহিত্যের খানিকটা বুঝেছি, বেশিরভাগই বুঝিনি। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যালোচনার দিন আজ নয়। আজ শুধু আমার স্নেহপ্রবণ গুরুদেবের সংবেদনশীল অন্তরটির পরিচয় দেবার জন্যেই আরও কয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধরা-ছোঁয়ার অতীত; সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি যে ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু, নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করাও যে দুঃসাধ্য।

www.pathagar.com

হিমালয়ের পাদমূলে বসে বিচিত্র পুষ্প চয়নকালেও ক্ষণে ক্ষণে গৌরী-শিখরের বিরাট, বিশাল, গম্ভীর মহিমা হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে অবসর সময়ে ক্যাটালগ তৈরি করতুম। তখন প্রতিদিন দেখতুম পাঠান্তে নতুন পুরাতন বই তিনি লাইব্রেরিতে ফেরত পাঠাতেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, কত বলব। এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল না। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আজীবন জ্ঞান-সাধক। কিন্তু তাই বলে জীবনকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে কঠোর জ্ঞানমার্গ তিনি অবলম্বন করেননি। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন— 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার'— পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। এক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রকৃত তপস্বী। তপস্যা;— সে তো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই। তাঁর একটি কবিতায় আছে—

'জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘ রাত্রি
করিছে সন্ধান,
চঞ্চলের মৃত্যুস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ঋষি-দৃষ্টির সমক্ষে সত্যের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। তারই পরিচয় তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, 'ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতনে'র নিবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়, তা সম্পূর্ণই অনুভূতির।

'মহুয়া' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে চয়ন করে 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশ করেন; তাতে 'মহুয়া'র অতি অল্প কবিতা স্থান পায়। তখন রব উঠেছে 'মহুয়া'তে কবির সৃজনী-শক্তির অপ্রাচুর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ভয় হল, রবীন্দ্রনাথও বুঝি তাই বিশ্বাস করে 'মহুয়া'র যথেষ্ট কবিতা 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান দেননি। কলকাতায় থাকতুম; শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি 'সঞ্চয়িতা'তে 'মহুয়া'র আরও কবিতা দিলেন না কেন? আমাকে যদি 'সঞ্চয়িতা' সম্পাদন করার ভার দেওয়া হত, আমি তা হলে 'মহুয়া'র মলাট ছিঁড়ে 'সঞ্চয়িতা' নাম দিয়ে প্রকাশ করতুম। বলতুম, এতেই সবচাইতে ভালো কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গুরুদেব হেসে বললেন, ভাগ্যিস তোমাকে 'সঞ্চয়িতা' তৈরি করবার ভার দেওয়া হয়নি। আমি 'মহুয়া'র কবিতা 'সঞ্চয়িতা'তে যে বেশি পরিমাণে দিইনি, তার কারণ এই যে, 'মহুয়া'র কাব্য-সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আসলে 'মহুয়া'র কবিতাগুলো মাত্র সেদিনের লেখা। কবিতার ভালোমন্দ বিচার করার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন সেটা 'মহুয়া'র বেলায় এখনও যথেষ্ট হয়নি।

ঠিক সেই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করার দিন বোধহয় এখনও আসেনি। যে পৃথিবীকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অতি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই পৃথিবী ছেড়ে তিনি মাত্র সেদিন চলে গেছেন। শোকে বাংলাদেশ মুহ্যমান। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচনার জন্য যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন তা আমরা এখনও পাইনি।

১৯৩৯ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হল শান্তিনিকেতনে।

www.pathagar.com

তাকিয়ে বললেন, লোকটি যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে। তুই নাকি বরোদার মহারাজা হয়ে গেছিস?

আমি আপত্তি জানালুম না। তর্কে তাঁর কাছে বহুবার নাজেহাল হয়েছি। আপত্তি জানালে তিনি প্রমাণ করে ছাড়তেন, আমিই বরোদার মহারাজা, নয়তো কিছু একটা জাঁদরেল গোছের।

নিজেই বললেন, না না। মহারাজা নয়, দেওয়ান-টেওয়ান কিছু একটা।

আমি তখনও চুপ। 'মহারাজা' দিয়ে যখন আরম্ভ করেছেন, কোথায় থামবেন তিনিই জানেন।

তার পর বললেন, কীরকম আছিস? খাওয়া-দাওয়া?

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আরে না না, আজকালকার দিনে খাওয়া-দাওয়া যোগাড় করা সহজ কর্ম নয়। তোকে আমি একটা উপদেশ দি'। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস 'টাটা ভবন' তাতে একটি লোক আছে, তার নাম পঞ্চা; লোকটি রাঁধে ভালো। তার সঙ্গে তুই যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারিস তবে ওখানে তোর আহারের দুর্ভাবনা থাকবে না।

আমি তাঁকে আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে অনুরোধ জানালাম।

তখন বললেন, তুই এখনও বরোদা কলেজে ধর্মশাস্ত্র পড়াস, না?

আমি জানতুম, তিনি ঠিক জানেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রেরা কে কী করে। তাই মহারাজা বা দেওয়ান আখ্যায় আপত্তি জানাইনি।

তার পর বললেন, জানিস, তোদের যখন রাজা-মহারাজারা ডেকে নিয়ে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কী গর্ব হয়, আমার কী আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশ-বিদেশে কৃতী হয়েছে।

তার পর খানিকক্ষণ আপন মনে কী ভেবে বললেন, কিন্তু জানিস, আমার মনে দুঃখও হয়। তোদের আমি গড়ে তুলেছি, এখন আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তোদের প্রয়োজন। গোখলে, শুক্ল, তোরা সব এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবি। কিন্তু তোদের আনবার সামর্থ্য আমার কোথায়?

তা যাক্। বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে?

আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি দিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।

তার পর আধঘণ্টা ধরে অনেক কিছু বললেন হিন্দু-মুসলমানের কলহ নিয়ে। তাঁকে যে এই কলহ কত বেদনা দিত সে আমি জানি। আমাকে যে বলতেন তার কারণ বোধহয় আমি তাঁর মুসলমান ছাত্র। বোধহয় মনে করতেন আমি তাঁকে ঠিক বুঝতে পারব।

গুরুদেব তখন বেশি কথা বললে হাঁপিয়ে উঠতেন। আমি তাই তাঁর কথা বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিলাম। তিনিই হঠাৎ লক্ষ করলেন, আমার জামার পকেটে ছোট্ট ক্যামেরা। বললেন, ছবি তোলার মতলব নিয়ে এসেছিস বুঝি। তোল, তোল। ওরে সুধাকান্ত, পরদাগুলো সরিয়ে দে তো। কীরকম বসব বল্।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না; আমি ঠিক তুলে নেব।

www.pathagar.com

তোর বোধহয় খুব দামি ক্যামেরা, জার্মানি থেকে নিয়ে এসেছিস, সব কায়দায় ছবি তোলা যায়। অন্যেরা বড় জ্বালাতন করে; এরকম করে বসুন, ওরকম করে বসুন। কত কী!

ছবি তোলা শেষ হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন, কী রে, কিছু বলবি নাকি?

আমি বললুম, একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।

তিনি ক্লাসে যেরকম উৎসাহ দিতেন ঠিক সেইরকমভাবে বললেন, বল, বল, ভয় কী?

আমি বললুম, এই যে আপনি বললেন, আপনার সামর্থ্য নেই আমাদের এখানে নিয়ে আসবার, সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমার নিজের তরফ থেকে বলছি যে, বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।

গুরুদেব বললেন, সে কি আমি জানিনে রে, ভালো করেই জানি। তাই তো তোদের কাছে আমার সামর্থ্যহীনতার কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয় না।

মনে হল গুরুদেব খুশি হয়েছেন।

গুরুদেব আজ নেই।

কিন্তু সেই হারানো দিনের স্মৃতি আজও আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবির বিশ্বরূপ

রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার শক্তি আমাদের নেই। গীতাতে উক্ত তিন মার্গেই একসঙ্গে একই মানুষ চলেছে এর উদাহরণ বিরল। তিনি জ্ঞানী ছিলেন; শব্দতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি কর্মী ছিলেন; গ্রামোন্নয়ন, কৃষির উৎকর্ষ, সমবায় সমিতি, শ্রীনিকেতন বিদ্যালয় তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রসের সাধক ছিলেন— এটাকে ভক্তিমার্গ বলা যেতে পারে— তিনি তাঁর ভগবানকে প্রধানত রসস্বরূপেই আরাধনা করেছিলেন এবং ইহজগতের প্রিয়া, প্রকৃতিকে সেই রসস্বরূপেই কাব্যে, নাট্যে, গানে প্রকাশ করেছেন।

অথচ কোনও স্থলেই তিনি খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মতো যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শব্দ সঞ্চয় করে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখছেন তখন তাঁর ভাষা কঠিন শব্দতাত্ত্বিকের নয়, তাঁর ভাষা সরস কবির মতো। এবং সেখানে তিনি কর্মযোগীর ন্যায় এ উপদেশও দিচ্ছেন, কী করে সে ভাষাতত্ত্বের পুস্তক কাজে লাগাতে হয়। পক্ষান্তরে তিনি যখন বর্ষা, বসন্তের গান লিখছেন তখন উদ্ভিদবিদ্যায় অজ্ঞ সাধারণ কবির মতো একই ঋতুতে কদম্ব আম্রমঞ্জরী ফোটান না। বস্তুত আমাদের দেশে যে শত শত দিশি বিদেশি ফুল ফোটে, কোন জায়গায় কী সার দিলে ভালো করে ফোটে, এসব খবরও রাখতেন। বিদেশি ফুলের নামকরণ করতেন, একাধিক নাম-না-জানা দিশি ফুলেরও নামকরণ করেছেন। কথিত আছে— শহরাগত এক নবীন শিক্ষক অত্যন্ত সাধারণ জাম না গাবগাছ চিনতে পারেননি বলে কবি তাঁর হাতে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের সঁপে দিতে নারাজ হয়েছিলেন। আবার হাল

www.pathagar.com

চালানো, গাছ পোঁতার মতো নীরস গদ্যময় ব্যাপার কী হতে পারে?— শ্রীনিকেতনে যাঁরাই হলকর্ষণ বৃক্ষরোপণ উৎসব দেখেছেন তাঁরাই জানেন কবি কীভাবে এ দুই সাধারণ কর্মকে সৌন্দর্যের পর্যায়ে তুলে নিয়েছেন। অনেকেরই বিশ্বাস—

'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল'

বর্ষার গান। অন্তত সেই ঋতুতেই গাওয়া হয়। তা হলে প্রশ্ন উঠবে 'ভেদ করি[১] কঠিনের ক্রূর বক্ষতল' 'গূঢ় অন্ধকার হতে' কে আসছে? 'মরুদৈত্য কোন মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে'— কে সে?

আসলে এটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনে প্রথম টিউবওয়েল খননের সময়। মাটির নিচে যে জল বন্দি হয়ে আছে তাকে বেরিয়ে আসবার জন্য কবি কর্মযোগের প্রতীক কলকব্জার বন্দনা-গীতি ধরেছেন।

সবসময়েই তিনটি জিনিস যে একই আধারে থাকবে এমন কোনও ধরাবাঁধা নেই কিন্তু মোটামুটি বলা যেতে পারে, তিনি দুই, আড়াই কিংবা তিন ডাইমেনশনেই চলুন, আমরা চলতে জানি শুধু এক ডাইমেনশনে এবং তাই তাঁর সমগ্র রূপ আমাদের পক্ষে ধরা কঠিন, প্রায় অসম্ভব (তিরোধানের পূর্বে তিনি এক চতুর্থ ডাইমেনশনে চলে যান এবং সেটি এমনই রহস্যাবৃত যে, উপস্থিত সেটি উল্লেখ করব না; কারণ ওইটে ভালো করে বোঝবার জন্য আমি এখনও হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি)।

সে অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হবে, এবং যদি হয় তবে কী প্রকারে হবে?

এটা বোঝানো যায় শুধু তুলনা দিয়ে।

চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে গুণী রসিকেরা চেনেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি বাল্যবয়স থেকেই ক্ষীণ। তিনি চার হাত দূরের থেকেই কোনও জিনিস ভালো করে দেখতে পেতেন না।

যৌবনে তিনি একখানি বিরাট দেয়াল-ছবি বা ফ্রেস্কো আঁকতে আরম্ভ করেন। বড় বড় চিত্রকররাও সম্পূর্ণ ফ্রেস্কোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার জন্য বার বার পিছনে হটে ছবিটাকে সমগ্ররূপে দেখে নেন। আমরা, দর্শকরাও ছবি শেষ হওয়ার পর যখন সেটি দেখি তখন দূরের থেকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখি— তখন খুঁটিনাটি, সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখতে পাইনে— পরে কাছে গিয়ে খুঁটিনাটি দেখি— তখন আর তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাইনে।

পূর্বেই বলেছি, বিনোদবিহারী দূরের থেকে কিছুই দেখতে পান না। তাই তিনি অনুমানের ওপর নির্ভর করে একদিকে ছবি আঁকা আরম্ভ করে অন্যপ্রান্তে এসে শেষ করতেন, কিংবা খাবলা খাবলা করে যেখানে খুশি খানিকটে এঁকে নিতেন। পরে দেখা যেত পার্সপেকটিভ না দেখতে পেয়েও বিনোদবিহারীর বিরাট ফ্রেস্কোর এ-কোণের হাতি ও-কোণের প্রজাপতির চেয়ে যতখানি বড় হওয়ার কথা ততখানি বড়ই হয়েছে। তিনি অবশ্য কখনও সেটা দেখতে পেতেন না, কারণ যতখানি দূরে এলে আমরা সমগ্র ছবি দেখতে পাই ততখানি দূরে এলে তিনি সবকিছু ধোঁয়াটে দেখতেন।

একদিন তাঁর এক শিষ্য একটি ক্যামেরা নিয়ে এসে উপস্থিত। যতখানি দূরে দাঁড়ালে পুরো ক্যামেরায় ধরা পড়ে ততখানি দূরে দাঁড়িয়ে সে ক্যামেরায় ঘষা কাচের উপর প্রতিবিম্বিত

১. আমরা 'করি'ই শুনেছি। গীতবিতানে দেখছি 'করো' আছে। অর্থের অবশ্য কোনস পার্থক্য হয় না।

www.pathagar.com

পুরো ফ্রেস্কোটি সে বিনোদবিহারীকে দেখাল। এই তিনি তাঁর আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবি জীবনে প্রথম দেখতে পেলেন। একসঙ্গে এককোণের হাতি ও অন্যকোণের প্রজাপতি দেখতে পেলেন, এক চিত্রাংশ অন্য চিত্রাংশের সঙ্গে ঠিক ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন খাপ খেয়ে আঁকা হয়েছে কি না দেখতে পেলেন। অবশ্য ঘষা কাচের উপর খুঁটিনাটি কারুকার্য দেখতে পাননি, কিন্তু সে জিনিসে তাঁর প্রয়োজন ছিল না; কারণ কাছে দাঁড়িয়ে তো তিনি সেগুলো ভালো করেই দেখতে পান।

এই ক্ষুদ্র রচনায় আমি এত দীর্ঘ একটি উপমা দিলুম কেন? কারণ বহু বৎসর ধরে ভেবে ভেবেও আমি এযাবৎ খুঁজে পাইনি কী করে আরও সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে পারি।

পূর্বেই বলেছি, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হলে আমাদের যতখানি দূরে যেতে হয় ততখানি দূরে গেলে আমাদের সবকিছু ধোঁয়া লাগে। ঘষা কাচ হলে আমরা তাঁর পূর্ণ রূপ দেখতে পেতুম।

তা হলে এই ঘষা কাচ জিনিসটে কী?

কোনও মহৎ কবির পরবর্তীকালে যখন সবাই তার বিরাট সমগ্র রূপ দেখার চেষ্টা করে নিষ্ফল হচ্ছে তখন হঠাৎ আবির্ভূত হন আরেক মহৎ ব্যক্তি— যিনি কবির সর্বাঙ্গসুন্দর সমগ্র ছবি ঘষা কাচের মতো তাঁর বুকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর রচনায়, তাঁর কাব্যে তিনি তখন কবিকে এমনভাবে এঁকে দেন যে আমরা অক্লেশে তাঁর পূর্ণ ছবিটি দেখতে পাই। শক্তিমান জন দ্বারা কোনও দুরূহ কার্য সমাধিত হওয়ার পর সাধারণের পক্ষে তা অতি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কালিদাস বলেছেন,

'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'

'কঠিন মণিকে হীরক দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন সেই ছিদ্র দিয়া অনায়াসে ওই মণির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব।'

কালিদাস সুবাদেই বলি, এই এ যুগের আমাদের রবীন্দ্রনাথই তাঁর যে সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি এঁকেছেন, ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে বিরাট কলেবর আমাদের দেখিয়েছেন, সে তো অন্য কেউ ইতোপূর্বে করে উঠতে পারেননি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ যোগাযোগ বিরল নয়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান জর্মন সাহিত্য। গ্যোটের পঞ্চমুখে পঞ্চতন্ত্র কথা একইসঙ্গে শোনবার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য জর্মনিকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়নি। তাদের সৌভাগ্য, অংশত গ্যোটেরও সৌভাগ্য যে, তাঁরই জীবদ্দশায় হাইনের মতো কবি জন্মগ্রহণ করেন। দু জনাতে কয়েক মিনিটের তরে দেখাও হয়েছিল— মাত্র একবার। সে অভিজ্ঞতা কারওরই পক্ষে সুখদা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাইনে যখন ঘষা কাচের মতো তাঁর বুকের উপর গ্যোটের পূর্ণ ছবি প্রতিবিম্বিত করলেন তখন জর্মন মাত্রই গ্যোটের বিরাট ব্যক্তিত্ব অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারল।

রবীন্দ্রনাথকে সেভাবে দেখাবার মতো মনীষী এখনও এ জগতে আসেননি।

প্রার্থনা করি, আমাদের জীবদ্দশায়ই তিনি আসেন। বড় বাসনা ছিল, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিশ্বরূপটি দেখে যাই ॥

www.pathagar.com

ইউরোপ ও রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে যাঁরাই অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ইউরোপবাসী রবীন্দ্রনাথকে চেনে কত অল্পই। অথচ আমরা সকলেই জানি যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি যখন প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হয় তখন তিনি সেদেশে কী অদ্ভুত সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তার কয়েক বৎসর পর যখন কবি কন্টিনেন্ট ভ্রমণ করেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য কী অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে কত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে। এবং সর্বশেষ কথা এ জানি যে, ক্রমে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ম্লান হতে থাকে, এমনকি একাধিক সুপরিচিত সমালোচককে একথাও বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল কোন স্থূল বুদ্ধিতে এবং যাঁরা টমসনের রবীন্দ্রজীবনী মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাও হতাশ হলেন এই দেখে যে তিনি পর্যন্ত কাব্যরসে আদৌ নিমজ্জিত হতে পারেননি, অথচ তিনি যে খানিকটা বাঙলা ভাষা জানতেন সেকথাও সত্য। এ বইখানা রবীন্দ্রনাথকেও কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং বোধহয় তার প্রধান কারণ তিনিও হতাশ হলেন এই ভেবে যে, টমসনই যখন তাঁর কাব্যরস আস্বাদন করতে পারলেন না তখন ইউরোপের সাধারণ পাঠক করবে কী প্রকারে?

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে যখন ইংরেজ কবিগণ মত্ত তখন এদেশে আমরা আশ্চর্য হয়েছি যে এর ভিতর ইংরেজ কী পাচ্ছে যে তার এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। গীতাঞ্জলির গান বাঙলায় গাওয়া হয়— ইংরেজিতে তা নেই— বাঙলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে এ গানগুলো— ইংরেজিতে যেন চুম্বক, এবং বাঙলা কবিতারূপে এ গানগুলোর যে গীতিরস পাই (সুর বাদ দিয়েও) ইংরেজিতে তা কই! মনকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, হয়তো ইংরেজ পাঠক ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে তার মাতৃভাষায় এমন এক ইংরেজি গীতিরস পায় যেটা আমাদের অনভ্যস্ত কান ধরতে পারে না।

হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণপারে।

এটিকে কবিতারূপে পড়ে আমরা যে গীতিরস পাই,

Like a flock of homesick cranes flying night & day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its enternal home, in one salutation to Thee:

পড়ে তো সে-রস পাইনে। তখন মনকে বুঝিয়েছি যে হয়তো এই ইংরেজি অনুবাদে শব্দগুলো এমনভাবে চয়ন ও সাজানো হয়েছে যে ইংরেজ তার ভিতর আপন গীতিরস পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে।

গীতাঞ্জলির ফরাসি জর্মন এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ থেকে। সেসব অনুবাদে মূলের রস আরও পরিশুষ্ক হওয়ার কথা।

www.pathagar.com

রসের দিকের কিছুটা বাদ দিয়ে যখন ভাবের দিকটা দেখি তখন বরঞ্চ খানিকটা বুঝতে পারি, ইংরেজি এবং অংশত ফরাসি-জর্মন তথা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার গীতাঞ্জলি কেন গুণীজনকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহার করেছেন কিঞ্চিৎ প্রাচীন ইংরেজি। সে ভাষা কিছুটা ইংরেজি বাইবেলের ভাষা। এদেশের তুলনা নিলে বলব, যে বাঙালি বৈষ্ণবভক্ত *বিদ্যাপতি* পড়ে আনন্দ পান তিনি *ভানুসিংহের পদাবলী*র ভাষা পড়েই মুগ্ধ হবেন, তার গভীরে অতখানি প্রবেশ করবেন না— বিশেষত সে যদি অবাঙালি হয় এবং বৈষ্ণব না হয়ে ম্লেচ্ছ-যবন হয়।

দ্বিতীয়ত গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রভু-সখা-প্রিয়কে যে রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে ইংরেজ কিছুটা পরিচিত। বাইবেলের 'সং অব সংস' (সং অব সলোমন) এবং 'সাম্‌স' গীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মিলটি অনায়াসেই দেখতে পাবেন। পার্থক্য শুধু এই যে 'সং অব সলোমনে' প্রেমের দৈহিক দিকটা অনেকখানি প্রাধান্য পেয়েছে— গীতাঞ্জলিতে তা নয়— এবং সামস্‌ গীতিতে ভগবানের প্রিয় স্বরূপ কম, তিনি সেখানে দয়াল প্রভু, তিনি সর্বশক্তিমান কর্তা, তিনি ইচ্ছে করলে এ দাসকে তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে সান্‌ খোয়ান দে লা ক্রুসের ভগবদ্‌ প্রেমের কাব্য। এর মিল 'সং অব সংসের' সঙ্গে— কিঞ্চিৎ কায়িক প্রেম। যে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন তিনি সান্‌ খোয়ানের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রচনাতে এঁর প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। কিছুটা এই কারণেও ইয়েটস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সহজ হয়েছিল।

তৃতীয়ত গীতাঞ্জলির প্রভু-সখা-প্রিয় কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের ভগবান নহেন। ইংলন্ডে এরকম অনেক ভাবুক আছেন যাঁরা খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, এবং তাই সম্প্রদায়মুক্ত চিত্তে ঈশ্বরের কাছে আসতে চান। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু (এখানে ব্রাহ্ম-হিন্দুর পার্থক্যের কথা উঠছে না— বিদেশির কাছে এ-দেশের ব্রাহ্মণ মাত্রই যে হিন্দু সে তারা ধরে নেয়) হয়েও যে ব্রহ্মকে তাঁদের সামনে কাব্যে রসস্বরূপ প্রকাশ করলেন তা দেখে তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এইসব সংস্কারমুক্ত ইংরেজ দূর-বিদেশির আরাধনার ধন আপন সাধনার ধনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে— দুই-ই এক ভগবান। তারা আশ্বস্ত হল, তারা একা নয়। খ্রিস্টধর্মে আস্থা হারিয়েও তারা দেখে ধর্ম তাদের ছাড়েনি।

অনেকটা এইসব কারণেই 'ডাকঘর' তাই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তাই আমার মনে হয়, ইংরেজ রবীন্দ্রনাথের ভাবের দিকটাই দেখেছিল বেশি, তাঁর রস-সৃষ্টি তারা ধরতে পারেনি। আমরা বাঙালি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চিনি প্রধানত রসস্রষ্টারূপে; তাই তাঁর বর্ষাবসন্তের গীতি, তাঁর বিরহ-বেদনার প্রতি প্রীতি আমাদের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যতই অভিমান করে থাকুন না কেন, আমরা তাঁকে চিনেছি অন্য যে কোনও জাত অপেক্ষা বেশি।

তা সে যাই হোক, মূলকথায় ফিরে গিয়ে বলি, ভাবের পরিবর্তন হয় রসের পরিবর্তনের চেয়ে বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজেতা ইংলন্ডেই ভগবানের বিশ্বাস একসঙ্গে অনেকখানি কমে যায়। বরঞ্চ পরাজিত জর্মনি আর কিছু না পেয়ে ভগবানকে আঁকড়ে ধরল। ইংলন্ডে তাঁর জনপ্রিয়তা কমল; জর্মনিতে বাড়ল। তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই জর্মন যখন

www.pathagar.com

আপন পায়ে খানিকটে দাঁড়াল সেখানেও তাঁর জনপ্রিয়তা কমল— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটা লক্ষ করে উল্লেখ করেছেন।

এর সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্থূল কথা বলে রাখি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভাবের দিক দিয়ে হয়তো-বা ইউরোপের দু একজন গুণীজ্ঞানী গীতাঞ্জলির ব্রহ্মকে চিনতে পারবেন, কিন্তু ওই মহাদেশের সাধারণজন হয় তাঁকে অবহেলা করে, নয় চার্চের ভগবানকে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। আপন চেষ্টায় রসস্বরূপ পরমেশ্বরকে পাবার চেষ্টা তাদের নেই বললেও চলে। কিছুটা আছে ক্যাথলিক মিস্টিক ফাদারদের ভিতর— কিন্তু তাঁরাও আপন ধর্মের দিগদর্শন নিয়েই সন্তুষ্ট। কাজেই এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ইউরোপে কখনও জনপ্রিয় হবেন আমার মনে হয় না।

তাই যখন তাঁর খ্যাতি ইউরোপে কমল, আমরা আশ্চর্য হইনি।

আজ যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিশ্ববাসী তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছে তাতে আমরা খুশি। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করলে জানব, আজ পৃথিবীর সব দেশই আমাদের প্রিয় হতে চায়— তার অন্যতম কারণদ্বয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। এ উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয়ের উৎস থেকে উদ্বেলিত হয়নি। তাই বর্ষশেষে আবার যদি দেখি— ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যা দেখেছিলুম— সে জোয়ার কোনও চিহ্নই রেখে যায়নি তাতে যেন বিস্মিত বা মর্মাহত না হই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস ইউরোপ একদিন রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় পাবে। সেটা সম্ভব হবে যেদিন ইংরেজ ফরাসি জর্মনের বেশকিছু লোক বাঙলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর রসসৃষ্টির অনুবাদ করবে। তার কিছু কিছু লক্ষণ এদিক-ওদিক দেখতে পাচ্ছি। একাধিক ক্যাথলিক ইতোমধ্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখে নিয়েছেন এবং একাধিক জর্মন এই নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, আরও অনেক বিদেশি বাঙলা শিখবে এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথের রচনা উপযুক্ত লোক দ্বারা অনূদিত হবে।

আমার ভয় শুধু একটি, এ দেশে তথা বিদেশে ক্লাসিকদের সম্মান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। মানুষ মনোরঞ্জক দিকটাই দেখছে বেশি; ক্লাসিকদের স্থায়ী গভীর সচ্চিদানন্দ রস তারা পরিশ্রম করে আস্বাদ করতে চায় না অথচ রবীন্দ্রনাথের মূল উৎস সেইখানেই।

সেই ভয় আমি কাটাই এই ভরসা করে যে, রেনেসাঁসও তো হয়। বিরক্ত হয়ে আধুনিককে বর্জন করে মানুষ এ সংসারে কত-না বার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের সন্ধানে বেরিয়ে নিত্য নবীনের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিত্য নবীন।

কবিগুরু গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিষ্ঠান নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এঁদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, কোনও লেখক যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলক্ষ করে কোনও রচনা না পাঠান। এই

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানটির মনে হয়তো শঙ্কা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাম করে এঁরা হয়তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখে বসবেন। শঙ্কাটা কিছু অমূলক নয়।

কিন্তু এ শর্তের ভিতর একটা গলদ রয়ে গেল। এই প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যাবে— দ্বিতীয় জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় এত দীর্ঘায়ু কেউ থাকবেন বলে ভরসা হয় না। কাজেই এই শতবার্ষিকীতে কেউই যদি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে চিনেছিলেন, সেকথা না লেখেন, তবে দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে যাঁরা আজকের দিনের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি নির্মাণ করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হবেন। অবশ্য এই নিয়ে যে অন্যত্র ভূরি ভূরি লেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু শতবার্ষিকীর নৈমিত্তিক ধ্যান একরকমের, অন্য নিত্য-রচনা অন্য ধরনের।

* * *

কিন্তু এই মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, তারও বর্ণনা দেওয়া কি সহজ? প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ, আর পাঁচজন কবি কিংবা গায়কের মতো আপন কবিতা বা গান রচনা করার পর চট করে ধুলার সংসারে ফিরে এসে রাম-শ্যাম-যদুর মতো তাস পিটে, হুঁকো টেনে দিন কাটাতেন না। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসার পরও তাঁর বেশভূষা, বাক্যালাপ, আচার-আচরণে, দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে (আশ্রমের ছাত্রদের কথা হচ্ছে) তিনি কবিই থেকে যেতেন। এমনকি, আশ্রমের নর্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় কবিজনোচিত কোনও বাক্য বেমানানসই মনে হলে— এবং মনে রাখা উচিত সেই বেমানানসইটাও তাঁর কবিসুলভ হৃদয়ই ধরে নিত— সেটাকে তিনি অন্তত কিছুটা হাস্যরস দিয়ে উচ্চপর্যায়ে তুলে নিয়ে আসতেন। কিংবা সামান্য একটু অন্যধরনের একটি উদাহরণ নিন।

তাঁর ভৃত্য বনমালী তাঁর জন্য এক গেলাস শরবত এনে দেখে বাইরের কে বসে আছেন বনমালী থেমে যাওয়াতে কবি বললেন, 'ওগো বনমালী দ্বিধা কেন?' কবি বলেছিলেন সাধারণ ধুলো-মাটির দৈনন্দিন ভাষাকে একটু মধুরতর করার জন্যে। অথচ বাক্যটি তাঁর নিজের মনেও এমনই চাঞ্চল্য তুলল যে তিনি সেদিনই গান রচনা করলেন,

হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরেতে
মন কেন গেল ঠেকি ॥

এমনকি কমলালেবুর সওগাত পেয়ে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যে তাঁকে সেগুলো নিবেদন করেছিল, তার স্মরণে তিনি যেসব কবিতা লিখেছেন, সেগুলো অনেক পাঠকই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে না-চিনেও স্মরণ করতে পারবেন।

এতেও কিন্তু তাঁর এদিকটার পরিচয় অতিশয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা তাঁকে প্রধানত চিনেছি গুরুরূপে। সে সম্বন্ধে সুধীরঞ্জন দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তর লিখেছেন— আমারও সংক্ষেপে লেখার সুযোগ অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, আমরা যেটুকু অসম্পূর্ণভাবে দেখেছি সেটিও যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারিনি।

এমন গুরু হয় না। পড়াবার সময় তিনি কখনও বাক্য অসম্পূর্ণ রাখতেন না— প্যারেনথেসিসে, অর্থাৎ এক বাক্যের ভিতর অন্য বাক্য এনে কখনও ছাত্রদের মনে দ্বিধার

www.pathagar.com

সৃষ্টিও করতেন না, এবং প্রত্যেকটি বক্তব্য তাঁর পরিপূর্ণ মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতেন। আমার মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর ক্লাস-পড়ানো যদি কেউ শব্দে শব্দে লিখে রাখতে পারত তবে সে রচনা তাঁর 'পঞ্চভূত' কিংবা অন্য যে কোনও শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারত। এমনকি একথাও অনায়াসে বলা যায়, সে হত এক অদ্ভুত তৃতীয় ধরনের রচনা। এবং আশ্চর্য, তারই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের প্রশ্নও জিগ্যেস করেছেন, উত্তরগুলো শুদ্ধ করে দিয়েছেন, তার একটি-আধটি শব্দ বদলে কিংবা সামান্য এদিক-ওদিক সরিয়ে তাকে প্রায় সুষ্ঠু ভদ্র-গদ্যে পরিণত করেছেন।

ছাত্রের সব প্রশ্নের উত্তর কোনও গুরু দিতে পারেন কি না বলা কঠিন, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আমাদের সম্ভব-অসম্ভব সব প্রশ্নের কথা ভেবে নিয়ে প্রতিদিন তিনি অনেক মূল্যবান (মূল্যবান এই অর্থে বলছি যে, তিনি যদি ওই সময়ে বিশ্বজনের জন্য গান কিংবা কবিতা রচনা করতেন, তবে তারা হয়তো বেশি উপকৃত হত) সময় ব্যয় করে 'পড়া তৈরি' করে আসতেন। শেলি-কিটসের বেলা তা না-হয় হল, কিন্তু একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়, তিনি তাঁর আপন রচনা 'বলাকা' পড়াবার সময়ে পূর্বে দেখে নিয়ে রেখে তৈরি হয়ে আসতেন!

এই ক্লাসেরই বৃহত্তর রূপ আমাদের সাহিত্য-সভা।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিয়মানুরাগী ছিলেন। যদিও আমাদের সাহিত্য-সভা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার তবু তিনি যেভাবে সে সভা চালাতেন, তার থেকে মনে হত— অন্তত আইনের দিক দিয়ে— যেন তিনি কোনও লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারের মিটিং পরিচালনা করছেন। কোথায় কখন সভা হবে তার কর্মসূচি বা এজেন্ডা নিয়মানুযায়ী হল কি না, প্রত্যেকটি জিনিস তিনি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। একটি সামান্য উদাহরণ দিই।

সভাতে পাকাপাকিভাবে এজেন্ডা অনুযায়ী গান, প্রতিবেদন-পাঠ (মিনিটস অব দি লাস্ট মিটিং), প্রতিবেদনে কোনও আপত্তি থাকলে সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে তার পরিবর্তন, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদির পর সাধারণের বক্তব্য (জেনারেল ডিসকাশন) শেষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির বক্তব্য বলতেন। এবং বিষয় গুরুতর হলে তাঁকে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতেও শুনেছি।

একদা প্রতিবেদন পাঠের সময় সভার সবকিছু উল্লেখ করার পর আমি পড়ে যাচ্ছি। 'সর্বশেষে গুরুদেব সভাপতির বক্তব্যে বলেন—'

এখানে এসে আমি থামলুম; কারণ গুরুদেব তাঁর পূর্ববর্তী সভাতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং আমার প্রতিবেদনে তার সারাংশ লিখতে গিয়ে সাধারণ খাতার প্রায় আট পৃষ্ঠা লেগেছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগল, এই দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার প্রতিবেদন শোনার মতো ধৈর্য গুরুদেবের থাকবে কি না। কারণ যে জিনিস তিনি অতি সুন্দর ভাষায় একঘণ্টা ধরে বলেছেন, তারই সারাংশ লিখেছে একটি আঠারো বছরের বালক তার কাঁচা, অসংলগ্ন ভাষায়। সেটা শোনা কবির পক্ষে স্বভাবতই পীড়াদায়ক হওয়ার কথা। আমি তাই পড়া বন্ধ করে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাভরা স্বরে শুধালুম, 'এই সারাংশটি আট পৃষ্ঠার। পড়ব কি?' তিনি তাঁর চিবুকে হাত রেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'পড়ো'। আমাকে পড়তে হল। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় সভাতেও তারই পুনরাবৃত্তি। এবারেও সেই দ্বিধা প্রকাশ করলুম। একই উত্তর, 'পড়ো'।

www.pathagar.com

তখন বুঝলুম, তিনি সম্পূর্ণ না শুনে প্রতিবেদন-পুস্তকে তাঁর নাম সই করবেন না। সেটা নিয়মানুযায়ী— লিগেল নয়।

কিন্তু পাঠককে চিন্তা করতে অনুরোধ করি, আঠারো বছরের ছোকরার কাঁচা বাঙলায় লেখা তাঁরই সর্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতার বিকলাঙ্গ প্রতিবেদন শোনার মতো পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতাও তিনি এড়িয়ে যেতেন না। আমার শুধু মনে হত, এই অযথা কালক্ষয় না করে ওই সময়টাকে বাঁচিয়ে তিনি তো কোনও মহৎ কাজ করতে পারতেন।

* * *

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু এবং তিনি কবি। তাই তিনি আমাদের কবিগুরু। তিনি অবশ্য তাবৎ বাঙালির কাছেই 'কবিগুরু', কিন্তু সেটা অন্যার্থে অন্য সমাস। আমরা তাঁর কবি-রূপ দেখেছি অন্যভাবে।

তিনি দিনের পর দিন কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প এবং বিশেষ করে গান রচনা করে যেতেন এবং প্রত্যেকটি শেষ হলেই আমাদের ডেকে শোনাতেন। এই ভিন্ন রূপটি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সচেতন ছিলেন।

কোনও কবিতা লেখা শেষ হলে তিনি সেটি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কপি করে পাঠাতেন; একবার একটি গান পাঠিয়ে সঙ্গের চিঠিতে লেখেন—

'বলা বাহুল্য, বর্ষামঙ্গলের গানগুলো একটা-একটা করে রচনা করা হয়েছে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিন শুনবে, তারা সবগুলো একসঙ্গে পাবে। প্রত্যেক গান যে অবকাশের সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা দেখবে। আমার বিবেচনায় এতে একটা বড় জিনিসের অভাব ঘটল। আকাশের তারাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ব-বেনের বাজারে দামি জিনিস হতেও পারে, কিন্তু রসিকেরা জানে যে, ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে কিন্তু ওটা তারাটির চেয়েও কম দামি নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে, সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা না করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তুভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশি। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিতা পড়া হত, দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে— তখন ছাপাখানার দৈত্য কবিতার চারদিকের সময়াকাশকে কালি দিয়ে লেপে দেয়নি। কবিও প্রতিদিন স্বতন্ত্র পুরস্কার পেতেন— উপভোগটা হাইড্রলিক জাঁতায় সংক্ষিপ্ত পিণ্ডাকারে এক গ্রাসের পরিমাণে গলায় তলিয়ে যেত না। লাইব্রেরিলোকে যেদিন কবিতার নির্বাসন হয়েছে, সেদিন কানে শোনার কবিতাকে চোখে-দেখার শিকল পরানো হল, কালের আদরের ধন পাব্লিশারের হাটের ভিড়ে হল নাকাল। উপায় নেই— নানা কারণে এটা হয়ে পড়েছে জটলা পাকানোর যুগ— কবিতাকেও অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার কলেজপাড়ায় অমনিবাসে চড়ে। আজ বাদলার দিনে আমার মন নিশ্বাস ফেলে বলছে, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"— দুর্যোগে জন্মালুম ছাপার কালিদাস হয়ে— মাধবিকা, মালবিকারা কবিতা কিনে পড়ে— জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে না। ইতি— ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬' (দেশ, ১৩৬৮, পৃ. ৮৩৫)!

আমরা তাঁকে পেয়েছি যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন— তাঁরই ভাষায় বলি, 'আজকের দিনের মাধবিকা, মালবিকার মতো নয়।'

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে গঙ্গাজলে যে গঙ্গাপুজো করলুম, তার পর নিজের আর কোন অর্ঘ্য এনে বিড়ম্বিত হই?

www.pathagar.com

মোল্লা ফয়েজ

অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের স্মরণ থাকিবার কথা আমানউল্লা আফগানিস্তানকে রাতারাতি ফ্রান্সভূমিতে পরিবর্তন করিতে গিয়া কী দুরবস্থায় রাজত্ব হারান। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কাবুল হইতে পলায়ন করিলে পর দস্যু-দলপতি হবিবউল্লা, তখল্লুস বাচ্চা-ই-সকাও (ভারতবর্ষে বাচ্চা-সক্কা নামে পরিচিত) কাবুল ও উত্তর আফগানিস্তানের বাদশাহ হন।

বাচ্চা ডাকাত। কাজেই রাজা হইয়া কাবুলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার দুরভিসন্ধি তাঁহার ছিল না। শান্তি স্থাপন করা অর্থ লুটতরাজ বন্ধ করা, আর লুটতরাজ বন্ধ করিলে তাঁহার সৈন্যেরাই-বা মানিবে কেন? তাহাদিগকে তো ওই লোভেই দলবদ্ধ করিয়া আমানউল্লার সঙ্গে লড়ানো হইল। রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার কথাই উঠে না, কারণ আমানউল্লা তাহার অর্ধেক ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন নানারকম বিবেকবুদ্ধিহীন, অর্থগৃধ্নু দলপতিদিগকে বাচ্চার সঙ্গে লড়িবার জন্য প্ররোচিত করিতে গিয়া। দলপতিরা টাকা লইয়াছিল অসঙ্কোচে ও ততোধিক অসঙ্কোচে ও তৎপরতার সঙ্গে টাকা লইয়া উধাও-ও তাহারা হইয়াছিল। কিছু দিয়া কিছু হাতে রাখিয়া, টালবাহানা দিয়া লড়ানোর হুঁশিয়ার ফেরেব্বাজি জানিতেন আমানউল্লার পিতা আমির হবিবুল্লা ও তাঁহার পিতামহ, পরমনমস্য আমির আব্দুর রহমান।

'জলের মতো অর্থ ব্যয়' আর কলকাতা শহরে বলা চলে না কাজেই বলি ইনফ্লেশেনি অর্থ ব্যয় করিয়া যখন আমানউল্লা লড়াই ও অর্থ উভয়ই হারাইলেন তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক কালরাত্রিতে তিনি বাকি অর্ধেক অর্থ লইয়া কান্দাহার মামার বাড়ি পলায়ন করিলেন— বিপদকালে আমির-ফকির সকলেই মামার বাড়ির সন্ধান লয়।

কান্দাহার ইস্তিহার মেহমানদারি করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ দিতে নারাজ এ তত্ত্বটিও বুঝাইয়া দিল। আমানউল্লা তখন দেশত্যাগ করিলেন।

এদিকে বাচ্চার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমস্তম্ভীয় মোল্লাদের জেল্লাই বাড়িল কিন্তু অর্থাগম সরগরম হইল না। বাচ্চার সৈন্যকেই যখন লুট করিয়া জান বাঁচাইতে হয়, তখন মোল্লার তত্ত্বতালাশ করিবে কোন ইয়ার— ডাকুর সর্দারের তো কথাই উঠে না। তবুও বাচ্চা কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য মোল্লাদের চেল্লাচেল্লিতে কান দিলেন— তাঁহাদিগকে নানারকম ছোটখাটো চাকরি দিলেন। কিন্তু যে দেশে বিশেষ কায়দায় পাগড়ি পরিলেই মোল্লা হওয়া যায় সেখানে মোল্লার সংখ্যা সাকুল্যে বিল্লির চেয়ে বেশি। বাচ্চা নিরুপায় হইয়া ফালতুদিগকে 'মুহতসিব' কর্মে নিযুক্ত করিয়া কাবুল বাসিন্দাদিগের পশ্চাতে লেলাইয়া দিলেন।

মুহতসিব এক অদ্ভুত কর্মচারী। ইনি একরকম 'রিলিজিয়স পুলিশম্যান'। তাঁহার কর্ম হাতে চাবুক লইয়া রাস্তাঘাটে নিরীহ প্রাণীকে নানারকমে উদ্ব্যস্ত করা। 'আজানের পর তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করিতেছ কেন, ঈদের নামাজে কয়বার সেজদা দিতে হয়, আসরের নামাজের পর নফল পড়া মুনাসিব কি না, ইফতারের নিয়ম কী?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইলে মুহতসিব নাগরিকের পৃষ্ঠদেশে নির্মম চাবুক লাগান, অথবা নাগরিক ঠিকঠিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মুহতসিবের দক্ষিণহস্তে ক্ষিপ্রগতিতে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন নহে— পৃষ্ঠরক্ষা করে। মুহতসিব প্রতিষ্ঠানই খারাপ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু অজ্ঞ মোল্লাকে বেতন না দিয়া নাগরিকের পশ্চাতে লাগাইয়া দিলে সে যে

www.pathagar.com

বহুদিন যাবৎ গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করিয়া কাননস্থ মহিষকে তাড়না করিবে না তাহাতে কী সন্দেহ? বিজ্ঞ এবং ধার্মিক মোল্লারা এই মতই পোষণ করিতেন।

১৯২৮-২৯-এর শীতকালে কাবুলের রাস্তায় একদিকে লুটতরাজ অন্যদিকে মুহতসিব।

আমাকে একদিন ওই সময় বিশেষ কর্মোপলক্ষে বাহির হইতে হইয়াছিল। বিশেষ কি, অত্যন্ত বিশেষ কর্ম থাকিলেও তখন কেহ বাহির হইত না। কারণ যেখানে মরণ-বাঁচন সমস্যা সেখানে রাস্তায় নিশ্চয় প্রাণ দিতে বাহির হইবে কে? কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দুইটি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম— বন্ধুবরকে রাখিয়া গিয়াছিলাম তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে সাহস দিতে ও নিজে ডাক্তারের সন্ধানে।

পথে মোল্লা আবুল ফয়েজের সঙ্গে দেখা। তিনি ছিলেন মকতব-ই-হবিবিয়ার ধর্মশাস্ত্র বা দীনিয়াতের অধ্যাপক— আমার সহকর্মী। মোল্লাজি ছিলেন পরস্পরবিরোধী আচার-বিশ্বাসের মনোয়ারি জাহাজ। দেওবন্দের টাইটল কোর্স পাস ভাষ্যকর দিগ্‌গজ মৌলানা— অথচ পরিতেন সুট, পাগড়ি না— কারাকুলি টুপি অথবা ফেল্ট হ্যাট, গোঁফ ছিল কিন্তু দাড়ি অতি নিয়মিত কামাইতেন! নামাজ কড়াগণ্ডায় আদায় করিতেন, রোজা ফাঁকি দিতেন না; কিন্তু অন্য কোনও ধর্মকর্ম বা ধর্মালোচনায় কখনও তাঁহাকে লিপ্ত হইতে দেখি নাই। অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন; কিন্তু কলেজের অন্যান্য মোল্লাদের সঙ্গে মসলা-মসাইল লইয়া কখনও বাকবিতণ্ডা করিতেন না। আমানউল্লার পক্ষ লইয়া হামেশা লড়িতেন এবং আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষা করার একমাত্র উপায় যে ইংরেজ-রুশকে বাঁদরনাচ নাচাইয়া সে বিষয়ে তাহার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রকাশ্যে সেই রায়ই জাহির করিতেন।

তাঁহাকে রাস্তায় পাইয়া যেন জান কলবে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমার সেই কলব ধুকুধুকু করিতে লাগিল। বাচ্চার ভয়ে তখন বিদেশি ছাড়া কেহই সুট পরিবার সাহস করিত না। প্যারিস-ফের্তা পয়লা নম্বরের কাবুলি সায়েবরা তখন কুড়িগজি শেলওয়ার ও বাইশ-গজি পাগড়ি পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ সেই মারাত্মক চেকের কোটপাতলুন পরিয়া নির্বিকারচিত্তে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও আমার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব নিজেই করিয়া নিজেই বহাল করিলেন। আমি তাঁহাকে ওই উৎকট সঙ্কটের সময় কেন সুট পরিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইব এমন সময় কোথা হইতে এক ভীষণ-দর্শন মুহতসিব ততোধিক রোমাঞ্চন প্রজনন চাবুক হস্তে লইয়া আমাদিগকে ক্যাক্ করিয়া ধরিল।

আমার দিকে তাকাইয়া মুহতসিবজি বলিলেন, 'আপনি (শুমা) বিদেশি, আপনার উপর আমার কোনও হক নাই। আপনি যাইতে পারেন।'

বান্ধব-ত্যাগ সংকটের সময় অনুচিত। বিশেষত সেই বান্ধব ত্যাগ করিয়া যখন বৈদ্যরাজের বাড়িতে একা যাওয়া ততোধিক অনুচিত অর্থাৎ প্রাণহানির সম্ভাবনা। সবিনয়ে বলিলাম, 'হুজুর যদি ইজাজত দেন তবে দোস্তের আখেরি হাল কী হয় দেখিয়া যাইবার ইরাদা।' মুহতসিব বিরক্তির সঙ্গে বাঞ্ছিত ইজাজত মঞ্জুর করিলেন।

এদিকে দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ ঊর্ধ্বমুখে, নির্বিকারচিত্তে কাবুল পর্বত-গাত্রে চিনার পত্রে সূর্যরশ্মির ক্রীড়াজনিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অভিনিবেশ সহযোগে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোন বিপদে, কোন ভাবে, তাহার খেয়ালই নাই।

www.pathagar.com

মুহতসিবের মুখ দিয়া তখন শিকার ভোজনের লালা পড়িতেছে। সুটপরা কাবুলি! বেদীন নিশ্চয়ই 'দীনের' 'দ'ও জানে না, ইহাকে দীনিয়াতের তর্ক-বিতর্কের দ'য়ে মজাইতে ডুবাইতে কতক্ষণ। তার পর বিলক্ষণ অর্থাগম।

হায় মুহতসিব, তোমার হাতে চাবুক থাকুক আর না-ই থাকুক, জানিতে না কোন বাঘার খপ্পরে পড়িয়াছ!

হুঙ্কার দিয়া, শহর-আরা হইতে চিল-শকুন প্রকম্পিত করিয়া, মুহতসিব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল তো দেখি (ফারসিতে দুইরকম সম্বোধন আছে, 'শুমা' অর্থাৎ 'আপনি' বা 'তুমি', আর 'তু' অর্থাৎ তুই— অপরিচিত কাহাকেও 'তু' বলা অভদ্রতার চরম লক্ষণ) কোনও ইঁদারায় ইঁদুর পড়িয়া মরিয়া গেলে, সেই ইঁদারা হইতে কয় ডোল পানি তুলিলে পর সেই পানি নামাজের জন্য পুনরায় পাক বা জাহিজ হইবে?'

প্রশ্নটি কিছু সৃষ্টিছাড়া নহে। কিন্তু সাধারণ নাগরিককে এহেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দুষ্টবুদ্ধির কর্ম। মুহতসিবের কর্তব্য সাধারণ নাগরিককে নিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নামাজ রোজা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা, সেগুলি না জানিলে ফর্জকর্মগুলো আদায় করা যায় না। ইঁদারা কোন অবস্থায় পাক আর কোন অবস্থায় না-পাক এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন আলিম মৌলবি-মৌলানারা। কারণ কাহারও ইঁদারায় ইঁদুর পড়িলে ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরি দীন-ঘাতি নয় যে, তাহার ফৈসালা না জানিলে তদ্দণ্ডেই কাফির হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা। সাধারণ নাগরিককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অর্থ আর কিছুই নহে, তা হোকে বিপদারণ্যে নিক্ষেপ করা ও তৎপরে গুলি করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা।

দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ তখনও তাঁহার সঙহিট্ গুনগুন করিতেছেন—

> 'শবি আগর আজ লবে ইয়ার বোসনেয় তলবম
> জোয়ান শওম, জসেরো জিন্দেগি দুবারা কুনম।'*

মুহতসিব এবারে দারুল আমান হইতে খাক-ই-জব্বার পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া চিৎকার করিলেন, 'শুনিতে পাস নাই?'

আবুল ফয়েজ বলিলেন, 'বিলক্ষণ, কিন্তু মসালা এতই প্যাঁচিদা যে মুক্ত রাজবর্ত্মে তাহার সমূহ আলোচনা ও সমস্যা-নিরূপণ সহজে সম্ভব হইবে না। এই তো কাওয়াখানা, চলুন চা খাইতে খাইতে শাস্ত্রালোচনা ও অন্যান্য বিবেচনা করা যাইবে।'

'অন্যান্য বিবেচনার' কথা শুনিয়া মুহতসিবের দুষ্টমুখে মিষ্টহাসি খেলিয়া গেল— যেন কাবুলি বরফে সোনালি রোদ— বাঙলায় যাহাকে বলে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি!'

কাওয়াখানায় ঢুকিয়া মোল্লা আবুল ফয়েজ ছোকরাকে দুইজনের জন্য চা আনিতে বলিলেন। আমি নিজের জন্য চা'র হুকুম দিতে গেলাম— মোল্লা ফয়েজ আমাকে থামাইয়া বলিলেন, 'সে কী কথা, দুইজনের চা তো তোমার-আমার জন্য। মুহতসিব সাহেবকে আমরা চা খাওয়াইব কী করিয়া, সে তো রিশওদ দেওয়া হইবে; তওবা তওবা, সে বড় অপকর্ম, কবিরা গুণাহ, ওস্তাগফিরুল্লাহি রব্বি জম্বি মিন কুল্লি, ওতুবু ইলাইহি।'

---

* আজি এ নিশীথে প্রিয় অধরেতে চুম্বন যদি পাই
যৌবন পাব, গোড়া হতে হবে এ জীবন দোহরাই।

www.pathagar.com

বলিয়া মুহতসিবের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া একগাল হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব রাগে সিদ্ধ-চিংড়ির রঙ ধারণ করিয়াছেন। তবে কাওয়াখানার পাবলিক অর্থাৎ আমানুন্নাসের সম্মুখে হুংকার দিবার ঠিক হিম্মত না পাইয়া বলিলেন, 'ফিতরতি রাখ্, সওয়ালের জবাব দে।'

মোল্লা ফয়েজ বলিলেন, খাস আরবিতে 'ইস্তানা সুগাইর', অর্থাৎ 'ধৈর্যংকুরু'; 'মসালা খয়নি পেচিদা' অর্থাৎ বড়ই প্যাঁচালো। ঝটপট উত্তর হয় না, প্রথম বিবেচনা করা উচিত— বায়দ দিদা শওদ— ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল? সেইসব মজবুত পোকাপোখতা মওজুদ না হওয়া পর্যন্ত জবাব অত্যন্ত কঠিন, বসিয়ার দুশওয়ার!'

মুহতসিব চটিয়া বলিলেন, 'কী বাজে বকিতেছ, ইঁদুর ইঁদারায় পড়িয়াছে সেই তো কাফি।'

মোল্লা ফয়েজ বারতিনেক অর্ধচক্রাকারে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে মস্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, 'ওয়াহ ওস্তাদ! কারণ বিনা কার্যের অনুসন্ধান— বেগয়ের ওয়াজহ্ তফতিশ বিলকুল বেফায়দা। প্রথম মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতে হইবে ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল। তাই তো বলিলাম, খসালা বসিয়ার পেচিদা। তবু আপনার তকদির ভালো— আমার মতো পাক্কা ফিকাহ্ জাননেওয়ালা পাইয়াছেন। শুনুন, আমার মনে হয়, ইঁদুরকে কোনও বিড়াল তাড়া করিয়াছিল, তাই সে প্রাণের ভয়ে ইঁদারার দিকে পালাইয়া যায় ও জলে ডুবিয়া মরে। নয় কি?'

এই বলিয়া মোল্লা ফয়েজ আমার দিকে এমনভাবে তাকাইলেন যেন গভীর অতল সমুদ্র হইতে অতি উজ্জ্বল বহুমূল্য খনি উত্তোলন করিয়াছেন। সে তাকানোতে আত্মশ্লাঘা যেন ঝিলমিল করিয়া উঠিল।

আমি হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে ঠিক আন্দাজ করিতে না পারিয়া অন্ধকারেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, 'বেশক, আলবৎ, জরুর।'

মোল্লা ফয়েজ পরম পরিতোষের দিলখুস হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'দেখুন মুহতসিব সাহেব, দীনদুনিয়ার মামেলায় নাদান এই নওজোয়ানও সায় দিতেছে। আচ্ছা, আবার মোদ্দা কথায় ফিরিয়া যাই। যখন প্রমাণসবুত হইল যে প্রাণরক্ষার্থে মূষিক কূপতলস্থ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন সে তো শহিদ। কারণ, কোন উল্লু জানে না, জান বাঁচানা ফর্জ? ফর্জকাম করিতে গিয়া ইঁদুর শহিদ হইল। তাহার কবর হইবে বিনা দফন কাফনে। তাহাই হইল। শহিদের লাশ পানি নাপাক করিবে কেন? পানি দুরুস্ত।'

মুহতসিব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'সে কী কথা?'

মোল্লা ফয়েজ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, 'ইস্তান্না, ইস্তান্না সুগহির, সবুর, সবুর। মসলা মসাইলের মামেলা, ধীরেসুস্থে কদম ফেলিতে হয়। ইঁদুর মরিবার আরও তো কারণ থাকিতে পারে, সব কি আর নাই?

এ-ও তো হইতে পারে যে, ইঁদুর জান বাঁচানার ফর্জকামে মশগুল ছিল না। সে ইঁদারার কিনারায় খেল-কুদ করিতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া জান কব্জ হইল। তাহা হইলে তো সে আলবত্তা শহিদ নহে। তবেই সওয়াল— আর সে সওয়াল আরও পেচিদা— ইঁদুরের দরজা কী? আমি বহুত তফতিশ করিয়া দেখিলাম, ইঁদুর যে খেল-কুদ করিতেছিল সে সম্পর্কে হদিস আছে। নওমুসলিম ও আনসাররা মদিনা শরিফে বহুত খেল-কুদ করিতেন কাফেরের সঙ্গে লড়িবার জন্য। লেহাজা কাজে কাজেই আনসাররা যাহা কর্তব্যকর্ম বিবেচনা

www.pathagar.com

করিয়া করিতেন তাহা নবির উপদেশ মতোই। অতএব ফর্জ কাজের ফায়দা না পাইলেও সে কর্ম সুন্নতুন্নবী, অর্থাৎ নবীর আদেশে-কৃত অতিশয় অনুমোদিত পুণ্য কাজ। তাহার লাশেও তো পানি না-পাক হইতে পারে না। কী বল, আগা, জান?' শুধাইয়া মোল্লা ফয়েজ আরেক দস্ত হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব বেশ কড়া সুরে বলিলেন, 'দেখ, ওসব ঠাট্টা-মশকরার কথা নয়—'

'সবুর সবুর', মোল্লা ফয়েজ বলিলেন 'সবুর করুন সরকার। বুঝিলাম, আপনার রসকস বিলকুল নাই। তবে মরুন গিয়া আপনার দশ ডোল না বারো ডোল পানি তুলিয়া— পাড়ার যে কোনও মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বাতলাইয়া দিবে। ভাবিয়াছিলাম, গুণীজনের সহবতে আসিয়াছেন, জখনি মসলা-মসাইল দুরুস্ত করিয়া লইবেন, সে মতলব যখন নাই তখন আমি বে-চারা না-চার। চল হে আগাজান, তুমি না হেকিমের বাড়ি যাইবে!'

বাহির হইবার সময় শুনিলাম, কাওয়াখানায় অট্টহাস্যের রোল উঠিয়াছে।

বড়লাটি লাঠি

বড়লাট ভারতবর্ষের নেতাদের ডাকিয়া তাঁহাদের হাতে লাঠি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; যাহাতে তাঁহারা গাঁটের খাইয়া মনের আনন্দে বনের মহিষ তাড়াইতে পারেন। নেতারা সে লাঠিটা আত্মসাৎ করিবার লোভে একে অন্যের বাড়িতে বিস্তর হাঁটাহাঁটি বিস্তর লাঠালাঠি করিয়া দেখিলেন ভাগ-বখরার প্রচুর বখেড়া। কেহ চায় সে লাঠির পাঁচ বিঘৎ, কেহ চায় তিন বিঘৎ, কেহ বলে লাঠিটা উদয়াস্ত বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিবে, কেহ বলে, না, যখন বড়লাটি লাঠি তখন লাট সাহেব ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ইত্যাকার বাক্য বিনিময় মনোমালিন্যের পর যখন কিছুতেই কোনওপ্রকার চরম নিষ্পত্তি হইল না, তখন লাট সাহেব প্রকাশ্যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াও গোপনে সানন্দে মৌলা আলিতে মানত পূর্ণ করিয়া লাঠিখানা মাচাঙে তুলিয়া রাখিলেন। লাঠিখানি তিলোত্তমার কার্য উত্তমরূপে সমাধান করিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় আবার সুন্দ-উপসুন্দ ভাই-ব্রাদার হইয়া কৌসিল রণাঙ্গনে দেবতাদের পর্যুদস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা হইলে শুষ্ক যষ্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বড়ভাই বলিতেছেন, ছোটভাই বড়ই অর্বাচীন; ছোটভাই বলিতেছেন, 'ভাই ভাই কোরও না বলছি। তুমি আমার ভাই নাকি, তুমি আমার জানি দুশমন।' তিলক-কাটা গোঁড়া ভাইকে ডাকা হয় নাই বলিয়া তিনি খণ্ডিত বিপ্রলব্ধের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন (এমনকি এই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাইবেন বলিয়া মস্কোর ফলার উপেক্ষা করিয়া অনুশোচনা করিতেছিলেন), লাঠির ভাগাভাগি হইল না দেখিয়া পরমানন্দে বগল বাজাইতেছেন।

আমরা দুঃখিত হই নাই, আনন্দিতও হই নাই। এ যষ্টি যে আমাদের তমসাবৃত দেশকে জ্যোতিতে লইয়া যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবে এমন আশা আমরা কখনও করি নাই। যুদ্ধের পর বেকারি, অর্থাভাব, পল্টনফের্তা সৈন্যের কৃষিক্ষেত্রাভাব ইত্যাদি যে গন্ধমাদন জগদ্দলন হইয়া আমাদের দেশের বুকের উপর চাপিবে, তাহা ওই যষ্টি-লিভার দ্বারা

www.pathagar.com

উত্তোলন করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত যষ্টি লোভ না করার আরও বাহান্নটা কারণ আছে তাহার নির্ঘণ্ট অথবা ফিরিস্তি উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন। শুধু বাহান্ন নম্বরের কারণটা নিবেদন করি; যাহারা মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করিতে পারে, তাহাদের সে রাজদণ্ড হর্ষের ন্যায় সন্তোষক্ষেত্রে দান করিবার ক্ষমতা নাই।

অপিচ অকপট চিত্তে স্বীকার করি যে, বিপক্ষে বাহান্নটা কারণ থাকা সত্ত্বেও যষ্টিতে লোভ করিবার সপক্ষে একটি প্রকৃষ্ট যুক্তি ছিল। সে যুক্তি নিবেদন করিতে আমাদের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়, কারণ যাঁহাদের জন্য আমাদের এই লোভ তাঁহারা হয়তো এই বৃত্তিকে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ভাবিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবেন।

আমরা রাজবন্দিদের কথা ভাবিতেছি। '৪২ আন্দোলনের দেশসেবক, তৎপূর্ববর্তী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী, স্টালিন-বিরোধী গণতন্ত্রী, জমিয়ত উল-উলামার কর্মীগণের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় যে, ইঁহাদের দুঃখের অবসান যদি হিমালয়ের কলির শৈলেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াই হয়, তবে তাহাই হউক। আত্মজন বন্ধুজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হইতে বৎসরের পর বৎসর বিরহ, দিনে দিনে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার তুষানল দাহন, যৌবনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির নিষ্পেষণ, কারাগারে পাষাণপ্রাচীরের অন্তরালে বিপাকের বিভীষিকাময় রজনী যাপন, আশাহীন উদ্যমহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ত ঘূর্ণ্যমান; তাঁহাদের অদৃষ্ট চক্রনেমিতে এইগুলিই তো তীক্ষ্ণ লৌহকীলক। স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হইয়া তাঁহাদের বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইবার আশা যখন দিন দিন মরীচিকার মতো চক্রবাল হইতে চক্রবালান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে তখন আর অত শাস্ত্র মিলাইয়া সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া কীই-বা হইবে। বলিতে ইচ্ছা করে, হে গিরীশ্বর, হে গণ (পার্টি) পতিগণ, যে যাহা চাও লও। বুকের-শিরা-ছিন্ন-করা-ভীষণ পূজাই যদি আত্মজনের মুক্তি দিবার একমাত্র বিধান হয়, তবে পরাজয় স্বীকার করিতেছি। যে ইংরাজ রাজত্বকে একদিন 'শয়তানি' নাম দিয়াছিলাম আজ তাহারই প্রতীক বড়লাটকে দেশের 'প্রধান নেতা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। মান-অপমান-বোধ আজ আর নাই। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, সে মুক্তি রাজকারা হইতে বাহির করিয়া নিত্য কারাগারে লইয়া যাইলেও তাহা শিরোধার্য।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় দেশ-বিদেশের বহু লোক বলিতেছেন, কংগ্রেস অসহযোগ করিয়া এমন অসহযোগমনা হইয়া গিয়াছে যে, সে শুভক্ষণ শুভ যোগ চিনিতে পারিল না। গুজরাতি প্রবচন আছে যে, 'ছুৎবায়ুগ্রস্ত লোককে স্বয়ং লক্ষ্মী টিকা পরাইতে আসিলেও সে অন্ধকূপের দিকে ছুটে মুখ ধুইবার জন্য'। অর্থাৎ কংগ্রেসের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজ্যচালন করা। অর্থাৎ তাহার পর দেশে যেসব আইন জারি হইবে, যেসব ক্রিয়াকর্ম হইবে তাহার জন্য ভারতবাসী দায়ী হইবে। বিদেশে যেসব ভারতীয় সৈন্য যাইবে সে মিশরেই হউক ফলস্তিনেই হউক আর মালয়েই হউক, তাহারা আইনত ভারতীয়— আর শুধু ভারতীয় নহে, স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া যাইবে; অথচ তাহাদের উপর কী আদেশ কখন হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধিকার জাতীয়তাবাদীদের থাকিবে না। বিস্তর বাক্যবিন্যাস করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, যদি মিশরি সৈন্যরা একদিন কলিকাতার জনতার উপর কোনও কারণে গুলি চালায়, আর যদি

www.pathagar.com

তখন ওয়াফদিরা মিশরের শাসনকর্তারূপে বিরাজ করেন— সে শাসন আইনত (ডি জুরে) হউক কার্যতই (ডি ফাক্টো) হউক— তাহা হইলে প্রাতঃস্মরণীয় সাইজগলুল পাশা ও তাঁহার অনুবর্তীগণের প্রতি আমাদের কতটুকু ভক্তি থাকিবে?

সে যাহাই হউক। কথাটা তুলিলাম এই কারণে যে, যদিও পরাধীন জাতির কোনও পলিটিকস্ থাকিতে পারে না, একমাত্র স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া, তবু মিশর আরব পরাধীন ভারতবর্ষের নেতাদের ক্রিয়াকলাপের খবর রাখে। মিশরি ফলস্তনিরা আমাকে প্রায় বলিতেন, 'আমাদের ক্ষুদ্র দেশ, আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবার ক্ষমতা রাখ। আর তোমরা যদি স্বরাজ পাও, তবে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যনীতির অবসান হইবে।' ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের এই ভক্তি-উচ্ছ্বাস শুনিয়া তখন লজ্জা অনুভব করিয়াছি। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসহিষ্ণু তাঁহারা স্পষ্ট বলিতেন যে, আমাদের পরাধীনতাই তাঁহাদের পরাধীনতাকে অটুট করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি কাবুলেও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে বিরক্ত আফগানদের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাদের দৌর্বল্যই ব্রিটিশ রাজনীতিকে পুষ্ট করিতেছে এবং আফগানিস্তানকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। আমি তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা সবসময় মানি নাই; এস্থলে কিন্তু আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে কাবুল হইতে মিশর তুর্কি পর্যন্ত সব দেশের লোক আমাদের গতিবিধির পর্যালোচনা করে। আমরা সাধারণত তাহাদের খবর রাখি না।

বড়লাটি পরিকল্পনা স্বীকার না করাতে যাঁহারা নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছেন, তাঁহাদের শুধু এইটুকু আমার বলিবার ইচ্ছা যে যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিছাড়া কিছু করেন নাই।

প্রথম ধরুন মিশর। মিশরের ওয়াফ্‌দ্ দল ভারতবর্ষের কংগ্রেস-লীগ অপেক্ষা অনেক বলীয়ান। সে দলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যদি কাজে লাগাইতে পারে তবে তাহার যে কত সুবিধা হয়, তাহার খবর ওয়াফ্‌দ্ জানে, সাম্রাজ্যবাদীও জানে। ওয়াফ্‌দ্ এত ভালো করিয়া জানে যে, যেসব বিভীষণরা সাহায্য করিতে অত্যধিক মাত্রায় প্রস্তুত তাহাদের পরিষ্কার বলিয়া দেয় চাচা যেন আপন প্রাণ বাঁচায়। পাঠকের অজানা নাই যে, কেহ কেহ নিজের প্রাণটা ঠিক রক্ষা করিতে পারে নাই। ইংরেজদের প্রভুত্বহীন মিশরে ওয়াফ্‌দ্ সর্বদাই রাজত্ব করে ও করিতে প্রস্তুত কিন্তু রাজা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক হইয়া পড়েন, তখন ওয়াফ্‌দ্ আর সহযোগ করিতে সম্মত হয় না। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ওয়াফ্‌দ্‌কে বলে, 'তোমরা রাজত্ব চালাইতেছ না কেন? তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের অনেক মিল, সে কি বুঝিতে পার না। এই ধর না সুয়েজ খাল। তাহার কন্‌ট্রাক্ট তো প্রায় শেষ হইল, নতুন কন্‌ট্রাক্টে তোমাদিগকে অনেক কিছু দিতে হইবে, সেজন্য আমরা প্রস্তুত। তোমরা তো এখন আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নহ, তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা তো মানিয়া লইয়াছি। তোমরা মুরুব্বি, আইস সুয়েজখাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। হ্যাঁ, আর সেই সুদানের ব্যাপারটা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুদানও তোমাদের ফিরাইয়া দিতে হইবে বইকি। সে তো আমরা সর্বদাই বলি। তবে কি না কোনও কোনও সুদানি (পাঠকের অবগতির জন্য বলি এইসব সুদানি নুন মুদলেয়ার গোত্রীয়) আপত্তি জানাইয়াছেন, মিটিং করিয়াছেন, ডেপুটেশন ভেজিয়াছেন। সেকথাটাও তো বিবেচনা করিতে হয়। তাই পরিষ্কার কিছু বলিতে পারিতেছি না। আর ছাই বলিবই-বা কাহাকে? তোমরা

www.pathagar.com

যদি দেশের রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না কর (দিশি ভাষায় বড়লাটি লাঠি গ্রহণ না কর), তবে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিব কী করিয়া, তোমাদের 'লুকস স্টান্ডি' কোথায় (অর্থাৎ মুসলমানি ভাষায় তওবা করিয়া কুফর্ ইন্‌কার কর, বৈদিক ভাষায়, হে ব্রাত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ কর)?

'আরে আরে, ও শ্যামদাস পালাস কেন? শোন্-ই না। সেই যে ইংরেজ পল্টন মিশরে বসিয়া আছে। সত্যি ভাই, তাতে মিশরিদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, আমরাও বুঝি। সে বিষয়েও একটা সমঝাওতার বড় প্রয়োজন। আহা কী মুশকিল, পালাচ্ছিস কোথায়?'

কিন্তু মুস্তফা নহ্‌হাজ্ পাশা ঘুঘু ছেলে। মুখের ভদ্রতা অন্তত উশকুরুকুম (থ্যাঙ্ক) পর্যন্ত না বলিয়া তিনি তুর্কি টুপির ফুন্না উড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আজহর মসজিদে আশ্রয় লন। এবং নহ্‌হাজ্ পাশার পিছনে থাকে তামাম দেশ— যাহারা থাকে না, তাহাদের বিপদের কথা পূর্বেই সভয়ে পেশ করিয়াছি।

মুস্তফা ও ওয়াফ্‌দিরা যে কত বড় লোভ সম্বরণ করিয়া সর্বপ্রকার সমঝাওতা, দরকষাকষি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। সুয়েজ খাল, সুদান, ব্রিটিশ পল্টন এই তিন প্রশ্নের সমাধান তাঁহাদের কাছে বৌদ্ধদের ত্রিশরণ অপেক্ষাও কাম্য।

ফলস্তিনের (প্যালেস্টাইন) মতো দুর্ভাগ্য দেশ পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি নাই। ইহুদি পঙ্গপাল দেশটাকে ছাইয়া ফেলিবার পূর্বে (১৯১৮) আরবদের সুখে দুঃখে দিন কাটিত— আফগানিস্তান যেমন তাহার দারিদ্র্য নিয়াও বাঁচিয়া আছে। ফলস্তিন তখন তুর্কির অধিকারে ছিল ও খলিফার অধঃপতনের যুগে তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কোনওপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছিল না বলিয়া ফলস্তিন নবীনেরা স্বরাজ্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে আন্দোলনের নেতারা সফলতা লাভ করিতেন কি না-করিতেন সে প্রশ্ন অবান্তর— মূল কথা এই যে ফলস্তিন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকিলেও আপামর জনসাধারণ জাফা কমলানেবুর চাষ করিয়া নিজের জমিতে নিজের কুঁড়েঘরে জীবনযাপন করিত।

কুক্ষণে তাহারা লরেনসের ধাপ্পায় ভুলিল, কুক্ষণে তাহারা খাল কাটিয়া ঘরে কুমির আনিল। সে ইতিহাস আজ আর তুলিব না। ইহুদিরা আসিয়া তাহাদের কোটি কোটি টাকার পুঁজির জোরে আরবদের ঘরছাড়া ভিটেছাড়া করিয়া এমন অবস্থায় পৌঁছাইল যে অবস্থায় মানুষ আর কিছু না করিতে পারিয়া দাঁত দিয়া কামড়ায়, নখ দিয়া ছিঁড়ে। পৃথিবীর সহানুভূতি ফলস্তিন পায় নাই, কারণ ইহুদিরা দুনিয়ার প্রেসের মালিক। তবু মনে আছে ১৯৩৪ সালে যখন আমি ফলস্তিনে বাস করিতেছিলাম তখন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে আমি আরবদের বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করেন। নিঃস্ব আর্ত আরবদের সেকথা শুনিয়া চক্ষে জল আসিতে আমি দেখিয়াছি। ফলস্তিনের বেদুইন চাষি হয়তো কংগ্রেস-লীগ চিনে না কিন্তু আমি জানি যে সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা খবর পাইয়াছেন যে, ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগের ভিতর দিয়া আরবদের মঙ্গল কামনা করিয়াছে। দোহাই কংগ্রেস-লীগের কর্তাগণ, যাহা খুশি কর কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদ লইয়া যেন গুর্খা পাঠান শিখ মারাঠা ফলস্তিনে না যায়।

ফলস্তিন পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করিয়াছে। কিন্তু ইহুদিরা গণতন্ত্র চায় না যতদিন না দেশের লোক শতকরা ৫১ জন ইহুদি হয়। ততদিন দলে দলে ইহুদি আমদানি হইতেছে।

www.pathagar.com

বয়তউল-মুকদ্দসের (জেরুজালেমের) ম্যুনিসিপ্যালিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তাহাতে যোগদান করিলে আরবদের অনেক ছোটখাটো সুবিধা হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখনই তাঁহারা দেখিতে পান ক্ষুদ্র সহযোগের দ্বারা তাঁহাদের বৃহত্তর স্বার্থ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে, তখনই তদ্দণ্ডেই তাঁহারা বড়লাটি দণ্ডকে হাতে লওয়া পণ্ডশ্রম মনে করেন। অসহিষ্ণু মহা-মুফতি তো ফ্যাসিস্ট দলেই যোগদান করিলেন। কিছুদিন হইল খবর আসিয়াছে, আরবরা মুকদ্দসে ম্যুনিসিপ্যালিটি বয়কট করাতে সরকার ছয়জন সিভিল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফলস্তিনদের বাঙাল রাগ। বিশেষ অপবিত্র তরল দ্রব্য দ্বারা বরঞ্চ চিঁড়া ভিজায় তবু জল ব্যবহার করে না।

লেবানন সিরিয়া ফরাসিকে তাড়াইবার জন্য ইংরাজের সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ভালো করিতেছে কি মন্দ করিতেছে— ফরাসিকে তাড়ানোর কথা হইতেছে, না ইংরেজের সাহায্য লওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে— আল্লাই জানেন। কণ্টক দিয়া কণ্টক উৎপাটিত করা হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষের কণ্টক যেন মুষল হইয়া বাহির না হয়। তখন যদুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তবু যেন কেহ মনে না করেন যে, লেবানন-সিরিয়া আজাদ-জিন্নার ব্যবহারে উষ্ণ হইয়া গোস্‌সা প্রকাশ করিবে। নিজেরাই তাহারা ফরাসি যষ্টি বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নীতি একই।

ইরাক ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান। সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ডাল বেশিদিন গলিবে না। গত যুদ্ধের পর তাহারাই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদীদের অর্ধচন্দ্র দিয়াছিল। ইরাকেও অসহিষ্ণু নেতার অভাব ছিল না, এখনও নাই।

হে মাতঃ মুক্তি দাও যাহাতে রোরুদ্যমান হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি— হেন ক্রন্দনধ্বনি ইরাকের ক্রন্দসী হইতে উত্থিত হইতেছে।

ইরানের স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রতি সকলেরই লোভ। রুশ সপত্নও হুঙ্কারধ্বনি ছাড়িতেছেন। যে রুশ একদিন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তর ইরানের স্বাধিকার ত্যাগ করিয়াছিল, সেই রুশই আজ ইরানের তেল চায়— কারণ তৈল একা আসে না। ঘৃত লবণ তৈলতণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন একসঙ্গে যায়। আজরবাইজানের প্রতি রুশের লোভ নাই একথা এত জোরে বলা হইতেছে যে, আমরা শেক্সপিয়রি ভাষায় বলি — 'মহারাজ, মহিলা বড় বেশি প্রতিবাদ করিতেছে।' রুশিয়া যে ইরানের প্রতি রুষিয়াছেন তাহাতে কোনও বাতুল সন্দেহ করিবে না। কিন্তু কহি তবু তো ইরানের ইংরেজ-প্রেম সঞ্চারিত হইতেছে না। ইরান ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল, 'হে কর্তারা, যুদ্ধ তো শেষ হইয়াছে, তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো বিদায় লইতেছ না কেন? তোমাদের জন্য আতর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, আর কেন, আমাদের অনেক শিক্ষা হইয়াছে।' কিন্তু মুজঃফর (বিজয়ী) নগরের কম্বল ছাড়িবে কেন?

শুনিয়াছি ইরানে নাকি ভারতীয় সৈন্য আছে; যদি থাকে তবে বড় ভাগ্য মনে গণি যে, ইহাদের কপালে বিজয়তিলক কংগ্রেস-লীগ অঙ্কন করেন নাই। লাঞ্ছন শ্বেত-গৈরিক-শ্যাম নহে।

আফিগানিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আমি সমরশাস্ত্রে নিতান্তই মূর্খ, সংখ্যাতত্ত্বে ততোধিক। যত আফগানযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কী পরিমাণ গোরা, কী পরিমাণ পাঠান-গুর্খা-শিখ-মারাঠা ছিল জানি না।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের ব্রিটিশ প্রীতি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি যখন কাবুলে ছিলাম তখন সমগ্র আফগানিস্তানে মাত্র কজন ইংরেজ ছিলেন এবং সকলেই ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কর্মচারী। আফগানিস্তানের স্কুল-কলেজে তখন ফরাসি পড়াইতেন ফরাসি গুরুরা, জর্মন পড়াইতেন জর্মন গুরুরা, কিন্তু ইংরেজি পড়াইতেন ভারতবাসীরা। আমি যখন শিক্ষামন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে ইংরেজের প্রয়োজন, তা না হইলে ছাত্রদের উচ্চারণ ভালো হইবে না, তিনি মৃদু হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, 'কুরান তো আর ইংরেজি ভাষায় লেখা হয় নাই যে উরুশ্চারণের জন্য সায়েবদের মেলা তকলিফ দিয়া এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আনিতে হইবে।'

ইংরেজ তখন রুশিয়ার পাসপোর্ট বরঞ্চ পাইত, কিন্তু আফগানিস্তান! বরঞ্চ পঞ্চম মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে পাইত, কিন্তু ইংরেজ লান্ডিকোটালের ওই পারে পা দিতে গেলে নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত।

ইংরেজ-রুশে বন্ধুত্ব হওয়ায় আফগানিস্তান মহা বিপদে পড়িয়াছে। হায় জলালাবাদ হায়, মজার-ই-শরিফ!

বড়লাটি লাঠি আমরা হাতে লইলে বেচারি পাঠানদের দুইখানা লাঠির খর্চার ধাক্কায় পড়িতে হইবে। সে কি উত্তম প্রস্তাব? কাবুলিদের ভদ্রতা-বোধ কম। ভারতবাসীদের তাহারা গোলাম বলে। গোলামের হাতে কি লাঠি শোভে? লাঠি বাজিবে না?

হাইলে সেলাসি সাম্রাজ্যবাদীদের অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আর আদিস-আব্বাবার মতো বর্বর শহরে থাকিয়া বিস্তর কষ্টভোগ না করেন। ইতালীয়রা হাবশিদের যথেষ্ট সভ্য করিয়া গিয়াছে, ওইটুকুতেই তাহাদের কাজ চলিবে। সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি তথাপি 'শ্বেতভদ্রভার' নামাইতে পারিতেছেন না। হাবশিদের হৃদয়ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, সহযোগ যষ্টি লইবার জন্য হস্তোত্তলন করিতেছে না।

তুর্কিরা অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাসীদের দিলিদোস্ত! কারণ কোন মূর্খ বলিবে যে, তুর্কি জর্মনির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা না করিলে জর্মনি পরাজিত হইত। সে যুদ্ধে কী পরিমাণে লোকক্ষয়, বলক্ষয় হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই তবে আশা করিতে পারি ভারতবর্ষে যত পরাজিত জাপানি সমরবন্দি আছে, তুর্কিতে তাহা অপেক্ষা বেশি জর্মন বন্দি আছে। তবে সব সময়েই কি আর 'ফলেন পরিচিয়তে'। বরঞ্চ 'মা ফলেষু' এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৎসত্ত্বেও হায় রে তুর্কি, তোমার দার্দানেলেজ যে যায়-যায়। মিত্রশক্তি যখন তোমাকে অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, তখন তুমি সাম্রাজ্যবাদীর যষ্টি হাতে নাও নাই, এখন তোমার সপ্ত-কৃশ-বৎসরের চক্র। কিন্তু বল তো আলেপ্পো, তোমাকে কে ভেট দিতেছে?

কিন্তু তুর্কি স্বাধীন। হিজ্জাজের ইবনে সউদ স্বাধীন, যমনের ইমাস ইয়হিয়া স্বাধীন। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা-অসহযোগিতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ট্রেনসজর্ডানও গুছাইয়া লইয়াছে।

বুঝিতে পারিতেছি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম। আর কাব্যবিন্যাস করিব না। তবে আশা করি এইটুকু বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না যে, বড়লাটি লাঠি ভারতীয়দের হাতে না আসায় দুঃখ করিবার কিছু নাই। কংগ্রেস-লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে লাঠি নেন নাই বা পান নাই, কিন্তু আর যাহাই হউক, মধ্যপ্রাচ্য সেজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা করিতেছে, তাহাতেই মনে হয় ভালো কর্মই করিয়াছি। আল্লা মেহেরবান, আমাদের অজানাতেই হয়তো আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিয়াছেন।

www.pathagar.com

যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি

তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব যেরূপ কোনও এক শুভদিনে আপাদমস্তক নির্মিত হয়নি ঠিক সেইরূপ তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব হঠাৎ একদিন জন্মগ্রহণ করেনি। গ্রিক-রোমান ঐতিহাসিকরা যেসব জাতির সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের ধর্মের বিবরণও অল্পবিস্তর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এসব বিবরণের অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট। আর এঁদের ভিতর যাঁরা নাস্তিক ছিলেন তাঁরা নানা ধর্মের বিবরণ দেবার সময় সবকটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, নিজেরটাকেও ব্যত্যয় দেননি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবির স্থলে কেরিকেচার এঁকেছেন। তথাপি যে পদ্ধতির গ্রন্থই হোক না কেন, এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনও বিশেষ ধর্মের বা একাধিক ধর্মের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের গোড়াপত্তনও অসম্ভব।

খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হওয়ার ফলে গ্রিক, রোমান তথা ইউরোপীয় অন্যান্য ধর্ম লোপ পায়। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ধর্মের বিবরণ লেখার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। আজ যাঁরা জানতে চান, গ্রিক, রোমান, ট্যুটন্‌দের ধর্ম প্রাথমিক খ্রিস্টধর্মের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁদের তন্ন তন্ন করে গ্রিক ও রোমানদের সর্বপ্রকারের রচনা পড়তে হয় এবং সেখান থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলোর সন্ধান নিতে হয় প্রাথমিক খ্রিস্টধর্মের কোন কোন আচার অনুষ্ঠানে এরা নির্বিঘ্নে অনুপ্রবেশ করেছে, কিংবা খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন উপেক্ষা করে নবদীক্ষিত খ্রিস্টানগণ নিজেদের প্রাক খ্রিস্টীয় আচার অনুষ্ঠান নতুন ধর্মে কীভাবে এবং ইউরোপের কোন কোন জায়গায় প্রবর্তন তথা সংমিশ্রণ করেছে— এইসব তাবৎ তথ্য প্রভূত পরিশ্রম তথা গভীর গবেষণা দ্বারা সঞ্চয় করে তবে খ্রিস্টধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব। আজ যেরকম ভারতীয় চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন পুনর্নির্মাণ করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম।

সপ্তম শতাব্দীতে নবজাত ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সংঘর্ষের ফলে একে অন্যের ধর্মের বিরুদ্ধে রূঢ়তম কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মুসলমানদের বাধ্য হয়ে অনেকখানি সংযত ভাষা ব্যবহার করতে হল কারণ পবিত্র কুরানে খ্রিস্টকে আল্লার প্রেরিত-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ক্রুসেডের নৃশংস যুদ্ধ সত্ত্বেও দুই ধর্মের গুণীজ্ঞানী একে অন্যের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবরা ব্যাপকভাবে গ্রিক দর্শন পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র আরবিতে অনুবাদ করলেন ও পরবর্তীকালে আরব দর্শনশাস্ত্রের লাতিন অনুবাদ ইউরোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করল। এবং এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আরব (ও পরবর্তীকালে ইরানের) সুফিপন্থা (ভক্তিবাদ ও রাজযোগের সমন্বয়) খ্রিস্টীয় মিস্টিজিম বা রহস্যবাদের সঙ্গে বারম্বার নিবিড় সংস্পর্শে এল এবং ফলে একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারিত করল। কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, ইতোমধ্যে ভারতীয় রহস্যবাদ আরব সুফিতত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এস্থলে স্পেনবাসী আরব ধর্মপণ্ডিত ইব্‌ন্ হজ্‌ম-এর উল্লেখ করতে হয়। তিনি ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম নিয়ে অতি গভীর আলোচনা করেন, কিন্তু পুস্তকখানা যদিও বহু বহু স্থলে অমূল্য রত্ন ধারণ করে, তবু পূর্ণ পুস্তক পক্ষপাতদুষ্ট। ইব্‌ন্ হজ্‌মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সপ্রমাণ করা : ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এবং শুধু তাই নয়, ইসলামের যে শতাধিক শাখা-প্রশাখা

বহুবিধ সেক্‌ট্‌, 'স্কুল্‌স্‌' আছে, তার মধ্যে তিনি নিজের যেটিতে জন্মগ্রহণ করেন সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট বটে ও সর্বগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

এক হাজার বছর পূর্বেকার গজনির বাদশাহ মাহমুদের সভাপণ্ডিত আলবিরুনির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— যদিও তিনি মূলত তাঁর 'ভারতের বিবরণ' গ্রন্থে হিন্দুধর্ম, তার নানা শাখা-প্রশাখা, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, কিংবদন্তির বয়ান দিয়েছেন এবং যেহেতু ভারতীয় ধর্ম মাত্রই কোনও না কোনও দর্শনের দৃঢ়ভূমির ওপর নির্মিত, তিনি তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন সাতিশয় নৈপুণ্যসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং স্থলে স্থলে ইসলামের সঙ্গে তুলনাও করেছেন। প্রতিমানাশক, কট্টরতম মুসলমান মাহমুদের সভাপণ্ডিত কোনও স্থলে হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোনও মতবাদ বা আচারের প্রতি দৈবাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করলে সেটা যে তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সাতিশয় উপকারী হত না সেটা তো সে যুগের রাজ-জল্লাদ ভিন্ন অন্যজনও নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত। তৎসত্ত্বেও পরম আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইসলামের প্রতি সরল অনুরাগ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রশংসনীয় দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কোনও কোনও নিন্দনীয় আচারের কারণ দেখিয়েছেন। পাঠক মাত্রই সহজে প্রত্যয় করবেন না, যে-মাহমুদ হিন্দুর প্রতিমা ভঙ্গ করাটা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করতেন তাঁরই সভাপণ্ডিত আভাসে ইঙ্গিতে এবং তুলনার সাহায্যে প্রতিমাপূজার পিছনে যে হেতুটি রয়েছে সেটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক সেটা বুঝিয়ে বলেছেন। এ-স্থলে জরাজীর্ণ স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে সংক্ষেপে সেটি নিবেদন করি : মক্কা গমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ অথচ হজ পালন করা যখন তার একমাত্র অবশিষ্ট কাম্য, সেই অর্ধমৃতজনকে যদি কেউ মক্কার একখানা ছবি দেখায় তবে কি তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হবে না, অশ্রুজল দুই চক্ষু সিক্ত করবে না, কম্পিত কলেবরে সে হজকামী ছবিখানাকে হয়তো বারম্বার চুম্বন দিতে আরম্ভ করবে এবং হয়তো-বা যুক্তিতর্কের বিধান বিস্মৃত হয়ে সেই অতি সাধারণ জড় কাগজখণ্ডকে অলৌকিক দৈবশক্তির আধার বলে সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবে! অতএব যে স্থলে কলায় সুনিপুণ শিল্পী বহুমানবের ধারণা সাধনাকে মৃন্ময়রূপ দিতে সক্ষম হন, সে-প্রতিমার সম্মুখে কি সাধারণ মানুষ নতজানু হবে না? অবশ্য গোড়াতেই আলবিরুনি প্রতিমাপূজার প্রতি আপন বিরাগ প্রকাশ করেছেন। এস্থলে স্মরণীয় যে অস্মদ্দেশীয় বহু বেদান্তবাগীশ তথা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিমা-পূজা সমর্থন করেন না। অন্যান্য অনেকেই এ মার্গকে নিম্নস্তরে স্থান দেন।

পাঠান যুগে যদিও নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের সুফি ভাবাপন্ন সাধুগণ অতিশয় পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে যে কোনও ব্যক্তি আপন ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁদের শিষ্য হতে পারত, তথাপি ব্যাপকভাবে উভয় ধর্ম নিয়ে বিশেষ কোনও চর্চা হয়েছে বলে এ অক্ষম লেখকের জানা নেই। তবে নিজামউদ্দীনের শিষ্য ও সখা সুকবি আমির খুসরৌ ভারতের প্রচলিত ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

পাঠান রাজবংশ ভারতে বাস করার ফলে ক্রমে ক্রমে মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে যান। তাঁদের তুলনায় সে যুগের মোগলদের বর্বর বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বাবুর অসাধারণ মেধাবী, বহুগুণধারী পুরুষ। কিন্তু যদিও তিনি তাঁর রোজনামচায় ঘন ঘন আল্লাতালার নাম স্মরণ করেছেন, সেজন্য তাঁকে সত্য ধর্মানুরাগী মনে করাটা বোধহয় ঠিক হবে না (ইংরেজ প্রতিদিন পাঁচশো বার 'থ্যাঙ্কু' আওড়ায়; অতএব তার কৃতজ্ঞতাবোধ, উপকারীর প্রতি তার

www.pathagar.com

আনুগত্য আমাদের চেয়ে পাঁচশো গুণে বেশি এহেন মীমাংসা বোধহয় সমীচীন হবে না)। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম-নিন্দিত একাধিক ব্যসনে অত্যধিক আসক্ত তিনি তো ছিলেনই, তদুপরি যুদ্ধজয়ের পর তিনি যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ইসলামের মূল সিদ্ধান্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করে উৎপীড়ন, বর্বরতম পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সমাপন করেছেন, সেসব তিনি সগর্বে নিজেই আপন রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বস্তুত এক কথায় বলা যেতে পারে, ইসলামে দীক্ষিত বাবুরাদি তুর্কমান (মোগল নামে এদেশে পরিচিত) ইসলাম সেভাবে গ্রহণ করেনি, বাঙলা দেশের মুসলমান যেরকম হৃদয় দিয়ে করেছে। আর মোগল রাজাদের ভিতর এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন স্বধর্ম ইসলামের প্রতি উদাসীন, একাধিকজন সিনিক্ এবং প্রায় সকলেই কি ইসলাম কি হিন্দুধর্ম সব ধর্ম ব্যবহার করেছেন অস্ত্ররূপে রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য।

হুমায়ুনের জীবন এতই সংগ্রামবহুল যে তিনি অন্য কোনও বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করতে পারেননি। আপন যুবরাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইলেন তাঁরই চোখের সামনে।

নিরক্ষরজন যে অশিক্ষিত হবে এমন কোনও আপ্তবাক্য নেই।

নিরক্ষরজন সম্বন্ধে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেহেতু সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাস করেনি তাই কোন পুস্তক উত্তম আর কোনটা অধমাধম, কোনটা সত্য আর কোনটা নিছক বুজরুকি, এক কথায় তার মূল্যায়নবোধ বিকশিত হয় না। তারই ফলে দেখা যায় নিরক্ষরজন সাধারণত আপন স্বার্থের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনও বাবদে বিশেষ কৌতূহলী নয়। পক্ষান্তরে এটাও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনও কোনও নিরক্ষরজনের বিধিদত্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের রীতি অনুযায়ী উত্তম অধম-নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করেনি। ফলে তার মূল্যায়নবোধ যথোপযুক্তরূপে বিকাশলাভ করতে পারেনি।

আকবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসেবে তিনি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভারতের সর্বপ্রধান সনাতন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, দুই ধর্মের শাখাপ্রশাখা এবং হিন্দু-মুসলমান সাধুসন্ত সর্বধর্মের মিলন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যেসব 'পন্থা' প্রচার করেছেন এগুলোর কোনও একটা সমন্বয় না করতে পারলে সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে যে কোনও দিন মোগল বংশ সিংহাসনচ্যুত হতে পারে। অতএব আহ্বান জানালেন, সর্বধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের। এমনকি যে-জৈনদের সংখ্যা ভারতে নগণ্য এবং সে যুগে তারা প্রধানত গুজরাত, কাটিয়াওয়াড় ও মারওয়াড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁদেরও প্রধানতম জৈন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি অতি সুন্দর ভাষায় জৈনধর্মের মূল সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ করে জীবে দয়া সম্বন্ধে আম-দরবারে বক্তৃতা দিয়ে মায় আকবর সভাজনকে মুগ্ধ করলেন। ওদিকে আকবর ছিলেন ছিদ্রান্বেষী যথা 'ইনসাইড স্টোর' জানবার জন্য মহা কৌতূহলী এবং তিনি জানতেন, হিন্দু এবং জৈনদের মধ্যে একটা আড়াআড়ি ভাব আছে। রাত্রে ডেকে পাঠালেন হিন্দু পণ্ডিতকে। তিনি বললেন, "জৈন গুরু যে এত লম্ফঝম্প করলেন তাঁকে শুধোবেন তো মহারাজ, এ প্রবাদটির অর্থ কী—

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্।

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও জৈন মন্দিরে (বা গৃহে) প্রবেশ করেন না।" '

www.pathagar.com

আকবর পরদিন প্রশ্নটি শুধানোর পর জৈন গুরু মৃদু হাস্যসহকারে বললেন, 'আমি যদি উত্তরে বলি—

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ (শৈব) মন্দিরম্"[১]

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও শৈব মন্দিরে (বা শৈবের গৃহে) প্রবেশ করে না। তা হলে ছন্দপতন হয় না, অর্থও তদ্বৎ— শুধু জৈনের পরিবর্তে শৈবের কুৎসা করা হয়। বিদ্বেষপ্রসূত এসব প্রবাদের কোনও সত্যমূল্য নেই।'

আকবর রাজনৈতিক কারণে, নিজ স্বার্থে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর স্বয়ং একটি নবীন 'ধর্ম' প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, 'ইসলামের হজরত নবী ছিলেন নিরক্ষর আমিও নিরক্ষর। তদুপরি আমার হাতে রাজদণ্ড। আমা দ্বারা এ কর্ম সফল হবে না কেন?' সে যা-ই হোক, তিনি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ সন্ধানীজন নন। তবে একথা অতি সত্য যে তিনি সর্বধর্মের সর্বগুরুকে বাদশাহি নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজদরবারে আসন দেওয়ার ফলে ধর্ম বাবদে মোগল রাজসভা অনেকখানি সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে 'সর্বধর্ম জিজ্ঞাসা'র পন্থাটি সুখগম্য করে তোলে।

জাহাঙ্গির সর্ব বিষয়েই ছিলেন উদাসীন— যা অত্যধিক মদ্যাসক্তজনের প্রায়শ হয়ে থাকে।

শাহজাহানের মতিগতি বোঝা কঠিন। সুবৃহৎ লালকেল্লাতে কত না রঙমহল, কত না হাম্মাম, সম্পূর্ণ একটি হট্ট, কত না নিষ্কর্মা এমারৎ, নহবৎখানা, বন্দিশালা, এবং দুই বিরাট সভাগৃহ। অথচ বেবাক ভুলে গেলেন (?) দুর্গবাসীদের পাঁচ বেলা নামাজ পড়ার জন্য একটি ছোটাসে ছোটা মসজিদ বানাতে! দিল্লির দারুণ গ্রীষ্ম এবং নাকেমুখে আঁধির ধুলো খেতে খেতে তাদের দ্বিপ্রহরে যেতে হত জামি মসজিদে। দিল্লির কাঠ-ফাটা শীতের রাত্রে এশার নামাজ পড়তে।

তা সে যাই হোক, তিনি অদ্ভুত একটা একস্‌পেরিমেন্ট করেছিলেন তাঁর চার পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থায়। এক পুত্রকে স্পেশালাইজ করালেন রণকৌশলে, অন্যকে সঙ্গীতাদি

---

১. অধমের সংস্কৃত জ্ঞান এতই অল্প যে তার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতেও লজ্জা বোধ করি। বানানে নিশ্চয়ই একাধিক ভ্রম আছে। পাঠক নিজ গুণে শুধরে নেবেন। কাহিনীটিও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে লিখেছি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধ রচনার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবন্ধটি রচনার তারিখ ১৯৭৩ সনের ৩০ জানুয়ারি। ওই বছরটি ছিল রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীর বছর। ইন্দো-ইটালিয়ান সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক শ্রীরবিউদ্দীনের (যিনি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাবার সময় কবির একান্ত সচিব ছিলেন) প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের সন্নিকটস্থ নতিবপুর গ্রামে ওই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল রাজা রামমোহন ও যুবরাজ দারাশিকুহ্‌র উদার সহনশীল সমন্বয়ধর্মী কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। ওই সভার সভাপতি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. অমলেন্দু বসু। ওই আলোচনা সভার জন্য এই প্রবন্ধটি রচনা করেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ডাক্তার মহম্মদ আব্দুল ওয়ালির বিশেষ অনুরোধে এবং আলী সাহেব এই প্রবন্ধটি পড়বার দায়িত্বও ডাক্তার ওয়ালির ওপর ন্যস্ত করেন।

www.pathagar.com

চারুকলায়, কনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেবকে ছেড়ে দিলেন কট্টর মোল্লাদের হাতে এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ দারা শিকুহকে শেখালেন সর্বধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন।

*　　*　　*

সর্বধর্ম চর্চা করার জন্য মোল্লাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আকবর যে পথ সুগম করে দিয়ে সর্বধর্মগুরুকে রাজসভায় ডেকে এনে বসিয়েছিলেন, সেই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম দুই পুরুষ ধরে ছিল অনাবৃত অবহেলিত। দারা স্বয়ং সে পথ দিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। এবং শুধু তাই নয়, আকবরের কালে মৌলভি সাহেব সভাস্থলে প্রচার করতেন ইসলাম, হিন্দু পণ্ডিত প্রচার করতেন হিন্দুধর্ম, যে যার আপন ধর্ম— দারা সম্মুখে আদর্শ করলেন সর্বশাস্ত্র মূল ভাষাতে অধ্যয়ন করে, ব্রাহ্মণসন্তান যেরকম সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, মুসলিম-সন্তান যেরকম আরবি ভাষা আয়ত্তে আনে— তিনি একাই যেন সর্বধর্মের মুখপাত্র হতে পারেন। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ে আমাদের মনে যেন কোনও দ্বন্দ্ব না থাকে, দারা কোনও নবধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা তথা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হননি। আকবর যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটা দারার মনঃপূত হয়নি। আকবর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলি সিদ্ধান্ত, যেগুলো ওই ধর্মের প্রত্যেককে বিনা যুক্তিতর্কে মেনে নিতে হয় অর্থাৎ ডকট্রিন, শিবলেথ এবং ওই ধর্মের অবশ্য করণীয় আচার-অনুষ্ঠান— রিচুয়াল এ দুটি অঙ্গের ওপর দিলেন প্রধান জোর; ডকট্রিন এবং রিচুয়াল। অতঃপর আকবর সর্বপ্রধান প্রধান ধর্মের সর্ব ডকট্রিন ও রিচুয়াল সংগ্রহ করে বিচার করে দেখলেন এর কোন-কোনগুলো এ দেশের জনসাধারণে প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়েই আছে, কোন-কোনগুলো আপন ধর্মে না থাকা সত্ত্বেও সে ধর্মের লোক ওইগুলো আপত্তিজনক বলে মনে করে না এবং কোন-কোনগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এমনকি রক্তপাত পর্যন্ত ঘটিয়েছে। বিচার-বিবেচনার পর তিনি তাঁর নবীন ধর্মের এমন সব ডকট্রিন ও রিচুয়াল নিলেন যেগুলো সর্বধর্মগ্রাহ্য হয়েই আছে এবং যেগুলো হওয়ার সম্ভাবনা ধরে।

দারা এ পথ নিলেন না। তিনি বিচার করে দেখলেন, প্রত্যেক ধর্মের অন্তত কয়েকজন গুণী আপন আপন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং অল্প-সংখ্যক ধর্মানুরক্তজনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলেও সেগুলো প্রাণবন্ত, ডায়নেমিক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন হিন্দুর উপনিষদের গভীরে প্রবেশ করে। তসওউফ বা সুফিতত্ত্বকে তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন— ইসলামের সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর। এবং নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, দুই সাধনার ধারাই সম্মিলিত হয়েছে একই সিন্ধুতে। তাই তাঁর উপনিষদ-সাধনা পুস্তকের নামকরণ করেছিলেন— দ্বিসিন্ধু মিলন— মুজম্ উল্ বহ্‌রেন্। সে যুগে দুই ভিন্ন ধর্মের সাধক একান্তে বসে ধর্মালোচনা করতেন না— বস্তুত আপন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের যে বিশেষ ভাষা হয় সেটা অন্যজনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবোধ্য।

দারার আশা ছিল, উপনিষদ সযত্নে ফারসি ভাষাতে অনুবাদ করলে মুসলিম তত্ত্বজ্ঞানী সুফি উল্লাসে 'ইউরেকা' শব্দ দ্বারা 'আপন' আবিষ্কারজনিত হর্ষপ্রকাশ করবেন।

www.pathagar.com

দারার বিশ্বাস ছিল, যদিও আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর পুরোহিত তথা মুসলমানের মোল্লা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন, তথাপি তাঁদের মূল উৎস দুই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী যারা তাঁরাই।

মুসলিম সুফি একবার হিন্দুর উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর ও হিন্দু ব্রহ্মবাদীর মাঝখানে তো কোনও অন্তরাল থাকবে না— কুৎসা-কলহের তো কথাই ওঠে না। ফলে এঁরাই পুরোহিত মোল্লাদের যে নতুন অনুপ্রেরণা দেবেন, তারই ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাশ্বত মিলন স্থাপিত হবে।

নিয়তি দারাকে আপন কর্ম সমাপ্ত করতে দিলেন না। নইলে তিনি যে হিন্দুর বিচিত্র সব মণিমানিক্য মুসলমানের সামনে এবং মুসলিম জওহর-জওয়াহির হিন্দুর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে তুলে ধরতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতেরই নিয়তি, বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলেন না, শঙ্করাচার্যের আয়ুষ্কাল তো মাত্র বত্রিশ, চৈতন্যের বিয়াল্লিশ। রামমোহন দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি হাত দিলেন একই সময়ে সর্বকঠিন দুটি কর্মে, যার একটাই যে কোনও কালের যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে নিঃশেষ করে দেয়— ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার যুগপৎ! তদুপরি তাঁকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আরও বহুবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়; সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয়, পাদ্রি-মোল্লাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁর কালক্ষয় হয় প্রচুর।

দারা ও রামমোহনের উভয়েরই শিক্ষার বাহন ফারসি, সংস্কৃত এবং আরবি। দীক্ষা দু জনার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু উভয়েই মিলিত হয়েছিলেন উপনিষদের একই সিন্ধুতে। অতএব দারার গ্রন্থ 'মুজম উল-বহরেন' এই উভয় সাধকের বেলাও প্রযোজ্য। অপিচ রামমোহনের ফারসিতে লিখিত প্রথম কেতাব 'তুহাফাতুল মুওয়াহহিদিন'— 'একম এবং অদ্বিতীয়ম্'-এ বিশ্বাসীজনের প্রতি সওগাত যদি কাউকে উৎসর্গ করতে হয় রাজার সঙ্গে একই তীর্থের যাত্রী রাজপুত্র দারাকে। রামমোহনের প্রথম পুস্তক ফারসিতে এবং দারার পুস্তকও ওই ভাষায় এবং উভয়ের পুস্তকের শিরোনাম আরবিতে। দু জনাই পুস্তক লিখেছেন মুসলমান সাধকের উদ্দেশ্যে। দারা আপন বক্তব্য বলেছেন উপনিষদ মারফত, রামমোহন তাঁর যুক্তিতর্ক সঞ্চয় করেছেন ইসলামের ভাণ্ডার থেকে। দুই পুস্তকই ধর্ম ও দর্শনের সংমিশ্রণ। আরও বহুক্ষেত্রে দু জনার ঐক্য, একাত্মবোধ ধরা পড়ে— শুধু লক্ষ্যবস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়।

নেতির দিক দিয়ে দেখলে যে সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেটি বিস্ময়কর। কেউই কোনও নতুন ধর্ম প্রচার করেননি, করতে চাননি।

দারা এবং রাজা সম্বন্ধে গত ত্রিশ বৎসর ধরে যেসব গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশ— অধিকাংশ কেন, শতাংশের একাংশ পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। গ্রহচক্রে আমি সে মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তাই এই রচনায় বিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ অনিবার্য। তবু কেন যে বার্ধক্যে এই অর্বাচীনসুলভ অপকর্ম করলুম সে তত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন। পাঠককে জানিয়ে কোনও লাভ নেই। লেখকের ভুলভ্রান্তি তার চক্ষুগোচর হলে সে অকৃপণ হস্তে হতভাগ্যের কর্ণমর্দন করার সময় আদৌ কর্ণপাত করে না— বেচারা লেখকের ওজুহাত-অছিল তথা করুণকণ্ঠে তার ক্ষমাভিক্ষার প্রতি।

www.pathagar.com

যোগাযোগ

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করার উপলক্ষে যে কোনও জাতিরই উল্লসিত হওয়ার কথা; বিশেষত যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে, যে জাতি অতীতে মানবসংসারে জ্ঞানের চিরন্তন দেয়ালি উৎসবে বহু প্রদীপ জ্বালিয়াছে, তার স্বরাজ্যলাভে পৃথিবীর বিদগ্ধ সম্প্রদায়েরও নিরঙ্কুশ আনন্দ হওয়ারই কথা। যে জাতি একদিন উপনিষদের দর্শন দিল, তথাগতের অমৃতবাণী শোনাল, গীতার সর্বধর্মসম্মেলন শিখাল, ত্রিমূর্তি নির্মাণ করল, তাজমহলের মর্মর স্বপ্ন দেখাল, তার কাছ থেকে পৃথিবীর গুণীজ্ঞানীরা এখন অনেক কিছুই আশা করবেন। স্বাধীনতা লাভের পর এখন আর তাদের নিরাশ করার কোনও অজুহাত আমাদের রইল না। এখন আর ইংরেজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা রেহাই পাব না।

সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের নবজীবন লাভ অনেকখানি নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুসামঞ্জস্যের ওপর। দারিদ্র্য যদি না ঘোচে, শক্তির সাধনায় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা যদি খাদ্যের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র সঞ্চয়ে মনোযোগ দিয়ে দেন, তা হলে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কলা-দর্শন এদেশে পুনরায় বিকশিত হবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। হিটলারের জর্মনি, স্তালিনের রুশিয়া যে বিশ্বমানবকে হতাশ করেছে, সেকথা কারও অজানা নয়।

মহাত্মা গান্ধী যখন আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন, তখন আমরা ভয় করেছিলুম যে হয়তো-বা আততায়ীর শাক্ত সম্প্রদায় তাবৎ দেশটাকে গ্রাস করে নব নব হিটলার, নব নব স্তালিনের দাস্যগ্রহণ করবেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা সে 'মহতী বিনষ্টি'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, আমাদের চরম সান্ত্বনা যে দেশের আপামর জনসাধারণও সে নিষ্কৃতির কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে।

পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমরা শান্তি ও মৈত্রীর কল্পনা করি, কোনও দেশ জয় করার কামনা আমাদের নেই, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সংযুক্ত করার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই, এ বড় কম কথা নয়। কারণ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে, একমাত্র পাকিস্তান ভিন্ন অন্য কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই আশা করতে পারি, আজ না হোক কাল নেতাদের সর্বপ্রচেষ্টা দেশের অভাব-অনটন মোচন করাতে নিয়োজিত হবে।

কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে, দেশের দারিদ্র্য না ঘোচা পর্যন্ত সংস্কৃতির বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বীজ পোঁতার প্রয়োজন নেই, ফসল ফলাবার ত্বরা নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিন প্রচেষ্টাই একই সঙ্গে চালাতে হয়— অবস্থার তারতম্যে বিশেষ জোর দেওয়া বিশেষ কোনও অঙ্গে, এইমাত্র।

ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যে বিকট রুদ্র রূপ নেবে না, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায় সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের যোগাযোগ থাকবে কি থাকবে না, এবং যদি থাকে তবে সেটি কী প্রকারের হবে।

www.pathagar.com

একটা দৃষ্টান্ত পেশ করি। সকলেই জানেন, প্যালেস্টাইনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ট্রান্সজর্ডান এবং তার প্রতিবেশী সউদি আরব যে প্যালেস্টাইনের আরবকে ইহুদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও সাহায্য করতে পারল না, তার প্রধান কারণ আমির আবদুল্লা ও ইবনে সউদের শত্রুতা। আমির আবদুল্লার ভয় ছিল যে তিনি যদি সর্বশক্তি নিয়ে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করতে পারেন, আবদুল্লার পক্ষে উভয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা অসম্ভব হবে— হিটলারও পারেননি এবং ফলে তার দুই কূলই যাবে।

কিন্তু তাই বলে ট্রান্সজর্ডান ও সউদি আরবের কৃষ্টিগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাবাশরিফের চতুর্দিকে ধর্ম সম্বন্ধে আরব তথা অন্য দেশবাসী শেখরা প্রতিদিন যে বক্তৃতা দেন, সেগুলোতে ট্রান্সজর্ডানের অধিবাসীরা আগেরই মতো হাজিরা দিয়েছে এবং আম্মানে লেখা কেতাব মক্কাতে পূর্বেরই ন্যায় সম্মান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মক্কা এবং আম্মান উভয় শহরের বিদ্যার্থীরাই কাইরোর আজহরে গিয়ে আগেরই মতো পড়াশোনা করেছে। ইবনে সউদ মক্কা দখল করার পর বহু বৎসর পর্যন্ত মিশর-মক্কায় মনোমালিন্য ছিল— এমনকি মিশর থেকে কাবাশরিফের বাৎসরিক গালিচা আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের মক্কা-মদনওয়ি ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যায়নি কিংবা ছাত্রেরও অপ্রাচুর্য হয়নি— মিশরে ছাপা ইমাম আবু হনিফার ফিকার কিতাব আগেরই মতো মক্কার বাজারে বিক্রয় হয়েছে।

আরব-ভূমি আজ কত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, তবু যখন আজহরে পড়তুম, সব রাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাদের আপন আপন হস্টেলে গিয়েছি, সকলে মিলে বাজার থেকে মুরগি কিনে এনে হৈ-হুল্লোড় করে রান্না করে খেয়েছি। বিশ্বাস করবেন না, রান্নার সর্দার ছিল মালদ্বীপের একটি ছেলে— মালদ্বীপ কোথায়, সেকথাই বহু ছাত্র জানত না।

এইবার গোটা দুই ইউরোপীয় উদাহরণ পেশ করি। ভাষা এবং কৃষ্টির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশ পড়েছে সুইটজারল্যান্ডের ভিতর। উত্তরাংশের খানিকটা পড়েছে লুক্সুম্বুর্গের ভিতর এবং আরও খানিকটা বেলজিয়ামের ভিতর। এসব দেশের লোকেরা আপন আপন রাষ্ট্রের প্রতি সর্বান্তকরণে আনুগত্য স্বীকার করে— ফ্রান্সও কখনও বলে না, এসব ফরাসি-ভাষী ভূখণ্ডগুলো লড়াই করে দখল করব। অথচ কৃষ্টিগত আদান-প্রদান এই তিন ভূমিতে হামেশাই চলেছে। প্যারিসে আঁদ্রে জিদের বই যেদিন বেরোয় ঠিক সেইদিনই সে বই জিনিভা, লুক্সুম্বুর্গ এবং ব্রাসেল্সে কিনতে পাওয়া যায়। জিনিভার বড় প্রকাশকরা প্যারিসে ব্রাঞ্চ রাখে, ব্রাসেল্সে প্রকাশকরা জিনিভায় আপন শাখা খুলতে পারলে খুশি হয়।

কিন্তু ঢাকার সাহিত্যামোদী এবং প্রকাশক হয়তো বলবেন, 'আমরা কলকাতার ধামাধরা হয়ে থাকতে চাইনে, কাজেই এ উদাহরণটা আমাদের মনঃপূত হল না।'

উত্তরে ভিয়েনা-বার্লিনের দৃষ্টান্ত পেশ করব। দুই শহর দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী। কেউ কারও চেয়ে কম নয় এবং এককালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির (মায় যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া) প্রতাপ জর্মনির চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। দু শহরের লোকই জর্মন বলে, জর্মন থিয়েটার দেখে, জর্মন অপেরা শোনে। ভিয়েনাতে কোনও নাট্য-সমঝদারের সাবাসি পেলে সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকার, অভিনেতা এবং নর্তক-নর্তকীদের নিমন্ত্রণ হয় বার্লিনে— বার্লিনে কোনও লেখক নাম করতে পারলে ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি তাঁকে অনারারি ডক্টরেট দেয়।

www.pathagar.com

এই দু শহরের দুশমনি-বর্জিত আড়াআড়িতেই বিরাট জর্মন সাহিত্য গড়ে উঠেছে, জর্মন সঙ্গীত বলতে একথা কেউ শুধায় না মৎসার্ট, স্ট্রাউসের জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং একথা সকলেই জানে যে সঙ্গীতসম্রাট বেটোফেনের জন্ম হয় বন্ (উপস্থিত পশ্চিম জর্মনির রাজধানী) শহরে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটান ভিয়েনাতে।

বাঙলা ভূমিতে ফিরে আসি।

বাঙলার বিদগ্ধ সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় প্রায় দেড়শো বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ (এমনকি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত), প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম এঁরা সবাই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন কলকাতায়। বাঙলা সাহিত্য (গদ্যসাহিত্য তো বটেই) রাজধানীর সাহিত্য— কম্যুনিস্টরা এই সাহিত্যকেই গালাগাল দিয়ে বলেন 'বুর্জোয়া' সাহিত্য— যদিও আমাদের কর্ণে এ গালাগাল বংশীধ্বনির ন্যায় শোনায়।

মাত্র সেদিন পুব-বাঙলার লোক সাহিত্যের আসরে নামলেন। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, মানিককে কিন্তু বাধ্য হয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। ঢাকা যে সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ ঢাকা কখনও কলকাতার মতো তামাম ভারত এবং বাঙলার রাজধানী হয়ে উঠতে পারেনি।

আমাদের ভয় হয়েছিল পূর্ববঙ্গ পাছে বাঙলা ভাষা বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করে বসে। সে ভয় কেটে গিয়েছে এবং ঢাকার বাঙলা যে উর্দু হরফে লেখা হবে না, সে খবরটা পেয়েও আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

এইবার ঢাকার পালা নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করবার। কলকাতা যে অদ্যকার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভের ফলে নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনায় নতুন সাহিত্য গড়তে মন দেবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই এবং কলকাতার অধিকাংশ সাহিত্যিকই যে পূর্ববঙ্গে আপন পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করেন, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মনে একটু দ্বিধা রয়ে গিয়েছে পূর্ব বাঙলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে। কেউ কেউ ভাবছেন পুব-বাঙলা হয়তো এমন সব শব্দ বাক্যবিন্যাস আরবি-ফারসি থেকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে যে, কালে কলকাতার লোক ঢাকায় প্রকাশিত বাঙলা বই পড়ে বুঝতে পারবে না। তাঁদের এ ভয় দূর করে দেবার জন্যই আজ আমার এ প্রবন্ধ লেখা— যাতে করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দ আজ সর্বপ্রকার দ্বিধাবর্জিত নিরঙ্কুশ হয়।

ইচ্ছে করলেই যে কোনও ভাষা থেকে জাহাজ-বোঝাই শব্দ গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে আজকের দিনের বাঙলা ভাষাই নিন। এ ভাষা যে শব্দ সম্পদে কত দীন, সেকথা যাঁরা অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য নতুন চিন্তা নিয়ে বাঙলায় কারবার করেন তাঁরাই জানেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ গ্রহণ করতে পারলে বহু মুশকিল, বহু গর্দিশ থেকে বেঁচে যেতেন। কিন্তু উপায় নেই— তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ইংরেজি-অনভিজ্ঞ যে পাঠকের জন্য তাঁরা বই লিখতে যাচ্ছেন, তারাই সে বই বুঝতে পারবে না। তা হলে আর লাভটা কী হল?

পুব-বাঙলায় তার চেয়েও বড় বাধা এই যে, গাদা গাদা আরবি-ফারসি শব্দ ঢোকাবার মতো উমদা আরবি-ফারসি এবং বাঙলা জানেন কয়টি গুণী? ড. শহীদুল্লাহ তো একজন।

www.pathagar.com

এবং বঙ্গবিভাগের পরও তিনি বেধড়ক, বেদরদ আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেননি। যদি করেনও, বুঝবে কটা লোক? এন্তার আরবি-ফারসি মেশানো বাঙলা বোঝার মতো এলেম পূর্ব-বাঙালির এবং আপনার-আমার পেটে তো নেই। আর যদি বলেন ভবিষ্যতে একদিন পূর্ব বাঙলার জনসাধারণ, চাষাভূষো সব্বাই উত্তম আরবি-ফারসি শিখে যাবে আর হুশ হুশ করে আরবি-ফারসির বগহারে রান্না বাঙলা ভাষা ঝুঝে ফেলতে পারবে, তা হলে তো সে আনন্দের কথা। প্রত্যেক ব্যক্তি তিনটি ভাষার (তার একটা আরবির মতো কঠিন ভাষা! বিবেচনা করুন) আলিম-ফাজিল, এত বড় ডাঙর সুখস্বপ্ন পূর্ব-বাঙলার নমস্য ব্যক্তিরাও দেখেন না।

আর যদি বলেন, নজরুল ইসলামের মতো কোনও শক্তিশালী লেখক এসে সেই কর্মটি করে দেবেন তবে উত্তরে বলি, একদা পশ্চিম-বাঙলাতেই এবং আরবি-ফারসি অনভিজ্ঞ রসিক সম্প্রদায়ের ভিতরই তাঁর কদর হয়েছিল প্রথম— পূর্ব-বাঙলা তাঁকে আদর করে বহু পরে। আজ যদি ঢাকায় নজরুল ইসলামের মতো কবি জন্মান, তবে কলকাতা তাঁর কেতাব আগেরই মতো উদ্‌গ্রীব, স্তম্ভিত-নিঃশ্বাস হয়ে পড়বে। তাতে করে তাবৎ বাঙলা সাহিত্যই শক্তিশালী হবে, শুধু পূর্ব-বাঙলার সাহিত্যই না।

তাই এই আনন্দের দিনে নিবেদন করি, রাজনৈতিকরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। ভারতীয় অন্তত বাঙালি সাহিত্যিক যেন সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়ে সে শান্তি পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়।

'বাংলা-একাডেমী পত্রিকা'

পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমীর ইতিহাস দিতে গিয়ে একাডেমীর মুখপত্র বলেছেন :

'পূর্ব পাকিস্তানের "ভাষা আন্দোলনে"র সহিত "বাংলা-একাডেমী"র ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৮ ইংরেজির একেবারেই গোড়ার দিকে বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত দাবি দেশের তরুণ ছাত্র-সমাজ হইতে উত্থিত হয়, নানা বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তাহা দৈনন্দিন প্রবলতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে। মাত্র চারি বৎসর পার হইতে না হইতেই, ১৯৫২ ইংরেজিতে আসিয়া এই আন্দোলন চরম বেগ সঞ্চয় করে এবং তাহার ফলে এই সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে ভাষা-আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় চারিটি ছাত্র নিহত এবং আরও কতিপয় ছাত্র আহত হয়। এই দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-আন্দোলন ছাত্র-সমাজের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের সর্বত্র গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।...আন্দোলনটি অচিরেই সরকারের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এইভাবে ১৯৫৩ সাল কাটিয়া গেলে পর, ১৯৫৪ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী-মুসলিম-লীগ যে একুশ দফা কর্মসূচি লইয়া আগাইয়া আসেন, বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়া "বর্ধমান হাউসে" একটি "বাঙলা-একাডেমী"

www.pathagar.com

স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল তাহার মধ্যে অন্যতম।... "নূতন যুক্তফ্রন্ট" সরকারের আমলে ১৯৫৫ ইংরেজির ৩ ডিসেম্বর একুশ দফার রূপায়ণরূপে ইহার অন্যতম দফা "বাংলা-একাডেমীর" উদ্বোধন কার্য "বর্ধমান হাউসে" সুসম্পন্ন করা হয়।'

একাডেমীতে থাকবে (অ) গবেষণা বিভাগ : তার দুটি শাখা— (১) বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, (২) পাণ্ডুলিপি তথা লোকগাথা লোকসঙ্গীত ইত্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ। (আ) অনুবাদ বিভাগ (ই) সংকলন ও প্রকাশনা-বিভাগ, (ঈ) সাংস্কৃতিক বিভাগ— পাঠাগার, সাহিত্য-সভা, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

বক্ষ্যমাণ সংখ্যা 'বাঙলা-একাডেমী'[১] পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

পত্রিকায় ন টি তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে— মাত্র একটি ছাড়া আর সবকটি প্রবন্ধই একাডেমির সাহিত্যসভায় পড়া হয়েছিল।

প্রথম প্রবন্ধটি উভয় বাঙলায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সায়েবের রচনা— এ প্রবন্ধে তিনি 'পণ্ডিত রেয়াজ অল্ দিন আহমদ মাশহাদি' নামক একজন বাঙালি লেখকের 'সমাজ ও সংস্কারক' নামক পুস্তকখানির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তার প্রয়োজনও বিলক্ষণ ছিল, কারণ ১২৯৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন। কেন করেছিলেন সেটা পুস্তকের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। রেয়াজ অল্-দিন রাজনৈতিক নেতা জমাল্উদ্দীন আফগানির ন্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে রেয়াজ অল্-দিন হৃদয়ঙ্গম করেন যে একদল হিন্দু যেরকম অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন 'সবকিছু আমাদের শাস্ত্রেই আছে', 'ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন কিছু নেই যা আমাদের মুনি-ঋষিরা জানতেন না' ঠিক সেইরকম বেশিরভাগ মুসলমানই বিশ্বাস করেন যে, আরবির মাধ্যমে তাঁরা যে আরবি-ইরানি আভিচেন্না আভেরস এবং গ্রিক প্লাতো-আরিস্টট্লের দর্শন-বিজ্ঞান ৮০০/১০০০ বৎসর পূর্বে আয়ত্ত করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সে-ই যথেষ্ট, নতুন কিছু শেখবার নেই। এ বিতর্কের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের তেমন কোনও আন্তরিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু রেয়াজ অল্-দিন সেদিন তাঁর পর্যবেক্ষণ, মনোবেদনা ও পথনিদর্শন যে-ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেটি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও একাধিক ভাষার সঙ্গে তাঁর দৃঢ় যোগসূত্রের পরিচয় দেয়।

'হিজরি দ্বিতীয়াদি শতাব্দীতে মোসলমান পণ্ডিতেরা যে সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শাস্ত্রকোবিদগণও সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুবর্তন করেন। বিশেষ যাঁহাদিগের রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি সমধিক তেজস্বিনী, তাঁহারা সেই কীট নিষ্কষিত প্রাচীনতম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিবৃতি প্রকৃতি লিখিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনা অনুসারে বর্তমান চিন্তা ও নবাবিষ্কৃত সমস্তই ভ্রমপ্রদানের আশ্রয় ও অকিঞ্চিৎকর; কেবল প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পৃথিবী এখনও চলিতেছে; অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, লৌহবর্ত্ম, তড়িতবার্তাবহ, তাপমান, বাতমান প্রভৃতি লোকসমাজের আবশ্যক ও বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্যাদি সমুদায়ই হিন্দুদিগের বিশ্বকর্মার ন্যায়

১. 'একাডেমী'র ইংরেজি উচ্চারণই যখন নেওয়া হয়েছে তখন 'একাডেমি' লিখলেই বোধহয় ভালো হত; কারণ ইংরেজিতে 'মি' হ্রস্ব।

www.pathagar.com

মুসলমানদের লোক্‌মান-হাকিমের চর্বিত-চর্বণ মাত্র। এ সমস্তকে কল্পতরুরূপী বর্তমান বিজ্ঞান-বৃক্ষের অভিনব বিষ-অমৃত-ফল তাহা মুসলমান অর্ধশিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, তাঁহারা আরস্তু (আরিস্‌টট্‌ল), আফ্‌লাতুন্‌ (প্লেটো) প্রভৃতির প্রাচীন জীর্ণ মতসকল গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া কৃতার্থ হয়েন বটে, কিন্তু আধুনিক নিউটন, গালিলিয়ো, কেপ্‌লার, ডারুইন, লাপ্লাস, কম্‌টির (কঁৎ) অতুল প্রতিভার দিকে তাঁহাদের অণুমাত্রও মনঃসংযোগ নাই। প্রত্যুত একপ্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মোসলমান মহাপণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রিসকে আপনাদের শিক্ষাগুরু বলিয়া জগতে অকুণ্ঠিত চিত্তে, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক অজ্ঞান মোসলমান শিক্ষিত লোকেরা তাদৃশ্য প্রাধান্যের কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বিবেচনা করেন। সুতরাং পৃথিবীর জাতিসাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও বুদ্ধির আদান-প্রদানে যে কুশল ও কল্যাণ সম্ভব, মোসলমানেরা তাহা লইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত রহিয়াছেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা নিউটনের সত্য, কোপার্নিকস বা আর্যভট্টের সত্য বা আবু আলি সিনার (আভিচেন্না) সত্য নহে, তাহাতে প্রত্যেক বিশ্ববাসীরই তুল্য অধিকার!'

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মুসলমানদের ঔদাসীন্য দেখে রেয়াজ অল্‌ দিন যে কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন এবং কী অকুণ্ঠ ভাষায় তার প্রকাশ দিয়েছিলেন নিম্নে তার উদাহরণ দিই;—

'যাঁহারা এসলাম গ্রহণ পূর্বক মোসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহাদের গভীর প্রেম, স্বপ্ন, স্নেহ ও স্বদেশবাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল তৎসমুদায়ের স্থানে এক সামান্যরূপে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির সঞ্চার দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হস্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে সম্মুত্থিত হইয়াছে। মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই; প্রত্যুত তৎসমস্ত পরদেশ ও পরভাষা বলিয়া অবিরত উপেক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের স্বদেশও নিজ ভাষা বলিয়া অপর কোনও পৃথক বস্তু দৃষ্ট হয় না, অথবা তাঁহারা অখিল মোসলমান সমাজ ও ধর্মকে এক ভাষার অধীনে স্থাপন করিতে উদ্যত।'

এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষকে অনায়াসে বাঙালি মুসলমানের রামমোহন বলা যেতে পারে। কিন্তু হায়, বাঙালি মুসলমান এঁকে তখন চিনতে পারেনি। আজ যদি বাঙলার মুসলমান এঁকে চিনতে পারে, তবে পুব বাঙলার একাডেমি আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অন্তহীন প্রশংসা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে পুব বাঙলার জনপ্রিয় মাসিক 'মাহেনও'-এর সম্পাদক জনাব আবদুল কাদির, কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ কাব্যে'র 'অনুবাদক' পুব বাঙলার কবি সৈয়দ আলাওল ও তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী'র পুঁথি সংগ্রহ করা অতি কঠিন। লেখক এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এতই পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সঙ্গে করেছেন যে মূল পড়া না থাকলেও কাব্যখানির সঙ্গে যে পরিচয় হয় তা অকৃত্রিম ও বিকৃতিহীন। তবে লেখক যে আলাওলকে 'নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আশা করি কাদির সাহেব এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখে আমাদের সন্দেহভঞ্জন করবেন।

www.pathagar.com

অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী মীর মশার্‌রফ হোসেনের কর্মজীবন ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে যে গভীর গবেষণাত্মক প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে 'বিষাদ সিন্ধু'র অনুরাগীদের প্রভূত উপকার হবে সন্দেহ নেই। মশাররফ হোসেনকে বাঙালি এক 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক হিসেবেই চেনে; তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রচুর পরিচয় এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকেই পাওয়া যায়।

সৈয়দ মোর্তাজা আলী সাহেব 'বাঙলা গদ্যের আদিযুগ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চারটি উদাহরণ দিয়েছেন। (১) ১৫৫৫ খ্রি. অহমরাজ চুকম্পাকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের চিঠি, (২) ১৬৪৭ খ্রি. শ্রীহট্টাঞ্চলে লেখা একটি 'হকিকত নামা', (৩) জয়ন্তিয়া বুরুঞ্জী থেকে উদ্ধৃত আসামরাজকে লেখা জয়ন্তিপুরের রাজার একখানা চিঠি ও (৪) মনোএলদা-আসসুমের *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* থেকে। যে সমস্ত অঞ্চলের ভাষা থেকে তিনি উদাহরণ নিয়েছেন সেসব অঞ্চলের ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রচলিত উপভাষাগুলোর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত এবং তাঁর 'হিসটরি অব জয়ন্তিয়া' ওই ভূখণ্ড সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখিত একমাত্র গ্রন্থ (পাঠান-মোগল কেউই খাসিয়া পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত 'জয়ন্তিয়া রাজত্ব' অধিকার করতে পারেনি বলে এদেশে প্রাচীন হিন্দু পলিটির প্রচুর আবিষ্কৃত নিদর্শন পাওয়া যায়) ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের' চর্চাকারীর পক্ষে অপরিত্যজ্য। অগ্রজের সাহিত্যচর্চার নিরপেক্ষ আলোচনা নন্দনশাস্ত্রসম্মত, কিন্তু সংস্কার বাধা দেয়।

পাবনার সাধক কবি জহীরউদ্দীনের জীবন ও গীত সম্বন্ধে লিখেছেন মৌলবি গোলাম সাকলায়েন ও শ্রীহট্টের কবি শাহ হুসেন আলম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মৌলবি নিজামউদ্দীন আহম্মদ।

ইরানের সুফি মতবাদ বাঙলা দেশে এদেশের নিজস্ব শ্রীরাধাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ভক্তিবাদের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে এইসব মারিফতি (গুহ্য তত্ত্বাত্মক) গীতের সৃষ্টি জর্মন পণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসিহার ও হর্টেনের বিশ্বাস ইরানে থাকাকালীনই সুফি মতবাদ বেদান্ত, যোগ ও নারদ শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল; ফরাসি পণ্ডিত মাসিন্নো অস্বীকার করেন কিন্তু ইরানি এবং আরব কবিদের ন্যায় এঁরা আপন জীবনকাহিনী তাঁদের সৃষ্টির ভিতর বুনে দিতেন না। আত্মগোপন করার ভারতীয় ঐতিহ্যই বরঞ্চ তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন (কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, 'চণ্ডীদাস কয়' জাতীয় ভণিতা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া)। দুই প্রবন্ধের লেখকই যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাই নিঙড়ে নিঙড়ে তাদের কাব্যসৃষ্টি থেকে বের করেছেন। এই ধরনের কাজের প্রতি একাডেমি যে বিশেষ মনোযোগ দেবেন সেকথা পূর্বেই বলেছি। ভালোই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা যথেষ্ট আরবি-ফারসি জানেন না বলে মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের আরবি-ফারসি-ভর্তি অংশগুলোর টীকাটিপ্পনী কর্মটি পর্যন্ত এড়িয়ে যান— এ কাজ বিশেষ করে পূর্ব বাঙলাতেই ভালো হবে।

চৌধুরী শামসুর রহমান সায়েবের 'আমাদের সাংবাদিক প্রচেষ্টা' তথ্যবহুল প্রবন্ধ— অশেষ পরিশ্রমের পরিপূর্ণ সাফল্য।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করেছেন একাডেমির সুযোগ্য সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি 'রহীমুন্‌নিসা' প্রবন্ধ দিয়ে। ১৭৬৩-১৮০০-র মধ্যবর্তী কালের এই মহিলা কবি সরস স্বাভাবিক বাঙলায় যে কাব্যসৃষ্টি

www.pathagar.com

করে গিয়েছেন তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হক্ সাহেব— ভবিষ্যতে আরও হবে সে আশা রাখি। উপস্থিত দু একটি উদাহরণ পেশ করছি। স্বামীর আদেশে তিনি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করে দেন; সেই সম্পর্কে বলেন—

'শুন গুণিগণ হই এক মন
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটাপদ হৈলে
শুধরিতা সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি বুদ্ধি বলে গুণী
বিরচিল এ ভারতী ॥
পদে উকতি বুঝি কি শকতি
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিনু গাঁথি ॥'

রহীমুন্নিসার পিতামহ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে অজ্ঞাতবাস বরণ করেন :—

অগ্রগামী হৈয়া ইংরাজ যুদ্ধ দিল।
দৈবদশা ফিরিঙ্গীর বিজয় হইল ॥
মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্নধন।
লুটিয়া করিল খয় যত পাপিগণ ॥

পিতামহের মাতৃভাষা নিশ্চয়ই হয় ফারসি, নয় উর্দু ছিল। রহীমুন্নিসা কিন্তু খাঁটি বাঙালি। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমন্নিচা নাম জান, আদৌ ছিরীমতী ॥

অর্থাৎ তাঁর নাম 'শ্রীমতী রহিমুন্নিসা'।

শোকের কবিতায় এ মহিলার অসাধারণ সরল কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য উদাহরণ দিলেও ভবিষ্যতে এর 'ভারতী' আরও প্রকাশিত হবে এই আশা নিয়ে এ আলোচনা শেষ করি;—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার।
মোর জাদু কাল ফিরি না আসিল আর ॥
আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচয়,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায়।
আমার কান্দন শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিনী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥

www.pathagar.com

একাডেমির ভার যোগ্য স্কন্ধে পড়েছে, এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

একাডেমির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন জিগ্যেস করব না। বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফ্যারাডেকে নাকি এক মহিলা এই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি নাকি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ম্যাডাম্, নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কী কে বলতে পারে!'

উপস্থিত দেখতে পারছি শিশুটি বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ও তার কৌতূহল অসীম। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি, 'শতং জীব, সহস্রং জীব।'

রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ

(বগুড়া কলেজের সাহিত্য-অধিবেশনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ)

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা এবং সমস্ত ধর্মমত ভৌগোলিক কারণে অল্পপরিসর নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সভ্যতা এবং ধর্মমত গড়ে তুলেছে। কিন্তু যখনই সেই সভ্যতা এবং ধর্মমত নিজের গতি মুক্ত হয়ে বাইরে অন্যের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে তখনি তাদের মধ্যে দেশকাল, পাত্রভেদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। আমার আজকের বক্তব্য ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে আপনাদের আমার আগের কথাটা একটু চিন্তা করতে বলি। আমি নিজে মুসলমান, কাজেই এ বিষয়ে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকা ছাড়া আমি নানা দেশ ঘুরে এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি।

আজ বিজ্ঞানের কৃপায় দেশে-দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে, কাজেই এক দেশ আর এক দেশকে, এক সভ্যতা আর এক সভ্যতাকে নিবিড় করে জানবার সুযোগ পাচ্ছে। এই আধুনিক যুগে সত্যিকারের ইসলামের সেবককে মানসিক জড়ত্ব ত্যাগ করে ইসলামের সঙ্গে অন্য প্রচলিত সব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে তার আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে— শুধু মৌলভি-মোল্লার অনুশাসন এবং ধর্মব্যাখ্যানের ওপর নির্ভর করলে চলবে না।

ইসলাম সম্বন্ধে আপনাদের বোধহয় একটা ধারণা আছে যে 'ইহাই একমাত্র ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট একমাত্র সত্যধর্ম'। কিন্তু সেটা সত্যি নয়— কেননা এর আগেও মুশা ও যিশুখ্রিস্টের নিকট ভগবানের প্রত্যাদেশ সত্যধর্মরূপে প্রকাশ হয়েছিল। এক বিষয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সাদৃশ্য আছে— আল্লাহ যুগে যুগে সত্যপুরুষ বা প্রফেটের মাধ্যমে সত্যবাণী প্রকাশ করেন, কাজেই ইসলামকে একেবারে আকস্মিক বলে ধরলে চলবে না— পূর্বোক্ত দুই ধর্মমতের পরিণতি হিসেবেই জানতে হবে এবং কোরানও এ সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন।

নতুন কোনও ধর্মপ্রচারের পশ্চাতে শুধু ধর্মের মহান বাণী ব্যতীত একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি না-থাকলে তার প্রতিষ্ঠা হওয়া শক্ত। যিশুখ্রিস্ট সুদখোর ইহুদি বণিক-সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মস্থানকে টাকার লেনদেনের স্থান দেখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন— ধনীশোষিত জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন করলেও স্বার্থহানিভীত ধনী ইহুদিরা তাঁকে রাজদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁর প্রাণহানি করিয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদের নতুন ধর্ম ইসলামের প্রচারের

www.pathagar.com

পশ্চাতেও এইপ্রকার একটা আর্থিক প্রোগ্রাম ছিল— কি না ধনীদের আয়ের কিয়দংশ 'জাকাত' অর্থাৎ গরিবদের দান করতে হবে। এতে 'হ্যাভ-নট'রা আশ্বস্ত হলেও 'হ্যাভে'র দল আশঙ্কিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। একেশ্বরবাদ প্রচারে যারা বিশেষ বিচলিত হয়নি সেই কোরেশ-সম্প্রদায় তাঁকে মক্কা-ছাড়া করল! কাজেই ইসলামের এই সাম্যের ভিত্তিতে ধনবন্টন নীতি যদি পালন না-করা হয়— redistribution of wealth দ্বারা যদি 'হ্যাভ-নট'দের কোনও সুব্যবস্থা না হয়, তা হলে ইসলামের মূলনীতি মানা হবে না। সবাইকে— ধনী-দরিদ্রকে সঙ্গে নিয়ে শুধু একসঙ্গে আহার এবং বাসের সুবিধা দিলেই Islamic democracy প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামের যে অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম আছে তাকেও কার্যকরী করে তোলবার জন্য প্রয়াস করতে হবে।

হজরত মুহম্মদ যখন মদিনা থেকে আবার মক্কায় ফিরে এলেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁর ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করল— কোনও রক্তপাতের দরকার হয়নি। সেটা শুধু তাঁর মহাপুরুষত্বের জন্য, না তিনি 'হ্যাভ-নট'দের সহানুভূতি পেয়েছিলেন বলে? তার পর খলিফাদের আমলে পারস্যসাম্রাজ্য জয়ে ইসলামের এই অর্থবন্টননীতি কার্যকরী হয়েছিল— পারস্যের জনগণ করভারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল এবং যখনই ইসলামের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে তখনই তারা ইসলামকে সাদরে বরণ করে নিল— নইলে যে বিরাট পারস্যবাহিনী গ্রিকদের পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল তারা কেন ইসলামের কাছে পরাস্ত হবে! ইসলামের ধনসাম্যের Message বা বাণী তাদের জনগণের Morale একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিল। এই ইসলামেয় বাণীই তুরস্ক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন জয়ে সাহায্য করেছে— সুদ্ধু অস্ত্রবল এবং নতুন ধর্মের বাণীতে হয়নি। ইসলামের আদিযুগের কাহিনী হচ্ছে এই।

তার পর যখন ইসলামের ক্ষমতা বিস্তৃত হল— দেশজয়ে যখন সম্পদে ইসলাম সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধ হতে লাগল, তখন থেকে তারা হ্যাভ-নটদের কথা বিস্মৃত হতে লাগল এবং ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পতন আরম্ভ হল। ভারতে যখন মুসলমান এল তখন ইসলামের সেই Message আর নেই। কাজেই দেখি নবাব ওমরাহদের বংশধর ব্যতীত মধ্যভারতের কয়েকটি শহর অঞ্চল ছাড়া ইসলাম আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হল না। বাঙলায়ও মুসলমান ধর্মের প্রসার হত না যদি আরব থেকে প্রচারকরা ইসলামের মূল নীতির বাহক ও ধারক হয়ে এখানে প্রচারে অবতীর্ণ না হতেন।

এদিকে ভারতে ঢুকেও ইসলাম নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে একপেশে হয়ে রইল। কারণ হিন্দুধর্মের ভগবান-সম্পর্কিত দিকটা বড় উদার— তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যাকে যখন খুশি মেনে নিলেই হল— তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু খাওয়া-ছোঁওয়া-বিবাহাদি ব্যাপারে সামাজিক অনুশাসন বেশ কড়া— বিশেষ বিশেষ পন্থি এবং নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে— সেসব অমান্য করলেই জাত গেল। মুসলমানদের এ বিষয়ে ঠিক হিন্দুদের বিপরীত— ভগবান 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এটা মানতেই হবে এবং এ সম্বন্ধে কোনও ভিন্নমত পোষণ করা একেবারেই চলবে না। আর সামাজিক ব্যাপারে অর্থাৎ আহারবিহারে একেবারে উদার। কাজেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনও Common Platform বা আপসক্ষেত্র পাওয়া গেল না, কাজেই মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে

www.pathagar.com

সাত-আটশো বছর বাস করলেও হিন্দুর বিরাট দর্শনশাস্ত্র ইসলামে কোনও ছায়াপাত করতে পারল না।

এইভাবে হিন্দু এবং মুসলমান টোল এবং মাদ্রাসাতে মশগুল হয়ে রইল। ধর্মমতের মিল আর হয়ে উঠল না। কেউ কাউকে জানার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করল না। ইংরেজ এসে কিন্তু 'মিরাকেল' ঘটাল— টোল-মাদ্রাসা ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান এক বিদ্যায়তনে পড়াশুনা করতে লাগল— ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ফারসির জায়গায় রাষ্ট্রভাষা হওয়াতে মুসলমান কিছুকাল মুখ ফিরিয়ে অভিমান করে বসেছিল— হিন্দুরা আগেই এসেছে বলে শিক্ষায় মুসলমানরা একটু পেছিয়ে গেল। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্র দুটো হলেও দু রাষ্ট্রের মধ্যে সকল ধর্মের লোক আছে, কিন্তু তাতে শিক্ষার বা কালচারের অসুবিধা কেন হবে। হিন্দু-মুসলমানে কোনও কোনও বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গির একটা ঐক্য থাকতে পারে— সেখানে ধর্মের কোনও স্থান নেই। পারস্যের কালচার যেমন পারস্যভাষার সাহায্যে নতুন করে গড়ে উঠেছে— যদিও পারসি ভাষা আরবি অর্থাৎ পবিত্র কোরানের ভাষা নয়— একেবারে কাফেরের ভাষা। পারসি ভাষায় রুমি, জালালুদ্দিন, সাদি, হাফিজ সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি করলেন। ভারতের উর্দুভাষা কিন্তু আরবি-পারসি-হিন্দি মন্থন করে গড়ে ওঠেনি— উর্দুর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে তো ঢের হিন্দু রয়েছে। উত্তরভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরের গঠনশিল্প কি হিন্দু ও ইসলামের মিলিত কালচারের চিহ্ন বহন করছে না? গজনির সুলতান মামুদের সভাকবি আলবেরুনি এদেশে দীর্ঘকাল বাস করেছেন শুধু এদেশের সভ্যতাকে জানবার জন্য এবং সেটার যেটুকু ভালো সেটুকু আহরণ করে নিজের দেশের সভ্যতার অঙ্গবৃদ্ধি করার জন্য। এই যে Power of assimilation বা পরের ভালোটুকু আত্মস্থ করে নেওয়ার ক্ষমতা সেটা একদিন ইসলামের ছিল— সেক্ষেত্রে সে ধর্মনিরপেক্ষভাবেই চলেছিল।

আজ পূর্ব পাকিস্তানের এই বিরাট জনসংখ্যাকে ইসলামের ঐতিহ্য মনে রাখতে হবে এবং সেই পরমতসহিষ্ণুতাকে সম্বল করে নিজের ধর্মমতকে আর একটু পরের সমালোচনার দ্বারা সহনশীল এবং তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র করে অগ্রসর হতে হবে— তা হলে জনসংখ্যায় এবং আয়তনে পারস্যাপেক্ষা বড় এই যে পূর্ব-বাঙলা, এ কি উন্নত হতে পারবে না? শুধু ধর্মের ঝুলির ওপর নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন দেশের পত্তন করা যায় না। নতুন রাষ্ট্রকে নতুনরূপে দেখতে হলে ইসলামধর্ম ভালো করে জানতে হবে— পড়তে হবে ইসলামের মূলনীতিগুলো যা সর্বদেশের এবং সর্বকালের জন্য। তা হলেই দেশ-স্বাধীন সত্যিকারের হবে। প্রাক-স্বাধীন যুগে ছিল ভাঙার কাজ— স্বাধীনোত্তর সময়ে হবে গড়ার কাজ। ভারত ডোমিনিয়নের কটা বন্দুক-কামান আছে এবং আমাদেরই-বা কটা আছে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেশের কোনও উপকার হবে না। হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা নয়— নিজের দেশের কিসে ভালো হবে, দেশের লোক কিসে পেটভরে খেতে এবং পরতে পারবে সেইসব শুভঙ্করী বুদ্ধিবৃত্তির দিকে আপনাদের উৎসাহ প্রয়োগ করতে হবে। যদি এই কথা মনে রাখেন, দেশের সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য তা হলে পাতঞ্জলের ভাষায় সেটাই হবে আপনাদের রাষ্ট্রের 'দৃঢ়ভিত্তি'— তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর অধঃপতন নেই।

www.pathagar.com

বৈদেশিকী

ইংরেজ রাজত্বে আমাদের মস্ত সুবিধা এই ছিল যে দেশ-বিদেশের খবর রাখার আমাদের কোনও দায় ছিল না। জর্মনির সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে ইংরেজ যে শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই যুদ্ধ বাধাত তা নয়, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে হতভাগা দেশকেও সে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলত। কোনও সরল ইংরেজ যদি তখন শুধাত যে ভারতবাসীর এ যুদ্ধে সায় আছে কি না, তখন লন্ডনের বড়কর্তারা অভিমানভরে বলতেন, 'এ বড় তাজ্জব প্রশ্ন! এ প্রশ্নে লুকানো রয়েছে আমাদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ। খবর নাও, দেখতে পাবে ভারতবর্ষে আমরা কস্মিনকালেও জবরদস্তি-রঙরুট (কন্‌স্‌ক্রিপশন) করিনি। ভারতের প্রত্যেকটি সেপাই আপন খুশ্‌ এক্তেয়ারে জর্মনির বিরুদ্ধে লড়ছে।'

কাজেই এরকম উত্তর শুনে ভূ-ভারত ভাবত, ভারতীয় সৈন্য অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শবাদী বীরপুরুষ। তাঁরা যে উচ্চশিক্ষিত সে বিষয়ে আর কী সন্দেহ? তাঁরা নিশ্চয়ই হিটলারের 'মাইন কাম্‌ফ্‌', রজেনবের্গের 'মিথ্‌' পড়েছেন, কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্প সম্বন্ধে তাঁরা ওকিব-হাল, নাৎসি দলের বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে সত্যসুন্দরমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জর্মনির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন।

তাই যদি হত তা হলে আমাদিগকে মেহন্নত করে এই 'বৈদেশিক পর্যায়' আরম্ভ করতে হত না। আমরা জানি, ভারতবাসী আপন বিরাট দেশ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, এমনকি তার জাতীয় সঙ্গীতে যে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধেও তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। পরাধীনতার সবচেয়ে মারাত্মক অভিসম্পাত সপ্রকাশ হয় তার 'শিক্ষা'-পদ্ধতিতে। আমরা এতদিন ধরে যে শিক্ষালাভ করেছি তার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করে পৃথিবীতে আপন আসন বেছে নিই। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত জড়ভরত করে রাখার; তাতে ইংরেজের লাভ ছিল।

তাই আশ্চর্য বোধ হয় যখন বাঙালির ছেলে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। আনন্দ বোধহয় যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুঃখ-দৈন্যের ভিতরও তারা তাদের মনের জানালা ক খানা বন্ধ করে দেয়নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলব না— দেশ-বিদেশ ভ্রমণকারী বান্ধবদের মুখে শুনেছি যে, তাঁরা বিদেশে কী শিক্ষা পেয়েছেন, সে সম্বন্ধে বাঙালি তরুণের যত না অনুসন্ধিৎসা তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের কৌতূহল যে-দেশ তাঁরা ভ্রমণ করে এসেছেন সে-দেশের নানা খবরাখবর শুনতে। বই পড়াতেও তাদের উৎসাহ কম নয়, আর খবরের কাগজ তো তারা পড়েই।

কিন্তু খবরের কাগজে তারা বিদেশি খবরের সন্ধান পায় কতটুকু?

আমি বাঙালি দৈনিক কাগজগুলোর কথা ভাবছি। সেগুলোতে বিদেশি খবর যেটুকু পরিবেশন করা হয় সে এতই নগণ্য যে তার ওপর নির্ভর করে যদি কোনও বাঙালি 'সাধারণ জ্ঞানের' পরীক্ষায় বসে, তবে তার 'অনার্স' বা সসম্মান ফেল অনিবার্য। বাঙলা দৈনিক পড়ে মনে হয়, বিদেশি খবর দেবার বরাত যেন ইংরেজি কাগজের, আবার 'দেশি' ইংরেজি কাগজ পড়লে

www.pathagar.com

মনে হয় তাঁরা যেন বরাত চাপিয়ে দিচ্ছেন 'স্টেটসম্যানের' ঘাড়ে। 'বিদেশি খবর?' ওগুলো দেবে বিদেশি কাগজ— ওসব হচ্ছে 'স্টেটসম্যানের ' কর্ম। যেন বাঙালি কাগজ বাঙালি বিধবার শামিল। বিলিতি বেগুনের মতো বিলিতি খবর তার পক্ষে নিষিদ্ধ!

আর বিদেশি খবর যে-হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দেন সে-ও আবার সর্বপ্রকার টীকা-টিপ্পনী বিবর্জিত। ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সের মতো সুশিক্ষিত দেশের কাগজওলারা পর্যন্ত খবর রাখে যে সাধারণ পাঠক কতটুকু জানে না-জানে এবং সেই হিসেবে বিদেশি খবর পরিবেশন করার সময় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী দিতে কসুর করে না। শুধু তাই নয়, সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হয়, রবিবারের কাগজে তার বিস্তৃত সচিত্র বিবরণ বেরোয় এবং যদি সমস্ত ব্যাপারটা দেশের সাধারণ লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তবে রাজনৈতিক কর্তাদের আসরে নেমে আপন আপন বক্তব্য খোলসা করে বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো প্রধানমন্ত্রীকেই বিবৃতি দিতে হয়। দেশের লোকেরা তখন অন্তত এইটুকু প্রত্যয় রাখে যে তাঁর বিবৃতি বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর তৈরি করা হয়েছে। সে বিশেষজ্ঞ রাজদূত; যে-দেশ নিয়ে আন্দোলন আলোড়ন চলছে তিনি সে দেশে বসবাস করেন ও প্রতিদিন না হোক, প্রতি সপ্তাহের সে দেশ সম্বন্ধে একখানা গোপনীয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পাঠান।

আমাদের পত্রিকাওলারা কোনওরকম মেহন্নত করতে নারাজ। পাঠক কী খবর চায় না-চায়, তাকে কী করে পৃথিবীর খবর সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বায়স্কোপওলারা যদি যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেয়, বড় বড় কোম্পানির নেকনজর থেকে যদি তাঁরা বঞ্চিত না হন তবে কাগজ চলবেই— কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভালো খবর পরিবেশন করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র নবজাত কাগজের মধ্যে। বাচ্চা হরিণের মতো তাঁরা ছুটোছুটি করেন ভালো খবরের সন্ধানে কিন্তু কাগজ চালু হয়ে যাওয়ার পর তাঁরাও মেদস্ফীত হরিণের ন্যায় পাঁচতলা-গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকাটাই জীবনের চরম মোক্ষ বলে ধরে নেন।

বক্ষ্যমাণ মাসিক এ সমস্ত অভাব ঘুচিয়ে দেবার স্পর্ধা বা দম্ভ করে না। তার যদি কোনও দম্ভ থাকে তবে সেটুকু মাত্র এই যে সে চেষ্টায় কসুর করবে না। এবং তার ভরসা যে একদিন যোগ্য পাত্র এসে আমাদের আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করে দেবেন।

দেশের অত্যন্ত কাছে, যে দেশকে বিদেশ বলা প্রায় ভুল, সেই দেশ নিয়ে আমাদের এ পর্যায় আরম্ভ হল।

আফগানি দাবি

একদা এক কান্দাহারি রাজকুমারী বহুশত যোজন অতিক্রম করে বরের সন্ধানে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় কবি তখন ভূ-ভারত দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন— রাজকন্যার দিকে ভালো করে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'এ কন্যার নিদেনপক্ষে একশো বাচ্চা হবেই হবে।' একশো বাচ্চা শুনে যেন আমরা আশ্চর্য না হই; কান্দাহারি পাঠান কুমারীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দেখলে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী সবাই করে থাকে— গান্ধারীকে দেখে হস্তিনাপুরের ব্যাস

যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটা ফলেছিল তো বটেই, এমনকি ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবার জন্য একটা বোনও পেয়ে গিয়েছিল।

এ হল প্রায় চার হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু আফগানিস্তান পাহাড়ি মুল্লুক, আইনকানুন জানে না, দলিল-দস্তাবেজের ধার ধারে না। সেদেশে কোনও দাবিদাওয়ার মেয়াদ ফুরোয় না, কোনও পাওয়া তামাদি হয় না— 'টাইমবার' নামক বাঁধাবাঁধি আফগান ঐতিহ্যে কখনও ঠাঁই পায়নি। তাই আজ চার হাজার বৎসর পর আফগানিস্তান তার কান্দাহারি মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ চেয়ে বসেছে।

এ খবর শুনতে পেয়ে পাকিস্তানিরা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছে। ডমিনিয়নবাসীরা বক্রহাসি হেসে বলছেন, 'করো পাকিস্তান, হও আলাদা। এইবারে ঠ্যালাটা সামলাও। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" বলে হুঙ্কার দিতে না এককালে?— এইবার তাগড়া পাঠানদের সঙ্গে লড়ে বাঁচাও "আপন জান্ আপন পাকিস্তান"।'

পাকিস্তানিদের মনে আবছা-আবছা ধারণা, আফগানিস্তানের ভাষা পশতু, আফগানরা জাতে পাঠান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাসিন্দারাও পশতু বলে, তারাও জাতে পাঠান। অতএব আফগানিস্তানের দাবিটা হয়তো সম্পূর্ণ কাবুলি পাওনাদারের লাঠির জবরদস্তির ভয় দেখানো নয়।

এ ধারণা ভুল ইতিহাস পড়ার ফল।

আর্য অভিযান থেকে আরম্ভ করি। আর্যরা এদেশে এসেছিলেন আফগানিস্তান হয়ে। আজ যাঁরা আফগান-পাঠান নামে পরিচিত তাঁরা আমাদেরই এক অংশ। পশতু ভাষা আর্য ভাষা।

আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আমাদের মহাভারত পুরাণে— আফগানিস্তানের নিজস্ব কোনও দলিল-দস্তাবেজ নেই। বল্হিক দেশ (ফারসি বল্খ্), কাম্বোজ, বক্ষু নদী (Oxus = গ্রিক অক্ষুস্) বিধৌত পার্বত্যভূমি আজ 'আফগানিস্তান' নামে পরিচিত। আমাদের ইতিহাসে এসব অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আজও কাবুলিওয়ালারা যে জাফরান ও হিঙ 'বল্খ্' অঞ্চল থেকে এ দেশে নিয়ে আসে তার নাম সংস্কৃতে 'বাল্হিকম্'।

পাকাপাকি ইতিহাস আরম্ভ হয় সিকন্দার সাহেব বিজয়-অভিযানের পর থেকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বল্খ্ বাদে সমস্ত আফগানিস্তান গ্রিকদের কাছে কিনে নেন।

রাজা অশোক বৌদ্ধশ্রমণ মাধ্যন্তিককে পাঠান আফগানিস্তানে। আফগানরা অগ্নি-উপাসনা (সে উপাসনাও বৈদিক ধর্মের অংশবিশেষ ও জরথুস্ত্রি ধর্ম নামে পরিচিত) ছেড়ে দিয়ে খাস ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। আফগানিস্থানের পর্বতগাত্রে খোদিত বামিয়ানের বিরাট বৌদ্ধমূর্তিযুগল ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন। গান্ধার শিল্পের যে ভাণ্ডার আফগানিস্তানে পাওয়া গিয়াছে তাও ভারতীয় ও গ্রিক শিল্পকলার সম্মেলনে তৈরি। এসব শিল্পকলাতে আফগানরা কোনও অংশ নেয়নি।

মৌর্য পতনের পর গ্রিকরা আফগানিস্তানে রাজত্ব করে। তারাও যে কতদূর ভারতীয় প্রভাবে পড়েছিল সেটা সপ্রমাণ হয় তাদের মুদ্রালাঞ্ছন থেকে। তাতে রয়েছে গ্রিক ও ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি— পশতুর কোনও সন্ধান নেই।

কনিষ্ক ভারত-আফগানিস্তানের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পেশোয়ারে— কাবুলে নয়।

www.pathagar.com

গুপ্তরা আফগানিস্তান দখল করেননি। কিন্তু গুপ্তযুগের পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ পাঠানের পক্ষে তথাগতের অহিংসানীতি পালন করা যে সুকঠিন হয়ে উঠেছিল সে তত্ত্বটা সহজেই অনুমান করতে পারি।

সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউ এন সাঙ কাবুলে এসে দেখেন আফগানিস্তানবাসীদের অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক বৌদ্ধ। তিনি কান্দাহার, গজনি, কাবুল অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন।

পাঠক যেন মনে না করেন যে ভারতবর্ষ যেসব যুগে আফগানিস্তানে রাজত্ব করেনি সেসব যুগে আফগানরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছেন। আফগানরা লড়াই করতে জানে, কিন্তু শান্তি-স্থাপনার কর্ম অনেক কঠিন— আফগানের পেটে সে বিদ্যে নেই। আর শান্তি স্থাপন না করে রাজত্ব করা যায় কী প্রকারে?

তার পর আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতবর্ষ মুসলমান হয়ে গেল। পাঠান রাজারা আফগানিস্তানে রাজত্ব করেননি সত্য কিন্তু দিল্লি ফরাসি সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল। কাবুলিরা শিক্ষাদীক্ষা অর্থাগমের জন্য ভারতবর্ষে আসতে লাগল। আলাউদ্দিন খিলজির সভাকবি আমির খুসরৌ ফারসিতে যে 'ইশকিয়া' নামক কাব্য লিখেছেন তাতে 'দেবল-দেবী'র প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। কত শত বৎসর হতে চলল আজও কাবুল শহরে জনপ্রিয় কবি ভারতীয় আমির খুসরৌ। কোনও আফগান কবির নাম তো কেউ কখনও এদেশে শোনেনি।

বাবুর আফগান নন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি কান্দাহার, গজনি, কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে ধরেছেন ও এসব জায়গার প্রতি তাঁর যতই দরদ থাকুক না কেন, তিনি রাজধানী বসিয়েছিলেন দিল্লিতে। তাঁর পৌত্র জালালউদ্দিন আকবর জালালাবাদ শহরের নতুন ভিত্তি নির্মাণ করে শহরকে আপন নাম দিলেন। তাঁর পৌত্র শাহজাহান কাবুলে বাবুরের কবরের কাছে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তামাম কাবুল শহরে সেই একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থপতি। (বাবুর কান্দাহার, গজনি, কাবুল অঞ্চলকে তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন)।

কিন্তু এসব তথ্যের চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে, আফগানরা এককালে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকলা গ্রহণ করেছিল; পাঠান-মুঘল যুগে দিল্লিতে এসে আরবি-ফারসি শিখত। ১৭৪৭ সালে আহম্মদ শাহ দুররানি কর্তৃক আফগানিস্তানে স্বাধীন রাজত্ব (আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম স্বাধীন রাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, এবং আজ পর্যন্ত আফগানরা আরবি-ফারসি এবং ধর্ম শিক্ষার জন্য আসে ভারতবর্ষের দেওবন্দ-রামপুরে। তারা পারস্যে যায় না, কারণ পারস্যবাসীরা শিয়া। শিক্ষাদীক্ষায় আফগানিস্তান যে ভারতবর্ষের কাছে কী পরিমাণ ঋণী তার সামান্যতম উদাহরণ এই যে, ভারতবর্ষের কোথাও ফারসি মাতৃভাষারূপে প্রচলিত নয়, কাবুলবাসীদের মাতৃভাষা ফারসি এবং কাবুলিরা আসে ফারসি শিখতে ভারতবর্ষে। দেওবন্দ-রামপুরে ফারসি শেখাবার জন্য যেরকম বিদ্যালয় আছে, আফগানিস্তানের কোথাও সেরকম নেই।

শুধু ইসলাম শাস্ত্র চর্চার জন্য যে আফগান এদেশে আসে তা নয়, বিস্তর ভারতীয় অধ্যাপক, শিক্ষক কাবুল-জালালাবাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান করেছেন। আজ যদি এঁরা সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন তবে আফগানিস্তানের 'ওজারত-ই-ম' আরিফ (শিক্ষা

www.pathagar.com

দফতর) চোখে নরগিস্ ফুল দেখবেন! পক্ষান্তরে আজ যদি সব কাবুলিওলা এদেশ থেকে চলে যায় তবে বহু কলের মজুর মৌলা আলিতে শিরনি চড়াবে।

এসব তো হল প্রাচীন অর্বাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের কথা। তার সব দলিল যে সবাই মেনে নেবেন সে আশা দুরাশা। কারণ শিক্ষা-দীক্ষার জগতে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় 'কালোবাজার' চলছে ইতিহাস-পট্টিতে। হিটলার থেকে আরম্ভ করে ট্রুম্যান পর্যন্ত সে বাজারে এক্স-দিল্ দামের সাত ডবল দাম চায়! সাদা বাজারের সসেজ-খেকো, ভুঁড়িওলা জর্মন সেখানে 'নর্ডিক-হিরো', ট্রুম্যান-পট্টিতে সুদখোর ইহুদি প্রিয়দর্শী অশোকের ন্যায় (প্যালেস্টাইনে) ধর্মপ্রচারাকাঙ্ক্ষী শ্রমণ!

কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা হোক। আফগানদের যুক্তি যদি ভাষা ও জাতীয়তার (racial) ঐক্যের ওপর খাড়া হয় তবে আফগানিস্তানের— প্রথম কর্তব্য হবে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল রুশিয়াকে (অর্থাৎ উজবেগিস্তান তুর্কিস্থান) ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় তুর্কোমান মোঙ্গল, উজবেগ।

দ্বিতীয় কর্তব্য হবে আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল ইরানকে ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় ইরানি।

অথবা উচিত রুশকে দাবি জানানো; রুশরা যেন তাদের উজবেগিস্তান ও তুর্কিস্থান আফগানিস্তানের হাতে সঁপে দেয় এবং ইরানকে বলা যেন তাবত ইরানভূমি আফগানিস্তানের অংশীভূত হয়ে যায়।

এ দাবিটা যে কতদূর বেহেড তার একটা তুলনা দিই। সুইস জাতি গড়ে উঠেছে তার পশ্চিম অঞ্চলের ফরাসি, উত্তর অঞ্চলের জর্মন ও পূর্ব অঞ্চলের ইতালীয়কে নিয়ে। এই তিন অঞ্চল আবার শব্দার্থে অঞ্চল, কারণ এরা সবাই মূল শাড়ি ফ্রান্স, জর্মনি এবং ইতালির প্রান্ত থেকে খসে পড়ে সুইজারল্যান্ডে লুটোচ্ছে। আজ যদি সুইজারল্যান্ড খেপে গিয়ে ফ্রান্স, জর্মনি এবং ইতালিকে সুইস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য দাবি জানায় তবেই তার তুলনা হবে আফগান দাবির সঙ্গে।

কিন্তু যদিও এ দাবি শুধু পাগলা-গারদেই নির্ভয়ে করা চলে তবু এ ধরনের দাবি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। কাবুলিওলাদের সুদের দাবি যে অনেক সময় আসলের বিশগুণ হয়ে দাঁড়ায় সে অনেক মজুরই জানে।

পশতুভাষী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তো কস্মিনকালেও আফগানিস্তানের অংশরূপে পরিচিত হয়নি, বরঞ্চ কান্দাহার— গজনি— কাবুল— জালালাবাদ অঞ্চল (এবং এই অঞ্চলই খাস আফগানিস্তান— এই অঞ্চলের লোকই পশতু বলে এবং 'পাঠান' নামে পরিচিত— পূর্বেই বলেছি বাদবাকি অঞ্চল ইরান ও সোভিয়েট তুর্কমানিস্তানও উজবেগিস্তানের অংশরূপে পরিচিত) ভারতবর্ষের অংশ, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে কেটে নিয়ে আফগানিস্তানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, খেয়ালি দাবির হাওয়া বইয়ে কাবুলি পাগলকে জাগাল কে?

রুশ।

ফরাসিতে প্রবাদবাক্য আছে, 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্ শোজ', অর্থাৎ 'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা বেশি করে আগের মতো দেখায়।' স্তালিনি গুণীরা যতই তাঁদের

www.pathagar.com

বৈদেশিক নীতি বদলাতে চান ততই তাঁদের চেহারা জারের চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। রক্ত-শোষক জার ও প্রলেতারিয়ার রক্ষক স্তালিনের বৈদেশিক নীতিতে আজ আর কোনও পার্থক্য নেই। বাংলা সাহিত্য পাটনির বরাতজোরে 'দুধে-ভাতে' বেঁচে ওঠা সন্তান। কিন্তু এই উপযুক্ত সঙিন বৈদেশিক নীতি তার ছাপ এই মোলায়েম সাহিত্যের ওপরও রেখে গিয়েছে;—

'বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনও এক সময়ে ইংরেজ গভর্নমেন্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়া কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনও হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন (ইং ১৮৬৮ মে— ১৮৭০ ডিসেম্বর) পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন একটা ছিদ্রপথ দিয়া (আসলে আফগানিস্তান দিয়ে — লেখক) যে রুশীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মা'র মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণত-বয়স্ক দলের সহায়তা লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখ তো।" মাতার-উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাতে পিতা লিখিয়াছিলেন— ভয় করিবার কোনও কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ান-ভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না— কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল।' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৭ খণ্ড, ৩০৫ পৃ.)

যে জুজুর ভয়ের উল্লেখ করে কবিগুরু কাহিনীটি বলেন, আফগানিস্তান আজ সেই জুজুর ভয়ই দেখাচ্ছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রুশ তখন যে ভয় দেখাত আজ সেটা প্রকাশ পাচ্ছে আফগানিস্তানের মুখভেংচিতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও জানি যে রুশ যেমন অন্তরে অন্তরে বুঝত যে আফগানিস্তান শেষ পর্যন্ত ভারত আক্রমণ করতে কখনও রাজি হবে না, আজও তেমনি আফগানিস্তান যত ভেংচিই কাটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধং দেহি বলে আসরে নামবে না। দোস্ত মুহম্মদ, আব্দুর রহমান, হবিবউল্লাকে রাশা বিস্তর তোয়াজ করেছে ভারত আক্রমণের জন্য। শেষ পর্যন্ত এ-দোহাই পর্যন্ত পেড়েছে যে মুসলিম আফগানের উচিত ভারতীয় মুসলিমকে কাফির ইংরেজের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, কিন্তু কাবুল নদীর জলে কোনও দিব্য-দিলাশার হাল কোনওদিনই কোনও পানি পায়নি। কারণ দোস্ত, রহমান, হবিব তিনজনাই জানতেন, ভারত আক্রমণ করেছ কি সঙ্গে সঙ্গে রুশ কপ্ করে আফগানিস্তানটি গিলে ফেলবে। হিটলারের বহুপূর্বেই কাবুলি গুণীরা জানতেন যে একসঙ্গে দুই অঙ্গনে নাচা-কুঁদা যায় না।

অধম ঝাড়া দুটি বৎসর কাবুলে ছিল। কাবুল এমনি নীরস নিরানন্দ পুরী যে সেখানে বেঁচে থাকতে হলে রাজনৈতিক দাবাখেলায় মনোযোগ করা ছাড়া অন্য কোনও পন্থা নেই। আফগানিস্তানের সৈন্যবল, অস্ত্রবল আমাদের যাত্রার দলের ভীমসেনের গদার মতো— ফাঁপা এবং কাঁকরে ভর্তি। শব্দ করে প্রচুর।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের আসল জোর তার পার্বত্যভূমি, তার গিরিসঙ্কটে। তাই দিয়ে সে আত্মরক্ষা করে আর আপন স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু আফগানিস্তান ভারত আক্রমণ করলে তো আর পার্বত্যভূমি, গিরিসঙ্কট আপন কাঁধে করে নিয়ে এসে ভিন্‌ দেশে কাজে লাগাতে পারবে না।

কিন্তু এসব হল পাকিস্তান এবং ডমিনিয়নের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি। সে আলোচনা আর একদিন হবে। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তানের অন্তঃসারশূন্য দাবি নিয়ে আলোচনা করার।

সর্বশেষে বক্তব্য, পাকিস্তান যদি আফগানিস্তানকে নিয়ে কোনওদিন সত্যই বিপদগ্রস্ত হয় তবে ডমিনিয়নের তাতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শুধু পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ নয়, ভারতেরও বটে।

সুদিনে দুর্দিনে জর্মনি

চীনের সঙ্গে যে আমাদের হৃদ্যতা আছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত প্রাচীন, বিরাট, বিপুল দেশ যে একদিন আমাদের রাজাধিরাজ চক্রবর্তী বুদ্ধ তথাগতের দর্শনলাভ না করেও তাঁর পদানত হয়েছিল সেকথা ভাবতে আমাদের হৃদয়ে গৌরবের সঞ্চার হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে সেদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক জাত্যাভিমানকে যখনই ইংরেজ অবমানিত করেছে তখনই আমরা আমাদের অধমর্ণ চীনের কথা ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি।

আরেকটি দেশ সে দুর্দিনে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। সে দেশ জর্মনি। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, শোপেনহাওয়ার উপনিষদের প্রশস্তি গেয়ে জর্মনির বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি আকর্ষণ করেন। ফলে জর্মন পণ্ডিতরা সংস্কৃত ও পালি নিয়ে যে গবেষণা আরম্ভ করেন সে মণিমঞ্জুষার দশমাংশের সঙ্গেও আমরা এখনও পরিচিত হইনি। ভারতীয় বৈদগ্ধ্যানুরাগী কিন্তু জানেন, আচার্য মোক্ষমূলর আর্যাভিযানের বিজয়রথ কী করে জাহ্নবীর ন্যায় অনুসরণ করেছেন, ইয়াকবি জৈনধর্মের লুপ্তপ্রায় গৌরব উতঙ্কের ন্যায় পুনরুদ্ধার করলেন, তাঁর শিষ্য কির্ফেল অগাধ পুরাণশাস্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে মৎস্যাবতারের মতো বিরাট পুস্তক 'ইন্ডিশে কলগনি' মস্তকে তুলে ধরলেন, গেল্ডনার গণপতির ন্যায় ঋগ্বেদ জর্মন ভাষায় অনুলিখন করলেন, উইনটারনিৎস সর্বশেষে সঞ্জয়ের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ অন্ধ পৃথিবীকে সামসঙ্গীত উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে দিলেন।

*মৃচ্ছকটিকা*র জর্মন অনুবাদ অন্ততপক্ষে সাতজন লেখক করে গিয়েছেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ওপর থিসিস লিখে কজন জর্মন, অজর্মন ডক্টরত্ব পেয়েছেন সে সম্বন্ধেও একখানা থিসিস লেখা যায়।

জর্মন ঔপন্যাসিক টেয়োডোর স্টর্মের 'ইমেন্‌জে' পুস্তকের গোড়ার দিকে একপাল ছেলেমেয়ে ছোট্ট একখানা গাড়ি বানিয়ে তার মধ্যে গুটিকয়েক বসেছে, বাদবাকিরা গাড়ি টানছে, আর সবাই চেঁচিয়ে বলছে;—

www.pathagar.com

'নাখ্ ইন্ডিয়েন্, নাখ্ ইন্ডিয়েন!'

অর্থাৎ

'ভারত চল, ভারত চল!'

পিরামিডের দেশ মিশর রইল, ড্রাগনের দেশ চীন রইল, আরব্যোপন্যাসের বাগদাদ রইল, ছেলেগুলোর মন কেন ভারতবর্ষেরই দিকে ধাওয়া করল কে জানে? তবু যদি শকটটি মাটির গড়া হত তবু বুঝতুম, কারণ *মৃচ্ছকটিকা*র দেশ ভারতবর্ষ। তবে হ্যাঁ, হয়তো শকটটি ক্ষুদ্র ছিল বলে সে 'হীনযান'কে শরণ করে তারা তথাগতের দেশে পৌঁছতে চেয়েছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেছেন বালকেরা ক্রীড়া করে এবং বৃদ্ধেরা চিন্তা করেন। শকটিকাতত্ত্ব আবিষ্কার করবেন বৃদ্ধেরা চিন্তা করে, বালকের মধ্যে যদি কোনও আবিষ্কার-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তবে সে জিনিস নিশ্চয়ই কল্পনাপ্রসূত।

এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জর্মনদের শিশু এবং কবি মনের কল্পনা যে নৈসর্গিকতার বেড়া কতবার ভেঙেছে তার লেখাজোখা নেই। হাইন্‌রিশ্ হাইনে যে শুধু সুকবি ছিলেন তা নয়, সুপণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছেন—

'কী অপূর্ব দৃশ্য!

শ্যামাঙ্গী সুন্দরী গঙ্গাতটে নতজানু হয়ে গঙ্গাজলে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের উপাসনা করছে।'

পদ্মপূজা! সে পদ্মও ফুটেছেন গঙ্গাস্রোতে! একেই বলে কল্পনা!

ওদিকে ভারতবর্ষও জর্মনিকে প্রচুর সম্মান দেখিয়েছে। আমরা জর্মনিকে যে সম্মান জানিয়েছি তার বেশি দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী যখন রৌন্ড-টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করতে বিলেত যান তখন বহু সাংবাদিক মহাত্মাজিকে এদেশ-ওদেশ বহুদেশ দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। মহাত্মাজি বলেন যে, একমাত্র গ্যোটের বাইমার দেখবার তাঁর বহুদিনের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

শুনে জর্মনি যে আনন্দধ্বনি করেছিল তার প্রতিধ্বনি জর্মন বেতারে বেতারে বহুদিন ধরে শোনা গিয়েছিল। জর্মনির বড়কর্তারা তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে মহাত্মাজিকে ষোড়শোপচারে আমন্ত্রণ করেন; হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র মহাত্মাজিকে বেতারে যৎকিঞ্চিৎ বলার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে যায় এবং আর সব বেতারকেন্দ্রের ঈর্ষা তখন যেমন যেমন বিকট হতে বিকটতর রূপ নিতে লাগল, হামবুর্গ বেতারকেন্দ্রের ঢক্কানিনাদ সেই অনুপাতে জর্মনির কর্ণপটহ ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করল। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র প্রথম খবর দিল যে মহাত্মাজি বেতারযন্ত্রের সামনে উপস্থিত হতে স্বীকৃত হয়েছেন তখন প্রচারকের (এনাউন্সারের) কণ্ঠে কী গদ্‌গদ ভাব, চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম লোকটা আনন্দে গলে পড়ছে আর 'সখী, আমায় ধরো ধরো' বলে ঢলে পড়ছে, রেডিয়োর আর পাঁচজন তাকে চতুর্দিক থেকে ঠেকো দিয়ে কোনওগতিকে খাড়া করে রেখেছে।

তার পর যেদিন দুঃসংবাদ দেবার কাললগ্ন এল যে মহাত্মাজি কনফারেন্সে বিফলমনোরথ হয়েছেন বলে বাইমার আসবেন না তখন সে প্রচারকের আর সন্ধান নেই। যে দেবদূত মা-মেরিকে যিশুর শুভাগমনের 'সুসমাচার' দিয়েছিলেন তিনি এবং সঞ্জয় কী করে এক ব্যক্তি হতে পারেন?

www.pathagar.com

ভেবেছিলুম অন্যান্য বেতারকেন্দ্র হামবুর্গের কান কাটাতে বগল বাজাবে কিন্তু তার পরিবর্তে শোনা গেল কেন্দ্রে কেন্দ্রে দরদী গলা এবং সবাই মিলে একজোটে কনফারেন্সের বড়কর্তা ইংরেজের পিঠে মারল কিল।

মহাত্মাজি যে বাইমার যেতে পারেননি সেকথাটা বড় নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মহত্তম আদর্শবাদের প্রতীক মহাত্মাজি লন্ডন বসে ব্যঞ্জনায় বলেছিলেন, ইউরোপে যদি দেখবার মতো কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে গ্যোটের বাইমার।

* * *

পরশুদিন চিঠি পেলুম জর্মন সতীর্থ পাউল হর্স্টারের (Paul Harster) কাছ থেকে। জর্মনির এখন যা দুরবস্থা এবং ভারতবর্ষের মাথায় এখন যা কাজের চাপ তার মাঝখানে জর্মনির সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গিয়ে ঠেকেছে জর্মনির পাউল এবং 'ভারতে'র অখ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে।

পাউল চিঠি আরম্ভ করেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত আমরা দুজনে রাইনের পারে, ভিনাস পাহাড়ের (ভেনুস-বের্গ) উপরে, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়, কাফের ধুঁয়োর মাঝখানে কখনও উচ্চস্বরে, কখনও নীরবে, কখনও পত্রবিনিময়ে ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতা লাভের সুখস্বপ্ন গড়েছি। আমি বলতাম, ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বেই আমি মরব। পাউল বাঁকা হাসি হেসে বলত, 'আগাছা সহজে মরে না, কাঁটাতে পোকা ধরে না; স্বরাজ না দেখার পূর্বে তোমার মতো কাঁটা শুকিয়ে ঝরে পড়বে না।'

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, কিন্তু জর্মনি পরাধীন। সে পরাধীনতার চরমে পৌঁছেছিল গেল শীতে। অনাহারে পাউলের দুই শিশুকন্যার যক্ষ্মা হয়, তার স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেন। ছাত-চোঁয়ানো হিমজলে ভিজে পাউলের নিউমনিয়া হয়; ভুগুন্তি কপালে এখনও অনেক বাকি আছে বলে পাউল এখনও পটল বা কপি কিছুই তুলতে পারেনি।

পাউল লিখেছে;

'সুসংবাদ দিয়ে চিঠি আরম্ভ করি। আহারাদির বন্দোবস্ত আগের চেয়ে অল্প ভালো হয়েছে। তার কারণ কিন্তু এই নয় যে, মিত্রশক্তি আমাদের দুর্দশা দেখে বিগলিত করুণায় আমাদের ভিক্ষা দিতে রাজি হয়েছেন। খুব সম্ভব তুমি জানো যে মিত্রশক্তিরা লড়াই জেতার পর স্থির করেছিলেন যে, ১৯৫১ পর্যন্ত— অর্থাৎ লড়াইয়ের যে ছ বছর আমরা তাদের ভুগিয়েছি, ঠিক সেই পরিমাণ — আমাদের না খাইয়ে মারবেন। কিন্তু কর্তাদের মত বদলে গিয়েছে, এবং তার কারণ—

১. 'আমাদের কলকারখানা যদি আগুন নিবিয়ে বসে থাকে তবে হলান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, গ্রিস আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না এবং তা হলে তাদেরও আমাদেরি মতো দুরবস্থা হবে। হলান্ড তো গেল বৎসরও তার শাকসজি বিনে পয়সায় দিতে রাজি ছিল, কিন্তু ইংরেজ এতদিন অনুমতি দেয়নি (এক বৎসর পরে আজ এই পয়লা তরকারি খেলুম)।'

হলান্ড-ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের দুরবস্থা যেন জর্মনির মতো না হয় সে দুশ্চিন্তা ইংরেজের মাথায় কেন ঢুকল সেকথা পাউল লেখেনি। অনুমান করি, মার্শাল প্ল্যান চালু করে রুশকে ঠেকাবার জন্য এসব দেশের ধনদৌলত বাড়ানো ইংরেজ ও আমেরিকার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

২. 'বেভিন সায়েব বিপদগ্রস্ত হয়েছেন : আমরা যদি মাল-সরঞ্জাম তৈরি এবং রপ্তানি না করি, তবে আমাদের অন্য কোনও উপার্জন নেই। ইংরেজ জনসাধারণকে তা হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াতে পরাতে হবে। আর যদি ইংরেজ আমাদের কলকারখানা চালু করতে দেয় তা হলেও বিপদ— আমাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছে যাওয়ার দরুন আমাদের খাইখর্চা এত তলায় এসে ঠেকেছে যে, আমাদের মাল তৈরি হবে অত্যন্ত সস্তাদরে— জাপান যেরকম একদা অত্যন্ত সস্তা মাল তৈরি করতে পারত— এবং সে সস্তা মাল ইংরেজের রপ্তানি-মালের দাম কমিয়ে দেবে। শেষটায় ইংরেজ ইউরোপে আর কিছুই বিক্রি করতে পারবে না।'

ইংরেজ যদি কোনওটাতেই রাজি না হয় তা হলে কী হবে সেকথাটা পাউল লেখেনি। বিবেচনা করি, না খেতে পেলে জর্মনরা হন্যে হয়ে সবাই কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে এবং তাই রুশ ভালুককে ঠেকাবার জন্য ইংরেজ জর্মনিকে বাঘের দুধ খাওয়াতেও রাজি আছে।

৩. 'আমেরিকার সমস্যা, হয় মার্কিন কলকারখানা পুরোদমে চালু রেখে পশ্চিম ইউরোপকে কলকজা, মালপত্র দাও— কিন্তু ভুলো না, বিনি পয়সায়— নয় রপ্তানি একদম্ বন্ধ করে দাও, কিন্তু ভুলো না, তা হলে রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন কলকারখানাও বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকার সমস্যা বাড়বে।'

পাউল লেখেনি, কিন্তু বিবেচনা করি, আমেরিকা বাইরের শত্রু রুশের চেয়েও ভেতরের শত্রু বেকার সমস্যাকে ভয় করে বেশি।

'এদিকে আমেরিকা পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে যাতে কম্যুনিজম না ঢুকতে পারে তার জন্য ধনপ্রাণ সব দিতে প্রস্তুত। এই তো সেদিন মার্কিন যখন দেখল ইতালির লোক ভোট দিয়ে হয়তো কম্যুনিজম ডেকে আনবে, সেদিনই সে বড় বড় জাহাজ ভর্তি খানাদানা ইটালিতে পাঠাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনরা আমাদের খবর পাঠাল যে আমাদেরও রেশন বাড়িয়ে দেবে।

ওদিকে রুশ রেশন বাড়াচ্ছেন জর্মনির আপন এলাকায়। এদিকে মার্কিন রুশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপন অধিকৃত জর্মন অঞ্চলেও রেশন বাড়াচ্ছেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পায়, এই নিলামের ডাকাডাকির দস্তুর দেখে।'

শুধু পাউলের নয়, আমাদেরও হাসি পায়। দু দিন আগে যে জর্মনিকে মার্কিন রুশ দু দিক থেকে পাইকারি কিল মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন, আজ তাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য গলায় ঢালছেন ব্রান্ডি, অন্যজন নাকে ধরেছেন স্মেলিঙ-সল্টের শিশি! শুধু কি তাই, গ্যোবেল্‌স্ সাহেব মরার পূর্বে যে একখানা সাত-পৌন্ডি টাইম-বম্ রেখে গিয়েছিলেন সেখানা কানে তালা লাগিয়ে ফেটেছে। গ্যোবেল্‌স্ মার্কিন-ইংরেজের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমাদের যে তোমরা বিনাশ করছ, তার জন্য তোমরা একদিন আফসোস করবে। তোমাদের শত্রু জর্মনি নয়, শত্রু তোমাদের রুশ। এবং সেই রুশের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, তোমাদের টাকায় বিয়ার-সসিজ্ খাইয়ে, বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে দিয়ে।'

গ্যোবেল্‌সের সে টাইম-বম্— আমরা বলি ফলিত-জ্যোতিষ— ফেটেছে। রুশের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করতে গিয়ে মার্শাল ট্রুম্যান যেসব বক্তৃতা ঝাড়েন সেগুলো শুনে মনে হয়,

www.pathagar.com

ট্রুমান যেন 'মাইন কাম্‌ফ্‌' পড়ে শোনাচ্ছেন, মার্শালের গলা আর গ্যোবেলসের গলায় তফাৎ ধরতে পারিনে।

শুধু কি তাই, হিটলার একদিন সদম্ভে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেছিলেন— গণতান্ত্রিক চেম্বারলেনের গালে ঠাস্‌ করে চড় মেরে। ঠিক সেই কায়দায় রুশ যখন সেদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতন্ত্র গলা টিপে মেরে ফেলল (মাজারিক নাকি আত্মহত্যা করেছেন, বেনেশ্‌ নাকি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন!), তখন আমেরিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। জর্মনি চেঁচিয়ে বলল, 'কিছু কর না কর, অন্তত চোখদুটো রাঙা কর।' আমেরিকা চোখ-দুটি বন্ধ করেছে।

ফরাসিতে প্রবাদ আছে, 'প্ল্যুসা শাঁজ, প্ল্যা সে লা মেম শোজ।' অর্থাৎ 'যতই সে রঙ বদলায় ততই তাকে আগের মতন দেখায়।' অনেকটা বাঙলা দেশের 'গবিতা' লেখকদের মতো। যতই তারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঢাকতে চান, ততই তাদের লেখাতে সে প্রভাব ধরা পড়ে।

মার্কিন, রুশ, ইংরেজ যতই তাদের রাজনীতি বদলাতে চায় ততই তাদের চেহারা আগের মতন হতে চলে।

জর্মনি আবার শক্তিশালী হবে।

* * *

ভুলে গিয়েছিলুম পাউলের চিঠি শেষ হয়েছে প্রশ্ন দিয়ে, 'Was fangen die Inder mit der wiedergewonnenen Freitheit an? Sich gegenseitig zu erschlagen kann doch unmoeglich das einzige Ergebnis gewesen sein.'

অর্থাৎ, 'নবলব্ধ স্বাধীনতা দিয়ে ভারতবাসীরা কী করছে? একে অন্যকে খুন করাই তো আর সে স্বাধীনতার একমাত্র ফল হতে পারে না।'

উত্তরে কী লিখি যদি কেউ বলে দেন!

অ্যানড্রুজ সাহেব

আমরা ওই নামেই তাঁকে চিনতুম। আমি তাঁকে গুরুরূপে পাই ১৯২১ থেকে ১৯২৬ অবধি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গুণী-জ্ঞানীরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। সে অধিকার আমার নেই।

১৯২১-এর বর্ষায় শান্তিনিকেতনে ভরতি হওয়ার কয়েকদিন পরই জানলুম, আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য তিনি এদিক-ওদিকে ছুটোছুটি করছেন। গুরুদেব তখন বিদেশে। ফিরে এলেন জুলাই মাসে। বোম্বাইয়ে নেমেই নাকি তিনি মহাত্মা গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি বলে তাঁর বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ওদিকে আবার রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঁধীজিকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন। শুনলাম, অ্যানড্রুজ সায়েব রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজি

www.pathagar.com

দু জনারই সখা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের শিষ্য। এই তিনজনের সখ্য, প্রীতি, স্নেহ তিনি একসঙ্গে পান কী করে? সে যুগে যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁরা স্মরণে আনতে পারবেন, একদিক দিয়ে আমাদের সর্বগর্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কাব্যাদি নিয়ে, অন্য দিক দিয়ে আমরা যোগ দিয়েছি গাঁধীজির অসহযোগ আন্দোলনে। এই দ্বন্দ্বেই আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত। আর অ্যানড্‌রুজ সায়েব এই তিনমুখী লড়াই সামলান কী করে?... এমন সময় শান্তিনিকেতনে খবর পৌঁছল, গুরুদেব ও গাঁধীজিতে নাকি মুখোমুখি বসে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। অন্যে যা বলুন, বলুন, আমার বিশ্বাস এই মোলাকাতটির ব্যবস্থা করেন অ্যানড্‌রুজ সায়েব। তার দু-একদিন পরেই গুরুদেব আর সায়েব আশ্রমে ফিরে এলেন। এবং আমরা আরও দিগ্‌ভ্রান্ত, এঁদের আলোচনার কোনও রিপোর্ট কোনও কাগজে বেরোয়নি। অ্যানড্‌রুজ সায়েব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেননি। শুনেছি রুদ্ধদ্বারে চার ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছিল। বিশ্বজনের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আর্টিস্ট ঠেকায় কে? আচার্য অবনীন্দ্রনাথ চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরকার অবস্থাটা একপলক দেখে নিয়ে একটি ছবি আঁকেন। সেটি এখন শন্তিনিকেতনের কলাভবনে।... আশ্রমে ফেরার দু-একদিন পরই সায়েব বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের ডেকে পাঠালেন। সায়েব সর্বপ্রথম বললেন— 'অর্ধশতাব্দী পরে আমার প্রতিবেদনে যদি ভুলভ্রান্তি থেকে যায় তবে সে সভায় উপস্থিত কোনও মহাশয় সেটি সংশোধন করে দিলে অধম বড়ই কৃতজ্ঞ হবে— গুরুডেব (সায়েব 'ড' 'দ'-য়ে তফাৎ করতে পারতেন না) এবং মহাটমাজি কলকাতাতে যে আলোচনা করেছেন সেটা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের জানানো দরকার। কিন্তু তোমরাও সেটি কাগজে প্রকাশ করো না।'

আহা, কী সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণ! এতদিন যা দু-চারবার ইংরেজের মুখে ইংরেজি শুনেছি তার চোদ্দ আনা বুঝতে পারিনি। তারা ছিল চা-বাগানের মালিক। খুব সম্ভব কক্‌নি। আর ইনি যা বলছেন তার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পারছি। যদিও তাঁর কথাগুলো বিরাট দাড়িগোঁফের মাঝখান দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে বেরুচ্ছিল।

পরদিন নোটিশ বেরুল সায়েব আমাদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাস নেবেন। অধ্যক্ষ বিধুশেখরের বারান্দায়। হায়, আজকের লোক বুঝতে পারবে না, আমাদের কী স্থানাভাব ছিল! ব্ল্যাকবোর্ড ছিল না বলে সায়েব বারান্দার মেঝের সঙ্গে আনা চক দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর শিরোনামা লিখতেন। বিরাট দেহ। সমস্ত রক্ত চলে আসত দাড়ি আর চোখের মাঝখানে।...

ঘণ্টা বাজল। সায়েব ছুটলেন তাঁর থালা আনতে। সে আমলে সব্বাইকে যেতে হত আপন আপন থালা নিয়ে রান্নাঘরের পাশে ডাইনিংরুমে। কিন্তু বিদেশিদের অন্য ব্যবস্থা ছিল। সায়েব সেখানে মাঝে-মধ্যে যেতেন। কিন্তু বেশিরভাগ খেতেন আমাদের সঙ্গেই।... তার পর সায়েব পড়ালেন শেক্সপিয়র এবং আমাদের অনুরোধে নিউ টেসটামেন্ট। কিন্তু কোনও বই-ই তিনি শেষ করার সুযোগ পেতেন না। আজ ওই হোথায় পাঞ্জাবে না কোথায় পুলিশ মজুরদের কোথাও— ব্যস্ হয়ে গেল। তাঁর ক্লাস বন্ধ।

কিন্তু কে শুনতে চায় আজকের দিনে এসব কাহিনী!

www.pathagar.com

যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও নব রাষ্ট্র নির্মাণপ্রচেষ্টা বহু মহাপুরুষের দেশপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে আরও দুটি কথা স্বীকার করতে হয় যে ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এর জন্য অংশত দায়ী। তাই ভারতীয় রাষ্ট্র ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে সে আলোচনা করতে গেলে ওই তিনটি জিনিসেরই প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

কোনও ভূখণ্ড পরাধীন হয়ে গিয়েছিল, ফের স্বাধীন হল এ পরিস্থিতি পৃথিবীতে বহুবার হয়ে গিয়েছে এবং তার নকশা প্রতিবারেই কিছু না কিছু আলাদা হয়েছে। তাই যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মিল আছে তাদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলে ভবিষ্যতের ভারত সম্বন্ধে কিছুটা আবছা-আবছা ধারণা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরব ভূখণ্ডের এক বৃহৎ অংশ, তুর্কি, ইরান ও আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা এ প্রবন্ধ যে মূল সূত্র নিয়ে আরম্ভ করেছি তার-ই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু উপস্থিত দ্রষ্টব্য এইসব দেশ তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে করল কী?

মুস্তফা কামাল ধর্মে বিশ্বাস করতেন না— এ বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণ একা ছিলেন তা নয়, তুর্কি পল্টনের বিস্তর অফিসার ফ্রান্স অথবা জর্মনিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে ধর্মের প্রতি এঁদের কোনওপ্রকারের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যখন স্বাধীনতা লাভের পর দেশ নির্মাণ শুরু করলেন তখন বুনিয়াদি স্বার্থ ধর্মের মুখোশ পরে তাঁকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগল। একে তো মুস্তফা কামাল জাত কালাপাহাড়, তার ওপর তাঁর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। জীবনটাকে তিনি একটা আস্ত জুয়ো খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই শত্রুর সামান্যতম পণের বিপক্ষে তিনি গোটা জীবনটাকে পণ ধরে 'খেলায়' নামতেন। এরকম লোক হয় তিন দিনেই দেউলে হয়, অর্থাৎ আততায়ীর হাতে প্রাণ দেয়, কিংবা কোটিপতি হয় অর্থাৎ শত জীবন লাভ করে। তাই মুস্তফার কাছে প্রতি বাজিতে মোল্লাদের নির্মম হার মানতে হল। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আজ যদি পণ্ডিতজি হুকুম দেন গায়ত্রী সংস্কৃতে উচ্চারণ না করে রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে পড়তে হবে তবে তাবৎ ভারতবর্ষে কীরকম বিরাট আন্দোলন সৃষ্ট হবে। অথচ মুস্তফা কামাল ঠিক ওই হুকুমটিই জারি করেছিলেন— আজান আরবি ভাষায় না দিয়ে দিতে হবে তুর্কিতে, নামাজের মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে তুর্কি ভাষায়!

আফগানিস্তানের বাদশা আমানউল্লাও আপন দেশটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে দেখেন মোল্লারা শত্রুতা সাধছেন। তিনিও তখন রুদ্ররূপ নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একে তো তিনি মুস্তফার মতো জুয়াড়ি ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মতো স্বাধীনচেতা জোয়ান আফগানিস্তানে ছিলেন অতি অল্পই। আরও কারণ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দুটো কারণই তাঁর পরাজয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আসল যুদ্ধটা লাগল আরবে। একদিকে ইব্‌ন্ সউদ, অন্যদিকে কট্টরতম মোল্লার পাল। তুর্কি-আফগানিস্তান ইসলাম ধর্মের পীঠভূমি নয়, এসব দেশের লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলাম নিয়েছে। কিন্তু আসল ইসলাম জন্ম নেয় আরব দেশে, আরবের

সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য যা কিছু তার সবই ইসলামের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে, ইসলাম ছাড়া অন্য সভ্যতার সঙ্গে তারা বহু যুগ ধরে কোনও সংস্পর্শে আসেনি বলে জগতের অন্য কোনও চিন্তাধারা, অন্য কোনও জীবন-সমস্যা সমাধান যে হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লোকমুখে তারা শুনেছে, আরবের বাইরে রমণীরা উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষেরা নাস্তিক, ধর্মের বন্ধন সেখানে একেবারেই নেই, সেখানকার নরনারী নির্লজ্জতায় পশুরও অধম।

গোড়ার দিকে ইব্‌ন্ সউদ নিজেও ওই দলেরই ছিলেন কিন্তু নজ্‌দ্ ও হিজ্জাজের রাজা হওয়ার পর তিনি যখন রাজ্য গঠনকর্মে নিযুক্ত হলেন তখন দেখেন ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি ভিন্ন কৃষি-বাণিজ্য কোনও প্রতিষ্ঠানেরই দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি করা অসম্ভব। এ তত্ত্বটি তিনি তখন ধীরে ধীরে মোল্লা সম্প্রদায়কেও বোঝাতে চেষ্টা করলেন— ওদিকে আবার প্রগতিশীল মিশর থেকে প্রত্যাবর্ত যুবক সম্প্রদায় দু-একখানা মোটরগাড়ি, কিছু কিছু গ্রামোফোনও সঙ্গে আনতে আরম্ভ করেছেন। মোদ্দা কথা, ধর্মের দোহাই দিয়ে আজকের সংসারের আনাগোনা, যোগাযোগ কী করে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়?

মোল্লারা ক্রমে ক্রমে নরম হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল বন্দুক-কামান ডাইনামো ট্র্যাক্টর কেনবার মতো কড়ি ইব্‌ন্ সউদের কোথায়— আরবের মরুভূমি এমন কী ফলায়, যার বদলে এসব কেনা যায়? তখন দেখা গেল সউদি আরবের মাটির তলায় প্রচুর পেট্রল। ইব্‌ন্ সউদ সেটা মার্কিনদের কাছে বিক্রি করে পেলেন কোটি কোটি ডলার। তাই দিয়ে অনেক কিছু হল— এখন ইব্‌ন্ সউদের প্রাসাদে লিফট্ হয়েছে, সে প্রাসাদ অ্যার-কন্ডিশন্‌ড্। আবার সেই টাকার জোরেই মিশর এবং ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ কুরান কেনা হচ্ছে এবং আরবদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে (সউদি আরবে ছাপাখানার ব্যবস্থা ভালো নয় বলে বোম্বাই-লক্ষ্ণৌয়ে নওলকিশোর প্রেসে ছাপা কুরান সেখানে যায়, কলকাতা থেকে এখনও ঢাকায় লক্ষ লক্ষ কুরান যায়)। ওদিকে সউদি আরবের কোনও কোনও শহরে গোপনে গোপনে স্কচ্ পানও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

আরবের 'ধর্মে' ও ইউরোপের 'অধর্মে' খানিকটা সমঝাওতা হয়ে গিয়ে থাকা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে ইউরোপীয় চিন্তাধারা এখনও মক্কা-মদিনাতে প্রবেশ করতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও চারটি দেশ স্বাধীন হয়ে গণতন্ত্র নির্মাণ করেছে— ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া, মিশরও যুগধর্ম রক্ষা করে গণতন্ত্র হতে চলল এবং চীন কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা-লাভের প্রথম কট্টর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে। তারা রাতারাতি তাবৎ ডাচ্ রাস্তার নাম, প্রতিমূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে চুরমার করে দিল (আমাকে এদেশে আগত ইন্দোনেশিয়ানরা প্রায়ই জিগ্যেস করে আমরা এখনও ময়দানে ব্রিটিশ প্রতিমূর্তিগুলো বরদাস্ত করি কেন। উত্তরে আমি বলি, কলা হিসেবে এগুলো এতই নিম্নশ্রেণির যে এগুলো রেখে দিলেই ইংরেজ মাথা হেঁট করবে, অন্যান্য বিদেশি মৃদু হাস্য করবে)।

কিন্তু তাই বলে ইন্দোনেশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বর্জন করল না। ওলন্দাজদের পরিবর্তে তারা এখন ইংরেজি সভ্যতার কিছুটা গ্রহণ করার চেষ্টায় আছে। সুলতান শহরিরের মতো আরও অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইন্দোনেশিয়ায় আছেন— এঁরা পণ্ডিত নেহরু গোত্রীয়, এঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার আওতায় বড় হয়েছেন এবং দেশের ঐতিহ্যকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও সে ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র সূক্ষ্ম এবং ক্ষীণ।

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সউদি আরবের মতো ইন্দোনেশিয়ায়ও ধর্ম মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। নব রাষ্ট্র-নির্মাণে এঁদের বিশেষ একটা হক্কও ছিল— শহরির-সুকার্নোর বহু বহু পূর্বে এঁরা হজে যাওয়ার ফলে মক্কা-মদিনার প্ররোচনায় দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এঁরা যে ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তারই উপর শহরির সম্প্রদায় তাঁদের ফুলের বাগান সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি, স্বদেশ-জাত ধর্মের বেলায় মানুষ যেরকম উত্তেজনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করে বিদেশাগত ধর্মের জন্য— বিশেষত এই জাতীয়তাবাদের যুগে— মানুষ অতখানি করে না। তাই ইন্দোনেশিয়ার মোল্লা সম্প্রদায় ইরানের কশানি সম্প্রদায়ের মতো বহু বল ধারণ করলেও এখনও 'আধুনিক' সম্প্রদায়ীদের আসনচ্যুত করতে পারেননি।

বর্মাতে ধর্মান্দোলন আরও কম, আর পাকিস্তানের খবর সকলেই অল্পবিস্তর রাখেন। চীন কম্যুনিস্ট, তবু চীন সম্বন্ধে একটি কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে— চীনে ধর্ম এবং সমাজ আলাদা আলাদা থাকে বলে ধর্ম সেখানে অনেকটা আমাদের দার্শনিক মতবাদের মতো। এদেশে পিতা যদি বেদান্ত মানেন, পুত্র যদি সাংখ্যবাদী হন এবং নাতি যদি যোগশাস্ত্রের চর্চা করেন তবে তিনজনকে পৃথক পৃথক বাড়ি বানিয়ে আলাদা আলাদা বসবাস করতে হয় না। তাই চীনের একই বাড়িতে এক ভাই বৌদ্ধ, দ্বিতীয় মুসলমান, তৃতীয় খ্রিস্টান এবং এঁরা একই বাড়িতে নির্বিবাদে গুষ্টিসুখ অনুভব করেন। তিন ভ্রাতাই কিন্তু চীনা ঐতিহ্যের সম্মান করেন এবং তাই আজ চীন ১৯১৭ সালের রুশ বলশেভিকদের মতো আপন বৈদগ্ধ্য 'বুর্জুয়া' নামে গালাগাল দিয়ে চীন-দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয়নি। বরঞ্চ গুণীদের মুখে শুনতে পাই মাওসেতুঙ্ যখন কম্যুনিজম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন বিশেষ করে চোখে পড়ে তার নিজস্ব চীনা রূপ— ভাব, ব্যঞ্জনা, অলঙ্কার প্রয়োগে মাও নাকি খাঁটি চীনা ঐতিহ্য মেনে চলেন।

এস্থলে একটি কথায় বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। প্রাচ্যের কোনও দেশই ভারতীয়দের মতো অতখানি ইংরেজি পড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার আওতায় পড়েনি— এমনকি তুর্কিও অতখানি ফরাসি শেখেনি। ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-লেখন-পদ্ধতি, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি আমাদের যতখানি প্রভাবান্বিত করেছে তার শতাংশের একাংশ অন্য কোনও প্রাচ্য দেশে হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, আমরা সংস্কৃত, বাঙলা সবকিছু ভুলে গিয়ে প্রায় একশো বৎসর ধরে ইংরেজির মাধ্যমে সর্বপ্রকারের জ্ঞানচর্চা করেছি— চীন কিংবা আরব একদিনের তরেও তা করেনি। তাই আজ আমরা বাঙলায় ফিরে গিয়ে ইংরেজি ভাবের বাঙলা অনুবাদ করার সময় শব্দের সন্ধানে মাথা কুটে মরি। চীন-আরবে এ সমস্যা অনেক সরল, নেই বললেও চলে এবং ঠিক তেমনি তাদের সাহিত্য বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সাহিত্য-কলার সম্পদ আহরণ করে অতখানি বিত্তবান-আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মতো হতে পারেনি।

এই বিত্ত এই সম্পদের বিরুদ্ধে ভারতেও একদল ওয়হ্হাবি (আরবের কট্টর) কশানি সম্প্রদায় দেখা দিয়েছেন। এঁরা সকলে মিলে যে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক সম্প্রদায় করেছেন তা নয়, যে কোনও রাজনৈতিক দলের ভিতর এই মতবাদের বিস্তর লোক পাওয়া যায়। এঁদের ধারণা যে খুব স্পষ্ট তা-ও নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এঁরা চান

www.pathagar.com

অতীতের কোনও 'সত্যযুগে' ফিরে যেতে, এঁদের বিশ্বাস ভারতের ইতিহাসে এরকম পাপতাপহীন যুগ ছিল এবং সে যুগে ফিরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যধর্মের জন্য আমাকে পশ্চাতের কোনও বিশেষ যুগে ফিরে যেতে হবে একথা বিশ্বাস করি না। ধর্মে বিশ্বাস করি বলেই কায়মনোবাক্যে মানি,

'নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখ্য ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

এবং ধর্মের চেয়েও বেশি মানি ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে— যে বৈদগ্ধ্যকে আমরা এতদিন অবহেলা করেছি।

যদি জানতুম যে ইউরোপীয়, আরব কিংবা চীনা বৈদগ্ধ্যের তুলনায় ভারতীয় বৈদগ্ধ্য বিত্তহীন তা হলে হয়তো আমি সনাতন পন্থায় সে বৈদগ্ধ্য নিয়ে আলোচনা করতুম, কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ বৈদগ্ধ্য আঁকড়ে ধরে বসে থাকতুম, কিন্তু দেখছি দেশে দেশের মাঝখানের সর্বপ্রকার ভৌগোলিক বাধা প্রায় লোপ পেতে বসেছে, আজ যেমন ইংরেজি-ফরাসি-জর্মন বৈদগ্ধ্য একে অন্যের গোপনতম সম্পদের খবর রাখে ঠিক তেমনি সেদিন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবে যখন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে আর সব বৈদগ্ধ্যের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। আমার সম্পদকে তখন তাদের সামনে এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে, তাকে এমনি ধরনে যুগধর্মোপযোগী করতে হবে যে বিশ্বজন যেন তাকে বুঝতে পারে, এবং তার পর এগিয়ে চলতে হবে তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, ইউরোপ, চীন, আরবের সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলার সর্বোত্তম নিদর্শন গ্রহণ করে, ভারতীয় সম্পদ দান করে।

তাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা নিয়ে চলেছেন,

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী'কে

তারা দাঁড়িয়ে নেই— তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ॥

ভাষার হাটে বেইমানি

একদা এদেশে মুসলমানি সভ্যতা-সংস্কৃতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাঙলার সভ্যতা, বেশভূষা, আলাপ-আচরণে অনেকখানি মোগলাই-মোগলাই রঙ ধরেছিল। আমার নমস্য গুরুজন জয়রাম মুন্সি চোগা-চাপকান পরতেন আর বড় বড় মজলিসে তাঁর ফারসি বয়েত আওড়ানো শুনে দেশ-বিদেশের জমায়েত মৌলবি-মওলানারা শাবাশ শাবাশ বলতেন। তার পর আমরা একদিন কোট-পাতলুন পরে কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলুম আর

www.pathagar.com

আমাদের ইংরেজি কপচানো শুনে দেশ-বিদেশের লোক ধন্যি ধন্যি বলল। সেদিনও গেছে— হরেদরে আমরা সবকিছু সামলে নিয়ে এখন আবার অনেকখানি সম্বিতে ফিরেছি।

আরবি-ফারসি থেকে শব্দ সঞ্চয় করার ফলে বাঙলা ভাষা গতিবেগ পেল সেকথা পূর্বেই একদিন নিবেদন করেছি। 'আলাল', 'হুতোমের' জোয়ার কেটে যাওয়ার পর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঙলা ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল সেখানে সে অনায়াসে গুরু-গুম্ভীর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারে, আবার চাষিবউয়ের কান্নাহাসিরও ঠিক ঠিক খবর দিতে জানে। এ ভাষা দিয়ে যেরকম 'প্রাচীন সাহিত্যে'র মন্দ্ররব শোনানো যায় ঠিক তেমনি 'রামের সুমতি'র মতো ভেজা ভেজা ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনীও শোনানো যায়— শুধু শব্দ আর বাচনভঙ্গির বেলায় একটুখানি হিসাব করে নিলেই হল।

ঊনবিংশ শতকের শেষ আর এ শতকের গোড়ার দিকে যে হিন্দি লেখা হত সে হিন্দিও মোটামুটি এই কায়দায়ই রচনা করা হত। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ হিন্দি লেখক উত্তম উর্দুও জানতেন বলে তাঁদের হাতের নাগালে রইত বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দ— কারণ বাঙলা যেরকম শব্দভাণ্ডারের জন্য প্রধানত নির্ভর করে সংস্কৃতের ওপর, উর্দু নির্ভর করে আরবি-ফারসির ওপর। আরবির শব্দ ভাণ্ডার সংস্কৃতেরই মতো বিরাট (সংস্কৃতের মতো আরবিও আপন ধাতু থেকে অসংখ্য শব্দ বানাতে পারে, যথা 'জালাসা' ='বসা', তার থেকে 'মজলিস', 'এজলাস' ইত্যাদি) এবং বাঙলায় যেরকম যেকোনো— তা সে 'ক্রন্দসী'র মতো অজানা শব্দই হোক না কেন— সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার 'শাস্ত্রাধিকার' আছে, উর্দুও ঠিক সেইরকম আরবির লক্ষ লক্ষ শব্দের যে কোনও শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

তার পর হিন্দিতে এল ভাষাশুদ্ধীকরণের 'বাই'। তার ফলে সে ভাষা বিদ্যেসাগরি ভাষার রঙ না ধরে ধরল সঙ। কারণ বিদ্যেসাগর মশায়ের মতো ওরকম জবরদস্ত লেখক হিন্দিতে কেউ তখন ছিলেন না। তবু সে ভাষা আরবি-ফারসি বিকটভাবে বর্জন করেনি বলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তখনও তর্জমা করা হত।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর কিন্তু এ 'বাই' চরমে গিয়ে পৌঁছল। আমরা বাঙলায় বলি 'তার পর', কিংবা 'তার বাদে' ('বাদ' শব্দটা আরবি সেকথা আমরা বেবাক ভুলে গিয়েছি) হিন্দিতে মাত্র একটি উপায়ে বলা যায় এবং সেটি হচ্ছে 'উস্‌কে বাদ'। হিন্দিওলারা তাই সেই 'বাদটুকু'কে পর্যন্ত বাদ দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন 'উস্‌কে পশ্চাৎমে'!

বছর তিনেক পূর্বে শ্রীযুত অমরনাথ ঝা-র একটি ভাষণ আমি শুনি। পূর্ণ অর্ধ ঘণ্টা ভদ্রলোক অতি বিশুদ্ধ হিন্দিতে বক্তৃতা দিয়ে শেষ করলেন এই কথা বলে 'অব জো হমারি রাষ্ট্রভাষা হোগি বহ্ সংস্কৃতময়ি হিন্দি হোগি' অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রভাষা 'সংস্কৃতময়ী' হবে।

শ্রী ঝা তাঁর অর্ধ ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে একটিমাত্র আরবি কিংবা ফারসি শব্দ ব্যবহার করলেন না।

আজ তাই হিন্দি ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সে অনায়াসে 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করতে পারে, কিন্তু 'রামের সুমতি' কিংবা 'গড্ডলিকা' করতে পারে না।

এ বড় মারাত্মক অবস্থা— সেই কথাটি আমি পাঠককে বলতে চাই। কারণ একথা ভুললে চলবে না, গণ-আন্দোলনের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন। চাষাভুষোর সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা নিয়ে আমাদের বই

www.pathagar.com

লিখতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, নাটক সিনেমা বানাতে হবে। এসব জিনিস বিদ্যেসাগরি বাঙলা দিয়ে যেরকম প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ঠিক তেমনি আজকের দিনে হিন্দি দিয়েও প্রকাশ করা যায় না। একেবারে যায় না বলা অনুচিত, কিন্তু সে ভাষা যে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে না তা-ই নয়, সে ভাষা অবোধ্য।

সুশীল পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, 'হিন্দি কী করে না করে, তা নিয়ে তোমার অত শিরঃপীড়া কেন?' কথাটা খুবই ঠিক, কারণ হিন্দি আমার মাতৃভাষা নয়, হিন্দি নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে আমার কিংবা আপনার ব্যক্তিগত কোনও লাভক্ষতি নেই— অবশ্য যতক্ষণ হিন্দি আপন জমিদারিতেই দাবড়ে বেড়ায়, আমাদের পাকা ধানে মই না দিতে আসে।

সেইখানেই তো বিপদ। মেনে নেওয়া হয়েছে হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে ও ক্রমে ক্রমে বাঙালি, আসামি, মদ্রাজি সবাইকে যে শুধু হিন্দি পড়তে হবে তাই নয়, সে ভাষায় লিখতে হবে, বলতেও হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র-নির্মাণের কর্ম অনেকখানি হিন্দির মাধ্যমে করতে হবে। আজকের দিনে ছুঁৎবাইগ্রস্ত হিন্দি দিয়ে কি সে-কর্ম সুচারুরূপে সমাধান হবে?

রসিকতা বাদ দিন। পরশুরামের 'ছি ছি বলিয়া তৃপ্তি হয় না, তওবা, তওবা, বলিতে ইচ্ছা করে'র অনুবাদ তো হয়ই না, ইংরেজকে যে খেদাতে হবে 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে' সেই জোরালো বাঙলা পর্যন্ত অনুবাদ করা যাবে না। কারণ 'আব্রু', 'ইজ্জত', 'ইমান' শব্দ ফারসি-আরবি— হিন্দি এ শব্দগুলো বরদাস্ত (থুড়ি! 'সহ্য) করবেন না। 'আব্রুর' সংস্কৃত কী জানিনে, 'ইজ্জৎ' না হয় কেঁদে-কুকিয়ে 'মান' দিয়ে চালালুম, কিন্তু 'ইমান' শব্দের সংস্কৃত নেই সেকথা নিশ্চয় জানি। 'বেইমানির' জায়গায় 'বিশ্বাসঘাতকতা' চালাতে গেলে 'ভাষার হাটে বেইমানি' করা হয়।

যে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে চায় তার শব্দভাণ্ডার হবে বিরাট। কারণ বহু প্রদেশের নানারকম চিন্তাধারা তাকে প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনমতো নানা প্রদেশ থেকে নানারকম নতুন শব্দও তাকে গ্রহণ করতে হবে— ইংরেজি যেমন নানা দেশ থেকে নানারকমের শব্দ নিয়ে আপন ভাষা বিত্তবতী করেছে।

যে ভাষা আপন শব্দভাণ্ডার থেকে অকাতরে খেদিয়ে দিয়ে বিস্তর শব্দ শুদ্ধমাত্র 'পবিত্র' হওয়ার জন্য, সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানাপ্রকারের শব্দ নিতে রাজি হবে সে আশা দুরাশা।

আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে, হিন্দি সাহিত্যিকদের ভিতর এমন লোকও আছেন যাঁরা শ্রীঝা'র মত সমর্থন করেন না।

ধৈর্যং কুরু! পুনঃ গচ্ছং ঢাকায়ে

গত পঁচিশ বৎসর ধরে কি ঘটি কি বাঙাল কলকাতায়, মাছের বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় দিবাস্বপ্ন দেখেছে, আহা ঢাকার লোক কী সুখেই না আছে। বিশেষ করে বাঙাল ছেলেমেয়েরা বাচ্চা বয়েস থেকে মা-মাসির কাছ থেকে ঢাকা, বিক্রমপুর, গোয়ালন্দি

www.pathagar.com

ইস্টিমারের বিশ্বভুবনে অতুলনীয় রাইসকারির কথা শুনেছে। ঢাকার কই? সে তো ঘটিদের ইলিশের সাইজ। আর কোথাকার ইলিশ? সে তো তিমি মাছের সাইজ। গোটা পৃথিবীটা নাকি কোন এক প্রাণীর মাথায় বিরাজ করছে— কিন্তু খাস ঢাকাইয়া মাত্রই জানে ঢাকার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে ব্রহ্মাণ্ড অলিম্পিকে যে তিনটে ইলিশ হেভিওয়েট প্রাইজ পায় সেই তিনটির উপর ঢাকা শহর নির্মিত। এ তত্ত্ব আপনার অজানা থাকলে চেপে যাবেন— নইলে ইলশায় হাসব।

তদুপরি ঢাকার নবাববাড়ির আওতায়, দীর্ঘ তিনশো বৎসর ধরে নির্মিত মোগলাই খানা! মোগলাই রান্নার উৎপত্তিস্থল দিল্লি-আগ্রা। একটা শাখা গেছে লক্ষ্ণৌয়ে, অন্য শাখা যমুনা বেয়ে বেয়ে এলাহাবাদ, কাশি থেকে একটু মোড় নিয়ে মোগলসরাই, ফের গঙ্গা বেয়ে পাটনা তার পর মুর্শিদাবাদ। ওদিকে পদ্মা বেয়ে বেয়ে ছোট নদী ধরে ঢাকা। রান্নার শেষ তীর্থ সিলেট— কারণ ওটা পাঠান-মোগল উভয়েরই শেষ সীমান্ত-নগরী।

বিক্রমপুর উল্লেখ করলুম কেন তবে? সে তো গ্রাম— আজ না হয় মেনে নিলুম ওটা মহকুমা সাইজ ধরে। এবং এ তো অতিশয় সুপরিচিত সত্য যে, কোনও একটি বিশেষ রন্ধনপদ্ধতি (ফরাসিতে কুইজিন— এবং এই শব্দটিই এখন আন্তর্জাতিক) গ্রামাঞ্চলে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

পাঠান-মোগলের পূর্বে বিক্রমপুর ছিল হিন্দুরাজাদের রাজধানী। এই তো কিংবদন্তি। জঙ্গিলাটরা যেরকম যুদ্ধের পর যুদ্ধের কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট থেকে সে দেশের ইতিহাস নির্মাণ করেন, এ রসনা-পূজারি রন্ধনপদ্ধতির (কুইজিনের) উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ধরে ধরে সে দেশের ইতিহাস নির্মাণ করে। জনশ্রুতি যদি সেখানে আমার কুইজিন-ইতিহাসকে সায় দেয় তবে সেই জনশ্রুতিই সত্য ইতিহাস— বাঁড়ুয্যে-সরকার সেস্থলে অপাঙক্তেয়।

বিক্রমপুরের কুইজিন ছিল মৎস্যকেন্দ্রিক। ঢাকার মোগলাই রান্না স্পষ্টতই মাংসকেন্দ্রিক। কিন্তু তাই বলে বিক্রমপুরকে ঠেকানো যায়নি। বস্তুত, এই ঢাকাতেই আপনি পাবেন মৎস্য-মাংস কুইজিনের বিরলতম সমন্বয়— গঙ্গা-যমুনার সম্মেলন। এ তীর্থে যে বঙ্গজন আসে না তার পিতা নির্বংশ হোক (এটা বিদ্যেসাগর থেকে চুরি)। যে এ তীর্থের প্রসাদ বেক্তেয়ার হয়ে উদরে ধারণ এবং পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় সে আখেরে যাবে বেহেশতে, যেখানে বিস্তর সুদূর নিস্তরঙ্গ নহর্-তরঙ্গিণী মৌজুদ এবং বলা বাহুল্য সেগুলোতে ইলিশ আবজাব করছে, কোনওপ্রকারে সিজ্‌ন্, অফ্‌ফ্ সিজনের তোয়াক্কা না করে। সৃষ্টিকর্তা ভক্তের মনোবাঞ্ছা কদাচ অপূর্ণ রাখেন না। আর সে যদি হিন্দু হয় তবে অতি অবশ্যই সে তদ্দণ্ডেই যাবে শিবলোকে, অর্থাৎ তার বাসস্থান হবে শিবশম্ভুর জটালোকে যেখান থেকে বেরিয়েছেন,

দেবী সুরেশ্বরী / ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন-তারিণী, / তরল তরঙ্গে।

আর একথা কি আমার মতো যবনকে তৈলবট গ্রহণ করে বিধান দিতে হবে যে সে গঙ্গায় বিরাজ করেন ইলিশ শুধু ইলিশ, দূরদিগন্তব্যাপী ইলিশ।

* * *

কিন্তু হায়, পদ্মার ইলিশ পরিপাটিরূপে রাঁধবার জন্য সুনিপুণা বিক্রমপুরাগতা লক্ষণা সমাজ— বিশেষ করে বৈদ্য বর্ণোদ্ভবা। এ বর্ণের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব পাঠক

www.pathagar.com

ক্ষণতরে বিস্মৃতির বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিন। এঁদের একেকটি যেন সাক্ষাৎ ভানুমতী। এঁদের হাতে কই-ইলিশ থেকে আরম্ভ করে এস্তেক কেঁচকি চুনোপুঁটি পর্যন্ত না জানি কোন ইন্দ্রজালের মহিমায় এমনই এক অপরূপ সত্তায় পরিণত হন যে তখন তাঁরই রসে সিক্ত রসনা গেয়ে ওঠে :—

ইহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

* * *

কোথায় আজ সে নবাববাড়ি যাকে কেন্দ্র করে একদা পূর্বাচলের মোগলাই কুইজিন গড়ে উঠেছিল? কলকাতার গোড়াপত্তন থেকেই সে ভুঁইফোড় আপস্টার্ট। কাজেই সেখানে অল্পকালের মধ্যেই দেখা দিল হোটেল, রেস্তরাঁ, চায়ের দোকান, মায় পাইস হোটেল এবং এদানির কফি হৌসগুলো। যদ্যপি একশো বছর পূর্বেও কলকাতায় প্রবাদ ছিল, বাঙাল দেশের জাত মারলে তিন সেন। উইলসেন, কেশব সেন আর ইস্টিশেন। ইউলসনের হোটেল, কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম আর স্টেশনে তো জাত মানার উপায়ই নেই। ঢাকাতে সেরকম হুশ হুশ করে রেস্তরাঁ গজাল না। বিরিয়ানি, পোলাও, চতুর্ককার— কোরমা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা— দোপেঁয়াজা, এবং ঢাকার অত্যুৎকৃষ্ট রেজালা, বুরহানি, সাদামাটা নেহারি (এটা বরঞ্চ সহজলভ্য), ঢাকাই পরোটা (ভিতরে অষ্টগ্রামের পনিরের পূর দেওয়া পরোটা), নানাবিধ সমোসা গয়রহ গয়রহ তাই রেস্তরাঁর মাধ্যমে ভালো করে প্রচার প্রসার লাভ করার পূর্বেই ঢাকার স্কন্ধে ভর করল ঢাউস ঢাউস বিলিতি মার্কা হোটেল— তাদের অপেয় সুপ, অখাদ্য ইস্টু, অকাট্য রোস্ট ইত্যাদি ট্যাশ যত সব গব্বযন্তনা। আর দিশি পোলাওয়ের নামে এক প্রকারের অগা খিচুড়ি (জগা নয়), কোরমার নামে আইরিশ ইস্টুর সঙ্গে ইন্ডিয়ান মশলার সমন্বয়— সরি, খুনোখুনি। যা কিছু গলা দিয়ে নামে সঙ্গে নিয়ে যায় রিটার্ন টিকিট। তিন দিনের নয়, তিন মিনিটের রিটার্ন। কপাল ভালো থাকলে এবং পেটে সুইডিশ স্টিলের লাইনিং থাকলে ঘন্টা তিনেকের ম্যাদ।

তবে হ্যাঁ, এখনও আছে বাকির (বাখর) খানি রুটি, এবং সুখা রুটি। কথিত আছে জনৈক পশ্চিমা খানদানি মনিষ্যি এন্তের জাগির পেয়েছিলেন বরিশালে। ঢাকা থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন এক ডাঁই সুখা রুটি (খাস উর্দুতে অবশ্য সুখি রুটি)। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আবিষ্কার করেন এই অপূর্ব চিজ। কোথায় লাগে এর কাছে উৎকৃষ্টতম ক্রিম ক্রেকার? ঝাড়া একটি মাস থাকে মুরমুর ক্রিস্‌প্। জনশ্রুতি, এই বাকির খানের নামেই হয় বরিশালের অন্য নাম বাকরগঞ্জ।

নেই নেই করে অনেক কিছুই আছে।

কিন্তু— কিন্তু— ঠিক এই সময়টায় তীর্থযাত্রাটা স্থগিত রাখুন। 'ভাদ্রাশ্বিনে পূর্বাচলযাত্রা নাস্তি।' একাধিক মৌলিক দ্রব্যের অনটন। তবে কি না শিগগিরই ট্যুরিস্ট ব্যুরো খুলবে। আসা-যাওয়ার সুখ-সুবিধে হবে। আসছে শীত নাগাদ পাসপোর্ট-ভিজার কড়াকড়িও কমবে।

বন্ধুবান্ধবদের যে সদুপদেশ দিয়েছি, সুশীল পাঠক, তোমাকে তো তার উল্টোটা বলতে পারি!

www.pathagar.com

ঈদ-আনন্দোৎসব

ধর্মের একটা দিক চিরন্তন এবং যার পরিবর্তন হয় না। এই যে আমি পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি তার বাইরে যে সত্তার কল্পনা আমি অনুভব করতে চাই, তিনি আদিঅন্তহীন, অপরিবর্তনীয়। যে মানুষ সাধনার ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হয় সে সেই অনুপাতে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তাঁর অনুভূতি নিবিড়তর হয়। আমাদের হজরত বলতেন তিনি সেই চরম সত্তাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন তাঁর স্কন্ধের শিরার (স্পন্দনের) মতো। বলা বাহুল্য আমরা মনন দ্বারা যে পরমসত্তাকে অনুভব করি তিনি চিন্ময়। শিরার স্পদন-জনিত অনুভূতি সম্পূর্ণ মৃন্ময়। চিন্তার মারফত আমরা কল্পলোকে যে অনুভূতি পাই, স্পর্শলব্ধ দৃঢ় মৃত্তিকাজাত শিরার অনুভূতি তার তুলনায় অনেক বেশি নিবিড়, অনেক বেশি দৃঢ়। তাই হজরত সেই পরম সত্তাকে শারীরিক অভিজ্ঞতার ভ্রান্তিহীন সত্যের মতো প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন। পক্ষান্তরে ধর্মানুভূতির জগৎ থেকে বেরিয়ে ধর্মাচরণের কর্মভূমিতে আমরা যখন নামি, তখন সে আচরণের অনেকখানি দেশকালপাত্রের ওপর নির্ভর করে। অবশ্য অন্বেষণ বিশ্লেষণ করলে অবশেষে দেখা যাবে আমাদের প্রত্যেকটি ধর্ম-আচরণও সেই অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তাশ্রিত। কর্মজগতে তাই প্রথমতো পাত্রের ওপর নির্ভর করে ধর্মাচরণ— আমল। আমি পক্ষাঘাতে চলৎশক্তিহীন, অথর্ব। মক্কা শরিফ দর্শনের তরে আমার চিত্ত যতই ব্যাকুল হোক না কেন, আমার যত অর্থ সম্পদই থাকুক না কেন, কোনও ধর্মজ্ঞজন কোনও ফকিহ্ আমার হজ-যাত্রার অপারগতাকে নিন্দনীয় বলে মনে করবেন না। আমি এ অবস্থায় যে কোনও হাজিকে, আমার হয়ে, পুনরায় হজ করার জন্য মক্কা শরিফে পাঠাতে পারি; অবশ্য তার সমস্ত খর্চা-পত্র আমাকেই দিতে হবে। এর থেকে কিন্তু এহেন মীমাংসা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, আমার ওপর যেসব ধর্মাচরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তার সবকটাই আমি অন্যলোককে দিয়ে করাতে পারি।

'পাত্রের' মতো 'কালও' ধর্মাচরণের সময় হিসাবে নিতে হয়। পূর্বাকাশ ঈষৎ আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সলাৎজিক্র্ ধ্যানধারণার পক্ষে সর্বোত্তম সময় ইহলোকে সব ধর্মই একথা স্বীকার করেছেন।

এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, একশো বছর আগেও সাধারণ ধার্মিকজন আপন ধর্মবিশ্বাস (ইমান) ও ধর্ম-আচরণ ক্রিয়াকর্ম (আমল) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে তার কোনও কৌতূহল ছিল না। থাকলেও সে কৌতূহল নিবৃত্তি করা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ অধিকাংশ স্বধর্মে বিশ্বাসীজনই পরধর্মাবলম্বীর সংস্রব এড়িয়ে চলত, তথা তাকে আপন ধর্মকাহিনী শোনাতে কোনও উৎসাহ বোধ করত না। উপরন্তু হিন্দু, জৈন এবং পারসিরা বহু শত বৎসর পরধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এবং আশ্চর্য বোধ হয়, আমাদের আলিম-ফাজিলগণ প্রতিবেশী হিন্দুকে শুদ্ধমাত্র 'কাফিরা, হানুদ, মলাউন' ইত্যাদি কটুবাক্য দ্বারা বিভূষিত করেই পরম তৃপ্তি অনুভব করেন; অথচ তাঁরা সকলেই আমার মতো না-দানের চেয়ে ঢের ঢের বেশি দানিশমন্দ— তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁদের পক্ষে আপন ধর্ম প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। এবং তাঁরা কেন, অতিশয় আহাম্মুখও জানে, বিধর্মীর ধর্ম তুলে কটুবাক্য বললে, তাকে ইসলামের প্রতি তো আকৃষ্ট করা যায়ই না, উপরন্তু আরেকটি প্রতিবেশীকে রুষ্ট করা হয় মাত্র।...

www.pathagar.com

'কাল' ও 'পাত্রের' কথা হল। 'দেশের' ওপর ধর্মাচরণ নির্ভর করে আরও বেশি। যে-দেশে ছ মাস ধরে সূর্যাস্ত হয় না, সেখানকার মুসলিমের এবং বাংলাদেশের রোজা রাখার কায়দা-কানুন যে হুবহু একই রকমের হতে পারে না সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঈদের পরব, এবং অন্যান্য তাবৎ পরবই এই 'দেশ' অর্থাৎ স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে। এবং এই সুবাদে আবার পাঠকের স্মরণে এনে দিই, বহুবিধ কারণে আমরা প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে এখন আর সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারিনে। মহরমের আর জগদ্ধাত্রী পুজোর মিছিল যদি একই দিনে পড়ে তবে তার হিসাব যে নগরপাল আগের থেকেই নেয় না, তাকে আমরা বিচক্ষণ আইজি বলে মনে করব না। তদুপরি খ্রিস্টান মিশনারিরা দু-শো বছর ধরে পাক নবীর বিরুদ্ধে এত কুৎসা রটিয়েছে যে তেনাদের ধর্ম— বিংশ শতাব্দীর প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম, যে ধর্ম একদিকে শেখায় 'কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে,' অন্যদিকে বিশ-পঁচিশ বৎসর পরপর আপসে কেরেস্তানে কেরেস্তানে লাগায় প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ, টাকার লোভ দেখিয়ে দুই দলই টেনে আনে বিধর্মীদের, সরল নিগ্রোদের, এবং সর্বশেষে শ্মশানযজ্ঞ চালায় হিরোশিমার নিরীহ নারীশিশুদের ওপর। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে স্বীকার না করে উপায় নেই, ইয়েহিয়া এদেশে যে তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছিলেন সেটাও ধর্মের নামে ইসলামের দোহাই দিয়ে সেটাও 'জিহাদ'! কিন্তু এই আনন্দের, ঈদের মৌসুমে হানাহানির কাহিনী সর্বৈব বর্জনীয়। আমি শুধু তুলনার জন্য কথাটা পেড়েছি, মুসলমানদের আনন্দোৎসব তার সত্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার জন্য।

ঈদ অর্থাৎ আনন্দ, আনন্দ-দিবস, পরবের দিন। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উদ্-দোহাতে কিন্তু ঈদ সীমাবদ্ধ নয়।

ইমানদার ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দোৎসব করার বিশেষ একটা কারণ আছে। এক মাস ধরে সুখে-দুঃখে, মানসিক অশান্তির ভিতর দিয়েও উপবাস করাটা সহজ কাজ নয়— কঠিন শারীরিক পীড়া ইত্যাদির ব্যত্যয় অবশ্য আছে। তাই যে মুসল্লি পূর্ণ ঊনত্রিশ বা ত্রিশ দিন শরিয়তের আদেশমতো উপবাস করতে সক্ষম হয়েছে, তার আনন্দই সর্বাধিক হয়। তার অর্থ এই নয়, যে-ব্যক্তি পূর্ণ মাস রোজা রাখতে পারেনি, সে ঈদ আনন্দোৎসবে যোগ দেবে না। অবশ্যই দেবে। যে লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে পারেনি— যে কোনও কারণেই হোক— তাকে স্বাধীনতা-দিবসের ঈদ-আনন্দোৎসব থেকে বঞ্চিত করার হক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের পুরুষোত্তমেরও নেই। অতিশয় অভাজন জনও যদি আনন্দোৎসবে যোগ দিতে আসে তাকে বিমুখ করা, তার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা ঈদের অঙ্গহানি করে। কারণ আনন্দের দিনে যে কোনওপ্রকারের অপ্রিয় কর্ম করা নিরানন্দের লক্ষণ, অতএব সর্বথা বর্জনীয়।

ঈদ বা আনন্দ সম্বন্ধে সুন্নি ও শিয়া এবং শিয়াদের নানা শাখা-প্রশাখা সকলেই প্রাগুক্ত ধারণা পোষণ করেন। বাংলাদেশে একদা প্রচুর খোজা ও বোরা ছিলেন। এঁদের দু দলই ইসমাইলি শিয়া, পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ ও সিলেটের পৃথ্বীম-পাশার শিয়ারা ইসনাআশারি শিয়া নামে পরিচিত। ঈদ সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা মোটামুটি এক হলেও ঈদ পরব পালনের কর্ম-পদ্ধতি শিয়াদের ভিতর অতি বিভিন্ন।

www.pathagar.com

সুন্নি হানিফিরা বিশুদ্ধ শরিয়তের দৃষ্টিবিন্দু থেকে ঈদ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট পথনির্দেশ পাবেন ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যগণ, ইমাম আবু ইউসুফ ইত্যাদির সাহচর্যে সংকলিত প্রামাণিক ফিকাহ গ্রন্থে। ঈদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীর আলোচনা পাবেন প্রখ্যাত দার্শনিক, ফকিহ ও সুফিহ ইমাম গজ্জালির অজরামর *কিমিয়া সা'দৎ* গ্রন্থে। মরহুম ইউসুফ খানের অনুবাদ অনিন্দ্যসুন্দর। কলকাতায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

তুলনাত্মক আলোচনা করলে দেখা যায়, ঈদ বা আনন্দ মাত্রেরই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে 'দেশ' বা ভৌগোলিক অবস্থান তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের উদয়কালে খাস আরবদেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। পক্ষান্তরে ভারত বহু বহু শতাব্দী ধরে ছিল ধন-ধান্যের বিত্তবান দেশ। জনসাধারণের অবকাশও ছিল যথেষ্ট। তাই এই বঙ্গভূমিতে, বর্তমান দারিদ্র্যের দুরবস্থাতেও কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা জানে। ওইসব পার্বণে একদা দানই ছিল প্রধান অঙ্গ— অন্নবস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, প্রকৃতপক্ষে কুটির-শিল্পে হেন বস্তু ছিল না যেটা বিত্তবান কিনে নিয়ে দান করত না। কিন্তু দান বাধ্যতামূলক ছিল না।

পক্ষান্তরে গরিব আরবদেশে নিত্য নিত্য নানামুখী দান কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব ছিল; ধর্ম কখনও মানুষকে এ ধরনের কর্ম করতে বাধ্য করে না। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই সে ধর্ম যে একদিন আরবভূমির বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে তার সম্ভাবনাও ছিল। সেসব দেশ আরবভূমির চেয়ে বেশি ধনী বা বেশি গরিবও হতে পারে। অতএব যতদূর সম্ভব অল্প সংখ্যক 'ঈদ' বা আনন্দের দিন বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়। দান কিন্তু ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন, তার অতি শৈশব অবস্থা থেকেই। ঈদ-উল-ফিতরে দান অলঙ্ঘ্য ধর্মাঙ্গ। বস্তুত ইসলামই ইনকাম ট্যাক্স— জাকাত— ধর্মের অঙ্গরূপে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করে।

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখি, আনন্দোৎসব (ঈদ) বা বাধ্যতামূলক ধর্মাচার (নামাজ রোজা ইত্যাদি) একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ বাড়িতে পড়তে পার কিংবা মসজিদে। জুম্মার নামাজ কিন্তু অবশ্যই মসজিদে পড়তে হবে। কারণ ধর্মসাধনা ভিন্ন এর অন্য উদ্দেশ্য ছিল; প্রত্যেক মুসলিম যেন সপ্তাহে অন্তত একদিন মসজিদে প্রতিবেশী সহধর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাত্ম-বোধ-জাত শক্তি অনুভব করতে পারে।

এর পরই আসে বৎসরে দু বার করে ঈদের নামাজ। ইমানদার মুসলিম মাত্রই চেষ্টা করে, বৃহত্তম মুসলিম জনসংঘের সঙ্গে বৃহত্তম জমাত-এ সে যেন নামাজ পড়তে পারে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য যত দূর-দূরান্ত থেকে যত সব নামাজার্থী ঈদগাহতে জমায়েত হয় তাদের সংখ্যা, তাদের ধর্মানুরাগ দেখে তাদের প্রত্যেকেই যেন আত্মবল, সংহতি-শক্তি অনুভব করতে পারে। ওইদিন পরিচিত জনের মাধ্যমে বিস্তর অপরিচিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দ্বারা। এই দূর-দূরান্ত থেকে, বৃহত্তম জমাত যে ঈদগাহে হবে, সেখানে নামাজ পড়ার পুণ্য ইচ্ছা নিয়ে ধাবমান যাত্রীদলকে আমি একাধিকবার বহুদূর অবধি তাকিয়ে দেখে দেশের জনসাধারণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করেছি, বিস্ময় বোধ করেছি।

www.pathagar.com

বাড়িটি ছিল একেবারে বিরাট পদ্মার পাড়ে, রাজশাহীতে। ওপারে, বহুদূরে দেখা যেত শ্যামল একটি রেখা— ভারত সীমান্ত। বারান্দায় দাঁড়িয়েছি অতি ভোরে। অন্ধকার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, কত না দূর-দূরান্ত থেকে, হেথা-হোথা ছড়ানো চরভূমি থেকে, শুনলুম পদ্মার ও-পার ভারত থেকে, কত না নামাজার্থী শীতের শুকনো বালুচরের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে রাজশাহী শহরের দিকে। শহরের প্রায় পূর্বতম প্রান্তের বাড়িটি থেকে দেখি, যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেই দূরে অতি পশ্চিম প্রান্ত অবধি যেন পিপীলিকার সারির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবসন্তান শহরের দিকে এগিয়ে আসছে— নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। পূর্বপ্রান্তে, যারা প্রাচীন দিনের জাহাজের খেয়াঘাট, পাশের ফুটকি পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে তাদের নতুন পাজামা-কুর্তা, বাচ্চাদের রঙিন বেশভূষা, হাসিমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই অক্লান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে সদর রাজশাহীর ঈদগাহের দিকে।

এদের কেউই হয়তো জানে না, ঈদের নামাজের সামাজিক মেলামেশার তাৎপর্য। গ্রামের জুম্মাঘর বা শহরের জামি' মসজিদ ত্যাগ করে করে বৃহত্তম ঈদগাহে এসে বহুগুণে বিস্তৃত অঞ্চলের ঐক্যবদ্ধাবস্থায় বেশুমার নামাজরত মুসলিমের সঙ্গে শব্দার্থে তথা ভাবার্থে কাঁধ মিলিয়ে তখন পদ্মাচরের সরল মুসলিম ঈদের নামাজ পাঠ শেষ করে তখন সে কি সচেতন যে, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা তার চরকে তার বউবাচ্চাকে বাদ-বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও ঈদগার মুসল্লিদের কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। দীন ইসলামের চিরন্তন চিন্ময় বন্ধনে প্রলয়ঙ্করী পদ্মার তাণ্ডব নর্তন কস্মিনকালেও ছিন্ন করতে পারবে না— অনুভব করে তার অবচেতন মন।

কার্যত আমরা রোজার ঈদেই আনন্দোল্লাস করি বেশি। কিন্তু সর্ব দৃষ্টিবিন্দু থেকেই ঈদ-উল-আজহা বহুগুণে গুরুত্বব্যঞ্জক।

(১) আপন আবাসে পড়া পাঁচ ওক্ত নামাজের ক্ষুদ্রতম গণ্ডি, (২) সেটা ছাড়িয়ে জুম্মার নামাজের বৃহত্তর পরিবেশ, (৩) সে পরিবেশ ছাড়িয়ে ঈদগার বৃহত্তম পরিবেশ— সাধারণ মুসলিমের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আল্লা যাকে তওফিক দিয়েছে, (৪) সে যেন জীবনে অন্তত একবার মক্কা শরিফে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমের সঙ্গে একত্র হয়। বিশ্ব মুসলিমের সত্তা-সংহতি-ব্যাপ্তি সে যেন দেখে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তার ক্ষুদ্র সত্তা যেন বৃহত্তম মুসলিম সত্তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

সে কাহিনী দীর্ঘ, সর্ব বিশ্বে তার গুরুত্ব ছেয়ে আছে। তার জন্য আগামীতে অন্য ঈদ।

ভাষা— বাঙলা

বাঙলা ভাষা মারফত সরকারি বেসরকারি সব কাজ নিষ্পন্ন করাটা আপাতদৃষ্টিতে যতই কঠিন মনে হোক না কেন, আমি অন্তত একটা দেশের কথা জানি, যেখানে এ সমস্যাটা সহস্রগুণে কঠিনতম ছিল এবং সে দেশ সেটা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যালেস্টাইনে এসে জুটতে লাগল শব্দার্থে কুল্লে দুনিয়া থেকে ইহুদির পাল। কত যে ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা নিয়ে তারা এসেছিল সে খতিয়ান নেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের পশ্চিম ভারত

www.pathagar.com

থেকে পর্যন্ত একদল খাঁটি ভারতীয় ইহুদি মারাঠি জাত তাদের কোঁকনি উপভাষা নিয়ে ইজরায়েলে উপস্থিত হয়। আপন রাষ্ট্র গড়ে তোলার আগের থেকেই ইজরায়েলের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল— তাদের রাষ্ট্রভাষা হবে কী? শেষটায় স্থির করা হল হিব্রু— যে ভাষাতে— আমি খুব মোটামুটি আন্দাজ থেকে বলছি— অন্তত হাজার বছর ধরে কেউ কথা বলেনি, সাহিত্য সৃষ্টি করেনি— শুধু পড়েছে মাত্র, তা-ও শুধুমাত্র ইহুদি যাজক পণ্ডিত রাব্বি সম্প্রদায়। যেসব ইহুদি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যায়নি, নির্বাসিত হলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে ফিরে এসেছে তাদের সক্কলেরই মাতৃভাষা আরবি— প্রায় বারোশো বৎসর আরবদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে। সেটাকে রাষ্ট্রভাষা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। যেসব রাব্বি হিব্রুতে ওল্‌ড টেস্টামেন্ট ও প্রধানত হিব্রুর সমগোত্রীয় আরমেয়িক ভাষায় রচিত তালমূদ্, মিদ্রাশ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেন তাদের সংখ্যা শতকরা এক হয় কি না হয়। তদুপরি হিব্রুভাষা প্রধানত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা। আড়াই হাজার বছর ধরে ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি যেসব শব্দ গড়ে তুলেছে তার একটিও এ ভাষাতে নেই— 'দূরআলাপনী' বা 'অনপনেয়' কালির তো কথাই ওঠে না। সবচেয়ে বড় বিপদ, বহিরাগত ইহুদিদের মাতৃভাষা— রাশান-পোলিশ, ইডিশ থেকে আরম্ভ করে ফরাসি, জর্মন, ইতালীয়, ফিনিশ— বলতে গেলে ইউরোপের তাবৎ ভাষা, আরবি, তুর্কি, ফারসি, কুর্দি এস্তেক কোঁকনি— সে ফিরিস্তি তো আমি আগেই এড়িয়েছি। এখন সমস্যা হল, মাস্টার যে হিব্রু শেখাবে, সেটা কোন ভাষার মাধ্যমে? তাবৎ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার লোক এক বিশেষ জেলায় জড়ো করে তাদের বৈদিক ভাষা শেখানো ঢের ঢের সহজ।

অথচ ইহুদিরা এই অলৌকিক কর্মটি প্রায় সমাধান করে এসেছে। টেলিফোন, ওয়ান উয়ে ট্র্যাফিক, মোটরের যন্ত্রপাতি যতরকম সম্ভব-অসম্ভব শব্দ তৈরি তো করা হলই এবং কত না অসংখ্য ভাষায়, প্রাচীন-অর্বাচীন, বর্ণশঙ্কর হিব্রু শব্দসহ এসব নতুন শব্দের অভিধান রচিত হল। নতুন নতুন শব্দের ফিরিস্তি, বয়ান, নিত্যি নিত্যি সাপ্তাহিক-মাসিকে বেরোয়, সাপ্লিমেন্টরূপে অভিধান যাঁরা ক্রয় করে ফেলেছেন তাঁদের নামে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে ইজরায়েল যে কতখানি কৃতকার্য হয়েছে, এবং এখনও তারা কতখানি যোগ্যতাসহ কর্মতৎপর তার একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট। আপনি টুরিস্ট। রাত দুটোর সময় আপনার দরকার হয়েছে একখানা ট্যাক্সির। 'অনুবাদ বিভাগকে'— নামটা আমি সঠিক জানিনে— প্রাগুক্ত সাড়ে বত্রিশভাষার যে কোনও একটিতে ফোন করে শুধোতে পারেন, 'আপনারা হিব্রুতে ট্যাক্সি শব্দের কী অনুবাদ করেছেন?' পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর হয় হিব্রু শব্দটি পাবেন, নয় অন্য প্রান্ত বলবে, 'শব্দটি এতই আন্তর্জাতিক যে আমরা এটার অনুবাদ করিনি। আপনি স্বচ্ছন্দে ট্যাক্‌সি, টাক্‌সি টাক্‌সে যা খুশি বলতে পারেন।' মোদ্দা কথা, যে কোনও লোক ইজরায়েলে আগত ইহুদিদের যে কোনও ভাষায় যে কোনও সময় যে কোনও শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ শুধোতে পারেন ও সদুত্তর পাবেন। অবশ্য এ হিব্রু যদিও বাইবেলের হিব্রুর ওপর প্রতিষ্ঠিত তবু এটাকে অভিনব হিব্রু বলাই উচিত। এ ভাষার প্রধান সম্পদ, বিদেশি ভাষা থেকে অকাতরে অসংখ্য শব্দ গ্রহণ করে নির্মিত হয়েছে।

এহেন অলৌকিক কাণ্ড অবশ্য সম্ভবপর হত না যদি ইজরায়েলে বিশেষ কোনও ভাষা-ভাষীর জোরদার সংখ্যাগুরুত্ব থাকত। ৩৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন তেলআভিভ যাই তখন রাস্তাঘাটে এত জর্মন শুনতে পাই, ফোন ডিরেক্টরিতে এত বেশি জর্মন নাম দেখি যে,

www.pathagar.com

আমার মনে ধারণা হয়েছিল শেষটায় ইজরায়েলের প্রধান ভাষা বুঝি জর্মনই হয়ে যাবে। কিন্তু ইহুদিরা এমনই মরণকামড় দিয়ে আপন ঐতিহ্য, ধর্মমূলক কিংবদন্তি আঁকড়ে ধরতে জানে, উৎপীড়ন অত্যাচার বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে অনুরাগ এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়, এবং যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইজরায়েলবাসী সার্থক রাষ্ট্রনির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার সম্মুখে প্রাচীনতম পূতপবিত্র হিব্রু ভাষার দুর্বার গতি রোধে কে?

কিন্তু হায়, তবু স্বীকার করতে হয় তাদের সমস্ত আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপন্থা, যে ভূমির ওপর তারা সর্বজনগ্রাহ্য রাষ্ট্রভাষার বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে চাইছে তার সবই কৃত্রিম, সবই এক স্বপ্নলোকের রূপকথা, মূর্তিমান করার ন দেবায় ন ধর্মায় প্রয়াস।

বার বার অসংখ্যবার নিপীড়িত এই জাতিকে যেন ইয়াহ্‌ভে নিষ্ঠুরতম হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করেন। এক আমেরিকা ছাড়া তারা এত অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করেছে— বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে, যেখানে বিস্তর খ্রিস্টানও ইহুদিদের প্রাচ্যভূমি থেকে বিতাড়িত হতে দেখলে প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করবে— যে, তাদের মনে সম্প্রতি প্রশ্ন জেগেছে মার্কিন সাহায্য বিপদকালে পুনর্বার কতখানি কার্যকরী হবে? ইয়েহিয়ার দিল্ জান্-এর প্যারা দোস্ত নিক্সন কী না করেছেন, নিরস্ত্র রাইফেল মাত্র সম্বল বাঙালকে ঘায়েল করতে, তদুপরি চীনও তো কম যাননি। উভয়ে মিলে ভারতকে জুজুর ভয় দেখিয়েছেন এবং পারলে অবশ্যই ভারত মায় বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত করতেন। তাই ইহুদিরা দুশ্চিন্তায় পড়েছে, মার্কিন মদতের ওপর কতখানি ভরসা করা যায়? তাদের দুসরা ভরসা ছিল, আরব রাষ্ট্রগুলো একদম ঐক্যবদ্ধ হতে জানে না। কিন্তু কে কসম খাবে, এরা কস্মিনকালেও একজোট হবে না?

আমার মনে হয়, পূর্ব বাঙলায় বাঙলাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাষা করার যে উদ্যোগ, বিশেষ করে সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীদের দপ্তরগুলোতে যে সহযোগিতার আত্যন্তিক প্রয়োজন, জনসাধারণের যে সদাজাগ্রত চেতনাবোধ, বাঙলা খবরের কাগজের সহযোগিতা, দিনের পর দিন নিজেদের প্রচেষ্টায় অন্তত একটি কলম জুড়ে নতুন নতুন যেসব পারিভাষিক শব্দ সরকার তথা জনগণ দ্বারা দৈনন্দিন কর্ম সমাধানের জন্য নিত্য নিত্য নির্মিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা, ভাষাবিদ্, চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ ইত্যাদিদের সেসব আলোচনায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো, এসব যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না। একদা বিশেষ করে ১ বৈশাখে, কখনও-বা ২১ ফেব্রুয়ারির রাত্রে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তাবৎ ঢাকা শহরের উর্দু, ইংরেজিতে লেখা নেমেপ্লেট, দেয়াল থেকে উপড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাঙলার প্রভুত্ব বুঝিয়ে দিত। এখন তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা নির্ভয়ে প্রত্যেক গৃহস্থকে অনুরোধ, প্রয়োজন হলে বাধ্য করতে পারে, বাড়ির নাম স্থির করুন, কিন্তু বাঙলাতে। (হোটেল 'পূর্বাণীর' কর্তৃপক্ষ ৪/৫ বৎসর পূর্বেই জানতেন, হাওয়া কোনদিকে বইছে তাই 'মগরিবি সরাই' বা গুলস্তান বোস্তান— 'হটেল দ্য লাহোর' বা 'রেস্তরাঁ' আইয়ুবিয়েন্' স্বপ্নেও মনে স্থান দেননি)। ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে মহাজন একটা মোটা টাকা পূর্বাণীতে খাটান তিনি সোল্লাসে সায় দিয়েছিলেন, কারণ এর বহু পূর্বেই তিনি তাঁর আপন ভবনটির নাম করেছিলেন 'শেফালি' এবং তাঁর মামি শিক্ষা বিভাগের এক প্রধান কর্মচারী তাঁর গৃহভালে তিলক অঙ্কন করেন সনাতন 'প্রান্তিক' নাম দ্বারা। আমি জানি, এসব এমনকিছু ইন্‌কিলাবি দুঃসাহসী শহিদজনোচিত কঠিন কর্ম নয়, কিন্তু সে কর্ম প্রতিটি গৃহস্থকে বহুদিন ধরে সচেতন রাখবে, কয়েক মাস পরপর লেটার-হেড ছাপবার সময় আত্মজনকে ঠিকানা দেবার সময় তার

www.pathagar.com

একটি বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠবে এবং দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন কিন্তু অতিশয় বাস্তব সেই আধ-ভোলা ভাষা আন্দোলনকে প্রগতির পথে সদাজাগ্রত করে রাখবে। ওদিকে চলুক সরকারি প্রচেষ্টা। সেটা বাঙলা একাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ— প্রয়োজন হলে নতুন বিভাগ স্থাপন— ইত্যাদি যে কোনও প্রতিষ্ঠান, এ কাজের ভার নিতে পারেন, ইজরায়েলের উদাহরণ তো এইমাত্র দিলুম। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সর্ব রাজকার্য গুজরাতিতে সমাধান করার জন্য বরোদার মহারাজা যে কমিটি নির্মাণ করেন তার সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল। তবু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তাঁরা কর্মসমাপণ তথা মুদ্রণান্তে যে বিরাট কোষ দফতরে দফতরে পাঠালেন সে কলেবরের পুস্তক দূর থেকে দেখেই আমি সেই বিভীষিকাকে মারণাস্ত্রক অস্ত্রসমূহের নির্ঘণ্টে স্থান দেবার জন্য পুলিশকে অনুরোধ জানাই। অথচ বছর তিনেকের ভিতরই ইংরেজির স্থান গুজরাতি দখল করে নিল, অক্লেশে!

শ্রীযুক্ত শঙ্কর ক্ষোভ করেছেন, 'বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতে তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না। ... একুশে ফেব্রুয়ারি আজ তেমনভাবে আর অনেককে নাড়া দেয় না।' শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'কোনও একটা ঘটনাকে কেউ কোলে নিয়ে তো বসে থাকতে পারে না।' দুটো কথাই ঠিক। কিন্তু শ্রীযুক্ত শঙ্কর তার সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও করছেন, তাঁর সুন্দর সরল ভাষায় সবিস্তর বলে না থাকলেও, একুশের প্রতি শ্রদ্ধা উভয় বঙ্গের বাঙলাপ্রেমীদের চিরন্তন অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে— নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাবচিন্তার আদান-প্রদানের জন্য তো বটেই, সেই শ্রদ্ধাপ্রসাদাৎ রবি কবি যে অক্ষর ভাণ্ডার রেখে গেছেন তার যোগ্য ওয়ারিশানও আমরা হতে পারব। আমি আরও আশা রাখি, যোগ্যজন সে ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিও করতে পারবেন। অবশ্যই শঙ্কর একথা বলতে চাননি, একুশেকে 'কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে' এবং নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়া উমা একথা বলেননি যে, একুশের প্রতি কোনওপ্রকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ নীতিই চরমে টেনে নিয়ে গেলে সেটা অনেকখানি রিডাক্‌শিও আড আবসুর্ডুম হয় বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উভয়ের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন ধরা পড়ে উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে তেমন কিছু নীতিগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে— যদি আদৌ থাকে— তবে সেটুকু শুধু মাত্রা নিয়ে। অবশ্য কট্টরপন্থি লোক সর্বাবস্থায়ই কিছু না কিছু থাকবে। ঢাকা-কলকাতার বিস্তর লোক আছেন যাঁরা ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেন, বাঙলা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা যদি কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হয় তবে সে বিদ্যালয়কে সরকার কোনও আর্থিক সাহায্য তো করতে পারবেনই না— ওই বিদ্যালয়কে কোনওপ্রকারের স্বীকৃতিও দিতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে এবং কার্যত পারতপক্ষে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বাঙলার মাধ্যমেই করতেন— আর আদ্যবিভাগের (স্কুলের) তো কথাই নেই। অথচ শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে, স্কুল-স্থাপনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানার্থে একটি স্বতন্ত্র শাখা খোলেন, কিংবা প্রচেষ্টা করে কৃতকার্য হননি— আমার ঠিক মনে নেই।

* * *

আমি মাসের পর মাস ঢাকায় কাটিয়ে এসেছি। বাংলাদেশের অগ্রগতির পথে যে কত কণ্টক, কত অগণন সমস্যা তার একটা অতিশয় অসম্পূর্ণ লিস্টি আমি দিনের পর দিন পূর্ণ একটি মাস ধরে খবরের কাগজ থেকে এবং আত্মজনের বাচনিক— মাত্র এই দুটি পন্থায়

www.pathagar.com

নির্মাণ করার প্রচেষ্টা দিল— অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যাইনি, পূর্ববঙ্গীয় সাংবাদিকদের আমি প্রায় চিনি না বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনওপ্রকারের স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ সংগ্রহ করার জন্য যত্রতত্র টো টো করার মতো সামান্যতম শারীরিক বল আমার নেই— বস্তুত প্রতি মাস অন্তত একটিবার বাসভবন দেহলি আমার ছায়াটি দেখেছে কি না সে বিষয়ে প্রতিবেশীগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।... শেষটায় নিরাশ হয়ে ফিরিস্তি নির্মাণকর্মে ক্ষান্ত দিই।

বাংলাদেশ সরকার অতি উত্তমরূপেই অবগত আছেন তাঁদের সমস্যা কী— এই একটি বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। '৭১-এর ন মাস যেন বন্যার মতো পুব-বাংলার লোককে হত্যা করে, ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করে, গৃহহীন অন্নহীন আত্মীয়-আত্মজনহীন করে দিয়েছিল, কিন্তু, কিন্তু এখন? এখন দিনের পর দিন— কতদিন ধরে চলবে তৃষ্ণার্তের এক আঁজলা পানির তরে আকুতি? যে বন্যা কুল্লো মুল্লুক ভাসিয়ে ছয়লাপ করে দিয়েছিল সেই বন্যাই যাবার বেলা নিয়ে গেছে তৃষাতুরের শেষ জলকণাটুকু! কিস্মত! কিস্মত!! কিস্মত!!!

বাংলাদেশের আপামর আচণ্ডাল ভদ্রেতর, কি রাষ্ট্রের কর্ণধার, কি নাগরিক, কি জনপদবাসী সক্কলের সম্মুখে যে কী নিদারুণ পরীক্ষা সেটা এ বাংলা থেকে তো কথাই নেই, ও বাংলায় বাস করে হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় সুকঠিন।

যত কঠিনই হোক না কেন, একটা সত্যে আমি বিশ্বাস করি :

'আপনি অবশ হলি,
তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস না রে ॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস নে তুই কোনওমতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস নে বারে বারে ॥
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ করে
বাহিরে হয়ে যা রে ॥'

www.pathagar.com

দিনলিপি

www.pathagar.com

আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা

আমার অগ্রজ তাঁর বাল্য, কৈশোর ও পরিণত জীবন যে দেশকালপাত্রের ভিতর কাটে তার বর্ণনা লিখেছেন। এতে করে প্রধানত শ্রীহট্টবাসী, গৌণত পূর্ব পাকিস্তান, এমনকি আসামবাসীরাও উপকৃত হবেন। মুখবন্ধে তিনি বিশেষ করে নবীন সেনের দৃষ্টান্ত তুলে নিবেদন করেছেন, তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন যতদূর সম্ভব চেপে গিয়ে সেই সময়ের কথা বলবেন বেশি। এ অতি উত্তম প্রস্তাব ও সাতিশয় বিনয়ের লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীহট্ট জেলার কৃতী-সন্তানের কাছে তাঁর দেশবাসী তাঁর জীবন সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে উৎসুক। আর কিছু না হোক, স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা অন্তত জানতে চাইবে, তিনি কী করে শিক্ষাজীবনে ম্যাথামেটিক্স-ফিজিক্স অধ্যয়ন করে পরবর্তী জীবনে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, ভৌগোলিক, তথা আর্ট ও স্থাপত্যের পণ্ডিত হলেন। বস্তুত অধুনা প্রকাশিত তাঁর 'চর্যাপদ' সম্বন্ধে অতিশয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ না পড়ার পূর্বে আমারও জানা ছিল না, ভাষাতত্ত্বেও তিনি কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

কিন্তু এস্থলে এটা আমার মূল বক্তব্য নয়। মমাগ্রজ আমাকে অনুরোধ করেছেন, যেহেতু আমরা একই পাঠশালে একই স্কুলে পড়েছি, অতএব আমিও যদি আমার বাল্যস্মৃতি স্মরণ করি তবে তাঁর ভুলে যাওয়া কথাগুলোও তাঁর স্মরণে আসবে।

এটিও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিপদ এই যে, আমি প্রায় ষোল বছর বয়েসে, স্কুল পাস করার পূর্বেই দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাঙলার শান্তিনিকেতনে চলে আসি এবং পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ বাইরে বাইরে কাটে। গোড়ার দিকে বছরের দুই ছুটিতেই দেশে গিয়েছি, পরবর্তী জীবনে সেটাও সম্ভব হয়নি— বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে।

মানুষ বিদেশে দীর্ঘকাল থাকলে বাল্যস্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। তার কারণ দেশে থাকলে দেশের লোকজন ঘরবাড়ি তাকে পুনঃপুন প্রাচীন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি ক্রমে ক্রমে দেশের নানা প্রাচীন কীর্তিকাহিনীও সে শোনবার সুযোগ লাভ করে— বাল্যে যেগুলোর প্রতি স্বভাবতই তার কোনও কৌতূহল ছিল না।

আমার ভাগ্যে হয়েছে উল্টোটা। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে. সিলেটি বলা দূরে থাক, বাঙলা বলারও সুযোগ ঘটেনি। দেশের লোকজন, ছেলেবেলার ঘটনাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সজীব রাখার জন্য জলসিঞ্চন করার নর্মসখা প্রায় পাইইনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতির অঙ্গনে চটুল নৃত্য জাগাতে হলে এক হাতের করতালি অসম্ভব।

www.pathagar.com

অথচ স্মরণ করিয়ে দিলে এখনও অনেক কিছু মনে আসে।

পূর্বেই আমার ভ্রাতার বিষয়ের উল্লেখ করেছি। তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : তিনি গোড়ার দিকে রীতিমতো পয়লানম্বরি স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন। আমার তখন হঠাৎ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ছবিটি। দু তিনখানা তক্তপোশ-জোড়া বিরাট খাটে সুদূরতম প্রান্তে দাদা দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখের ভাব করেছেন, পাদমেকং ন গচ্ছামি; বিদ্যামন্দির নৈব নৈব চ। বাবা-মা সাধাসাধি করছেন। কড়ে আঙুলে দোয়াত ঝুলিয়ে বড়দা স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে বিরক্তি প্রকাশ করছেন ও সবচেয়ে বেশি কাকুতিমিনতি করছেন আমাদের সম্পর্কে দাদা আলফী মিয়া। আর আমি এই পাঁচজনের বাইরে 'পাঁচের বাদ'। আমি শুধু ঘুরঘুর করছি চতুর্দিকে। আর ভাবছি, 'আমাকে যেতে দিলে আমি এখখুনি যাই'। তখনও স্কুল নামক ব্যাঘ্রটির সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলে দাদার আতঙ্ক কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হত না।

অথচ দাদা বলতে বেবাক ভুলে গেলেন— না চেপে গেলেন— সে যখন যেতে আরম্ভ করলেন তখন এক লফ্‌তে গুয়াগাছের মগ্‌ডালে উঠে বসলেন অবহেলে। এবং সেই যে বসলেন, তার পর কখনও তাঁকে কেউ নামতে দেখেনি। পরে সপ্রমাণ হল তিনি আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে সেরা পড়ুয়া।

সামান্য দুএকটি উদাহরণ দিই।

তখনকার দিনে আর কটি মুসলমান ছেলে স্কুলে যেত? এবং তাদেরও প্রধান আতঙ্ক ছিল অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি। অথচ সপ্তম শ্রেণিতে উঠে তিনি গায়ে পড়ে নিলেন মেকানিকস্— যার জন্য দরকার তুখোড় ম্যাথ্ জ্ঞান। এবং তখনকার দিনের দুই অঙ্কবিশারদ ক্ষীরোদবাবু (ইনি অল্পবয়সে গত হন) ও গোপালবাবুর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন। পরবর্তী যুগে কলেজে নিলেন I. Sc., সে-ও এক বিস্ময়। বি.এস-সিতে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তার জন্য প্র্যাকটিকালের একটি দুর্ঘটনা দায়ী। স্থির করলেন, এম.এস-সিতে সেটা তিনি অধ্যাপক রামনের (তখনও রামনরশ্মি আবিষ্কৃত হয়নি ও তিনি ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী শিষ্য কৃষ্ণন বিশ্ববিখ্যাত হননি) কাছে শিক্ষালাভ করে পুষিয়ে নেবেন।

দিনলিপি

(১২ বৈশাখ ১৩৬৭— ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭)

CALCUTTA— ISHURDI— RAJSHAHI

১২ বৈশাখ ১৩৬৭

A terrible journey from Calcutta to Rajshahi.

Yesterday it was 107° here in Calcutta. Fancy catching the train at 16.00, hottest part of the day. Kendu, Mukuldi, Ghantu, Saumen & Prof Saurin Dasgupta at the station.

www.pathagar.com

I do not recollect the times. From 19 to 21 or more at Darsana (India) From 21.30 to 23.45 of so, at Darsana (Pak).

1.35 Ishurdi. No room in the waiting room. Hot like hell even at that early hour. Wait wait till 6. Train left at 7.45. No fan in the compartment till 7.35. Hell again. I thought it was the last leap. No, another change at Abdullapur at about 8.15. jump up & down the railway line ditch. Hot platform! Wait for the train. Train left at 8.30. 9.30. at Rajshahi.

* * *

রাজশাহী

১৫ বৈশাখ, ১৩৬৭

এ কদিন ধরে পুব বাঙলার সর্বত্রই অসাধারণ গরম যাচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় ১০৫° পর্যন্ত উঠেছে। ঢাকা ১০২°, দিনাজপুর ১০৬°। রাজশাহী তো terrific তবে তার উত্তাপ কাগজে দেয়নি। এখানকার লোকে বলছে ৫/৭ বছরের ভিতর এরকম গরম পড়েনি। কাগজ বলছে, উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা গরমের ফলে। এখানে এসেছি অবধি সেই হাওয়াই দেখছি। দক্ষিণে পদ্মা— সেখান থেকে এযাবৎ কোনও হাওয়া আসেনি। কালবৈশাখী বা অন্য কোনওপ্রকারের বৃষ্টি, রাজশাহী অঞ্চলে অন্তত এখনও হয়নি।

অথচ একেবারে খোলা ছাদে শুয়ে ভোরের দিকে গায়ে একখানা চাদর টানতে হয়।

* * *

১৬ বৈশাখ, ১৩৬৭

এখানে আজ এই প্রথম দক্ষিণের বাতাস পেলুম। কিন্তু ১০/১১ টার ভিতর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তার পর উত্তর-পশ্চিমের বাতাস। তবে কালকের মতো দুর্দান্ত নয় ও পদ্মাকে সাদা সাদা ফেনার ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ করেনি।

* * *

১৭ বৈশাখ, ১৩৬৭

উত্তর-পশ্চিমের বাতাস কাল থেকে বন্ধ হওয়াতে গরম অল্প কম।

Message incomplete-এর বদলে একটা কাগজে ছিল massacre incomplete.

খবরটা ছিল কোথাকার যেন ম্যাসাকারের। কিন্তু শেষে messacre incomplete সেনসরের ম্যাসাকার না খবরের ম্যাসাকার বোঝা গেল না।

এবারের গরম পূব বাঙলায়ও ভীষণ। ডেলি কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় রোজই ফ্ল্যাশ করছে। পাঁচ বৎসরে এরকম হয়নি। আমার হিসেবে তারও বেশি। সাত মাস ধরে এদেশে বৃষ্টি হয়নি। Simply terrific.

পশ্চিম বাঙলার কোনও খবর পাচ্ছিনে। কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়নি, ঠাণ্ডাও পড়েনি। কারণ তা হলে পূব বাঙলাকে যে তাতিয়ে তুলেছে উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা গরম হাওয়ায় সেটা এল কী করে?

www.pathagar.com

শীতে বৃষ্টি হয়নি। গরমে দিনের পর দিন শুকনো কেটে যাচ্ছে, আদপেই বৃষ্টি হল না, এরকম অবস্থা পূব বাঙলায় আমি কখনও শুনিনি।

* * *

১৮ বৈশাখ, ১৩৬৭

আজকের কাগজ বলছে, দু একদিনের ভিতর ঝড়ঝঞ্ঝা হতে পারে। এখানে তার একমাত্র লক্ষণ, আকাশে .০১ হয়, কি না হয়, উটকো শরৎকালের হালকা মেঘ! এখন পশ্চিমের বাতাস বন্ধ। সকালে অল্প দক্ষিণা বাতাস পদ্মার উপর দিয়ে এল— সুশীতল না হলেও বেশ ঠাণ্ডা।

কলকাতায় গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এরকম পরপর এত অধিক তাপ দেখা যায়নি। ১৯৫৯-এ মাত্র একদিন ১০৮° থেকে ফের গরমি কমে যায়।

৭/৫/৬০-এর খবরের কাগজ রাজশাহী থেকে ৫/৫-এর খবরে বলছে এখানে নাকি পয়লা মে'তে hottest day with 108° গেছে। ব্যস! তার আগে যে একটা খবর বেরুল ২৮/৪-এ এখানে ১১০° গেছে?

ধর্ম জানেন আমি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই যে প্রতি সন্ধ্যায় বিদকুটে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে খচখচানি আর তার সঙ্গে সঙ্গে বেসুরা বেতালা গান রাত বারোটা-তেরোটা অবধি এরও একটা সীমা থাকা দরকার।

ক্ষীণ চাঁদের আলো, মাথার উপর সপ্তর্ষি, দূর পদ্মার মৃদু গুঞ্জরণ, নারকেল-গাছের অল্প শিহরণধ্বনি— এছাড়া কোনও শব্দ নেই— শান্ত-গম্ভীর পরিবেশ, কেমন যেন রহস্যময়। এর ওপর এই অসহ্য খচখচানি!

* * *

২০ বৈশাখ, ১৩৬৭

মানিকগঞ্জ এলাকায় পদ্মার ভীষণ ঝড় ও নৌকাডুবি।

কয়েকদিন ধরে উত্তর-পশ্চিমের গরম হাওয়া বন্ধ।

আজ দুপুর আর বিকেল গেল গুমোট গরমে। ১০৮°-এর কম নিশ্চয় নয়।

উনিশটার সময় এল দক্ষিণ থেকে ঝড়— লু। অতিশয় সূক্ষ্ম সাদা ধুলোতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। 'দুরাশা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে কুয়াশায়-ঢাকা পৃথিবী দেখে বলেছিলেন, ভগবান যেন রবার দিয়ে সৃষ্টি ঘষে তুলে ফেলতে চান। এখানে সাদা ধুলো দিয়ে। এ ধুলো পদ্মাচরের।

পদ্মা নদী পর্যন্ত আর দেখা গেল না।

কিছুক্ষণের জন্য সপ্তর্ষি পর্যন্ত লোপ পেল।

ন টার সময় সামান্য একটু ক্ষান্ত দিয়ে ফের সমস্ত রাত জোর দক্ষিণের বাতাস বইল। ঠিক ঝড় নয়— ঝোড়ো বাতাস। এখনও চলছে।

আকাশের অতি উচ্চ যে আড়াইখানা ছেঁড়া মেঘ তারা পশ্চিমদিকে চলে গেল।

বিদ্যুৎ চমকালো না, মেঘ ডাকল না।

বাতাস এসময় যতটা ঠাণ্ডা হয় ততটাই— কোনওদিকে বৃষ্টি হয়ে থাকলে যতখানি শীতল হয় তার কিছুমাত্র না। নিতান্ত পদ্মার বারো মাইল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে বলে যা ঠাণ্ডা হওয়ার কথা।

একেবারে মেঘটেঘ না জমেই হঠাৎ ঝড়।

www.pathagar.com

সেই ঝড় যখন তার চরম রুদ্রে তখন দেখি একটা দাঁড়কাক প্রাণপণ তার সঙ্গে লড়ছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি সে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সে যেন আশ্রয় না খুঁজে অন্য কিছু খুঁজছে। তার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীকে।

* * *

২১ বৈশাখ, ১৩৬৭

কোথায় কালকের লু'র পর আজ দিনটা ঠাণ্ডায় যাবে, আজ গেল সবচেয়ে গরম দিন।

ভোরে পদ্মাতে প্রথম স্নান। আমাদের বাড়ির সামনে পদ্মা একটা মাছের বড়শির মতো হুক করেছে। সেই হুকে রাজ্যের মেয়েমানুষ ভোর থেকে নাইতে আসে। তাদের ঘন ঘন অঙ্গ বিতাড়ন এবং যত্রতত্র মর্দন থেকে বোঝা যায় তারা এই নিদাঘ যামিনী নিষ্কর্মা কাটায়নি; তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই হুকে তো আর নাইতে পারিনে। তাই হুক পেরিয়ে খানিকটে এগোতে হয়। তখন দেখি পায়ের তলায় লিকলিকে ভলভলে প্যাঁচপেঁচে পলিমাটি। বালুর সুখস্পর্শের বদলে এই স্লাইমি কাদার উপর হেঁটে যাওয়া, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কাদার ক্লেদময় স্পর্শে— সর্বাঙ্গে কেমন যেন কিরকির করে। শত শত কিলবিলে বাঙ্ মাছের উপর দাঁড়ালে যে অনুভূতি হয় এ তাই।

জল ভারি সুন্দর। দক্ষিণের বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে সর্বাঙ্গ সহস্র চুম্বনে শীতল করে দেয়।

রাত দশটায় ফের লু। কিন্তু কালকের মতো জোরালো নয়। এবং ঠাণ্ডাও নয়। এ অঞ্চলে অন্তত কোথাও বৃষ্টি হয়নি।

লু কালকেরই মতো এল হঠাৎ আচম্কা। আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। এখন বুঝলুম পদ্মার ঝড় কেন ভয়ঙ্কর। আকাশে বাতাসে কোনওপ্রকারের ইশারা না দিয়ে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে। আস্তে আস্তে যে গতিবেগ বাড়বে তা-ও নয়। অসাবধান কেন, সাবধানী দাঁড়িও এর হঠাৎ ধাক্কা সামলাতে পারে কি?

সমস্ত রাত এবং এখনও হিল্লোলের পর হিল্লোলে দক্ষিণ বাতাস।

* * *

নবমী

২২ বৈশাখ, ১৩৬৭

ঠিক কালকেরই মতো। অসহ্য, দুঃসহ না কালকের চেয়ে কম না বেশি এসব আর চিন্তা করার শক্তি নেই।

ঠিক কালকেরই মতো রাত দশটায় লু। তবে গোড়াতে কমজোর ছিল। এখন ২২.৪৫, বাড়ছে। ধুলোতে লেখা যাচ্ছে না।

তার পর কিন্তু বাতাস কমে গিয়ে মশার উৎপাত শুরু হল। মশারি খাটাতে হল। সকালে দেখি, হিম পড়েছে। এই প্রথম।

আকাশে কণামাত্র মেঘের চিহ্ন নেই।

সিলেটে জোর বৃষ্টি।

* * *

২৩ বৈশাখ, ১৩৬৭

আজ কোনওদিক থেকে কোনওপ্রকারের বাতাস ছিল না। গরম অন্যদিনের তুলনায় কম বলেই মনে হচ্ছে। ঢাকা বলেছে, আমাদের এলাকা শুকনো শুকনিতেই যাবে। এটা বলার

www.pathagar.com

দরকার ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনামাত্র করতে পারিনে, কোনদিক হতে, কী কারণে মেঘ জমতে পারে আর বৃষ্টিই বা হতে পারে। এই যে দক্ষিণের বাতাস আসে সেই-বা কোত্থেকে? বঙ্গোপসাগর থেকে? কলকাতা ছাড়িয়ে? তা হলে এত জোর পায় কোথায়? কলকাতার উপর দিয়ে তো এত জোরে বয়ে যায় না। তবে পদ্মাতেই এর জন্ম? তাই-বা কী করে হয়।

একটা জিনিস বিলক্ষণ বুঝেছি। হঠাৎ এমনই আচম্‌কা এই দক্ষিণের বাতাস আসে— কোনওপ্রকার মেঘ না জমে— যে, যে কোনও নৌকার পক্ষে এটা কাল। প্রথম ধাক্কা সামলাতে পারলেও সে বাতাস সামলে হাল ধরে নৌকো বাঁচানো শক্তিশালী পুরুষের দরকার। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই আচম্‌কা ঝড় সম্বন্ধে একাধিকবার সাবধান করেছেন।

আজ এগার দিন হল এখানে এসেছি। গরমের ঠেলায় চৈতন্য যেন সময়ের হিসাব রাখতে পারেনি। মনে হয় মাত্র তিন-চার দিন হল।

রাত এগারটায় দক্ষিণের বাতাস উঠল। ধুলোয় ঝড় না তুলে সমস্ত রাত ব্যজন করে গেল।

* * *

২৪ বৈশাখ, ১৩৬৭

আজ দিনটা যেমন তেমন কাটল কিন্তু রাতটা গেল খারাপ। বাতাস ছিল না বললেই হয়। মশারির ভিতর-বাইরে শুয়ে আরামহীন রাত।

* * *

২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭

দিনটা জ্যোঁও ত্যোঁও কাটে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই আরম্ভ হয় গরমের সত্য উৎপাত। ঘরটা তেতে ওঠে চরমে— ওদিকে বিজলির জোর কমে গিয়ে পাখা আর ঘুরতেই চায় না। বাইরেও গরম। হাওয়া বন্ধ। কখন বইতে শুরু করবে তার ঠিক নেই। সে-ও বইবে গরমই। কারণ চতুর্দিকে বৃষ্টি হয়েছে বা হবার আশা আছে বলে কোনও কাগজ আশা দেয়নি।

রাতটা কাটল দুঃসহ গরমে। অন্যদিনের মতো রাত বারোটায়ও ঠাণ্ডা হল না।

গেল দু দিন ঢাকা ভরসা দিয়েছিল, রাজশাহী অঞ্চলেও বৃষ্টি হতে পারে। আজ তা-ও প্রত্যাহার করল।

* * *

২৬ বৈশাখ, ১৩৬৭

আজ আরও গরম।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণ থেকে বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা নয়।

পূর্বে কিছুক্ষণ খরার বিজলি হানল। সন্ধ্যায় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ জমেছিল। কিছুক্ষণের ভিতর তা-ও কেটে গেল। মেঘগুলো যেন কোথাকার বর্ষাভোজের পর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলা এঁটো পাতা। দেখলে হিংসে হয়, কোথাও যেন কপালীরা উত্তম বৃষ্টির উৎসব ভোজ করেছেন। আমাদের কপালে ছেঁড়া পাতা। ক্ষেমা-ঘেন্না করে সেগুলো চাটতে রাজি আছি— যদি তাঁরা বৃষ্টি হয়ে নামেন। তা-ও তাঁরা নামলেন না।

এখন (২৩.০০) জোর দক্ষিণের বাতাস কিন্তু আরামহীন। পদ্মা মাঝে মাঝে সমুদ্রেরই মতো অনেকক্ষণ ধরে একটানা গর্জন রব ছাড়ে। বড় গম্ভীর— তবে সমুদ্রের মতো উদ্দাম

www.pathagar.com

নয়। পাড়ে এসে ঢেউও মাথা কোটে না। সমুদ্রপারেরই মতো নারকেলপাতার একটানা ঝিরঝির শব্দ। অন্য পাতার সঙ্গে মেশা বলে ঠিক সমুদ্রপারের আওয়াজ নয়।

* * *

২৭ বৈশাখ, ১৩৬৭

কাল রাত্রে বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল বলে নিদ্রা হল ভালো।

ভোরে দেখি আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে মন্থর গতিতে রওনা দিয়েছে। পদ্মার বুকে কিন্তু দুর্দান্ত দক্ষিণের ঝোড়ো বাতাস। সেই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে চলেছে খান-চারেক বিশাল মহাজনি নৌকো। দক্ষিণের বাতাস কী কৌশলে পাল দিয়ে কাবু করে নৌকা উজানে পশ্চিম দিকে যেতে পারে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।

এখন ১৩.৪৫-এ মৃদুমন্দ কিন্তু গরম বাতাস। মেঘ বেবাক অন্তর্ধান করছে। বুঝেছি এ ধরনের মেঘে বৃষ্টি হবে না। যদি হয় তবে হুড়মুড়িয়ে আসা কালো মেঘে— বিন নোটিসে, সন্ধ্যার দিকে। সে এখন মাথায়।

২০টায় লু উঠে (৩/৫-এর মতো) ধুলোয় ধুলোয় ত্রিভুবন ধূলিতন্ত্রের তাঁবেতে গেল। বারোটা থেকে সকাল অবধি সুন্দর বাতাস। ঘরের ভিতরে শুয়েও ভোরে গায়ের চাদর খুঁজতে হল।

* * *

পূর্ণিমা

২৮ বৈশাখ, ১৩৬৭

পদ্মার পাড়ে বাসা— আমাদের বাসা ছাড়িয়ে মাত্র দুটি কি তিনটি— পরিবারটি সিরাজগঞ্জের। বিরাট নদীর সঙ্গে এদের আশৈশব পরিচয় থাকার কথা।

তিন ভাই স্নান করতে গেছে এগারটায়। যার বয়েস বাইশ সে হঠাৎ নাকি চিৎকার করল, 'ডুবলুম, গেলুম গেলুম।' অন্য ভাইরা মশকরা ভাবল।

আমি যখন তাকালুম, বাড়ি থেকে, তখন ১১.৩০/১১.৩৫ নাগাদ। একটা নৌকা যোগাড় করে উড়ন জাল ফেলে ফেলে চেষ্টা করা হচ্ছিল ছেলেটাকে খুঁজে বের করার। ইতোমধ্যে গোটাতিনেক ছেলেও ডুব দিচ্ছিল— কেউ কেউ লগি পুঁতে তাই ধরে ধরে নামছিল। এদিকে ওদিকে বিস্তর ছেলে-ছোকরারা সাঁতার কাটছিল কিন্তু ডুব দিয়ে সন্ধান করার মতো শক্তি ওদের নেই, কারণ ওখানে ৩/৪ লগি গভীর জল।

ইতোমধ্যে মিলিটারির দু জন লোক— একজনের মাথায় লোহার টুপি— পাড়ে এসে জুটল। লোকজন তাদের চতুর্দিকে জটলা করল। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল। কিছু করল না— করবার ছিলই-বা কী?

তার পর আরেকটা নৌকা এল রাঘব-জাল নিয়ে। সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো হল না। তবে কি রাঘব-জাল অতখানি গভীরে তলাতে পারে না।

প্রায় একটার সময় ওপার থেকে তরতর করে দক্ষিণ বাতাসে পাটল-রক্ত রঙের পাল তুলে একটা জুড়িন্দা নৌকা আসছে দেখা গেল— আমার মনে একটু আশা হল। এরা এসে সাবধানে খাড়ির ওদিকে প্রথম দাঁড়াল। তার পর একটা একটা করে— আসলে জুড়িন্দা নয়— দুটোই খাড়ির মুখে এসে আর পাঁচজনেরই মতো লগির খোঁচা দিয়ে দিয়ে সন্ধান করল।

www.pathagar.com

প্রায় দেড়টার সময় আস্তে আস্তে সব চেষ্টাই বর্জিত হল। যে জেলে জাল ফেলছিল সে খাড়ির ওপারে চলে গেল। জোড়া নৌকা এবারে লগি পুঁতে নৌকা বাঁধল। শুধু দু তিনটি ছেলে তখনও মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ইতোমধ্যে বাচ্চু এসে বলল, ছেলেটি নাটোরের। বাপের এক ছেলে (আপিসের চাপরাসি বলল বাপের নাম ডা. রেবতীভূষণ চক্রবর্তী), এখানে মামাবাড়িতে এসেছিল, সাঁতার জানত অল্পই; পাড়ার দুই ছেলে তাকে নিয়ে সাঁতরাতে যায়। ছেলেটা সাঁতারে অপটু। ডুবে যাচ্ছে দেখে ওরা সাহায্য করেও ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি।

আমি শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারলুম না। ও যদি খাঁড়ির মুখেই ডুবে থাকে তবে ওখানে সন্ধান বেশি না করে করা তো উচিত ছিল আরও ভাটিতে। যত কমই হোক, স্রোত তো এখানে কিছুটাও আছে।

সন্ধ্যার পর ফের লু। এখন ২৩.৪৫ কিছুটা কমেছে। তবু squalls.

পদ্মা পূর্ণিমায় তাঁর নরবলি নিলেন!

[এই সর্বনাশা রূপ ছাড়াও পদ্মার প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেখক দিনলিপির এক স্থানে একটি বর্ণনা লিখে রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে সেটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল]

পদ্মা— রাজশাহী

একে উজান, তার ওপর পবন যেন বান ডেকেছে ভাটার দিকে। এতে কখনও নৌকো বাওয়া যায়? তা-ও যায়। স্পষ্ট দেখলুম দু জনাতে কী রকম তরতর করে নৌকা উজানে ঠেলে নিয়ে গেল— লগি মেরে মেরে।

পদ্মার সঙ্গে যাদের কারবার তারা সব পারে।

সপ্তমীর রাতে পদ্মা পেরিয়ে আসছে ধূ ধূ করে দক্ষিণা বাতাস— কখনও-বা দমকা দমকায়।

আমার সামনে বিরাট পদ্মা। তার চর, চরের পর ফের নদী, তার পর দূর সুদূরের ঝাপসা ঝাপসা গাছপালা— সে-ও চরের উপর। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে মনে হয় আমি যেন অন্তহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাতাসে-জলে ধাক্কাধাক্কিতে যে ধ্বনি উঠছে সেটা ক্ষীণতর হলেও সমুদ্রগর্জনেরই মতো। একই গাম্ভীর্য। সমুদ্রে যেরকম পাল পাল ঢেউ বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে, এখানেও ঠিক তেমনি নদীর স্রোতের গতিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে পুব-পশ্চিম জোড়া পালের পর পাল ঢেউ আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে, আমার দিকে। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নদীর এখানে-ওখানে ফেনা জেগে উঠছে— ঠিক সমুদ্রেরই মতো।

এই ঝোড়ো বাতাসেও কিছুটা শীতলতা আছে বলে তার অস্থিরতা সত্ত্বেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে— নদীপারে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

মনে হল, আজ আরেকটা ছোট চর ভেসে উঠেছে।

www.pathagar.com

বাতাসের উল্টোদিকে পাল তুলে দিয়ে নৌকা যেতে পারে, শুনেছিলুম, বিশ্বাস করিনি। এখন এখানে সেটা স্পষ্ট দেখলুম।

স্রোত বইছে পশ্চিম থেকে পূবে, হাওয়া বইছে পুব-দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম পানে। দু খানা নৌকো পাল তুলেছে নৌকোর সঙ্গে গা মিলিয়ে প্যারালেল— বোধহয় উল্টো বাতাস নৌকোর ভারের সঙ্গে আড়াআড়ি আটকা পড়ে হাওয়াটার বিপরীত ধাক্কা neutralize করে দেয়। এবং তার পর স্রোতের ভাটার বেগে গন্তব্যদিকে অগ্রসর হয়। কারণ খাঁড়ির ভিতরে ঢুকেই এরা পাল গুটিয়ে নিল— কারণ সেখানে হাওয়া কম।

পদ্মার এ অদ্ভুত সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে খাতায় পোকার দাগ কাটতে হবে! বিরাট অথচ ছেঁড়া ছেঁড়া একটা কালো ছায়া নদীর ওপার থেকে এপারে ভেসে আসছে দ্রুতগতিতে— তার পিছনে যেন তার বাছুর, সে-ও আসছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই দুটি মেঘ আকাশে খুঁজে নিতে কণামাত্র কষ্ট হয় না। পারে উঠেই যেন এরা অদৃশ্য হয়— ওদের যেন পাসপোর্ট-ভিজা নেই। একেবারে মিলিয়ে যায় তা নয়। কারণ পাড়ের বালি বড় সাদা। একটুখানি আমেজ যেন থেকে যায়। V. I. P-দের বডিগার্ডের মতো ভিড়ের মাঝখানে মিলেও মেশেনি।

ওই দূরে দূরে দু একখানি ডিঙি নৌকা। তারও দূরে চরের পশ্চিমতম কোণে লম্বা সারির খড়ের ঘর। শুনেছি পদ্মার জল গত বৎসর থেকে এপারের দিকে আসছে— আমাদের বাড়ির সামনেকার জলধারা আর খাড়ি নাকি গত বছরেও ছিল না, মাঝগাঙ্গের চর অবধি হেঁটে যাওয়া যেত— এদের ম্যাদ তা হলে আর ক-বছরের।

ওপারের হিন্দুস্থান ভোরের বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ওই উপর দিয়ে গেল বাঘডোগরা থেকে কলকাতার প্লেন।

এপারে মহাজনি নৌকো যাচ্ছে নির্ভয়ে পুরো পাল চেতিয়ে। আরেকখানা বিনা পালেই যাচ্ছে উজান। হালের কাছের মাঝিটা পর্যন্ত নেই। কাৎ হয়ে হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণের দিকের বাতাসে চলেছে সূর্যাস্তের দিকে।

কাল রাত্রে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিছুক্ষণ ধরে গুমোট থাকার পর বইল উত্তর থেকে বাতাস। হঠাৎ দেখি আমার ঘরের ভিতর তুমুল কাণ্ড। উত্তর-দক্ষিণ বাতাসে লাগিয়েছে হাতাহাতি। যেন ফিরোজ আর ভজু।

* * *

২৯ বৈশাখ, ১৩৬৭

বাড়ির গেট বন্ধ করে যখন বেরোলুম তখনও অতি অল্প হাওয়া। বিশ কিংবা পঁচিশ কদম যেতে-না-যেতেই হুড়মুড় করে যে লু ধেয়ে এল তখন রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, এগুবো না বাড়ি যাব। নিতান্ত গোঁয়ার বলেই এগুলুম। অবশ্য গলির ভিতর ঢুকতেই অন্তত চোখ মেলে তাকাতে পারলুম।

কাজেই পদ্মাতে নৌকা চালানো যে কী হুঁশিয়ারির কাজ সেটা এ সময়ে এদেশে এলে একটা অভিজ্ঞতা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাত এগারোটা অবধি এই সূক্ষ্ম ধুলোর মাঝখানে খেতে বসতে ইচ্ছে করে না।

www.pathagar.com

মাইল বারো দূরে, শারদার কাছে ছেলেটির মৃতদেহ আজ পাওয়া গেছে। তাই বলছিলুম, দু ঘণ্টা পরেও যেখানে সে ডুবেছিল সেখানে ওরা জাল ফেলেছিল কোন আক্কেলে।

বাপের নাম রেবতী সান্ন্যাল। বিশী যা বলল সেটা বাচ্চুর কাহিনীর সঙ্গে মেলে। তবে প্রথমটায় তার 'গেলুম, গেলুম' কেউ বিশ্বাস করেনি, পরে দুটি ছোকরা তাকে ধরেও ছিল বটে তবে বয়সে কাঁচা বলে ঝাপটাঝাপটিতে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়াতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

গরম অল্প কমেছে পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই, কিন্তু এখানে প্রতি রাত্রে এই ধুলোর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মেঘ রোজই সকালের দিকে আকাশের এখানে-ওখানে দেখা যায়। বোধহয় শেষরাত্রে বা ভোরে যখন হাওয়া বন্ধ হয় তখন জমবার সুযোগ পায়। তার পর হাওয়া উঠে দুপুর হতে-না-হতে মেঘ হাওয়া।

মেঘের চেহারা অনেকটা আকাশের ডাবরে নীল দুধে বদখদ দম্বল দিলে যেরকম হেথায় জমাট হোথায় জোলো দই জমে সেইরকম!

১২ তারিখ প্রিন্স আলী খান মোটর দুর্ঘটনায় গত হয়েছেন।

জিনিসটা অত সরল নয়।

প্রথমত তিনি মারা গেলে করিম— প্রতিপক্ষ দলের আর কোনও ইমাম প্রার্থী রইলেন না।

দ্বিতীয়ত করিমের প্রতিপক্ষ দল নিজেদের অসন্তোষ হালে প্রকাশ করছিল। তাই করিম পক্ষীয় দলের পক্ষে এই 'দুর্ঘটনা'র ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না।

দুর্ঘটনায় দেখা যাচ্ছে,

(ক) আলী পূর্বে জানা ঠিকঠাক করা রাঁদেভুতে যাচ্ছিলেন— এলোপাতাড়ি bunmelu করতে বেরোননি। আততায়ীর পক্ষে আগেভাগেই জানা কঠিন ছিল না।

(খ) আলী অতি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ড্রাইভার। যে বয়সে মানুষ par excellence গাড়ি চালায় তাঁর বয়েস সেই। চালাচ্ছিলেন ৩৮ মাইল বেগে— প্যারিসে সে কিছুই নয়, তা-ও রাত্রিবেলা।

(গ) তিনি ধাক্কা মারেননি। মোড় নিতেই অন্য গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়।

* * *

প্রথম বর্ষণ

৩০ বৈশাখ, ১৩৬৭

ঘুম থেকে উঠলুম প্রায় উনিশটায়। দেখি মেঘ জমেছে, কিন্তু সেরকম কালো-ঘনঘটা নয় যা দিয়ে বোলপুরে বৃষ্টি নামে। সকালে মেঘ করেছিল কিন্তু অন্য দিনের মতো দুপুরবেলা হাওয়ার জোরে অন্তর্ধান করেনি। আপিসের বড়বাবু বৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তার পর বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে আকাশের সর্বত্রই। মেঘও ডাকল জোর। তবু বৃষ্টি নামে না।

৮-১০-এ অতি সূক্ষ্ম বারিকণা দিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মনে হল পুব-দক্ষিণে কোথাও বৃষ্টি হতে হতে এখানে এসে পৌঁছচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় হাওয়াও ছিল জোলো ও ঠাণ্ডা।

www.pathagar.com

অনেকক্ষণ পাঁয়তারা কষার পর বৃষ্টি এল উত্তর দিক থেকে। (ঢাকায় একাধিকবার এই ব্যাপার দেখেছি) তার পর আরম্ভ হল দক্ষিণ থেকে।

বিদ্যুৎ এমনই ঘন ঘন চমকাচ্ছিল যে পূর্ণ অর্ধ সেকেন্ডের তরে আকাশ একবারও অন্ধকার যায়নি। আর শিরা-উপশিরা ছড়ানো এতখানি আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ-জাল আমি ইতোপূর্বে কমই দেখেছি। আর মাঝে মাঝে রীতিমতো অশনি-পাত। বলতে গেলে মনসুন 'ভাঙার' মতো তোড়জোড় এবং তাণ্ডব। তবে বৃষ্টিটা সেরকম জোর নয়।

ঘণ্টা দুই পরে থামল। ধরণী শীতল হলেন।

বিজলি আলো বন্ধ হল ২১.০০। উৎপাত। খুলল ভোরে। মিলিটারি এদের ফাঁসি দিতে পারে না?

* * *

বৈশাখ ৩১, ১৩৬৭

কাল রাত্রে দু ঘণ্টা বৃষ্টির ফলেই আজ দেখি ঘাস চিকন-সবুজ রঙ ধরেছে।

দিনটা গেল অবিশ্বাস্য আবহাওয়ায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা। ১৫.৩০-এ যখন শুতে গেলুম তখন ঘর অন্ধকার করার জন্য দোর-জানালা বন্ধ করলুম বলে পাখা চালাতে হল। না চালালেও হয়তো চলত।

উনিশটায় সেই সুন্দর ঠাণ্ডা দমকা বাতাস। সমস্ত দিন মেঘলা ছিল— এখনও তাই। অল্প বিদ্যুৎও চমকাল।

ঠাণ্ডার ঠেলায় ফিরোজের আর জ্বর নেই।

আঠারো তারিখ লাটসায়েব আসবেন। তারই প্রস্তুতির জন্য রাবেয়াকে কাল ঢাকা যেতে হবে। বিশ তারিখ (ইংরেজি) মেজ ভাই আসবেন।

ফিরোজের আবার জ্বর (২১.০০)।

আশ্চর্য! রাতদুপুরে হাওয়া বিলকুল বন্ধ হওয়াতে ঘরে মশারির ভিতর আর আরাম বোধ হচ্ছিল না। ওই সময়টাতেই তা হলে Max-heat গেল!

আকাশে চাঁদ, তারা; মেঘ নেই।

* * *

কৃষ্ণা পঞ্চমী, জ্যৈষ্ঠ ১, ১৩৬৭

ভোর থেকে মেঘলা ঠাণ্ডা আরামের বাতাস।

বিকেলের দিকে সামান্য একটু গরম।

সন্ধ্যায় অল্পক্ষণের জন্য পুব থেকে জোর বাতাস।

তার পর অনেকক্ষণ ধরে পুবের বাতাসে বিদ্যুৎ চমকাল।

তার ওপর বিদ্যুতের খেল উত্তর বাগে চলে গেল। বাতাসও কালকের মতো আজও রাত্রে বন্ধ হয়ে গেল। এখন (২৩.৪৫) কষ্টদায়ক না হলেও মশারির ভিতর অনারাম হবে।

রাবেয়া দুপুরের গাড়িতে ঢাকা গেল।

www.pathagar.com

সাঁওতালরা পুব বাঙলার কতখানি গভীরে ঢুকেছে জানিনে। উত্তর বাঙলায় বগুড়া ও বারেন্দ্রভূমিতে তারা আছে। এখানে বাড়ির সামনে মাটি কাটার কাজ করছে।

এরা বোলপুরের সাঁওতালদের মতো বুনো-বুনো নয়। দু তিন জনে হাত ধরাধরি করে মৃদু গুঞ্জরণে গান গাইতে গাইতে এদের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখিনি। বোলপুরীয়দের মতো এদের growth stunted নয়। অনেকটা তন্বঙ্গী শ্যামা বাঙালির মতো। শাড়িও পরে হুবহু বাঙালি ঝি মেছুনির মতো। গামছা আছে, কিন্তু সেটা কোমরে জড়ায়নি। এদের রঙও তৈলচিক্কণ নয়। একটু যেন অপরিষ্কারও। খিল খিল করে হাসতেও এদের দেখিনি।

* * *

২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

সমস্ত বাংলায় ভীষণ ঝড়, রাত্রে খড়গপুরে বৃষ্টি।

ভোরবেলা থেকে ধূ ধূ প্রচণ্ড উত্তরের বাতাস। ঘরে মশারির ভিতর গায়ে চাদর জড়াতে হল। আকাশ মেঘলা। একদিকে আসন্ন বর্ষণের কালো রঙ মাখা।...

* * *

৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

ভোর থেকেই সুন্দর দক্ষিণের বাতাস।

কখন মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে লক্ষ করিনি। পৌনে তিনটে নাগাদ স্নান করতে যাবার সময় দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো মেঘ। তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই খানিকটে গরম আর গুমোট ছিল বলে পাখা চালাতে হয়েছিল। বাথরুমে থাকা অবস্থাতেই লু উঠল। খেতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর বৃষ্টি নামল।

উত্তর দিক থেকে। কয়েকদিন আগে W. F. বলেও ছিল বটে, উত্তর-পশ্চিম থেকে ঝড় বইতে পারে।

তোড়ে বৃষ্টি। দু একবার শিলঙের মতো দু ঝাপটা বৃষ্টি মেঘের মতো বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

বোধহয় ১৫/২০ মিনিটের বেশি বৃষ্টি হয়নি— সমস্তটাই উত্তর থেকে— তবু ঘরের মাঝখান অবধি শুধু ভিজে যায়নি, রীতিমতো জল দাঁড়াল। চৌকাঠ না থাকার ফল। বেশিক্ষণ এরকম তোড়ে বৃষ্টি হলে ঘরের জিনিসপত্র রাখবার জায়গা থাকত না।

রাবেয়া আজ ফিরল না কেন বুঝতে পারলুম না।

সন্ধ্যায় পদ্মার জল অদ্ভুত অলিভগ্রিন হল।

এখনও বেশ মোলায়েম ঠাণ্ডা। অতি মৃদু দক্ষিণের বাতাস (০০.৩০), তবে দু চারটে মশার ভনভনানি কানের কাছে।

* * *

৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

আজও সন্ধ্যার পর সামান্য বৃষ্টি হল। এ কদিন রাতদুপুরে হাওয়া বন্ধ হত। আজ আর তা হল না। পরদিন পর্যন্ত সুন্দর হাওয়া ছিল।

* * *

www.pathagar.com

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

দুপুরবেলা খুব ঘন মেঘ জমল।

খুব হাঁকডাক। এন্তের জাঁক দেমাক। বুঝি আকাশ ফেটে পড়বে।

আধ আউন্স শিলাবৃষ্টি হল।

তার পর তিন আউন্স বৃষ্টি। সে-ও পূর্বদিনের মতো উত্তরের বাতাসে জলকণা।

তার পর হাওয়া বন্ধ।

এখন (১৯.৪৫) সুন্দর বাতাস।

পুবের বাতাস যখন বইছিল তখন পশ্চিমের স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পদ্মার বুকে যা সাদা ফেনার ঢেউ জাগাল, তা-ও আবার এমন chopped যে সে এক প্রলয় কাণ্ড

বৃহস্পতিবার সকালের বসুমতী লেখে :

... 'অন্তত আবহাওয়া অফিস বুধবার রাত্রে যে পূর্বাভাস দিয়াছেন তাহাতে অদ্য বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টি হইবার কোনও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ তো নাই, বরঞ্চ বলা হইয়াছে যে, অদ্য আবহাওয়া শুষ্ক থাকিবে ও দিবাভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে!'

* * *

৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কলকাতায় কালবৈশাখী, সামান্য বৃষ্টি। সেই যে গেল শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছিল, তার পর আর কষ্টদ গরম পড়েনি। ফৈজু ভাই ঠিকই বলেছিল, একবার বৃষ্টি হলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম, শান্তিনিকেতনের মতো উটকো বৃষ্টি হয়ে ফের গরম পড়বে। তা হল না, Thank God— touch wood! So far.

আজ বেশ ঠাণ্ডা। দিনে একবার ঝড় উঠেছিল। রাত্রে ২২টা নাগাদ অল্পক্ষণ সামান্য বৃষ্টি হল। এখন ০০.৩০-এ সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর গুরুগুরু মেঘ ডাকছে— যেন খাঁটি বর্ষাঋতু। অতীব রমণীয়।

তার পর নামল তুমুল বেগে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি। আর ঝঞ্ঝার বাতাস। এক্কেবারে খাঁটির খাঁটি বর্ষা।

* * *

৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা in Bonga from 6.45 to 7.30 in the morning.

সকাল থেকে রীতিমতো ঠাণ্ডা বাতাস।

সমস্ত দিন মেঘলা আর ঠাণ্ডা। দুপুরবেলাও শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে থাকা যায় না। সকালে তো ড্রেসিংগাউন পরেই কাটাতে হল।

সমস্ত দিনটা গেল খাঁটি বর্ষাঋতুর মতো।

রাত প্রায় দশটা থেকে কী বিদ্যুতের খেলা। বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

গেল রাত্রির বৃষ্টিতে আকাশ থেকে শেষ ধূলিকণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বলে আজ সকালে দূরের চরের— মনে হয় ওপারের— গাছপালা পরিষ্কার ঘনশ্যাম দেখাচ্ছিল। দেশে ধানক্ষেতের ওপারের গ্রাম যেরকম দেখায়। দূর-দূরান্ত অবধি অবাধ দৃষ্টি ধেয়ে গিয়ে যা-কিছু

www.pathagar.com

দেখবার সব দেখা যায়। নদীর বড়ধারা যেখানে শূন্যে লীন হয়েছে— বালুচরের উপর যে কটি সবুজ ঘাস রাতারাতি গজিয়েছে। স্বচ্ছ— একেবারে স্বচ্ছ। মনে হল আমার চোখের উপর যে চামড়ার পরদাটা রয়েছে সেটাকেও যেন কাল রাত্রের বৃষ্টি ধুয়ে পুঁছে ঝকঝকে স্বচ্ছ সাফ করে দিয়ে গিয়েছে।

রাবেয়া সকালে পাবনা গিয়েছিল, সন্ধ্যায় ফিরে এল।

মাইজম ভাইসাহেব কাল ও আজ রাত্রে এখানে খেলেন।

*　　*　　*

৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কী শীত, কী ঠাণ্ডা! সমস্ত রাত বৃষ্টি হয়েছে নাকি? এখন তো ধমকে ধমকে বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসছে উত্তর দিক থেকে (৭.৩০)। যেন ভরা বর্ষার ভোরের বৃষ্টি।

এই আজ প্রথম নদীতে স্নানার্থিনী নেই। একটিও না।

তবু তো স্নান এ দেশে fetish— necessity না হলেও। বৃষ্টি থামতেই সেই কনকনে ঠাণ্ডাতেই দু তিনটি রমণীর আবির্ভাব। ওদিকে যে পোলটা তৈরি হচ্ছে তারও মজুররা কাজে লেগে গিয়েছে।

তিনজন জেলে উড়োন জাল ফেলে মাছ ধরছে। অন্যদিন এ সময়ে ধরে না। বোধহয় গরম বলে এতক্ষণে মাছ জলের গভীরে ডুবে যায়— যেখানে জাল পৌঁছয় না।

দূরদূরান্ত অবধি কী সুন্দর পেলব ধরণী। বাতাসে মাঝে মাঝে যখন গতিবেগ কমায় তখন বিশাল পদ্মার উপর যেন ছোট ছোট নাগ-নাগিনী ক্ষুদে ক্ষুদে ফণা তোলে। দূরে চরের সদ্যজাগা কচি সবুজের প্রলেপ দিয়েছে সবে-গজা ঘাস। তার পিছনে প্রাচীন গাছপালার ঘন সবুজ। তার পিছনে কাজল-নীল আকাশ।

*　　*　　*

৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

সেই যে তের তারিখে বৃষ্টি হয়েছিল, তার পর আর গরম পড়েনি। সেই অতি সূক্ষ্ম ধূলিতন্ত্রেরও অবসান হয়েছে।

সমস্ত দিন মেঘলা আকাশ। আসন্নবর্ষণ না হলেও চেহারা বর্ষাকালেরই মতো। সর্বাঙ্গসুন্দর নিম্বাস (Nimbus) না হলেও ওই গোত্রেরই বটে। আকাশের কোনও কোনও জায়গা যেন নীলাঞ্জন-লিপ্ত। শুধু মাঝে মাঝে সাদা সাদা ভাব— কাজলটা যেন জলের সঙ্গে ঠিকমতো লেপা হয়নি। আবার সমস্ত উত্তর আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ পাক-খাওয়া-খাওয়া কালোয় ধুলায় মেশানো সেই বনসঙ্কর নিম্বাস।

শেষ বালুকণা আকাশ থেকে বিলীন হয়েছে বলে ওপারের হিন্দুস্থান দেখা যাচ্ছে। আমার শালীর ছেলের বয়স ১৫/১৬, সে কত অনায়াসে বলল, 'ওপারে? ওপারে ইন্ডিয়া।'

এই জেনারেশনের কাছেই পরদেশ 'ইন্ডিয়া'। প্রার্থনা করি, তার পরের জেনারেশন যেন ইন্ডিয়াকে মিত্রের চোখে দেখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই দেশ যদি ঠিকমতো সহযোগিতা করে তবে চীনকেও সর্বক্ষেত্রে হারাতে পারবে।

*　　*　　*

www.pathagar.com

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কাল রাত্রে হাওয়া বন্ধ ছিল। পাখা না চালিয়েও খুব কষ্ট হয়নি।

সকালে আকাশ মেঘহীন ছিল। ক্রমে দক্ষিণের বাতাস মেঘ জমাতে আরম্ভ করল। Cumulus— Nimbus-এর দোআঁশলা। দক্ষিণের বাতাসটি গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকাতে শুক্র শনি রবিতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে 'সংবাদ' উল্টো গান গাইছে।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলছেন, ক্যালেন্ডারের একই দিনে বৃষ্টি হয়। যদি অন্য সময় বেশি বৃষ্টি হয় তবে সে আকাশে মেটেওর-ফেটেওর কী সব কারণে।

আমার ক্যালেন্ডার তো তা বলে না। তবে কি অন্য Geo-physical Calander রয়েছে?

দিল্লি থেকে সংবাদদাতা লিখছেন, ভারত-পাকিস্তানে entente cordial বাড়ছে। সাধু!

সন্ধ্যায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট। আকাশেও মেঘ নেই। রক্তাক্ত সূর্যাস্ত। এই কি ফের গরম আরম্ভ? Pre-monsoon গুমোট?

রাবেয়া পাবনা গেল। কিসের যেন মুখপোড়ার Pre-census.

অমাবস্যা

১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

Birthday of রাসবিহারী বসু। আশুতোষের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী।

নজরুল্ ইসলামেরও জন্ম ১৩০৬ সালে।

কাজী আমিন উল্লা	মুনশী তুফায়েল আলী
" ফকীর আহমদ	মুসম্মৎ Zaheda খাতুন
" নজরুল ইসলাম	

তাঁর 'পিতৃব্য কাজী বজল-ই-করীমের কাছ থেকে নজরুল ইসলাম বিস্তর ফারসি শোনেন। আত্মীয়েরা তাঁকে দুখু মিয়া ডাকত, অন্যেরা 'ক্ষ্যাপা'। আসানসোল বেকারি। কাজী রফীকুদ্দীন সব্ইন্স্পেকটর অব পুলিশ তাঁকে কাজীর সিমলা (Kazir Simla) গ্রামে (মৈমনসিংহে) পাঠান। সেখানে তিনি class X অবধি ওঠেন। ১৩২৯-এ ত্রৈসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত। ২৩ বছর বয়সে ১ বছরের জেল। ৩৯ দিনের অনশন। আব্দুলা সুহ্রাওর্দীর অনুনয়ে অনশন ভঙ্গ— he carried a message from the nation requesting him to do so— Mrs M. Rahman took charge of him— বিয়ে, আশালতা সেন (পরে নাম প্রমীলা)— কুমিল্লার মেয়ে—

সকাল থেকে গুমোট। ভাবলুম, এই বুঝি শুরু হল ফের গরম।

দুপুরে পাখা চালালুম। অবশ্য সবসুদ্ধ তেমন কিছু পীড়াদায়ক নয়।

সন্ধ্যা ছ-টায় ঘনঘটা করে এক মিনিটের জন্য দক্ষিণ থেকে ফাইন বৃষ্টি।

এখন অতি ফিনফিনে বৃষ্টি পূব থেকে (১৯.১৭), ঠাণ্ডা। আরামদায়ক।

বিশীর বাড়ি থেকে রাত্রে ফিরে ঘরটা গরম বোধ হল।

রাত্রে দোমনা হয়ে শুলুম, গুমোটই, পাখা না চালিয়ে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। ছাত ভেজা।

www.pathagar.com

কলকাতায় বর্ষাকালীন আবহাওয়া বিরাজ করছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও দু এক পশলা বৃষ্টি। Main monsoon proceeding to Calcutta.

*　　　*　　　*

প্রতিপদ ৬/৫৯, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

সকালে চড়চড় করে গ্রীষ্মের রোদ উঠল। ভাবলুম, খেয়েছে, আমাদের ঠাণ্ডার হনিমুন শেষ হল।

তার পর কোথা থেকে ঘন মেঘ জমতে আরম্ভ করল— যদিও ঠিক বর্ষণদ নয়। আর ধূ ধূ বাতাস। কাচের দরজা বন্ধ করে বসতে হয়েছে। কোদাল কাটা পদ্মায় সাদা ফেনা। গাছপালা, মেয়ে-মদ্দের শাড়ি-ধুতি হেন বস্তু নেই যা শান্ত থাকতে পারে। চানের ঘাটেও হৈ-হৈ— জনা পঞ্চাশেক প্রচুর তোলপাড় করে স্নান করছে।

আর পূর্ব দিগন্তে মেঘে, জলে, বালুচরে কী অপূর্ব রহস্যময় সমন্বয়ে সবকিছু পেলব করে দিয়েছে। ইতোমধ্যে দুফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা। তার পর অনেকক্ষণ হালকা পাতলা বৃষ্টি হল— প্রায় ঘণ্টা-দেড়। বিদ্যুৎ না, মেঘের ডাক না। হাওয়া এখনও বইছে। তবে জোরটা কমেছে।

নারকোল গাছ এখানে সর্বোচ্চশির। কখনও মনে হয় windmill, কখনও-বা আনাড়ি হাতে তৈরি দশভূজার মূর্তির মতো।

দিনটা সুন্দর গেল। সন্ধ্যায় মেঘলা ছিল বলে ঈদের চাঁদ দেখার কোনও প্রশ্নই উঠল না।

*　　　*　　　*

১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কত না দৃশ্য দেখা যায় এখানে ঝড় উঠলে।

খাড়ির ভিতরে দু খানি জালি বোট এবং আর সব নৌকো নিশ্চিন্ত। খাড়ির বাইরে কুণ্ডের বাইরে ছিল মহাজনি নৌকো— বালুভর্তি। সে খাড়ির ভিতর আশ্রয় নেবার জন্য রওনা দিল। একজন জল সেঁচছে— একজন হাল ধরেছে, আর দু জনা জোর বৈঠা চালাচ্ছে। ভাটাতে যাচ্ছে বটে কিন্তু পূব-দক্ষিণের হাওয়া বলে তাকে পুরো লড়াই লড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে হল। খাড়িতে ঢুকে নিষ্কৃতি।

মাঝ-নদীর চর থেকে আসছে আরেকখানা মহাজনি। ওখানে হাওয়ার থেকে কোনও আশ্রয় নেই। হয়তো-বা নৌকোতে বালু। সে যদি পুরো ভেজে তবে নৌকো ডুবিয়ে দেবে। তাই এই ঝড় মাথায় করে পুবের বাতাসের সঙ্গে লড়তে লড়তে এল। খাড়ির মোহনায় পৌঁছতে এতই বেগ পেতে হয়েছে যে সেখানে পৌঁছনোমাত্রই একজন রশি হাতে মাটিতে নেবে বাকিটা টেনে নিয়ে এল।

কিন্তু আশ্চর্য, আরেকখানা নৌকো মাঝগাঙে দাঁড়িয়ে— এদিকে আসছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ওর কি ডর-ভয় নেই! ঝড়ের বেগ তো আরও বাড়তে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, মাল্লাদের ভিতর কণামাত্র দৌড়ঝাঁপ বা অন্য কোনও প্রকারের উত্তেজনা নেই। লড়ালড়ি যুঝাযুঝি সব করে যাচ্ছে অতিশয় আটপৌরে চালচলনসহ। হৈ-হুল্লোড় করল পুল তৈরির জন তিরিশেক মজুর।

www.pathagar.com

বেতারে সতর্কবাণী দেওয়ার এক-দেড় ঘণ্টার ভিতরই বৃষ্টি আরম্ভ হল। অবশ্য মেঘ জমতে আরম্ভ করেছিল সকাল থেকেই। ভোরে রৌদ্র ছিল। হাওয়া বইল দুপুর অবধি উত্তর থেকে। অথচ বৃষ্টি আর ঝড় এল পূব এবং দক্ষিণ থেকে।

এখন ঝড়ের দাপট কমেছে। ঘাট পাড় জনশূন্য। পুলের মজুর সব অন্তর্ধান করেছে। নৌকোর ভিতরে মাল্লারা আশ্রয় নিয়েছে। গয়লানী তুফানের শুরুতেই গাই দুটো ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল, এখন ঘুঁটে সরাচ্ছে। ওপারে নৌকোটা ওখানেই দাঁড়িয়ে। (ওখানে বোধ হয় চড়ার কাছে বলে জল কম) এবং এই বৃষ্টিতে দুটো বাঁদর ছোঁড়া সাঁতার কাটছে। বোধ হয় সেই প্রবাদটা শুনেছে, 'এমন সুবুদ্ধিমানও আছে যারা বৃষ্টির হাত থেকে এড়াবার জন্য পুকুরে ডুব দেয়।'

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি (১৭.৩০), জোর বৃষ্টি হচ্ছে। যখন অল্পক্ষণের জন্য থামল তখন দেখি, বাগানে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে— ওবেলা যেরকম দাঁড়িয়েছিল। দিনে দু বার এরকম ধারা পূর্বে হয়নি।

এখনও খাঁটি বর্ষাকালের পিটির পিটির চলছে।

কেউ বলবে না এটা গ্রীষ্মকাল।

এরকম আর কয়েকদিন চললেই তো এ বৃষ্টি মৌসুমি বৃষ্টির সঙ্গে মিলে যাবে। কারণ খবর এসেছে মৌসুম বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

এখন অবধি চলেছে বর্ষার মতো। কখনও পিটির পিটির, কখনও দমকা হাওয়া। বাতাস একেবারে বন্ধ কখনও হয়নি। বিদ্যুৎও কম। যেটুকু তা-ও দূরে দূরে। বেতারকেও ব্যাঘাত করে না।

* * *

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

যেন খাঁটি বর্ষা ভোর।

একটুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বলে ওপারের গাছপালা ঝাপসা হয়ে দেখা যাচ্ছে। নদীঘাট জনহীন। মাত্র দুটি মেয়ে মুখোমুখি হয়ে কোমরজলে শীতে জবুথবু প্রায় দাঁড়িয়ে— অন্যদিন তারা তলওয়ারের মতো খাড়া হয়ে ভীষণ বিক্রমে সর্বাঙ্গ মর্দন করত— মাঝখানে একটা উপু কলসি ভাসছে। কাছে কাছেই দু একটা শিশুক এসে জুটেছে। কাল সন্ধ্যায় একখানা জালিবোট ফিরে এসেছে। তার নবদ্বার বন্ধ। পাড়ে ছাতা মাথায় একটি লোক কোনও গতিকে পা টিপে টিপে নিচের দিকে নামছে। পোলটার মেরামতি হচ্ছে বলে ঢালু পাড়ির অনেকখানি নেমে ফের চড়ে সড়কে উঠতে হয়।

অতি সূক্ষ্ম বারিকণা ওই ওপার হিন্দুস্থান থেকে ধেয়ে আসছে। ভুল বললুম, আস্তে আস্তে সবকিছু ঝাপসা করে দিয়ে এগিয়ে আসছে। যেন পাহাড়ে কুয়াশার পর্দা এগিয়ে আসছে। এখন এসে পৌচেছে স্নানার্থিনীদের কাছে। বালুচর, ওপারের বনরাজি দেখা যাচ্ছে না— যদিও দূরত্বটা বোঝা যাচ্ছে। নদীর মাঝখানে অতি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কাল ঝড়ের সেই দুঃসাহসী দুঁদে-নৌকোটা। ভুতুড়ে, ফ্যানটম বোট যেন।

এ-ছবি জাপানিরা আঁকে চমৎকার।

www.pathagar.com

আবার জোর দমকা হাওয়ায় মেশানো বৃষ্টি। সমস্ত দিন কাটল ঝোড়ো বৃষ্টিতে— মাঝে মাঝে থেমেছিল বটে। এসেছে সর্বক্ষণ উত্তর দিক থেকে এবং এমনি ট্যারচাভাবে যে উত্তরের চওড়া বারান্দা ভেজা— শুকোবার ফুর্সৎ পায়নি অথচ ঝড় সাইক্লোন তো আসবার কথা দক্ষিণ থেকে।

সেটাই বোধহয় এল এখানে ২০.০০। খুলনা থেকে এখানে আসতে লেগেছে প্রায় ছ ঘণ্টা। এখন একটানা শোঁ শোঁ শব্দ! তবে যে বেগে হঠাৎ এসেছিল, সেই বেগেই চলছে— বাড়েনি এখনও (২১.০০)। ঝড়ের গোঙরানোটা কিন্তু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বৃষ্টি খুব নয়। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে না।

বর্ধমান— চারদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর ও মাঝে মাঝে বৃষ্টির পর কাল রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টি।

২৫/৫। অদ্য সিউড়িতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ। শুক্রবারেও হয়েছে।

* * *

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কাল ২০.০০ থেকে এখন ৮.৩০ নাগাড়ে চলেছে বৃষ্টি— যদিও জোর নয়— আর ঝোড়ো বাতাস। বাতাস আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। কেন জানিনে বিজলির 'ফ্যুস' এত লাফাচ্ছে যে রেডিয়ো খুললেই এত শব্দ হয় যে কিছুই ভালো করে বোঝা যায় না। এই জলঝড়ে রাবেয়া পাবনা থেকে আসবে কী করে?

উজানে বর্ষা না নামলে নদীর জল বাড়ে না। কিন্তু এই লোকাল বৃষ্টিই পদ্মার জল বেশ বাড়িয়েছে। ভাটির দিকে হাওয়া বইছে বলে কোনওকিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খাওয়াতে পদ্মার বুকে তেমন তরঙ্গ উঠছে না— কিন্তু যা উঠছে তা-ও এর পূর্বে কখনও দেখিনি।

বানুর বিশ্বাস, এটাই মনসুন। কী করে হয়?

বর্ষাঋতু চলল ১৫.৩০ অবধি। তার পর ঘুমুতে গেলুম। ১৭ নাগাদ উঠে দেখি সবকিছু শুকনো, হাওয়া বন্ধ; বর্ষার ভাব পুরো কেটে গেছে। তবে আকাশ মেঘলা, যদিও তার ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা গেল। চতুর্থী কি পঞ্চমী। পাবনা অঞ্চলে বোধহয় বাস্ ছাড়ার সময় অবধি বৃষ্টি ধরেনি। বউ তাই আসেনি।

নৌকোগুলো ফের খাড়ির মুখে জড়ো হয়েছে। নদীপারে সন্ধ্যায় ফের জনসমাগম। এখনও বৃষ্টিহীন অল্প গুমোট আবহাওয়া। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না।

সন্ধ্যার পর আমার অল্প— যদিও অতি অল্প গরম বোধ হচ্ছিল।

ন-টায় অতি সুন্দর মলয় বইতে লাগল। এখনও (০১.০০)।

এই দিনেই শান্তিনিকেতনে ৪.৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। Highest of the month according to V. B. Bulletin.

* * *

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

সকালবেলা শুকনো— যেমন তেমন।

দুপুরে ভ্যাপসা পীড়াদায়ক গরম। পাখা চালিয়েও শান্তি নেই। একদিনেই হেন পরিবর্তন! রাজশাহী গরম জায়গা— by nature.

www.pathagar.com

বউ ফিরেছেন।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে গুমোটে ফের কষ্ট। যদিও হাওয়া অল্প-স্বল্প ছিল। ঠাণ্ডা হতে হতে বেশ সময় লাগল। এখন ০১.০০ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় বেতার বলল, রুশিয়া স্পষ্ট বলেছে, যেসব আড্ডা থেকে বিদেশি প্লেন গুপ্তচরী করতে রুশ আকাশে উড়বে সেসব আড্ডার উপর বোমা ফেলা হবে। আরও বলল, এসব প্লেন যেন না ভাবে, তারা এমন উপর দিয়ে উঠতে পারবে যেখানে তাদের রকেট পৌঁছতে পারে না।

শাবাশ্! এইবার তা হলে পাকাপাকি পাঁয়তারা কষা আরম্ভ হল। কিন্তু এসব কথা শুনে তো বুকে রক্ত হিম হয়ে যায়। রুশে-মার্কিনে লড়ুক না, কিন্তু আমাদের নিয়ে কেন টানাটানি?

আরেকটা প্রশ্ন, ওদের রকেট যদি সবকিছুই যত উপরেই হোক না কেন, নষ্ট করতে পারে তবে হাওয়াই আড্ডা ধ্বংস করার হুমকি কেন? ওদের মেরে ফেললেই পার। আমার মনে হয় পারে না। আর ওই যে মার্কিন বিমান ভেঙেছে ওর চালক কম্যুনিস্ট।

* * *

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কালকের মতোই দিন গেল। চতুর্দিক থেকে ফোরকাস্ট-ও হয়েছে যে বৃষ্টি কমবে। আজও তাই কালকের মতো শুকনো গেল। গরম কিন্তু অসহ্য নয়। কালকেরই মতো সন্ধ্যা থেকে ধূ ধূ হাওয়া।

সকালে চারবার দাস্ত হল। মাছের ডিম খেতে নেই। মনকে একাধিকবার বুঝিয়েছি।

আকাশ এত পরিষ্কার যে শরৎকালের মতো তারা সব জ্বলজ্বল করছে। ছায়াপথ দেরিতে ওঠার পর তাকেও অতি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভাটার সমুদ্রের মতো পদ্মা কখনও গর্জন করছে জোর, কখনও ক্রন্দন খানিকটে কমিয়ে দিচ্ছে।

এত হাওয়া— সে শুধু একেবারে পদ্মার বুকের উপর খাড়া এই বাড়ির কল্যাণে। সেকথা একাধিক লোক আমাকে বলেছেন।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। সমুদ্রপারেই বল আর এখানেই বল, ধূ ধূ হাওয়ার মাঝখানে মন যেন শান্তি পায় না, কোনও কাজে পুরোপুরি concentrate করা যায় না। একদিকে গায়ে ক্রমাগত হাত বুলোচ্ছে, অন্যদিকে কানের কাছে শব্দ করছে— একসঙ্গে দুটো disturbance.

* * *

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

এ কদিন গরম ছিল ভ্যাপসা। ঘামও হচ্ছিল। বোধহয় আজ তাই সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে, এই মিনিট দশ আগে (৮.৩) অতি সূক্ষ্ম একপশলা বৃষ্টি এক মিনিটের তরে হল। তার পর দূর-দূরান্ত অবধি সেই পাতলা জলকণাযবনিকা ঢাকা মাঝনদীর চর, ওপারের সবুজ রেখায় বিলীয়মান জনপদভূমির তরু-বনানী, আকাশের দিগ্বলয়প্রান্ত শ্যাম কাজলে মসীমাখা।

আবার পুবের বাতাস—এতদিন ছিল দক্ষিণের। তারই জোরে মহাজনি নৌকো চলেছে বুক ফুলিয়ে। এদের গতি এতই মসৃণ আয়াসহীন যে এর কাছে রাজহাঁসও হার মানে।

www.pathagar.com

এরই মাঝখানে দেখি, আকাশ-ভরা মেঘের এক জায়গায় অতি ছোট একটা চক্র— তার ভিতর দিয়ে ট্যারচা হয়ে সূর্যরশ্মি পড়েছে শুভ্র বালুচরের উপর— সে রশ্মি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল মেঘের, নীল আকাশের উপর। বালুচর যেন আতশি কাচ হয়ে সূর্যের সঙ্গে চোখ-ঠারাঠারি করছে।

এইবারে রাক্ষুসী পদ্মা ধরেছেন জেব্রার ঢঙ।

আকাশের অনেক জায়গায় মেঘ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ফালি ফালি ডোরা ডোরা হলদে পদ্মার জল, আর অন্য জায়গায় নীলের ডোরা। সেই পরশুরামের দক্ষিণরায়, মোশয়, ডোরা ডোরা আঁজি আঁজি!

* * *

২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

শান্তিনিকেতনে যেরকম নিত্য নিত্য আবহাওয়ার চার্ট রেখেও এত বৎসর পরেও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারিনে, এখানেও তাই। কখন যে কোন্ দিক দিয়ে ডিপ্রেশন হয় এবং ফলে ঝড়বৃষ্টি হয় (যদি সত্যই তাই হয়) তার কোনও হদিস আগের থেকে পাওয়া যায় না।

গত বছর অনেক দেরি অবধি বর্ষা চালু থেকে বন্যা ঘটাল।

শান্তিনিকেতনের মাটি ভেজা রইল অনেকদিন। কিন্তু শীতের বৃষ্টি যেটা প্রতি বৎসরের পাওনা, হল না। এমনকি পুব বাঙলায়ও না— বেশিরভাগ জায়গায় সাত মাস ধরে বৃষ্টি হয়নি।

জোর ঝঞ্ঝা ঝড় হওয়ার কথা বৈশাখ মাসে। হল না। হল ৩০ বৈশাখে। সেটা আবার চলল একটানা ২৯/৩০ অবধি। সচরাচর কি এরকম হয়?

তার পর এখনও ঠিক গরম পড়েনি। পশ্চিম বাঙলা অন্তত ২৬ তারিখ অবধি ঠাণ্ডা ছিল।

ইতোমধ্যে কলকাতা একদিন বলল, মনসুন বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আসছে। তার পর চুপ।

এখন প্রশ্ন সত্যকার আসল বর্ষা নামবে কবে?

এসব অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে পেছিয়ে যাবে, না মাঝ-জুনে যথারীতি নামবে।

তেরো তারিখে বৃষ্টি নামার পূর্বে দিনকয়েক যে হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট করেছিল তা নয়। কাজেই আজকের দিনের জোর হাওয়া দেখে বলা, যে বৃষ্টি হতে অনেক দেরি এটিও অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ।

সুন্দর বাতাসে ভোর আটটা অবধি সুনিদ্রা।

পদ্মার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি এক রাত্রেই ডুবে ডুবে অনেকখানি জল খেয়েছেন। কুণ্ডের একটা পাশ ডুবে গিয়ে এখন স্রোতের ধারা প্রায় পাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল। ছোট্ট চরটি সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করেছে।

আকাশে ভালো করে মেঘ জমেছে। বর্ষা-সকালের আবহাওয়া।

খাড়ির সবকটা নৌকাই যেন একে একে পাড়ি দিয়েছে উজানের দিকে পশ্চিম পানে। তাদের গতি এমনই মসৃণ পিচ্ছেল অনায়াস যেন পাকা স্কেটিঙের সর্দারনীর বুকে ফোলানো প্রফাইল দেখতে পাচ্ছি পারের থেকে।

এই দেখে মনে পড়ল, আমাদের দেশে যখন কোনও নৌকো পাল তুলে তর তর করে উজানে ধায়, আর দেখে অন্য কোনও নৌকো পাল নেই বলে বৈঠা মেরে মেরে অবিরাম

www.pathagar.com

ঘামছে তখন চেঁচিয়ে বলে, 'হালের বলদ বন্ধক দিয়ে পাল কেন।'

কত গরিব আমাদের দেশ। সামান্য একটুকরো কাপড় কেনার পয়সা নেই।

রাত সাড়ে দশটায় লু আরম্ভ হল। উত্তর দিকে দূরে দূরে মেঘের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শব্দহীন। আকাশেও মেঘ নেই। আজ ধুলো কম। না হলে এই বাতাসেই আমরা ফের ধূলিতন্ত্রের অধীন হতুম। বৃষ্টির আশা কম। কালকের তুলনায় আজ ভ্যাপসা ছিল কম।

ঘণ্টাখানেক এই লু উৎপাত করে চলে যাওয়ার পর এখন (০১.০০) হাওয়া একদম বন্ধ। কী উৎপাত। কাল এই সময় কী হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে হাওয়া আসছিল।

* * *

২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

আজ সকালে স্নানের ভিড়। দশেরা? এ-সময়ে দশেরা কী রে বাবা? আজ দুপুর এবং এখন (১৮.৪০) সত্যই গরম। ভ্যাপসা, ধুলো, দক্ষিণের হাওয়া নেই। পুবের হাওয়া এখানে ঢোকে না। পদ্মা চলেছে বোঝা যায় তার শব্দ থেকে— হাওয়া থেকে নয়। 'জ্যুস' শেষপ্রান্তে।

আজ কতরকম আবহাওয়াই না যাচ্ছে।

সন্ধ্যায় ছিল গুমোট। তার পর সন্ধ্যাবেলাতেই পুবের বাতাস। তার পর পুব-দক্ষিণ থেকে ধূ ধূ হাওয়া। দরজার একটা পাটি বন্ধ করে দিতে হল; না হলে কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘ ছিল অল্প— তা-ও খুব বর্ষণপ্রদ নয়, লম্বা লম্বা ফালি ফালি। তার পর অসহ্য গুমোট। হাওয়া এমনই মোক্ষম বন্ধ হল— এরকম ধারা জীবনে কখনও দেখিনি— যে বেশ কিছু মশা সর্বাঙ্গের চতুর্দিকে ভন ভন করে অস্থির করে তুলল। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক। ঠিক বৃষ্টি হব হব ভাব। তার পর হঠাৎ জোর বাতাস ধূলিতন্ত্র। নিরাশ হয়ে দোর জানালা পর্যন্ত বন্ধ করলুম না।

এই হাওয়া-গুমোটের তামাশা কবার হয়েছিল জানিনে।

শেষরাতে অনুভব করলুম, বৃষ্টি হয়েছে। সকালে দেখি ছাত বেশ ভেজা।

* * *

২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

ঈদ্-উজ্-জোহা/ আজ হল না

১০ জু'অল হজ্জ

সকালে দেখি ছাত ভেজা। অল্প অল্প বাতাস। তাতে ধূলিকণার অত্যাচার কম। এখন ৫.৫৫-এ ঢাকা ফোরকাস্ট দিল আজ চাটগাঁ, দক্ষিণ ঢাকা ও দক্ষিণ রাজশাহী বিভাগে ঝড়-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি তাবৎ কিছুই হবে। এই মুহূর্তে এখানে নিদারুণ গুমোট, বাবলাগাছের বিন্দুপারা পাতাটিও নড়ছে না। বৃষ্টি হলে বাঁচি। তবে ঈদের বাজারের সর্বনাশ হবে।

ঈদ

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

আজ আবার নীল চাঁদ দেখলুম। এই নিয়ে জীবনে তিনবার। আর দু বার বছরের ঠিক এই সময়েই দেখেছিলুম। এবারে ব্লু, কিংবা fine emareld green.

www.pathagar.com

আজ চাঁদের শুক্লা দ্বাদশী। সূর্যাস্ত এখানে— রাজশাহীতে— আজ ১৮.৫২-তে। দেখলুম ঠিক ১৯.০০। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই চাঁদ সোনালি হয়ে গেল। বোধহয় অন্ধকার বাড়ল বলে চাঁদের জ্যোতিও বাড়ল। তাই সবুজ-নীলত্ব লোপ পেল। ১৯.৫৫-এ নিত্যিকার চাঁদ।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন মেঘ তখন আকাশ ও চাঁদের গায়ে। এমনকি তখনও সূর্যাস্তের লালিমা আকাশের হেথা হোথা-লেগেছিল।

আজ সকালে উঠে বুঝলুম, কালকেরই মতো বৃষ্টি হয়েছে।

বেতার বলল, ঢাকাতে বৃষ্টি সত্ত্বেও নামাজের জনসমাগমে মানুষ কম হয়নি।

দিনটা মোটামুটি গরমই। তবে এখন ২২.১৫ হাওয়া বইছে। সন্ধ্যা থেকেই পুব থেকে ছিল। বর্ষা কাছে আসার সঙ্গে পুবের বাতাসের প্রাধান্য বাড়ছে।

* * *

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কালকের চাঁদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম বলে এবং visitors ছিল বলে নীল চাঁদ দেখার চেষ্টা করিনি। দুঃখ হচ্ছে।

সাঁওতাল রমণীর বর্ণনা— শান্তিনিকেতন।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে চুলে তেল দেয় না।

খোঁপা কি আমাদেরি মতো বাঁধে?

পরনে কমলা রঙের শাড়ি— বেগুনি পাড়।

ডান হাতে বাজুবন্ধ।

গলায় সাদা পুঁতির হার।

কানে পেতলের সাদাসিধে গোল একটি কানফুল— just a big full stop। ডান হাতে সুতো বাঁধা— ওতে কি কবজ?

* * *

RAJSHAHI— CALCUTTA

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

ফিরোজ ভজু স্টেশনে এসেছিল। তাদের মুখ শুকনো। থাক, সে আমি বলতে পারব না।

বউ ঈশ্বরদী অবধি এল। আমাদের বগিটা অনেকক্ষণ ধরে শানটিং করল।

আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন হানিমুনে। বউ ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারি ওই ঢাকা এই পাবনা একাধিকবার বাসে করে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাত দেড়টার সময় আমার গাড়ি ছাড়ল। সে-ও শুকনো মুখে বিদায় নিল।

এ বড় পীড়াদায়ক। এসব কথা আর লিখব না। এ তো কাল্পনিক পীড়ার জাল বুনে বুনে উপন্যাস লেখা নয়।

* * *

www.pathagar.com

সমুদ্র-প্রকৃতি

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা চওড়া কালো রাস্তা। তারি সঙ্গে গা মিলিয়ে একফালি ঘন সবুজ মাঠ, ছোঁড়ারা ক্রিকেট খেলে— তার সঙ্গে গা মিলিয়ে ফের আরেক ফালি সোনালি বালুপাড়— একপাশে জেলেদের বস্তি, গাছ নেই পালা নেই কতকগুলি কুঁড়েঘর— বালুপাড়ির সঙ্গে গা মিলিয়ে আরেক ফালি লম্বা একটানা নীল সমুদ্র।

চোখে পড়ে চার ফালি কালো পথ, সবুজ মাঠ, সোনালি বালু আর নীল সমুদ্র। নীল হল কথার কথা। তা না হলে দিনে যে সুন্দরী ক-বার কাপড় বদলাল তার হিসাব রাখা দায়— বাকি তিনজন কুঁড়ের বাদশাহ, তাদের রঙের ফেরফার হয় না।

সমুদ্রের একদিকটা গিয়ে লেগেছে আডিয়ার নদীর মোহনায়। দুইজনের ধাক্কাধাক্কিতে টক্কর খেয়ে একটা ঝিল তৈরি হয়েছে— সে এঁকেবেঁকে আমাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে— জেলেদের গাঁ ছাড়িয়ে। ঝিলটা নিতান্তই খরা, তার উপর নৌকা চলে না, জেলে জাল ফেলে না, তার রঙেরও অদলবদল হয় না। তবু এঁকেবেঁকে গেছে বলে মাঠ, বালু সমুদ্রের ফালি কেটে সব জিনিস যেন দূরে নিয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

সকালবেলা দেখি বালুপাড়ের গায়ে যেন কে নীলাম্বরি শাড়ি শুকোতে দিয়েছে। আলো-আঁধারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। এদিকে দক্ষিণের বারান্দায় পুবের রোদ এসে পড়েছে, নিমগাছের ফাঁকে ফাঁকে। অনেকক্ষণ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইলুম। মন বোধহয় শান্ত ছিল তাই কোনও পরিবর্তন লক্ষ করিনি। বেলা যখন বেশ হয়েছিল তখন দেখি পুবের রোদটুকু বারান্দাটি যেন মুছে দিয়ে চলে গেছে।

ওদিকে দেখি নীলাম্বরি শাড়ির উপর রুপালি জরির অগুনতি চুমকি কুচি ফুটে উঠেছে। সাদাসিধে নীলাম্বরি কখন যে হঠাৎ জড়োয়া হয়ে গেল টেরই পাইনি।

একসারি খুঁটি পোঁতা, কাত হয়ে, দেখছিলাম সকালবেলা নীলাম্বরির পারে। জেলেরা জাল টেনে তুলছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি তারা আর নেই— বালুচর পেরিয়ে, সবুজ মাঠের উপর জেলেনিরা চলেছে মাথায় ঝাঁকা করে বাজারের দিকে।

মাঠের গরুগুলো ঠিক সেইরকম ছবিতে আঁকা। শুধু compositionটা বদলে গেছে। একদিকে বেশিরভাগ জড়ো হয়েছে— অন্যদিকে দুটো-চারটে ছিট্‌কে-পড়া।

পেছনের বস্তিতে জেলেনি কলতলায় কাপড় কাচছে। এমনি আঁটসাঁট গঠন যে সমস্ত শরীর দু ভাঁজ করে পায়ের কাছে কাপড় আছড়ানোতেও শরীরের কোনও জায়গা দুলে উঠছে না। আমাদের মালীর বউ নাইতে বসেছে। কাকের কা-কার সঙ্গে কাপড় কাচার ধোপধাপ আর কলতলায় ঝাঁট দেবার শব্দ।

জোয়ার আসার সময় হয়েছে। বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে তার প্রথম মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সন্ধেয় গিয়ে দেখি কপাল জুড়ে চওড়া লাল আবির মেখেছেন, এক কান থেকে আরেক কান অবধি।

www.pathagar.com

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না— ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?
আজ সন্ধেয় কি বাসর-সজ্জাটাই না পরেছিলে!
এতবড় কালো ঘোমটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

* * *

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

আজ সন্ধেয় গিয়ে বললুম মাটির মানুষ আমি। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি যেখানে মাটির শেষ। তোমার নীল কোলে জায়গা দাও।

গরম বালুতে পা পুড়িয়ে রোজ আসি— তুমি আমার পা শীতল করে দাও।

একদিনের তরে সমস্ত ভেতরটা ঠাণ্ডা করে দাও না কেন?

গভীর অন্ধকার— পরশু মহাশিবরাত্রি— শুধু বাক্ আর স্পর্শ। গুরু গুরু গর্জন ঘন ঘন মিশে যাচ্ছে পাগল হাওয়ার এদিক ওদিক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে। কখনও কানে আসছে দুয়ে মেলার শব্দ। কখনও হাওয়া যেন গর্জন থেকে খসে পড়ে যায়। তার পর হঠাৎ গমগমানি যেন নিজেকে একা বোধ করে থেমে যায়। নোনা বাতাস কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, কখনও-বা জোর লাগিয়ে চাদরখানা সরিয়ে দেয়।

তবু যেন অন্ধকারেরই জয়। দূরের গর্জন, মাঝামাঝি অন্ধকার, কাছের স্পর্শ সবকিছু তলিয়ে পড়ে কী যেন অজানা অন্য কোনও অন্ধকারের তলায়।

এই গভীর বিলুপ্তি অতল বিস্মৃতি নিয়ে আসে না কেন?

সমুদ্রপারে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না—

* * *

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, আমার দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা কালো ভারতবাসীর মতো। সুলতান মাহমুদ তার তলোয়ার চালাতেই তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না— Scatters and slays with his enchanted sword— আমার হয়েছে সত্যিকার তাই, কাক— দুপুরের শান্তির প্রধান অন্তরায়। সমুদ্রের গুরুগম্ভীর গর্জন, দমকা হাওয়ায় দোল-লাগা নারকেলপাতার শিরশিরি সব চাপা পড়ে যায় ওই কর্কশ লুব্ধ চিৎকারের তলায়। এ চিৎকারে যেন সমুদ্রপারের পচা মাছের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নীল ফরাস পেতে রেখেছ এতক্ষণ ধরে— নাচ শুরু হোক না।

সমুদ্রের বুক চিরে যেন অন্ধকার বেরিয়ে এসে, আলাদীনের জিনের মতো সমস্ত আকাশ বালুপার কালো বিষ ঢেলে একাকার করে দিল।

জলের ভেতরে কি আরেকটি জিন এখনও পোরা রয়েছে নাকি? তার লাথালাথির গমগমানিতে সমুদ্র আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

পশ্চিম আকাশের লাল কাগজের ফানুসবাতিতে যেন হঠাৎ আগুন ধরল। দেখতে না দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে আলোটাও নিভে গেল। পুবে-পশ্চিমে একটানা অন্ধকার।

* * *

www.pathagar.com

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

বউমার ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না। ডানদিকে বালুচরের লম্বা কোলবালিশ, বাঁ দিকে ঘন ঘোলাটে মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে বানিয়ে তোলা তুলতুলে আরেক কোলবালিশ। কে যে পাখার হাওয়া করছে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেঘের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঘোলাটে শাড়ির জমি হেথা-হোথা সর্বত্র বারে বারে কেঁপে উঠছে। দুঃস্বপ্ন দেখছেন কি না বলা যায় না, মাঝে মাঝে গুমরে উঠছেন, পাখার হাওয়ায় সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে— পষ্টাপষ্টি কিছু বলার উপায় নেই।

পাখার হাওয়া ঝড়ের হাওয়া হতে চলল যে। হঠাৎ কখন একপাশের শাড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সাদা ফ্যানার পেটিকোট— না লেসের সেমিজের শেষের দিকটা?

কালোজাম, গোলমোহর, নিম-নারকোলে কী মাতামাতি। সমস্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাইরের দিকে তাকাবার উপায় নেই। শুধু ওই ইলেকটেরির খুঁটিটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ওর কোনও নড়নচড়ন নেই। এতবড় সমুদ্র— তিনিও দুলে দুলে ওঠেন প্রাণের কাঁপনে— কিন্তু খুঁটিটার কাঁপন নেই, জীয়ন মরণও নেই।

পারের সবাইকে তাড়াবার জন্য আজ গুমরে গুমরে বড় বড় ঢেউ পারে এসে আছাড় খাচ্ছিল। কী মতলব কে জানে। তাড়াতাড়ি অন্ধকার টেনে আনার জন্য আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। কাল অমাবস্যা— আজ এত তাড়া কিসের?

অন্ধকার যেন পেছন থেকে তাড়া করে করে বাড়িতে ভাগাল।

বারান্দায় বসে আছি জোর আলো জ্বালিয়ে কিন্তু বাইরের অন্ধকারের গায়ে যেন আঁচড়টি কাটতে পারছে না। ওদিকে সমুদ্র হুংকার দিয়ে বারে বারে শোনাচ্ছেন, আজ হোথায় যাওয়া বারণ। কাল মহাশিবরাত্রির আয়োজনে কোনও কাপালিকদের ডমরু আজ সন্ধে থেকেই বাজতে আরম্ভ করল।

নোনাগন্ধে খানিক খানিক আভাস পাচ্ছি।

* * *

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

বড়লোক দেউলে হওয়ার অনেকদিন পরও জাঁকজমক সমানই চলতে থাকে— বরঞ্চ অনেক সময় বেড়ে যায়। পালাপরবে গমগমানি বরঞ্চ বেশি হয়— ওদিকে আটপৌরে খরচে টানাটানি চলে।

আকাশের একটানা লাল নিভে গেল কিন্তু টুকরো টুকরো মেঘে তার জাঁকজমক জেগে রইল অনেকক্ষণ ধরে— আরও বেশি লাল হয়ে। দেউলে-হয়ে-যাওয়া জমিদারের ইয়ারবকসি যেন এরা। মনিবের শেষের তলানিটুকু খেয়ে মাতলামির লালে লাল। হুজুর লুকিয়ে থেকে গাদা গাদা আবির ছুড়ছেন।

আটপৌরে আকাশ ম্লান কিন্তু মেঘে মেঘে পালাপরবের বাড়াবাড়ি জাঁকজমক। আড়াল থেকে অস্তগত সূর্য পেলা দিচ্ছেন। দাক্ষিণ্য থেকেই দারিদ্র্য ধরা পড়ে।

পুবে-পশ্চিমে দেখনহাসি ইলেকটেরিতে খবর পাঠানো না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিম লালের ইশারায় পুব লাল হল। সেই লাল ফিকে হচ্ছে— কি গোপন কায়দায়

www.pathagar.com

তার খবর পুবে পৌঁছচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ তো ফিকে, কোনও রঙ নেই, ফেরফার নেই— কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে— এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়!

* * *

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

আকাশ যেন উবু হয়ে শুয়ে সমুদ্রকে চুমো খাচ্ছে— এদিকে সমুদ্রের পা ওদিকে মুখ। রঙে রঙে সমস্ত জিনিসটা ঘটল। প্রথম চুম্বনে দিগ্বলয় লাল হল। তার পর নিবিড়তর চুম্বনের কাতরতায় বেগুনি হল, সেই বেগুনি ফিকে হতে লাগল, এদিকে ঢেউয়ের দোলায় সুন্দরীর পা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে— সমস্ত দেহ শান্ত। চুম্বনের তরঙ্গ শান্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ওপার হতে এপারে এসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে উঠছে— কেন্দ্রীভূত আনন্দ এপারে এসে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তার পর বেগুনি সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে ছাইরঙ হল। এ যেন সর্বশেষ নিবিড়তম চুম্বনে হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু ঠোঁট দিয়ে শুষে নিয়ে চলে গেল। এপার ওপার জুড়ে পড়ে রইল প্রাণহীন ফ্যাকাসে শবদেহ।

কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ল। তার পর আকাশে ছোট ছোট মোমবাতির পিদিম জ্বালিয়ে শবের পাহারা।

সেই কালো চাদরে সবকিছু ঢাকা। দক্ষিণমুখো হয়ে বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁ দিক থেকে আসছে কান্নার শব্দ— শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডানদিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি— যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিঝিনি। সামনে মোমের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

কিসের প্রতীক্ষা? কোনও চন্দ্রোদয়ের? যেন তিনি সুধাভাণ্ড নিয়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে কোনও মৃতদেহে প্রাণ দেবেন।

* * *

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

সূর্য অস্ত যাব-যাব করছেন এমন সময় পারে পৌঁছলুম। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছিল, অন্যদিনেরই মতো। ভাবলুম কালকের মতো আজও ফাগের খেলা জমে উঠবে। প্রথম লক্ষণ দেখাও দিল। আকাশ ফিরোজা সবুজ শাড়ি পরল— আস্তে আস্তে গয়না চাপাব চাপাব করছে, এমন সময় দেখি শাড়িখানাই ফিকে হয়ে হয়ে, কেমনধারা সেই ছাইনীল হয়ে গেল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি তারও সেই ফিকে শ্যাওলা সবুজ রঙ। চারদিকেই কেমনধারা আধমরা ছাইরঙ ধরতে লাগল।

কালকের দিনের সব সাজসরঞ্জামই ছিল কিন্তু কেন জানিনে খেলা শুরু হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল।

তখন দেখি আকাশে দ্বিতীয়বার অতি ক্ষীণ চাঁদের অত্যন্ত ম্লান ঝিলিক।

যেন হিমালয় তার সব রঙ সব সৌন্দর্য মুছে দিলেন, আড়ম্বর-আভরণহীনতার মাঝখানে দুখিনী কন্যাকে ঘরে তুলবেন বলে। চাঁদের মুখে তাই কি ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে লাগল?

অন্ধকার যখন ঘনতর হল তখন চাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর সবাই, মেঘ জল বালুচর আপন আপন আলো নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে।

www.pathagar.com

বরণশেষে বাড়ি ফিরলুম।

ফাল্গুন মাস— কিন্তু কোনওদিকে নবজাগরণের কোনও চিহ্ন নেই। এদেশে শীতের ঘুম নেই, বসন্তের জেগে-ওঠাও নেই।

*　　　*　　　*

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

মাঝআকাশ থেকে একটুখানি ঢলে-পড়া তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী; সূর্য হেলে পড়েছেন কিন্তু তখনও জ্যোতির্ময়। তাই ভস্মভাল শিবের ললাটে হীনজ্যোতি শশাঙ্ক-কলা। উমা কি এখনও ঘরের কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি— বেলা যে গড়িয়ে এল। জেলেদের পাড়ায় কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে— জেলেনিরা রঙিন-শাড়ি পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে— সমুদ্রপারের লোক বোধহয় স্বল্পভাষী হয়, ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথাবার্তার মেহন্নতে গল্পগুজব জমে না, ঝগড়াঝাটিতে গলা চিরে যায়— জেলেরা বোধ করি বাজারে গেছে— নারকোলপাতার ছাউনির কুঁড়েঘর ওই নারকোলগাছের গা-ঘেঁষে যেন রোদ থেকে শরীর বাঁচাচ্ছে।

উমার কাজ শেষ হয়েছে। ভস্ম মুছে ফেলে, ঘোর আসমানি রঙ দিয়ে শঙ্করের কপাল ঢেকে দিয়েছেন— তার উপরে দিয়েছেন তিনটান টকটকে ফাগ— আর মাঝখানে এঁকে দিয়েছেন উজ্জ্বল, নবকান্তি, অকলঙ্ক শশাঙ্ক।

হাসি ফুটেছে। সমুদ্রের জল আসমানি রঙ নিয়েছে— ধূসর বালুচর সোনালি হল। সমুদ্রের লোনা হাওয়ার জোর কমল— উত্তর থেকে হিমালয়ের বাতাস এল নাকি উমার চঞ্চল অঞ্চল আন্দোলনে?

সমুদ্রের একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে— তার মাঝে ডুকরে ডুকরে ওঠা গুমরানো।

নিমগাছ ডাল নাড়ছে, কালোজামের পাতা কাঁপছে, বারান্দার টবে বেতগাছের সরু পাতা ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে। দিনের বেলা তারা রঙ বদলায়, পাখি এসে বসে তাদের উপর, সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্তের কতরকম আলো তাদের উপরে এসে পড়ে— তারা সাড়া দেয়— তাদের জীবনপ্রবাহের ঢেউ ওঠে, তারাও দোল খায়।

রাতের অন্ধকারে তারা শুধু সমুদ্রের কান্না শোনে— একমনে। বাতাস সে কান্না বয়ে নিয়ে আসে, আর সেই বাতাসের ডাকে সাড়া দিয়ে সমুদ্রের কান্নার সঙ্গে যেন নিজেকে মিশিয়ে দেয়।

সমুদ্রের কান্না থামে না বলে, ওদেরও যেন চোখে ঘুম নেই।

এখানকার সংসারের সবরকমের সবকটা তার যেন সমুদ্রের কান্নার সুরে বাঁধা।

*　　　*　　　*

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

এ খেলা তিন দিন ধরে চলেছে। আকাশ, সমুদ্র, বালুচর বিবর্ণ নিরস দেখায় যতক্ষণ সূর্য একেবারে না মিলিয়ে যান— মনে হয় আর সবাই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আছে। সূর্য যেই অদৃশ্য হলেন অমনি কী গোপন লিপ্সায় আকাশের গাল লাল হয়ে আসে— ভাসুরঠাকুর উঠে যাওয়া মাত্রই কনেবউ যেরকম বরের দিকে তাকায়— প্রথমটায় আমেজ লাগার মতো। তারি রেশ সমুদ্রের ফেনায় লেগে গোলাপি হয়ে ওঠে— তারি পরশভেজা বালুতে গোলাপজামের ফিকে

www.pathagar.com

গোলাপি হয়ে দেখা দেয়। তার পর বরবধূতে কী কথাবার্তা হয় জানিনে— কনে লজ্জায় টকটক করতে থাকেন— ফাগ সিঁদুর সব রঙ তখন হার মানে। আর সে লালের সঙ্গে সঙ্গে পেছনের আকাশ হয় ঘন আসমানি, দূর সমুদ্রের জল হয় গাঢ় পান্না। সমস্ত দিনের মূর্ছা কেটে গিয়ে বিরাট আকাশ যেন গমগম করে ওঠে, পশ্চিম থেকে পূব জুড়ে লম্বা লম্বা রঙিন কড়িকাঠ যেন পূর্বাচল-অস্তাচলকে জুড়ে দেয়, দূরে পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের কোণে।

তার পর লজ্জা-শরম ইশারা ঠারাঠারিতে কী খুশি হয় জানিনে। দেখতে পাই পিদিম যেন কেউ নিভিয়ে দিল— না বউ কালো কপাটের দরজা বন্ধ হয়ে দিল— না কালো ঘোমটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

দুপুররাতে ঘুম ভাঙল। এ কী কাণ্ড! চাঁদের আলো জ্বালিয়ে আকাশে তারার ঘুঁটি সাজিয়ে বরবধূতে এ কী খেলা!

* * *

৫ মার্চ, ১৯৪৭

এখানে সমুদ্র নেই। উঁচুনিচু সবুজ ক্ষেত— মাঝে মাঝে তালগাছ আলের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে। তার পর নিকটের পাহাড়— বড় বড় পাথর স্পষ্ট দেখা যায়। তার পেছনে দূরে নীলাভ পাহাড়— লাইন বেঁধে পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত দক্ষিণ দিকটা জুড়ে।

বর্ষাকালে এই শুষ্ক দেশও সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে গিয়েছিল। বসন্তের মাঝামাঝি এরি মধ্যে ফালি-ফালি হলদে ক্ষেত বেরিয়ে সেই সবুজের গা যেন জখম করে দিয়েছে। সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আকাশ কী যেন এক ব্যাকুল ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে— পালাবার পর্যন্ত সাহস নেই। পুবের বাতাস আসছে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। মৃদু তপ্ত এবং অল্প ভেজা-ভেজা। দু দিন বাদেই পশ্চিম থেকে হু-হু করে জোর গরম বাতাস বইতে আরম্ভ করবে— পুবের বাতাস এখনও ঠিক মনস্থির করতে পারছে না এদেশে আর আসবে কি না।

পশ্চিমের হাওয়া পৌঁছায়নি বটে কিন্তু গাছপালা তার খবর পেয়ে কোন্ আশ্চর্য উপায়ে— সব ফুল গা থেকে আছড়ে ঝেড়ে ফেলেছে। রক্তকরবী ঝরেনি কিন্তু কে যেন আগুন দিয়ে ঝলসে দিয়ে গেছে। শুধু বুগনভিলিয়া আর রাঙাজবা— না স্থলপদ্ম?

এতদিন ঘুঘু ডাকেনি। তপ্ত মধ্যাহ্নে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত তার ডাক। সমস্ত শীতকাল ময়ূর নিস্তব্ধ ছিল— মেঘ আসার কোনও লক্ষণ নেই তবু থেকে থেকে ডেকে ওঠে— ঠিক যেন একা কৈ? একা কৈ প্রশ্ন শুধায়।

প্রজাপতি পালিয়েছে দল বেঁধে— না তাদেরও ডানা ঝলসে গিয়েছে?

দুপুরবেলা শুনি সাপে যেন কার গলা চেপে ধরেছে— চাপা গলার ক্ষীণ আর্তরব— এ কি খাণ্ডবদহনের অগ্নিদেব পশুভোজনের বিরাট পর্ব আরম্ভ করেছেন?

না দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ? সবুজ অঞ্চল গেছে— এখন যেন অঙ্গবস্ত্র প্যাঁচের পর প্যাঁচ খুলছে গ্রীষ্ম দুঃশাসন— বীভৎস আনন্দ যেন ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে চেখে নিচ্ছে।

ধরণীর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায় পত্রে-পুষ্পে; কূপগহ্বর অন্ধের উপড়ে নেওয়া চোখের মতো— ক্ষতজল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

*   *   *

৬ মার্চ, ১৯৪৭

বহুকাল পূর্বে পড়েছিলুম কারও ফাঁসির হুকুম হলে রুশিয়ার কোনও জেলে জেলরের সুন্দরী মেয়ে কয়েদির সঙ্গে প্রেম করতে যেত। তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তি করে সেপাইদের হুকুম দিত শেকলে তাকে আচ্ছা করে বাঁধবার। তার পর সেই মেয়ে সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে আসত তার কাছে। হাত দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট তার চোখের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে ধরত। কয়েদি মাথা পেছনের দিকে সরিয়ে সরিয়ে দেওয়াল পর্যন্ত নিয়ে যেত। তার পর মেয়েটা সিগারেট চোখের উপর চেপে ধরে তাকে অন্ধ করত।

দ্বিপ্রহরের সূর্য ক্রমেই কুয়োর জলের দিকে এগিয়ে আসছে— জল ক্রমেই নিচের দিকে নেবে যাচ্ছে। তার পর শেষের দিন আসবে যেদিন তার স্বচ্ছ টলটলে চোখ কানা হয়ে গিয়ে থলথলে ঘোলাটে কাদা বেরুবে। তার পর তা-ও শুকিয়ে গিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

থাকবে অন্ধকার কোটর।

*   *   *

৮ মার্চ, ১৯৪৭

সকালবেলা এবারে এখানে পৌঁছে দেখি চতুর্দিক নিস্তব্ধ। পুব-পশ্চিম কোনও দিক থেকে হাওয়া বইছে না। সমুদ্রে জমে-যাওয়া নীল বরফের মতো— স্কেটিং রিঙ্ক। তারি মাঝখানে দক্ষিণ বাতাস এল জোর। নারকোল, গোলমোহর, নিম, বকুল দুলে উঠল— সমুদ্রের সর্বাঙ্গ যেন হাল চালিয়ে চষে দিল।

এ দক্ষিণ বাতাস ঠাণ্ডা নয়, গরমও নয়। এ এসেছে সবাইকে চঞ্চল করে দেবার জন্য। কলতলায় সুন্দরী কাপড় সামলে স্নান করতে পারছে না, নারকোল ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে, কলতলার শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই বিড়ি ধরাতে পারছেন না— এক চোখ সুন্দরীর দিকে, পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ি হেলতে হেলতে ধুলোয় জবুথবু হয়ে পড়ে গেল।

*   *   *

৯ মার্চ, ১৯৪৭

সমুদ্রের গর্জনে নানা সুর। কোনওদিন অশান্ত উদ্বেলিত হাহাকার, কোনওদিন গুমরে-ওঠা চিৎকার, কোনওদিন একটানা করুণ আর্তনাদ। যেদিন জোর পুরবীয়া হাওয়া বয় সেদিন সব গর্জন ক্রন্দন ছিন্নভিন্ন হয়ে পারের দিকে আসে— আজ হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস বন্ধ হল সন্ধ্যাবেলায়, কিন্তু পুবের বাতাস এল না। আজ তাই সমুদ্রের একটানা কান্না লহমার তরে বিরাম নিচ্ছে না। ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ চুপচুপ দাঁড়িয়ে, আজ পর্যন্ত তাকে কখনও কোনও শিহরণে বিক্ষুব্ধ হতে দেখিনি।

কে শুনছে? পারে লোকজন নেই। গয়লাপাড়ার শেষ বাতি নিভে গেছে। ডাইনে-বাঁয়ে কোনও কোনও বাড়িতে আলো নেই। চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে খোলা জানালা চৌকো চোখের মতো বাইরের দিকে তাকিয়ে— কেমন যেন অন্ধের তাকানোর মতো। মাঠে, রাস্তায়, বালুপাড়ে চাঁদের আলোর অতি ক্ষীণ স্তিমিত আস্তরণ। শুধু সমুদ্রের জলে যেখানে চাঁদের

www.pathagar.com

আলো পড়েছে সেখানে গালানো রুপা বালুচর থেকে সোজা পূব আকাশে গিয়ে মিলেছে।

জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কেমন যেন মনে হয় গাছগুলো সমুদ্রের মতোই প্রাচীন। তারা বহুকাল ধরে এই নানা সুরের কান্না শুনেছে। তারা যেন তার কারণও জানে। একে অন্যের দিকে মাথা দুলিয়ে কী যেন বলে, আর সবাই শিরশিরিয়ে উত্তর দেয়, 'ছিছি, ছিছি।'

* * *

১১ মার্চ, ১৯৪৭

টলটল নীল রঙ সমুদ্রের আর দূরের আকাশ ঘন বেগুনি। পশ্চিমের আকাশ লাল টুকটুকে— মাথার উপরে প্রকাণ্ড এক থাবড়া মেঘ শুভ্রমল্লিকার স্তূপের মতো জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণমুখো হয়ে আডায়ারের দিকে চললুম। যেতে যেতে যেখানে আডায়ার নদীর মোহনা সেখানে পৌঁছলুম। তিনদিকের ঢেউ সেখানে এলোপাতাড়ি মারামারি করে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর বালু জমে জমে সমুদ্র ওই জায়গাটায় অগভীর। গোটা পাঁচেক জেলে গোড়ালি-জলে সুতো দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টায় ডাইনে-বাঁয়ে চলাফেরা করছে। সাদা পাল তুলে সায়েব মেম আডিয়ার উজিয়ে চেট্টিনারের বাড়ির দিকে হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে।

মোহনার জল নীল হতে আরও নীল হতে লাগল। দূরের আকাশ বেগুনি ছেড়ে গাঢ় নীল হতে লাগল। তার পর আস্তে আস্তে দুই নীলে মিলে গিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল— দূরের আকাশ আধা আলো-অন্ধকারে আর প্রায় দেখা যায় না। সে-নীল এমনি জোয়ারের মতো সবকিছু ছাপিয়ে কাছে আসতে লাগল, যেন মনে হল বাতাস পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। জেলেদের ময়লা কাপড় সে-নীলে ছুপিয়ে রঙ ধরল— আমার মনে হল যেন নীল রঙ *ঠেলে ঠেলে* এগিয়ে চলেছি।

নীলের বানে সবকিছু ডুবে গেছে। আমি চোখ বন্ধ করলুম। সেখানেও নীল— চোখের সাদা-কালো কি দুই-ই নীল হয়ে গেল?

* * *

১২ মার্চ, ১৯৪৭

বালুপাড়ে কত অজানা পদচিহ্ন; তার ওপর সাগরের ঢেউয়ের কী রাগ। দূর থেকে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে, আকুলিবিকুলি হাত বাড়িয়ে মুছে দেবার কী অবিরাম চেষ্টা। উঁচু পাড়িতে বসে দেখি জোয়ারের জলে মুছেই যাচ্ছে, মুছেই যাচ্ছে। এদিকে লোকজনের চলাচল কমে গেল— নতুন পদচিহ্ন আর পড়ে না বললেই চলে। তার পর যতদূর দেখা যায় সাগরের জল ধুয়ে-মুছে সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এবারে ভাটার জল আর এগুচ্ছে না। ঢেউ ভেঙে পড়ে লম্বা লম্বা হাত আর এগিয়ে দিচ্ছে না— এখন যেন লক্ষ লক্ষ রুপার নূপুর নেচে নেচে নাচের গরমে গলে গিয়ে জলে মিশে যাচ্ছে।

সকালবেলা গিয়ে দেখি সেই পরিষ্কার ধোয়া-মোছা বালিতে সাগর ঝিনুকের গয়না সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে— প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বাড়িতে কুড়িয়ে আনলুম। দেখি ম্লান হয়ে গিয়েছে। যেন সুন্দরীর কানের দুল ভেলভেট বাক্সের কফিনে সাজানো ফ্যাকাসে মড়া।

www.pathagar.com

*　　*　　*

১ আগস্ট, ১৯৪৭

এবারে প্রথম সন্ধ্যায় সমুদ্রপারে গিয়ে দেখি সবাই যেন বেজার মুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছেন। আপন আপন কাজ করে যাচ্ছেন সবাই কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে— বাড়ির বউরা যেমন মুখ গুমসো করে শাশুড়ির দিকে না তাকিয়ে আপন আপন কর্তব্য করে যান। আমি এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে অনেকক্ষণ চলাফেরা করলুম কিন্তু কেউ একটিবারের তরেও সাড়া দিল না।

সবাই আপন আপন কাজ করলেন আবার— মিনিমাল রেট। আকাশ যে সেই শেলেটের রঙ নিয়ে মুখভার করে বসেছিল তার রদবদল হল না— জল যে সেই ফিকে শ্যাওলার রঙ নিয়েছিল তার উপরে সূর্যাস্তের কোনও রঙ এক লহমার তরে গায়ে মাখল না— আকাশ কতকগুলি সাদা মেঘের বুদ্বুদ ওড়াচ্ছিল, সেগুলোকে নড়াল না, ফাটাল না— জলের ঢেউ একটানা দড়ি পাকিয়ে পারে এসে সেগুলোকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ল, পারের দিকে এগুলো না, সমুদ্রের দিকে পেছুল না।

আমি অবহেলায় লজ্জা পেয়ে বাড়িমুখো হলুম।

এমনকি সেই চারজন জুয়াড়ি ঠিক সেইরকম উবু হয়ে আধা আলো-অন্ধকারে জুয়া খেলছে। এই চারটি মাস যেন হুশ করে তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে।

*　　*　　*

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭

ফটোগ্রাফ তোলাবার সময় মানুষ যেরকম কাঠের পুতুল হয়ে বসে, আজ সকাল থেকে জল স্থল আকাশের সেই অবস্থা। যে মেঘের টুকরো ভোর হওয়ার সঙ্গে আডায়ারের আকাশে বাসা বেঁধেছিল সে এখনও ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে— টেলিগ্রাফের খুঁটিতে শূলবিদ্ধ হয়ে। কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতার স্পন্দন সমস্ত নিস্তব্ধতাকে যেন আরও নিস্তব্ধ রূপ দিচ্ছে, সিগারেটের ডগা থেকে ছাইটুকু মাটিতে পড়ল ডাইনে-বাঁয়ে এতটুকু না পড়ে।

কী অসহ্য থমথমে গরম। যেন ইলেকট্রিক উনুনে রান্না হচ্ছে— আগুনের হল্কা চোখে পড়ে না। কালোজাম পচতে আরম্ভ করেছে, নিমপাতা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, কলতলার কলরব চিৎকার-বিদীর্ণ। দূর জেলেপাড়া থেকে মেয়েটি কলসি কাঁখে করে, আসছে যেন রোদ্দুরের বন্যা উজান ঠেলে ঠেলে। এদিকে অজন্তা-স্তনওয়ালী মালীবউ সবুজ মেরুনের শাড়ি কাচছে, আর থেকে থেকে কপালের ঘাম মুছছে।

এতদিন হাওয়ার গর্জন আর সমুদ্রের হুঙ্কারে বাড়িঘরদোর ডুবে থাকত বলে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল কানে এসে পৌঁছত না। আজ বাতাস নেই, সমুদ্র ক্লান্ত— তাই অনেক রকম শব্দ কানে এসে পৌঁছচ্ছে, এমনকি পাশের বাড়ির কড়া পর্দানশিন মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রার অর্ধগুঞ্জরণ এখানে এসে পৌঁছচ্ছে। রোজার শেষের দিক, কড়া গরম, হাওয়া বন্ধ— তাই সে গুঞ্জরণে ক্লান্তি জড়ানো।

পশ্চিমের বর্ষা এদেশে দুর্বল— পুবের বর্ষার এখনও ঢের দেরি। ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, দেশি লোক এখনও আসনে বসেননি— তারি ফাঁকে লাহোর কলকাতার অরাজকতার মতো গরমের একচোট নির্মম প্রহার!

www.pathagar.com

*　　　*　　　*

১৬ আগস্ট, ১৯৪৭

যখন বন্ধু কলকাতায় তখন তিনি কাজকর্মে বড্ড ব্যস্ত থাকেন বলে চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, যখন বোম্বায়ে তখন dull feel করেন বলে— তা সে বর্ষার জন্যই হোক অথবা কোনও কাজকর্ম নেই বলেই হোক— চিঠি লিখতে পারেন না; তার ওপরে তাঁরই ভাষায় মাঝে মাঝে চিঠি না লেখার spell আসে বলে চিঠি লিখতে পারেন না। এ তিন ফাঁড়া কাটিয়ে চিঠি লেখার শুভলগ্নে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের বন্ধুত্ব এত পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে তখন চিঠি লেখার আর প্রয়োজন থাকবে না। 'অনুপস্থিতি' নাকি 'দুই বিরহী হৃদয়কে এক করে দেয়'— চিঠিপত্র না লেখার নীরবতা দুই হৃদয়কে আরও এক করে দেয়। তার ওপর আরও একটা প্রবাদ রয়েছে— 'নীরবতা হিরন্ময়'।

আমার হাসি পেল, অগোচরে যে অবহেলা রয়েছে সে-ই এসব ফাঁড়া জুটিয়ে দিয়ে অপরাধী বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায় এবং অজানাতে সেই প্রলেপ যুক্তির রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ ভাবে সে দুর্গন্ধপ্রলেপ বন্ধুর কানে সুধাবর্ষণ করবে।

*　　　*　　　*

১৭ আগস্ট, ১৯৪৭

কয়েকদিন ধরে বেশিরভাগ সময় হাওয়া বন্ধ থাকে বলে গরমে মনপ্রাণ কচ্ছপের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। কাল বেতারে বলল আজ এ অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। সকালে দেখি হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্ষার গোড়ার দিকে যেরকম পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া বইত ঠিক সেইরকম গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে কিন্তু উপরের আকাশে অম্বুহীন পাণ্ডুমেঘ পুবসাগর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে চলেছে। দুপুরবেলা হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল— বিকেলের দিকে ফের পুবের বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ভাবছি এই দু-টানার ভেতর আকাশ মনস্থির করে বর্ষণ করবেন কী করে। এযাবৎ যা অবস্থা তাতে তো মনে হয় না বৃষ্টি হবে। অথচ বর্ষায় সমুদ্রের প্রলয়নাচ দেখার জন্যই তো এখানে এলুম। গরমে প্রাণ যায়, নতুন বই আরম্ভ করতে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিনে।

জানি অভ্যাস নেই বলে লিখতে কষ্ট বোধ হয়। মানুষ সে কষ্ট নানা কারণে সয়ে নিয়ে বই লেখে। কেউ টাকার জন্য, কেউ প্রিয়জনদের কাছে নিজের দাম বাড়াবার জন্য, কেউ আত্মম্ভরিতার তাড়নায়। আমার বেলা শুধু প্রথম কারণটা খাটে, অথচ টাকার জন্য লিখতে মন যায় না। মনে হয় তার চেয়ে অল্প মেহনতে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাওয়া যাবে।

*　　　*　　　*

১৯ আগস্ট, ১৯৪৭

মাদ্রাজ উপকূল দুই বর্ষার সঙ্গমভূমি। পশ্চিমের বর্ষা এখানে আসে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে তার আর সে ঝামর মুখ কৃষ্ণগম্ভীর হয়ে বর্ষণ-আশা সঞ্জীবিত করে না। বাঙালোরেই দেখেছি পশ্চিমের মেঘ পুব দিকে যাচ্ছে কী রকম পানসে চেহারা নিয়ে। এখানে দেখি সে মেঘ প্রায় সাদা হয়ে গিয়ে শরতের হংসশুভ্র ঝালর হয়ে নীল চন্দ্রাতপে দুলছে। এখান থেকে আর পুব দিকে যেতে চায় না, এক সমুদ্রপার থেকে রওনা দিয়ে অন্য সমুদ্রপারে পৌঁছে আর যেন এগুবার উৎসাহ তার নেই।

www.pathagar.com

তাই কোনও কোনও দিন দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। নিচে পশ্চিম সাগরের মেঘ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর উপরে পুব সাগরের মেঘ মন্থরগতিতে পশ্চিম দিকে রওনা হয়েছে। আর কখনও-বা দেখি পশ্চিমের মেঘ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে আর ঊর্ধ্বে, অতি ঊর্ধ্বে পুবের মেঘে শান্ত শুভ্র স্থির হয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে আছে— দুই স্তরের মাঝখানে বিপুল ব্যবধান।

কখনও আসে পশ্চিম থেকে গরম বাতাস— দাক্ষিণাত্যের তৃষ্ণার্ত উষ্ণ জনপদের বহ্নিদাহনের শুষ্ক ও চর্মদাহক। কখনও আসে বাতাস— ভিজে ভিজে। বঙ্গসাগরের ঠাণ্ডা জলের পরশ পেয়ে পেয়ে সুশীতল।

কাল রাত্রে দুই বাতাসে আর দুই সমুদ্রের মেঘে কী বোঝাপড়া হল জানিনে। মাঝরাতে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাতাস আর বৃষ্টি এল পশ্চিম দিক থেকে।

সকালবেলা দেখি সমস্ত আকাশ কালো কম্বল দিয়ে পালঙ্ক ঢাকা দিয়েছে— দুই মেঘের মাঝখানে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তারা যেন গভীর নিবিড় আলিঙ্গনে গড়িয়ে পড়েছে, বাকি পৃথিবীকে তারা দেখতে দিতে চায় না।

* * *

২৬ আগস্ট, ১৯৪৭

অশান্ত ক্রন্দন।

সমুদ্রপারে অশান্ত মন নিয়ে যেতে নেই। মন জানে যে সমুদ্র প্রাণহীন তার গর্জনে অথবা ক্রন্দনে কোনও অর্থ নেই এমনকি গর্জন বা ক্রন্দন শব্দ দিয়ে এই অনুভূতিহীন ধ্বনিকে চৈতন্যের স্তরে নিয়ে আসা ভুল। সুস্থ লোক এ তত্ত্ব জানে, এবং তার অবচেতন মনেও এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা নেই বলে সমুদ্রের ধ্বনি সম্বন্ধে সে খানিকক্ষণ পরেই অচেতন হয়ে যায়।

কিন্তু যার অবচেতন মন বিক্ষুব্ধ সে বেশিক্ষণ বুদ্ধিমানের মতন স্বীকার করে বসে থাকতে পারে না যে সমুদ্রধ্বনি নৈসর্গিক প্রাণহীন শব্দতরঙ্গ মাত্র।

সে শুধায় :

এর হৃদয়ের অন্তস্তলে কী আলোড়ন? সে আলোড়নের কেন্দ্র কোথায়? সে কি দূরে উদয়-দিগন্তেরও পেছনে? সেই আলোড়ন কি দৃষ্টির অগোচরে অন্তরালে উদ্বেলিত হয়ে হয়ে এই সিন্ধুপারে এসে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে শুভ্র অশ্রুজলের কোটি কোটি শ্বেত বুদ্বুদে ভেঙে পড়ছে?

না এ অনাদৃতা সুন্দরী? ক্ষণে ক্ষণে নীল অঙ্গনের উপর শুভ্র ফেনের আলিম্পন এঁকে রবিকরকে তার চটুল নৃত্যে প্রলুব্ধ করছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যভঙ্গের ভয়ে দ্রুততর গতিতে নব নব আলিম্পনের পরিবেশন করে যাচ্ছে। সব চেষ্টা বিফল হল বলে শেষ রশ্মি মেলাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সকরুণ ক্রন্দন নিষ্ফল আক্রোশ গর্জনে পরিণত হচ্ছে?

না এ অভিমানী শিশু। দূর থেকে দেখতে পাই ছুটে আসছে, তার ঠোঁট কাঁপছে, ডাইনে-বাঁয়ে কোণের কাছে বিকৃত ভঙ্গি নিয়ে ফাট-ফাট হচ্ছে, তার পর কাছে এসে পারের উপর আছড়ে পড়ে শতধা অশ্রুতে বিগলিত হয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠছে। পারের মা কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোল দিলেন না। ওদিকে কে যেন সেই থমকে-গিয়ে-চুপ করে যাওয়া শিশুকে মায়ের পায়ের কাছ থেকে ভাটার টানে সরিয়ে নিল।

www.pathagar.com

না কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত মাতাল? বেহুঁশ বেখেয়ালে ক্রেমদ্য খাঁতের উপর বোতলের পর বোতল সোডার ফেনা ঢেলেই যাচ্ছে, ঢেলেই যাচ্ছে। আর সেই মাতলামোর ভেতরে ও যতই দেখছে হুইস্কি-সোডার রঙ আসছে না ততই রোষে ক্রোধে গর্জন করে যাচ্ছে?

*   *   *

৩১ আগস্ট, ১৯৪৭

চোখ বন্ধ করে বসে ছিলুম। অন্ধকার নেবে আসছিল মুমূর্ষুর চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসার মতো করে।

ভেতরে ভেতরে যেন সাড়া পেলুম— না সত্যি শুনতেঁ পেলুম আমার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল।

চোখ মেলে দেখি সত্যি তো। আমার চোখের সামনে দিয়ে কে যেন সমুদ্রের উপর সোনালি জল শাড়ি থেকে নিংড়ে ফেলে ফেলে, সমুদ্রকে যেন দুই ভাগ করে সোজা উদয় সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে— চোখ বন্ধ ছিল, তাকে দেখতে পাইনি। শেষ প্রান্তে পৌঁছে ওই সাদা দেয়াল বেয়ে অভিসারিকা যেন কার বাড়ির ঝরোকায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল সমুদ্রের উপর তার চলে যাওয়ার সোনালি চিহ্ন ঝলমল করছে— অবাক হয়ে তাই দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ঘোমটা নেই।

পূর্ণচন্দ্র।

এক মিনিটের তরে। যার জন্য অভিসার সে যেন তাড়াতাড়ি এসে কালো মেঘের কম্বল দিয়ে সুন্দরীর মুখ ঢেকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালি রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হল। আকাশ-বালুপার সব আড়ি-পাতার-দল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল।

*   *   *

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে যায় তাই খবরের কাগজ দিয়ে জানাল সন্ধে সাতটা পনেরোয় দেখা হবে। আমাকে খুঁজে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না জানতুম তাই ডাঙায়-তোলা নৌকাখানার আড়ালে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসলুম।

রাক্ষুসে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ সাদা দাঁত দিয়ে বালুপারের গায়ে অবিরাম কামড়াচ্ছে। সূর্য ডুবল সাড়ে ছ-টায়। আকাশের শেষ লালিমা মোছার সঙ্গে সঙ্গে বেলাভূমি নির্জন হতে লাগল, সাতটা বাজতে না বাজতে বেশ অন্ধকার হয়ে এল, জনমানবের চিহ্ন নেই, আমি এক নৌকার আড়ালে বসে— মনে কোনও ভয় নেই, আমাকে ঠিক খুঁজে পাবে, কতবার পেয়েছ, কোনওদিন ফাঁকি যায়নি।

নির্জন, অন্ধকার। তোমার আসার সময় হল বলে। চিরকাল এসেছ নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাই শুধু চোখ দিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করেছি।

অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা জ্বলজ্বল করছে।

তোমার আসার সময় পেরিয়ে গেল।

তার পর সাড়ে সাতটা বাজল, পৌনে আটটা, আটটা। এ কী! তুমি তো কোনওদিন এক মিনিটের তরেও আসতে দেরি কর না। আমাকে কোনওদিন খণ্ডিত বিপ্রলব্ধ করনি। তবে আজ! খবরের কাগজে দিয়ে লগ্ন মুহূর্ত পাকাপাকি জানিয়ে দিয়ে।

www.pathagar.com

এক ঘণ্টা ধরে ঘড়ির কাঁটা দেখছি, বুকের কাঁটা গভীর হতে গভীরতর হয়ে ঢুকেছে।

সোয়া আটটায় উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ির দিকে চলার মুখে একবার ফের শেষবারের মতো পেছনের দিকে তাকালুম।

কৃষ্ণ-সপত্নের আলিঙ্গনে এতক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিলে? তারি জটার ভেতর দিয়ে আমার অবমানিত প্রত্যাগমনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ধরা দিলে!

লজ্জা পেয়ো না সুন্দরী। বহু লাঞ্ছিত অপমানিত রক্তসিক্ত এ দেহে আর স্থান নেই যেখানে তোমার দৃষ্টিক্ষেপ নব অবমাননার অচেনা বেদনা হানতে পারে।

তুমি যেন বেত্রাহত গায়ে উল্কি সাজালে!

*　　*　　*

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রায় চতুর্দিকেই খোলা বলে গোলচক্রবাল, গম্বুজের মতো আকাশ। মনে হয় সোনালি নীল আণ্ডার মাঝখানে বসে আছি হাঁসের বাচ্চাটির মতো— ছেলেবেলায় বারুণীতে জাপানি খেলনা কিনতুম, গোল কাচের ভেতর সোনালি হাঁসের ছানা।

এতদিন ধরে এই হাঁসের বাচ্চার মতো অপেক্ষা করেছি এই নীল আণ্ডা ফাটবে কবে আর আমি এই বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু যতই ভাবি ততই কূল-কিনারা পাইনে যে এই আণ্ডার বাইরে আছে কী। হাঁসের বাচ্চা ডিমের ভেতরে বসে কী ভাবে জানিনে কিন্তু সে যতই কল্পনার ছুট লাগাক না কেন, সে কি কখনও বাইরের পৃথিবীর কল্পনা করতে পারে? তাই কল্পনা করে কী লাভ।

দুপুররাতে ঘুম ভাঙল— দেখি চাঁদ যেন আকাশের আণ্ডাতে ফুটো। অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম যে এর ভেতর দিয়ে মুক্তির পৃথিবীর সন্ধান মেলে কি না।

*　　*　　*

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পশ্চিমের তপ্ত বাতাস থেকে থেকে কালোজাম গাছের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া আর নিমের চিকন পাতার ঝুঁটি হাতের মুঠির ধরা এড়িয়ে যায় বলে তারা শুধু দোল খায়।

কৃষ্ণচূড়ার বীজপুট চারমাস হল শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু কিছুতেই গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়তে চায় না, এরা না খসলে গাছ ফুল ফোটাবে কী করে?

এ যেন মরাস্বামী বিধবার সর্বচৈতন্য অভিভূত করে ভূতের মতো চেপে বসে আছে, নতুন প্রেমের নব কিশলয় ফোটাতে দিচ্ছে না।

দূরে একফালি নীল সমুদ্র— বালুচর আর দিগ্বলয়ের মাঝখানে সেঁটে দেওয়া নীল রিবন। এর দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণতা এখান থেকে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মৃত্যুর মতো এর রঙ নীল। মৃত্যু অহরহ মানুষের চতুর্দিকে রয়েছে তবু মানুষ তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়— এ সমুদ্রেরও যে শেষ নেই সেকথা মন জানলেও সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়।

গাছ, সবুজ মাঠ, বালুপার, নীলজল— সবকিছু রৌদ্রস্নানে গা এলিয়ে দিয়েছে— কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে শুয়ে। মেঘমুক্ত আকাশ শরতের নীলরঙ এখনও ধরেনি— বর্ষার ভয়ে এখনও সেই পুরনো ফ্যাকাসে বরষাতি দিয়ে গা জড়িয়ে রেখেছে। বাতাস নিষ্কর্মা

www.pathagar.com

ভবঘুরের মতো এ-গাছে ও-গাছে ধাক্কা দিচ্ছে— মেঘ বয়ে নিয়ে আসার বেগার থেকে যেন রেহাই পেয়েছে।

জেলেপাড়ার নারকোলপাতার ছাউনি বর্ষায় ভিজে কাকের মতো জবুথবু হয়ে বসে ছিল। রৌদ্রে এখন যেন পালক শুকিয়ে উস্কো-খুস্কো হয়েছে। যদি একদিন উড়ে চলে যায় তবে নগ্ন দারিদ্র্যের এই চক্ষুশূল থেকে হেথাকার মানুষ নিষ্কৃতি পাবে।

গতিহীন, বেগহীন নির্জীবতা পুব বাঙলার নদীর পারে গড়ে ওঠা মানুষকে বাড়ির কথা, দেশের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।

* * *

২৯ জুন, ১৯৫৫

স্বপ্ন

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্ন দেখে।

কী স্বপ্ন?

আমি যেন একটি রসিকতা তৈরি করার চেষ্টা করছি। ইংরেজিতে যাকে বলে humourous story— ওই যেসব বস্তু Tit-Bits-এ বেরোয়।

কী গল্প তৈরি করলুম?

এক ভদ্রমহিলা ভিখিরি trampকে শুধাচ্ছেন, 'তা, তুমি কাজকর্ম কর না কেন?'

'ম্যাডাম, কাজ দেয় কে?'

'আমি দিচ্ছি। আমার বাগানটি বড় অযত্নে আছে। তুমি ওটাকে একটু সাফ-সুৎরো করে দাও।'

ট্র্যাম্প একটু— ভেবে বলল, 'তাই সই।'

মহিলা বললেন, 'যন্ত্রপাতির কী কী দরকার হবে তার একটা ফর্দ করা যাক।' বলে তিনি একটা কাগজে 'কোদাল', 'কাস্তে' এসব লিখলেন। তার পর ভ্যাগাবন্ডকে বললেন, 'আমার আর তো কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা তুমি কাগজ-পেন্‌সিল্ নিয়ে ভেবেচিন্তে বাকিগুলো লেখ। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য গোটা দুই স্যানউইচ নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে দেখেন, ভাগাবন্ড লিখেছে, বেশ বড় বড় হরফে—

একখানা খাট
দুটি বালিশ!'

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম। স্বপ্নে এরকম গল্প বানাবার প্রবৃত্তি আমার হতে যাবে কেন? আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউই তো কখনও বলেননি যে তাঁরা স্বপ্নে রস-গল্প তৈরি করেছেন। কোনও humourist-এর আত্মজীবনীতেও এরকম ঘটনার কোনও উল্লেখ পাইনি।

হ্যাঁ, জানি, কেউ কেউ একটা episode দেখেছেন। যেমন মনে করো রবিবাবুর 'গানভঙ্গ'। তিনি দেখলেন, বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ) তাঁর বাল্যসখা এক বুড়োকে মজলিসে গান

www.pathagar.com

গাইতে হুকুম দিলেন। সে গান গাইতে গিয়ে কেঁদে ফেলল বলে, তিনি তার হাত ধরে তাকে সভাস্থলের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

তাই নিয়ে রবিবাবু 'গানভঙ্গ' লিখলেন।

এরকম ধারা আরও বিস্তর হয়েছে।

কিন্তু এই humourous story by itself, স্বপ্নেই সম্পূর্ণ তৈরি করে দেওয়া—উপরের episode-গুলো, কিছুটা স্বপ্নে বাকিটা জাগরণে— এর উদাহরণ তো জানিনে। এটা কী করে হল।

তখন মনে পড়ল, আইয়ুব, কচিতে, আমাতে একদিন কথা হচ্ছিল, আমরা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাট্য সবই লিখতে পারি। ওৎরাবে কি না, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমরাই হয়তো তখন বলব, এ গল্প কিন্তু গল্প হল না, এ উপন্যাস কিন্তু উপন্যাস হল না, ইত্যাদি। কিন্তু tit-bits-এর গল্প লেখা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এসব গল্পের উৎস কোথায়, কী করে আরম্ভ হয়, তার কোনও পাত্তাই আমরা জানিনে। তাই যদি জোর করে কিছু লিখি তবে সেটা হবে nothing : আমাদের ছোটগল্প লোকে বলবে খারাপ ছোটগল্প, উপন্যাস পড়ে বলবে, খারাপ উপন্যাস, ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের জোর-করে লেখা tit-bits প্রচেষ্টাকে লোকে চিনতেই পারবে না, বলবে এটা Just nothing।

এ-আলোচনা আমাদের ভিতর কবে হয়েছিল আমার আর মনে নেই। দশ, পনেরো পঁচিশও হতে পারে, কিন্তু এ আলোচনার কথা আমি বহুবার ভেবেছি।

তাই কি আমার 'অবচেতন' মন যে-সমস্যা তার গোপন কোণে সঞ্চয়ন করে রেখেছিল তাই দিয়ে এই গল্প গড়ল?

* * *

কলকাতার ঁকালীপুজো

১ নভেম্বর, ১৯৬৭

সকাল ৮.০০ বিকটতম পিচ্-এ তীব্রতম ভলুমে মাইকবাদ্যসঙ্গীত।

চাপা দেবার জন্য রেডিয়োর একটি যা তা স্টেশনে classical music লাগালুম। ১০%-ও চাপা পড়ল না। কাজে মন দেবার চেষ্টা করলুম। ইয়াল্লা! হঠাৎ সেই classical বন্ধ হয়ে তারাও পাল্লা দিয়ে আরম্ভ করেছে ওই ফিল্মি গানা দিয়ে।

মোটর স্টার্ট নিচ্ছে না। রোজ সকালে সেটাকে অভিসম্পাত দিই। আজ সেটা নন্দনকাননের মধুরতম সঙ্গীত বলে মনে হল— মাইকটা বেশ চাপা পড়েছে। কপাল আমার! অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি স্টার্ট নিল।

প্যান্ডাল যদি লং প্লেইং বাজাত তবে হয়তো বেঁচে যেতুম। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের নীরবতাটাই যন্ত্রণার বহর বুঝিয়ে দেয়। কনফুৎস বলেছেন, নিরেট দেওয়ালটা কোন কাজে লাগছে! লাগছে তো তার মাঝখানের

www.pathagar.com

ফাঁকটা— দরজাটা। এখানে ঠিক উল্টো। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের ফাঁকটা না থাকলে ওই চিৎকারে অভ্যস্ত হয়ে যেতুম।

ভাগ্যিস ওরা classical বা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছে না।

বিনোদ বলত, জোর করে কুইনিন খাইয়েছে কিন্তু রসগোল্লা হলে আরও কষ্ট হত। এটা ঠিক নয়। Rape case আসামির উকিল মেয়েটার Connivance ছিল প্রমাণ করতে গিয়ে শুধোল, 'কিন্তু তোমার ভালো তো লেগেছিল?' মেয়েটা বলল, 'উকিলবাবু, জোর করে কেউ মুখে রসগোল্লা পুরে দিলে সেটা কি তেতো হয়ে যায়?'

১০.১৫ গব্বযন্ত্রণা থেকে মুক্তি?

১০.২৫ Alas, false pain ! ফের শুরু!

১১.৩২ বেশি না, পাঁচ পাঁচ মিনিটের ভিতর পাঁচবার, পিন গ্রুভে আটকে গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁ। cf 'বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে'।

দুপুর ১২.০০ আমার সুখ-শান্তির বারোটা। চিৎকার করে গলা ফেটে গেল। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে বুড়ো শয়তান, আর শয়তানের আণ্ডা দুটোই প্যান্ডেলে জাত-ইডিয়েটের মতো হাঁ করে লৌড-স্পিকারের দিকে তাকিয়ে আছে। খাসা excuse আছে— আমার ডাক শুনতে পায়নি।

আমি 'লবদ্বার' বন্ধ করে অতিষ্ঠ। আর এরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভূমার সন্ধানে একেবারে লাউডস্পিকারের সদরে।

এরাই মহাজন! পরিবেশ— তা সে যা-ই হোক— পছন্দ করতে জানে। আর আমার প্রতিবেশীদের ঈর্ষায় বুক ফেটে যাচ্ছে— আহা, ওরা যদি আমার বদলে এ বাড়ির বাসিন্দা হত।

৩.০০ ওহ্! 'কী ভুল করিনু আমি যোগী!'

মডার্ন্ কবিতা আকছারই মেশিনারি থেকে নিরন্তর inspiration পায়। W. C.-তে বসে শুনছিলুম— উপায়ান্তর সেই অন্তত সেখানে— একটা গানে বার বার যেন পিন গ্রুভে আটকা পড়ে যাচ্ছে। শেষে বুঝলুম, অহহো। এটা deliberate নয়া টেকনিক। গাওয়াইয়া ঠিক groove-এ খাবি-খাওয়া পিনের অনুকরণে হুবহু একই শব্দ পাঁচবার— তার পর কিছু নির্ঝঞ্ঝাট গান— ফের একই শব্দ পাঁচবার— তার ওই গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁর অনুকরণে গান গাইছে।

১৩.১০ আহ্ কি আরাম! মহাসঙ্গীত থেমেছে। ঢাকের বাদ্যি নাকি থেমে গেলে ভালো লাগে (সে আমলে গ্রামাঞ্চলেও শব্দকাতর সজ্জন ছিলেন! আশ্চর্য); যদি বলি এই মহাসঙ্গীতের বদলে আমি ঢাকের বাদ্যি any day prefer করব।

যে গুণী বলেছিলেন

> কী কল পাতাইছ তুমি!
> বিনা বাইদ্যে নাচি (নাডি) আমি ॥

তিনি প্যান্ডেলের এ মহাবাদ্য শুনলে কী করতেন।

www.pathagar.com

১৩.৪০ ওরে মূর্খ, ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ! ঝাড়া তেরোটি বছর স্কুল কলেজে ইংরেজি পড়ে এই প্রবাদটুকু শিখিসনি, 'অরণ্যানীর লতাগুল্ম বিচ্ছিন্ন করে জনপদে পদার্পণ না করা পর্যন্ত হর্ষোল্লাস করে উঠিসনি।' কিন্তু সেই বোগদাদি মূর্খ অন্-নশ্‌শারের মতো আণ্ডার ঝুড়ি সামনে রেখে রাজকুমারীকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিসনি।

আবার আবার সেই কামানগর্জন।

লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। এবং এরা অত্যন্ত আইনসম্মত আচরণ করে বলে সরকারি কর্মচারীদের মতো আধ ঘণ্টার বেশি লাঞ্চ আওয়ারে নেয় না। সোনারচাঁদরা বাঁচলে হয়!

'কামানগর্জন' বললুম, কিন্তু কামানগর্জন গম্ভীর সিংহগর্জনের মতো আদৌ কর্ণপটাহ-বিদারক নয়। এমনকি চ্যাংড়া মেশিনগানের ক্যাটক্যাটও প্যান্ডেলের তাণ্ডব-আরাবের সমানে জুঁইফুলের গানের মতো মোলায়েম।

সেদিন যেন কৃপা আমার করেন ভগবান।
মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের ওই গান।

গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হুঁ। কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রলয়বাদ্যের সামনে তিনি কি গাইতেন?

১৪.০০ রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় না। আমার ভরসা দুপুর। দুপুর থেকে তিনটে অবধি দিবানিদ্রায়। ঘুম লেগে আসছে, এবার কে যেন— কেসিয়াস ক্লে-ই হবে— পেটে মারে মোক্ষম গুত্তা। ফের no loudspeaker, এবারে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে পাঁজরে খোঁচা। চলল নিদেন আধঘণ্টা।... যা দেখলুম, এ যাবৎ আমার ঘুমটাই একমাত্র হিরো যে ওই বিটকেল মুজিকির সঙ্গে lost battle-এর rearguard action লড়ল।

মা কালী! একটা প্রশ্ন শুধব মা, তুমি দুপুরবেলা অ্যাট্টু দিবানিদ্রা দাও না? না এই উৎকট— সেই যে তুলসীদাস বানরদের লঙ্কা আক্রমণের সময়কার বিকট শব্দ অনুপ্রাস সহযোগে প্রকাশ করেছেন—

কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিগহ ধাবহি—

কী বলছিলুম মা, এই কটকটহি-ই কি তোমার অতি বিকটিনী দিবানিদ্রা আয়েশের আফিং!

১৭.৩০ আমি তো অগা। তাই শুধোই, সন্ধ্যা তো হল। দেবীর আরতিটারতি হবে না? তখন তো শাঁখটাঁখ বাজার কথা। সেটা শুরু হলে বাঁচি।

ম্যাডাম কালী ভূতনাথের কোন পক্ষ যেন হন। না, সে বুঝি অন্নপূর্ণা—

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে!

তা, ও, একই কথা। তা পাষাণ বাপ মরুক আর না-ই মরুক, ভাইয়ের

www.pathagar.com

অভিমানে যে বড্ড লাগে এটি বড়ই খাঁটি, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ঘরোয়া বাঙালির গোপন গন্ধে-ভরা বেদনা!

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই।

১৮.০০ শাঁখ বাজল না, লাউডস্পিকারও থামল না। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে অবশ্যি শুধানো যায়। সর্বনাশ! ঈশ্বর রক্ষতু! আমার মতো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পাড়ার মুরুব্বিকে উৎসাহিত কৌতূহলী দেখে তারা না আমাকে ডবলাপ্যায়িত করার জন্য আরেকটা লাউডস্পিকার-এর সন্ধানে ভূতের ঘোড়া চেপে ছুট লাগায়!

১৯.০০ 'ডাক্তার যা বলেক বলুক না কো', আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস exercise physical movements of any sort স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় খতরনাক। কিন্তু আর পারা গেল না। প্যান্ডেলের সঙ্গীত উচ্চতর হয়েছে। রাস্তায় নামতে হল।

প্রথমেই শুনলুম, 'লাউড্স্পিকার বলছে, 'আজ রাত্রি আটটার সময় নির্ধারিত যাত্রা হবে না!' আমি প্রথমটায় উল্লাস বোধ করেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কাল হবে'।

সেটা নিশ্চয়ই মিন লা. স্পি. হবে না। সেটা কি এর চেয়েও খুনিয়া হবে? কে জানে!

এখান থেকে প্রায় একশো গজ দূরে একটি ছোট্ট ঘরে আরেক কালী। প্যান্ডেল লাউডস্পিকার কিছুই নেই। দু চারটি বউ বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তায়ও যুবতী মা-ই বেশি। সন্তানের যেন অমঙ্গল না হয়।

২০.১৫ এবারে আরম্ভ হয়েছে যা তা অতুলনীয়। আধঘণ্টা ধরে রেকর্ড বাজছিল না। এখন organizer-রা বেসুরা গান গাইছেন, মাইক চরম চড়ায় তুলে। তবলাও চলছে। চতুর্দিক নীরব হয়ে যাওয়ার ফলে এবারে আমার suffering চরমে উঠেছে। কালীপূজায় রাত জাগাটা তো স্বাভাবিক।

সকাল ১০.৩০ ফের রেকর্ড চলছে।

www.pathagar.com

গান

যদি না হত তোমার রচনা
একটি মোরে দিলে
যদি না রাতি হত কাহারো
বিরহ এ নিশীথে
তোমার স্মৃতি মধুর
অসহ বিরহ ভরা
কতটুকু যেতো মুছে
রজনী দহনে।

চন্দ্রসূর্যগ্রহতারা
সাজাও আলোমালা
তারায় তারায় বাঁধি তুমি
অসীম আনন্দিনী
তোমার এ যে মহান ছবি
দিয়ে হত এর কি সব-ই
প্রিয়ার চোখে আমার চোখ
যদি যেতো মিলে।

সুর
পণ্ডিত রতনজনকর

কথা
সৈয়দ মুজতবা আলী।

৫ মার্চ ১৯৬৩।

২১ নভেম্বর ১৯৪৭
মৌলবি বাজার

প্রিয় কণামিয়া,

কিসের কণা ভাবিয়া মনে হদিস নাহি পাই
হলপ তবু করিতে পারি তাহার সাথে নাই
জ্ঞানের যোগ, ইলিম আর বুদ্ধি যারে কয়
পেয়েছ মেলা সুযোগ তবু দাওনি পরিচয়!
না হলে এতদিনে
আসিতে হেথা, বলিতে হাসি, 'নিয়েছি আমি চিনে
যেমন করে মেঘের ডাকে ময়ূর উঠে নাচি
অলখকর-পরশ পেয়ে কুমুদ উঠে বাঁচি
— তপ্ত-খর নিদাঘ-দাহ দিবার অবসানে— ।
অজানা কোন টানে?
কিসের পরিচয়?
ডাউকি হতে ছুটিল জল সাগরে হবে লয়?
মেঘের বাণী, শুক্লা নিশি, সিন্ধু পারের ডাক,
চিনেছি আমি ভাষায় ভরা কভু বা নির্বাক।'

উপযুক্ত তত্ত্বকথা করিতে সপ্রমাণ
চলিয়া আসো ত্বরিতগতি চড়িয়া মোটর যান।
সঙ্গে এনো তাবৎ লেখা তব
অছাপা ছাপা বেবাক মাল প্রাচীন আর নব।

কহেন গুণী, 'বাড়ির জোরে বিশেষ এক প্রাণী
তেরিয়া হয়ে বীরেরে যায় হানি।'
আম্মো তাই সাহস করি তবে
— হুঙ্কারিয়া টঙ্গি ঘরে নাচিয়া ভৈরবে
মনের সুখে করিব গালাগাল,
বলিব, 'তব তাবৎ লেখা নেহাত জঞ্জাল
রদ্দি ওঁচা, ভ্যাপসা পচা, থাড্ডো কেলাশ অতি
ওরে রে দুর্মতি
বাড়াস কেন এ দুনিয়ার বিভীষিকার ভার
নাম যে কণা, কণামাত্র সন্দেহ নেই আর।'

www.pathagar.com

১২ জুন ১৯৫৫

মডার্ন কবিতা

এখানে কত রকম গরমই না পড়ে।
এবং বৃষ্টিও নামে কোনওপ্রকারের নেটিশ না দিয়ে।
কাল দুপুর রাতে হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম।
সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, প্রাণ যেন গান গেয়ে উঠল।

আজ সকাল থেকে ভ্যাপ্‌সা গরম।
কী করি, কী করি, কী করে গরম ভুলি।

এমন সময় এক বন্ধু এলেন এক ঠোঙা কালো জাম নিয়ে!
কত বৎসরের পরে কালো জাম!

মনে পড়ল,
বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল;
আমি যখন একদিন এই রঙের একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলুম,
কারণ আমার রঙ তখন ছিল ফর্সা,
— আজ আমার ছেলে ফিরোজের মতো—।

হার্টটা দুম্‌ করে বন্ধ হলে গেল।

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

HEINE

[আজ সকালে হাইনের কবিতা অনুবাদ করলুম]
সত্যি সত্যি আমরা দুজনে মিলে
অদ্ভুত এক গড়েছি প্রেমের জোড়া
প্রিয়া মোর পায়ে না পারে দাঁড়াতে ভালো
আর আমি? আমি একবারে হায় খোঁড়া।

ব্যামোতে কাতর সে যেন বেরাল-ছানা
আমি তো কুকুর শুয়ে শুয়ে কাতরাই,
আমার মনেতে সন্দেহ আছে মেলা

www.pathagar.com

দুজনার সাথে বেশ কিছু আছে বাই!

তার মনে লয় কমলিনী তিনি নাকি
কল্পনা করে গড়েছে আপন মনে
ফ্যাকাশে চেহারা— তাই লয় মোর মন
নিজেরে হেরো না, চন্দ্রমাসম গণে!

কমলিনী ওই খুলিল পাপড়িগুলি
চন্দ্রমা পানে তুলে ধরে তার আঁখি
কোথায় না ভরা সফল জীবন পাবে—
হাতে তার, হায়, কবিতাটি শুধু রাখি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে

১২ এপ্রিল ১৯৬১

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হতে শতবর্ষ পরে
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
ভাবিয়া অবাক হবে কী করে যে হেন ইন্দ্রজাল
বঙ্গভূমে সম্ভবিল। পরাধীন দীন দগ্ধ-ভাল
অন্ধভূমি। তারি তমা বিনাশিতে উদিল যে রবি
স্বর্গের করুণা সে যে। বঙ্গ কবি হল বিশ্বকবি।
তার পর এ যুগের লোকে স্মরি মানিবে বিস্ময়
কোন পুণ্য বলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়!

১৪ এপ্রিল ১৯৬১

নববর্ষ
(১৩৬৮)

স্নেহের মুকুল,

তুমি তো আক্কেল ধরো, বলো তো আমারে
নববর্ষ লয়ে কেন ফাটাফাটি প্রতিবারে!
পুরনো বছরটারে বাতাস কুলার
দিয়ে কেন ঝাঁটা দিয়ে করে দেয় বার?

কী দোষ করেছে, কও, পুরনো বছর
তারেই তো নিয়ে বাবা, করে নিলে ঘর
তিনশ পঁষট্টি দিন। গেল কি খারাপ,
উঠেনি কি সূর্য বুঝি, দেয়নি কি তাপ?
উঠোন বাজারে মাছ ভালো মন্দ যাই,
ব্লেডেতে কাটিয়া মাছ দিন কাটে নাই?
মদ্য খেয়ে চাচা বুঝি হয় নাই টং
পুপু পুটু মীরামাই করে নাই ঢং
যার যাহা, অভিরুচি? টেটেন পটের
বিবি সেজে বেরোয়নি? মেজদা ঘটের
বুদ্ধিটি খরচ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
মাথায় বুলায়ে হাত এনেছে এন্তের
খরচ করেনি তারো বেশি? পদি পিসি
করেনি ক্যাটের ক্যাট? ভাঙা ফাটা শিশি
করেনি কি বিক্রি, রামা, টুপাইস তরে?
বৌদি চষেনি মাঠ চক্করে চক্করে
টাট্টু ঘোড়া যেন হায়! যাবে অলিম্পিকে।
বড়দা করেনি রাঙ্গা বাড়িটারে পিকে?
পাক মাম গুড়গুড়ি বাবুজি জামাই
করেনি কি দিবারাত্রি শুধু খাই খাই?
রকেতে দুজনা বসি করিনি কি প্ল্যান
টুপাইস কামাবো বলি— খুদা যদি দ্যান!
কে জানে জর্মনি বসে হয়তো ভাইয়া
করে রেখে আছে ব্লন্ড গুণ্ডা দুই বিয়া!

(২)

তবে কি পুরানা সাল ছিল দিশি সস্তা
তাহারে বিদায় দিয়া ভরি বস্তা বস্তা
আনিবে জর্মন-মাল কিংবা সে বিলাতি
নববর্ষ— গ্যারান্টিড পাকা সে বেসাতি!
চলিবে দশটি সন এক নব বর্ষে
কই, দিদি, বলে না তো চোখেতে সরষে—
দেখি যবে, বলে কি না এরেও বিদায়
দেওয়া হবে। বারো মাস হয়ে গেল, হায়!

www.pathagar.com

(৩)

তুমি তো সেয়ানা মেয়ে চালাও সংসার
বল দেখি তবে কেন এহেন ব্যাভার?—
বাজে খর্চা একদম— পুরানটা যবে
দিব্য কাজ দিয়ে যায়; নয়া আনা তবে?

বর

২ জানুয়ারি ১৯৬২

মুখ খান্ কেনে মেঘলা মেঘলা
চউক্ষে কেনে পানি
ঠোঁট ফুলাইয়া থাকিলে পরে
কেমুন কইরা জানি।

কনে

ছলে বলে বানছো আমায়
কাইরা নিছো মন
কাইলকা যা কইছিলাম, নাগর
আছে কি স্মরণ?

বর

জেওর-বেসর যত চাইছ
ঢ্যাইল্যা দিমু পায়
একটুখানি হাস কন্যা
পরান জুইল্যা যায়॥

৯ এপ্রিল ১৯৬২

পিলসুজ 'পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা;
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অবহেলে
মাভৈ বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে-আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

'দিনলিপি'-তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।
১। রাবেয়া— লেখকের স্ত্রী।
২। ফিরোজ— লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
৩। ভজু— লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র।
৪। বিশী— প্রফুল্লকুমার বিশী (লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মধ্যম ভ্রাতা)।

www.pathagar.com

পত্রাবলি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পুত্রদ্বয়কে লিখিত পত্র

১

১৬ মে ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

এই বারে তুমি আমাকে দেখেই চিনতে পারলে। এর পূর্বে যতবার তোমাকে দেখতে গিয়েছি তুমি আড় নয়নে তাকিয়েছ, তোমার মায়ের হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পেছিয়েছ আর ভেবেছ, এ লোকটা কে?

এবারে চট করে তুমি আমাকে চিনে নিলে।

দু মিনিট যেতে-না-যেতেই বললে, 'মোটর'।

আমি তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলে তোমাকে মোটর দিলুম।

তুমি খুশি হয়ে ভজুকে কাছে নিয়ে মোটর নিয়ে খেলা করলে।

খানিকক্ষণ পরে আবার এসে বললে, 'মোটর'।

আমি বললুম, 'ওই তো ফিরোজ'। মোটরটা দেখিয়ে দিলুম।

তুমি বললে 'না, কঁ-ক্-ক্, 'কঁ-ক্-ক্' সেই মোটর।'

বুঝতে পারলুম না।

তোমার মা বুঝিয়ে দিলে, তুমি খেলনার মোটর চাও না, তুমি চাও আসল মোটর— যে মোটরে তুমি যখন কটকে এসেছিলে, ঘুরে বেড়াতে।

তোমার ঠিক মনে আছে।

আব্বু

২

২৮ মে ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ

তুমি যেসব কথা বলো তার মানে কি তুমি বুঝতে পারো? অনেক সময় তুমি না বুঝে আবোল-তাবোল বলে যাচ্ছো, আবার অনেক সময় দেখি যা বলতে চাও ঠিক তাই বলেছ— কথাগুলো আদপেই অর্থহীন নয়।

মাঝে মাঝে তাই ধোঁকা লাগে।

www.pathagar.com

তোমার মা বলছিলেন তুমি নাকি একদিন ঘড়িটাকে নিয়ে বড্ড ঝুলোঝুলি লাগিয়েছিলে। পাছে তুমি সেটা ভেঙে ফেলো তাই তিনি তোমাকে ওটা কিছুতেই দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। শেষটায় তুমি নাকি হঠাৎ মাটিতে পা মেরে বললে, 'লাথ মারো দুনিয়াকো।'

বলেই গুম গুম করে বেরিয়ে গেলে।

পরে জানা গেল, ওটা নাকি ফিল্মি গানার এক লাইন! তুমি তোমার আজীজ ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছ।

আব্বু

৩

১২ জুন ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি নাকি একদিন আদর করে ভজুকে জিগ্যেস করলে, 'ভজু, তোর আব্বু কোথায়?

আমি তখন ঢাকাতে তোমাদের দেখতে গিয়েছিলুম। তুমি তোমার আব্বুকে পেয়ে ভারি খুশি। কিন্তু ভজুকে ভালোবাসো বলে দুশ্চিন্তা হল— আমার তো তাই মনে হয়— এর আব্বু একবারও আসেনি কেন?

আব্বু

৪

৪ জুলাই ১৯৫৫

গাড়িতে পাটনা থেকে হৈদ্রাবাদ

বাবা ফিরোজ,

তুমি বড় হলে আমারই মতো গরমকাতর হবে না প্রার্থনা করি। যদিও জানি গরমকাতর হবেই। কারণ সেপ্টেম্বর মাসেও এক মিনিটের তরে পাখা বন্ধ হলেও তোমার ঘুম ভেঙে যায়।

তাই মনে করি বর্ষা ঋতু তোমার জীবনেও সেই স্থান দখল করবে যেটা সে আমার জীবনে করেছিল।

বর্ষাকালে ফসল হয়, তাই অন্নপ্রাণ মানুষ তাকে ভালোবাসে। যাদের কবিত্ববোধ আছে তারা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। আমার কাছে তার সর্বাধিক মূল্য তার শৈতল্যে। তুমি বলবে, সে কি, বাবা তার কবি-মনোবৃত্তি নিয়ে এটাকেই সবচেয়ে বেশি দাম দিলে। হ্যাঁ বৎস, তাই।

যৌবনে আমি ১২৬° ভিতর দিয়ে খাইবারপাস পার হয়েছি। কষ্ট পেয়েছি, কাতর হয়ে পড়েছি, কিন্তু তাই বলে ভ্রমণের উৎসাহ কমেনি।

এখন কিন্তু মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। এই গরমে কোথায় যাব! বাড়িতেই প্রাণ অতিষ্ঠ।

ভোজপুর। (শাহাবাদ Dt)

কচুরিপানা নেই।

আমবনের জমা-জলে গাছের কালো ছায়া। দেখে মনে হয়, গ্রামের কলহ বর্জন করে, গাঁওবুড়োরা সভায় বসেছেন।

www.pathagar.com

ধান পর্যন্ত ফলাচ্ছে জলে ক্ষেত ভর্তি করে। মাঝে মাঝে পলিমাটি, আমার দেশে ওরকম নেই। বাঁশ!

বর্ষার ঘোলা জলে সন্ন্যাসীর স্নান। গঙ্গা থেকে দূরে, নিশ্চয়ই ইঁদারা নেই। প্লাটফর্ম : বুড়ি সম্পূর্ণ দন্তহীন— হাতে উল্কি বাহারে-পেড়ে শাড়ি বাসন্তী রঙের ওড়না— হাতে বিরাট বিরাট মকর-মুখো রুপোর বালা— সোনালি রেশমি চুড়ি। নাতনি পাশে। সোনালি ওড়না, কিন্তু হাতে সোনা-রুপো নেই, শুধু কাঁচ। নাতনির বয়স ১০-১২ কিন্তু সবসুদ্ধ নিয়ে বুড়িটাই সুন্দরী।

আরেক মেয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে, বস্তার আড়ালে কখনও ঘোমটা টেনে, কখনও মাছি তাড়াতে তাড়াতে আম খাচ্ছে— গোগ্রাসে।

(দিলদার নগর)

হঠাৎ মাঠ কতদূরে চলে যায়, আবার কাছে আসে।

বর্ষা এসে আমার দেশ আর এদেশের তফাত ঘুচিয়ে দিয়েছে— সম্পূর্ণ না, অনেকখানি।

বিহারের বিখ্যাত আমবাগানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি।

৫

১৯.৭.৫৫

ফিরোজকে ট্রেনে

অতএব হাতের লেখা টলটলায়মান

আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে তুমি কি আমার মতো এত সব দেশ-বিদেশ দেখবে? আজ আমি পাটনা থেকে দানাপুর— আরা— বক্‌সার হয়ে দিল্লি যাচ্ছি।

কী নিবিড় ঘন বর্ষাই না নেমেছে। আকাশ বাতাস সবই শ্যামল স্নিগ্ধ শীতল। কামরার সব শার্সি তোলা, তবু সব কিছু ঠাণ্ডা। বাইরের ভুবন ঝাপসা। দূর দিগন্তের সবুজ গ্রাম, তার উপর নীলাকাশের সুনীল মেঘ নেমে এসেছে। বৃষ্টি-কণা সারাক্ষণ তাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। কখনও দেখতে পাই, কখনও পাইনে।

ধরণী যেন সর্বাঙ্গ উন্মোচন করে নববরষণের মুক্তিস্নানে আনিদ্র আসুপ্ত হয়ে আছেন।

কী সুন্দর দৃশ্য। হয়তো তুমি একদিন দেখবে।

তোমার
আব্বু

৬

ট্রেনে-টলটলায়মান

২৫.৭.৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি যখনই গাড়িতে যাও না কেন, মোগলসরাই থেকে দু দিকে চোখ রাখবে। চুনার, বিন্ধ্যাচল অঞ্চল অপূর্ব সুন্দর।

www.pathagar.com

১৯২৬-এ প্রথম এ জায়গা দেখি।
১৯৫৫-য় আজ আবার যাচ্ছি।
সেই সৌন্দর্য।

আব্বু

৭

৩ অক্টোবর ৫৫

বাবা ফিরোজ,

আমার একটা বইয়ের নাম 'দেশে বিদেশে'। বাংলায় ইডিয়ম 'দেশ, বিদেশে'। অর্থাৎ সর্বত্র অর্থাৎ 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে'। আমি কিন্তু 'দেশে বিদেশে' শব্দার্থে লিখেছি অর্থাৎ এ বইয়েতে কিছুটা 'দেশে'র বর্ণনা পাবে যথা পেশাওয়ার ইত্যাদি আর বাকিটা 'বিদেশে'র অর্থাৎ এ স্থলে কাবুলের।

'দেশ-বিদেশের' অন্য অর্থ ধরে।

আমি যদি কখনও 'দেশ-বিদেশে' লিখি তবে তাতে যত্রতত্র সর্বত্রর বর্ণনা পাবে। সে-বই তা হলে বিয়াল্লিশ-ভলুম হবে। তার ফুরসৎ আমার নেই।

রবিঠাকুর লিখেছেন, (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ. ৩২৪) রানি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে।

তিনি 'দেশে বিদেশে' কী অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটু অনুসন্ধান করো তো।

আব্বু

পুঃ আজ আমি খুব বকবকানিতে আছি। এ চিঠির আগে আরেকটা চিঠি লেখা হয়ে গেছে।

৮

১৯.১০.৫৫

বাবা ফিরোজ,

তোমরা যখন কটকে এসেছিলে তখন আমার alsatian কুকুর 'মাস্টার'কে বড় ভালোবাসতে। বরঞ্চ বলা উচিত, মাস্টার তোমাদের অনেক বেশি ভালোবাসত। কে কতখানি কাকে ভালোবাসত সে কথা আরেকদিন হবে।

তোমার মা তখন স্থির করলেন, তোমাদের জন্য একটি কুকুর পুষবেন।

আমি যখন এবারে ঢাকায় গেলুম, তখন দেখি, ছোট্ট একটি ফুটফুটে কুকুর। কী সুন্দর। আর কী তেজ! এক লাথি মারলে সে তিন টুকরো হয়ে যাবে। অথচ আমাকে যা তাড়া লাগাল! তিন মিনিটেই কিন্তু দোস্তি হয়ে গেল যখন দেখলে, তোমরা সবাই আমার দিকে হাসি মুখে এগিয়ে আসছ।

ওর নাম কী? জাম্বু। সে কী, এক ফোঁটা পাপীর নাম জাম্বু!

তোমার মা বললেন, গ্যান্ডেরিয়ায় তোমার মাসিমার যে কুকুর আছে তার নাম জাম্বু। তুমি যখন সেখানে থাকতে তখন ওই জাম্বুর সঙ্গে তোমার খুব ভাব-সাব ছিল বলে ওকে তুমি জাম্বু বলে ডাকতে আরম্ভ করলে। বুঝলাম, তোমার বয়সে কুকুর মানেই জাম্বু।

তার সঙ্গে আমার কী বন্ধুত্বই না জমে উঠেছিল। আমি তাকে আদর করতুম, আর সে ন্যাজটি বর্মি পাখার মতো গোল করে মেলে দিয়ে ফ্যাশানেবল মেয়েদের মতো দোলাতে

www.pathagar.com

আরম্ভ করত। যখন ঘুমিয়ে থাকত তখনও মাঝে মাঝে চোখ একটুখানি খুলে দিয়ে মিটমিটিয়ে দেখত আমি তার পাশে বসে আছি তো। তোমরা দু ভায়েতে যখন তার ওপর বড্ড বেশি চোটপাট করতে তখন সে এসে আমার কাছে আশ্রয় নিত। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য নয়। আবার যেত তোমাদের কাছে। ভজু হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এসে ন্যাজে দিত টান, আর তুমি দুই হাতে তার মুখ ফাঁক করে যে রকম উপর-নিচ টানতে তা দেখে পুরাণের কোন্ এক বকাসুর-বধ না কিসের এক ছবি মনে পড়ত। জাম্বুর তখনকার অবস্থা সত্যই করুণ। মুখ দু দিকে চেরা বলে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না। তোমাদেরও ভয়-ডর নেই। বোঝো না যে-কোনও মুহূর্তে ওই একরত্তি কুকুর তোমাদের কুটি-কুটি করে দিতে পারে। কিন্তু সে নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমার 'মাস্টার' যে কি না তাগড়া 'অ্যালসেসিয়ান' তাকে নিয়েও তোমরা কটকে ওই 'অপকর্ম' করতে। সে-ও জাম্বুর মতো অকাতরে সইত।

তোমার মা লিখেছেন, সে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে পাগল হয়ে যায়। তোমাদের স্কুলের চারটি মেয়েকে কামড়েছে। তোমাদের গায়েও নাকি আঁচড় রয়েছে। তোমাদের দু ভাইকে ১০টা ১২টা injection নিতে হয়েছে। ভাবো দেকিনি, কী কাণ্ড। তোমরা দু জনাই আমারই মতো delicate— নাজুক। তোমাদের কী কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি ভাবতে ভাবতে—

(পত্র অসমাপ্ত;

৯

৩।১০।৫৬
আজ ঢাকাতে এলুম

বাবা ফিরোজ,
আজকাল আমি 'জলে-ডাঙায়' লিখছি। তার ইতিহাস তোমাকে বলি। ১৯৫৩ ইংরেজির শীতের শেষে আমি মৈমনসিং গিয়েছিলুম। তখন আমি 'অবিশ্বাস্যে'র শেষ অধ্যায়গুলো লিখছি। রোজ সকালে বারান্দায় এক কোণে বসে বই লিখি (তুমি তখন বড্ড জ্বালাতন করতে— তোমার ইচ্ছে, আমি তোমার সঙ্গে খেলাধুলা করি) আর তোমার মা আমাকে মাঝে মাঝে চা দিয়ে যান।

একদিন চুপ করে বসে আছি। তোমার মা জিগ্যেস করলেন, 'লিখছ না যে।'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য' শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বসে বসে ভাবছি অন্য কী বই আরম্ভ করি।' তোমার মা এক মুহূর্ত না ভেবেই বললেন, 'বাচ্চাদের জন্য একখানা বই লেখ।'

আমি তদ্দণ্ডেই 'জলে-ডাঙায়' লিখতে বসে গেলুম। এর কয়েকটি instalment আমি ৪৮-৪৯ সনে 'বসুমতী'তে প্রকাশ করেছিলুম বটে কিন্তু তার পর ওটার কথা ভাবিইনি। তাই নতুন উৎসাহে বইটা লিখতে আরম্ভ করলুম।

উৎসাহের কারণ :

(১) তোমার মা বলেছেন,

(২) দেখলুম, তোমার বয়স যখন ১২।১৪ হবে, তখন আমি তো এ-লোকে থাকব না; তাই তোমার জন্য তোমার ওই বয়সের উপযোগী— কিছু লিখে রেখে গেলে তুমি খুশি হবে। উপস্থিত 'জলে ডাঙায়' বসুমতীতে বেরুচ্ছে।

www.pathagar.com

আজ এখানে শেষ বর্ষা যাচ্ছে। এখানে এটাকে 'হাতিয়া' নক্ষত্রের বৃষ্টি বলে। এর পর নাকি এদেশে আর বৃষ্টি হয় না।

চওড়া বারান্দায় বসে শুনছি, ঝিল্লির ঝিলিমিলি, তার সঙ্গে ব্যাঙের 'কর্ কর্ কর্ কর্'। সামনের দেয়ালে বেড়ে ওঠা মধুমালতীলতা দুলছে, লাল-সাদায় মেশানো ফুলগুলো কাঁপছে—

দাঁড়াও, এই লতাকে যে 'মধুমালতী' বলা হয় তার কোনও হদিস নেই। কারণ এগুলো তো এসেছে রেঙ্গুন থেকে— এখনও একশো বছর হয়নি। অথচ 'মধুমালতী' প্রাচীন নাম। ইংরেজিতে একে বলে Rangoon Creepers (ইংরেজিতে 'শিউলি'কে বলে Sorrow Flowers, টগরকে বলে Twister Jasmine, বেলকে বলে wood apple, সজনেডাঁটাকে বলে Drum sticks, ঢ্যাঁড়শকে বলে Lady's fingers. এগুলো ইংলন্ডে নেই বলে কোনও ইংরেজ এগুলো বুঝবে না,— অর্থাৎ এগুলো Anglo-Indian শব্দ)। ঠিক ওই রকম মাধবী কি ফুল কেউ জানে না। গুরুদেব এক নাম-না জানা লতাকে মাধবী নাম দেন। তার পর গান রচেন, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন?' 'পারুল'ও তাই। কেউ জানে না ওটা কোন্ ফুল। শান্তিনিকেতনের কাছে যে 'পারুল বন' আছে সেটা গুরুদেবের দেওয়া নাম। এখানকার ফুল সত্যই পারুল কি না, কেউ জানে না।

ভেবেছিলুম বর্ষার মোলায়েম বর্ণনা দিয়ে তোমাকে আজ গল্প বলব। তা আর হল না। পারুল মাধবীর শব্দতত্ত্ব নিয়ে সময় কেটে গেল।

কিন্তু আজ সত্যই মেদুর সন্ধ্যা। আজ সপ্তমী। এখন আটটা বেজেছে। সপ্তমীর চাঁদ কখন ওঠে ঠিক জানিনে। বাইরে অন্ধকারটা জমাট নয়। আকাশ যেন কোনও ঘোর রঙের চশমা পরে তাকিয়ে আছে। বাতাস যেন ভিজে কাঁথা পরে আমার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। দু-এক ফোঁটা জল আমার লেখাকে চুপসে দিচ্ছে। সেক্রেটারিয়েটের ঘড়ি আটটা হাঁকছে। শামাপোকা জোরালো বাতির চতুর্দিকে ঘুরছে। ডানাগুলো আস্বচ্ছ (অস্বচ্ছ নয়), ইংরেজিতে যাকে বলে ডায়েফনাস্।

সমস্ত জীবন কাটল এই রকম একা বসে বসে।

আব্বু

॥ কনিষ্ঠ পুত্রকে লেখা পত্র ॥

১৭.১০.৫৫

বাবা ভজু,

তোমাকে নাকি ফিরোজ জিগ্যেস করল— আমি যখন ঢাকায় গিয়ে তোমাদের আদর করছিলুম— 'কবীর, তোর আব্বু কই?'

আব্বু

উপরের পত্রগুলো যখন সৈয়দ মুজতবা আলী লেখেন, তখন তাঁর পুত্রেরা নিতান্তই শিশু। এ চিঠি তারা বড় হয়ে পড়বে, সেই আশাতেই লেখক লিখেছেন। প্রতি চিঠিতেই প্রবাসী পিতার বুভুক্ষু বাৎসল্য প্রকট। ফিরোজ— জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ মুশাররফ আলীর ডাকনাম, ভজু— কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ জগলুল আলী।

www.pathagar.com

॥ শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে (জরাসন্ধ) লিখিত পত্র ॥

১

১.১.৭০

প্রিয়বরেষু,

নববর্ষে আপনার সহি-সালামতের জন্য আল্লার দরগায় দোওয়া মাঙছি। আপনার "জরিন কলম" হোক, আপনি আরও বহু বহু বৎসর ধরে বাঙালিকে আনন্দ দান করুন, এটা আসল। তৎপর যা করে আসছেন, অর্থাৎ 'অপরাধ' কী, 'অপরাধী' কারে কয়, সে-সম্বন্ধে বাঙালিকে চিন্তা করতে ও সহিষ্ণু হতে শেখান। আল্লার কসম, এগুলো আমার উপদেশ নয়। আমার হৃদয়ের কামনা, প্রার্থনা, আমি ভেবেছিলুম, আপনি আমার খোঁজ নেবেন। তা তো নিলেন না। অবশ্য আমার কসুর অধিকতর। আসলে ব্যাপারটা এই, আমার বয়স ৬৪ (জন্মাষ্টমীর সূর্যাস্তে জন্ম!) এবং তার চেয়ে বেশি অথর্ব। উৎসাহের তোড়ে যদি বা আপনাকে pin down করলুম, তার পর সেটা আর follow up করতে পারলুম না। ... ৪।১।৭০ আবার রাজশাহী যাচ্ছি, ধর্মপত্নী ও দুই সৈয়দজাদা (যথাক্রমে ১৭ এবং ১৫) সেখানে থাকেন, এটা আমার বাৎসরিক 'হজ্'।

পরশুদিন শচীনবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর অজানতে দু খানা বই চুরি করে আনি। 'ন্যায়দণ্ড' তথা 'গল্প লেখা হল না'। পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি, বড় আনন্দ পেয়েছি। সে-কথা জানাবার জন্যই এই কার্ড। শেষের বইখানা বাবাজীবনদের জন্য নিয়ে যাব, জানেন বোধহয়, আজকাল কোনও প্রকারের printed matter পাকিস্তানে নিয়ে যেতে দেয় না। ওদিকে বাবাজীবনরা আপনার, রাজশেখরবাবুর ভক্ত। 'সিব্রাম'ও ওদের ভারি পছন্দ। একদা মনে করত 'সিব্রাম' greatest writer of Bengal. সে এক মজার ব্যাপার, বড় ব্যাটা ফিরোজকে একদিন বলেছিলুম, সিব্রামকে আমি চিনি। তাচ্ছিল্যি করে ব্যাটা বললেন, 'রেখে দাও! তুমি আবার লেখক। সিব্রামদা তোমার সঙ্গে কথাই কইবে না।' আমি মনস্তাপ জানিয়ে সিব্রামকে আদ্যন্ত জানালুম। তার পর ফিরোজ ছুটিতে কলকাতা এলে তাকে সিব্রামের ওখানে নিয়ে গেলুম। সে এক দৃশ্য। সিব্রাম ফ্যালফ্যাল করে ফিরোজের দিকে তাকিয়ে, আর ফিরোজ মুগ্ধ নয়নে। সিব্রাম বেচারি ফিরোজের জন্য ফ্লুরি থেকে ফের্‌রাদ্‌জিনির কেক কিনে এনেছিল। আমিও যে খুব একটা নিরেস লেখক নই সেটা সিব্রাম একবার ফিরোজকে বোঝাতে গেলে সে with one murderous sweep of hands সেটা বন্ধ করে দিলে। ...এবারে বলুন, কোন্ সাহসে ফিরোজকে বলি, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে?

গুণমুগ্ধ
সৈ. মু. আলী

www.pathagar.com

২

Dec. 6/7/71

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদবরেষু,

আপনার ৬। ৪। ৭০-এর চিঠি আমি পাই সিলেটে। দেশে ফিরে আসা মাত্রই মোকা জুটে যায় জর্মনি যাওয়ার। তারই তদ্বির-(কে যেন বলেছেন "একদা বসুন্ধরা ছিলেন বীরভোগ্যা, এখন তদ্বিরভোগ্যা") তদারকির মধ্যিখানে— অবশ্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই— আপনার সঙ্গে দু দণ্ড রসালাপ করব তেমন কিস্মৎ আমার ছিল না। তড়িঘড়ি ফের বিদেশ।

আপনি সহৃদয়। তাই আব্দুর রহমান— সে-ও বড্ডই দরদী ছিল— আপনার হৃদয়ে সরাসরি ঢুকে গেছে। আপনার মতো কোনও সজ্জন যখনই তার প্রশংসা করেন তখনই আমার মনে বড় বেদনা জাগে, তার সম্বন্ধে তো আরও অনেক অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু আপনি কৃতী লেখক, বিলক্ষণ অবগত আছেন, কোনও চরিত্র অঙ্কনে একটা অপটিমাম মাত্রা আছে। কিংবা বলতে পারেন, আপনার ("আমার" না বলে "আপনারই" বললুম, কারণ সে ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের ডালভাত আর আপনার কাছে সে রস-প্রতিম)। আবদুর রহমান আমার কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলা। কিন্তু থাক। নিজের কথাই সাত কাহন!

বলতে ভুলে গিয়েছি, ওই তিন মাসের সফর অ্যাসন তক্‌লিফদেহ্ হয়েছিল যে মাসাধিককাল অধম দণ্ডবৎ, লাঠ্যাবৎ (বিবেকানন্দ পশ্য) হয়ে শয্যাশায়ী। নয়া-পুরনা বেবাক আলীপুর আমার কাছে বার্লিনের চেয়ে সুদূরতর। মধ্যিখানে নকশলাইট— আমার কাছে most welcome! ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব।

আমার দুই ব্যাটা ১৮ এবং ১৬ আপনার লেখার— যাকে বলে Fan--grand admirers. শুধু বড় ব্যাটা শুধোলে, "এই জরাসন্ধবাবু (আমার বাচ্চারা তাদের জননীর মতো— ['আম্মো তাই'] ঈষৎ Old-fashioned, হিন্দু নামে "বাবুটা" হরবকৎ জুড়ে দেয়) বললেন, "মার্কিন criminologist ওঁকে বললে, এ দেশে born criminal নেই, (অপরাধ নেবেন না, আমার কথাগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই; আপনার কেতাবখানাও নেই। বললে পেত্যয় যাবেন না, আপনার তাবৎ কেতাব কভু কড়ি ফেলে, কভু-বা ফোকটে যোগাড় করেছি কিন্তু ধন্যি আমার চেলারা, তেনারা পঙ্গপালের মতো আপনার বেবাক বই গিলে ফ্যালেন— except যেগুলো আমি কোনও গতিকে বাবাজি ও তাদের গর্ভধারিণীর জন্য পাচার করি; জানেন তো পাকিস্তানে আমাদের তাবৎ বই ব্যান্‌ড্!) তার অর্থটা কী?" মা কালীর দোহাই দিয়ে বলেছি, আপনি ভাববেন না, আপনার লেখাতে কোনও এমবিগিটি— ঝাপসাপারা— ছিল। আপনার রচনা limpid, sparkling, flows like oil from a bottle. আমি বললুম, "বাবাজি, যখন কলকাতা আসবে (ভারত-পাক "লড়াইয়ের" পর ওদের পক্ষে এ দেশে আসা কঠিন হয়ে গিয়েছে) তখন তোমাকে চারুবাবুর কাছে নিয়ে যাব। সেখানে মোকাবেলা করো।" "চারুবাবু! আমি বলছি জরাসন্ধের কথা।" আমি বললুম, "ওই! যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিরানব্বুই। যাহা জরাসন্ধ তাহা চারুচন্দ্র।" তখন বলে কী জানেন, "ওঁর মতো great writer তোমাকে কি তাঁর বাড়িতে ঢুকতে দেবেন? অর্থাৎ টাপেটোপে বোঝালে I am a very poor writer; great writer আপনি— আমাকে পাত্তা দেবেন কেন?

www.pathagar.com

"ন্যায়দণ্ড" কেন আপনার কুল্লে বই আমার ভালো লেগেছে, লাগে এবং লাগবে। আপনি "জনপ্রিয়" থাকুন। বিদগ্ধদের জন্য মেলা উত্তম উত্তম লেখক যথা কালিদাস, দান্তে রয়েছেন। আমি বিদগ্ধ নই। আমি (উপস্থিত আপনার এফিডেভিট মাফিক মেনে নিচ্ছি, তর্কস্থলে যে আমি বিদগ্ধ কল্‌চর্‌ড্‌, হাইব্রাও, connoisscur, gourmet, comme its fant, যাবতীয়) আপনার ভাষা ও শৈলী (language & style) অর্থাৎ form, বিষয়বস্তু (content) দুই-ই বড্ড ভালোবাসি। তদুপরি আপনি a great raconteur = recounter.

৫নং পার্ল রোড
পো. সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭

গুণমুগ্ধ
সৈয়দ মু আ—

॥ শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে লিখিত পত্র ॥

১

১২। ১২।৬৫

ভাই গজেনদা

কাল বিকেলে তোমার ১১।১২-র চিঠি পেয়েছি। (১) পারতপক্ষে P. O. Bolpur ছাড়া বাকি ঠিকানাটা আদ্যন্ত বাংলায় লিখবে। ('ডক্টর'টা কিছুদিনের জন্য নামের পূর্বে জুড়ে দিয়ো। পাড়ায় ডাকঘরে আরেকটু পরিচিত হওয়ার পর drop করবে) কারণ আমাদের পাড়ার পিয়ন অল্পই ইংরেজি জানে। প্রায়ই অন্যলোকের চিঠি পাই, (যদিও typed); তার থেকে knowledge by inference, আমার চিঠিও অন্যের বাড়ি যায়। পরস্ত্রী আমার কাছে আসুক... etc, etc, এই knowledge by inference সংস্কৃতে রসিয়ে দেওয়া আছে।

(ক) দেবদত্ত মোটা

(খ) দেবদত্তকে কেউ কখনও দিনের বেলা খেতে দেখেনি। (অতএব knowledge by inference) ;

(গ) দেবদত্ত রাত্রে খায়।

(২) অবধূতের কিছু ছাপা হলেই পাঠাবে বুঝেছি, অন্য উপদেশ পরামর্শও বুঝেছি। কিন্তু যতদিন না আসে, বলতে পার, বিষয়বস্তুটা কী? মনে হচ্ছে 'হিমালয়-ভ্রমণ'— তা ছাড়া?

(৩) 'পৌষ ফাগুনের পালা' তুমি খুব সম্ভব আমাকে এযাবত দাওনি। এবারে বিবির ওখানে তালাশ করে দেখলুম যে-কটা একবার দিয়েছিলে সেগুলো তখনই পড়া হয়ে যায়, এক 'পৌষ ফাগুন' তার সঞ্চয়নে নেই। অতএব পাঠিয়ে দিলে পড়ব নিশ্চয়ই— অবশ্য অবসরমতো দিন পনেরোর ভিতর।

(৪) Same applies to 'সোহাগপুরা'।

কিন্তু দাদা, মতামত দিতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকে। তোমার মতো কুতুবমিনারি লেখকের প্রশংসা করা বিড়ম্বনা, তোমার লেখা অপছন্দ করার অর্থ, আমার রুচির অভাব।

www.pathagar.com

এক মার্কিন নাকি লন্ডনে "Titian"-এর ছবি দেখে বউকে বলে, "Gee, I don't think I like that one" পাশে দাঁড়িয়েছিল একজন গাইড। বললে, "Sir, Titian is not being tested; your taste in being tested!"

তবেই কও, এই ডিলেমার সল্যুশন কী? By the way, before I end, যে কোনও দিন abruptly তোমাকে, ভানুকে সবাইকে চিঠি লেখা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে— আমার অনিচ্ছায়। কেন, শুধোলে উত্তর বড় দীর্ঘ হবে। তখন চটো না।

আ

নীচুপট্টি
পো. বোলপুর
বীরভূম।

২

ভাই গজেনদা,

তোমার বই পড়ছিলুম। বহুকাল পূর্বে (১৯২১) দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বড়বাবু' আমাকে বলেন, 'কথাটা "কষ্টে সৃষ্টে" নয়; হবে "কষ্টে শ্রেষ্ঠে"। তিনি কী কী যুক্তি দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই। আমার মনে হয় 'কষ্টে সৃষ্ট' না হয় বোঝা গেল, কিন্তু 'কষ্টে সৃষ্টে'র 'এ'কারটা এল কোত্থেকে? তদুপরি by itself 'কষ্টে সৃষ্টে' ঠিক মানে কী ধরে? আমরা আজকাল তো বুঝি 'অতিকষ্টে'। এবং 'অতিকষ্টে' সক্ষম হয়েছি অর্থাৎ 'সৃষ্টি' করেছি। তা হলে তো, 'অতি কষ্টে সৃষ্টে কাজটা করতে পেরেছি' অর্থ দাঁড়ায়, 'অতি কষ্টে সৃষ্ট সৃষ্টি করেছি। ডবল ডবল পুনরাবৃত্তি। অথচ 'কষ্টে শ্রেষ্ঠে', 'সুখে দুঃখে', 'হাসি কান্নায়', 'তকলিফে বেতকলিফে' কাজটা সেরেছি— এটাই তো ভালো।

তাই তোমার বইয়ের (পৌষ-ফাগুনের পালা) p. 524, line4-এ গাঁইয়া উচ্চারণে 'কষ্টসৃষ্ট' নতুন করে প্রশ্নটা মনে তুলল।

তুমি এসব শব্দ সমাস নিয়ে মাথা ঘামাও, তাই আরেকটা বলি : 'চুল চেরা' বোধহয় আসলে ছিল 'চুন্-চেরা'— ফারসিতে আছে— ওই একার্থে। 'কখন'? 'কেন' (চেরা)? বলে অযথা সূক্ষ্মতর্ক করা। ন'টা কি ভুলে 'ল' হয়ে গিয়েছে। অবশ্য 'চুলচেরা' by itself সুন্দর image মনের চোখে আনে— কিন্তু সংস্কৃতাদিতে এর নজির নেই!

Happy New Year

আ ॥

পুনঃ 'ব্যবহারিক (না ব্যাবহারিক) শব্দকোষ' সম্বন্ধে আমার সতর্কবাণী পেয়েছ? উত্তর কই?

॥ শ্রীনারায়ণ সান্যালকে লিখিত পত্র ॥

৪ঠা ভাদ্র ১৩৭৩

প্রিয়বরেষু,

আজকের ভাষায় যাকে 'রসোত্তীর্ণ', আপনার 'সত্যকাম' তাই হয়েছে কি না সে বিচার না করে প্রথমেই বলি, এই obscurantism ও revivalism-এর যুগে আপনি এ-পুস্তক লিখে বাঙালি হিন্দুর চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগাবার চেষ্টা করেছেন। সে যদি— অঞ্জন মাখতে না চায়—

www.pathagar.com

আশা করি ইতোমধ্যে ভট্টপল্লি তথা নবদ্বীপে স্মার্ত সমাজ par excellence আপনাকে হুনো দেননি— তবে সে-দোষ আপনার নয়। এখনও যে দেশে বারেন্দ্র-রাঢ়ী-বৈদিকে সহজে বিয়ে হয় না; পূর্ববঙ্গের শরণাগত গুহ রাঢ়ী ঘোষ-বোস দ্বারা কুলীন বলে স্বীকৃত হয় না, কায়েত মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বামুনবাড়ি গেলে— এবং এ ব্যাটাদের তিন পুরুষের কেউ সন্ধ্যাহ্নিক করেনি, কিঞ্চিৎ এ-পুরুষ পঞ্চমকারে আকণ্ঠ নিমগ্ন— খড়মপেটা হওয়ার সম্ভাবনা, বিয়ের মরসুমে যে-সব নিমন্ত্রণপত্র আসে সেগুলো আমি খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখি, কটা অসবর্ণ বিয়ে হল তার শুমারি, % রাখার চেষ্টা করি। আমার এক অনুজপ্রতিম বারেন্দ্র (আপনারই মতো সান্ন্যাল) মুখুয্যে 'শাদি' করেছে। সে-দেশে সত্যকামের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রতি ধর্মভীরু দ্বিজের কর্তব্য। আপনি সেই কর্মটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, শতংজীব; সহস্রজীব, শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন।

আপনি আদৌ ভাববেন না, আমি কৌলিক ঐতিহ্য তথা আচার-অনুষ্ঠান বাবদে চার্বাক-পন্থী। কিন্তু সে কাহিনী এখানে তুলব না।

সত্যকাম তথা অন্য বহুবিধ কারণে যেসব ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের উপনয়ন হয়নি, (অর্থাৎ, বিশেষ করে, যে-সব অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে তুলতে হবে। তাদের নিয়ে 'ব্রাত্য'— সে তো আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন। এক জর্মন পণ্ডিত ঝাড়া বিশটি বছর খেটে (কারণ ব্রাত্যদের সম্বন্ধে তথ্য হেথা-হোথা সর্বত্র ছড়ানো) পঁচিশ পাতার কেঁদো কেতাব লেখেন, নাম স্রেফ ব্রাত্য। আমার বড়ই বাসনা ছিল, কেউ বইখানার অনুবাদ করে। হিন্দু উপকৃত হত। দেখত সে একদা কতখানি dynamic, catholic ছিল, শুধু যুক্তি দিয়ে বিচার করত না (আপনার কথায় 'যে সত্যের পিছনে, শিব সুন্দর নেই'— সেটা বেকার) হৃদয়ের logic-ও শুনত, বলত : if tradition (স্মৃতি) help us, good! If not, without it and so much the better!' আর আজ!

আপনি সত্যকামের কাহিনী বললেন (আজকাল দিনের লোক উপনিষদ মাথায় থাকুন, রবিঠাকুরও পড়ে না— তাই 'উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন' লাইনগুলো কেতাবের পয়লা বা আখেরে দিলে ভালো করতেন, মায় উপন্যাসটির নাম), রামমোহনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, agnostic বিদ্যেসাগরও শাস্ত্রের দোহাই দেন। তখন বঙ্কিম (for whose religious views I have little understanding, except that কৃষ্ণচরিত্র which is a mervellously written book with a very wrong thesis to prove!) তাঁকে লেখেন, আপনি শাস্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছেন কেন? শাস্ত্র কেউ মানে না। মানে লোকাচার। আপনি তাই Humanitarian grounds-এর ওপর নির্ভর করুন।' বিদ্যাসাগর খুবসম্ভব কোনও উত্তর দেননি। তিনি জানতেন, শাস্ত্রের বরাত দিলে তবু-বা কিছু হতে পারে। Rational, humanitarian consideration have precious little chance.

অর্থাৎ Voltaire-এর যুগ এই পোড়া বাঙলা দেশে এখনও আসেনি। আমার জানা মতে ১নং চৈতন্য, ২নং বিবেকানন্দ— সাহস যা দেখাবার, to rebel against শাস্ত্র, এঁরাই কিছুটা দেখিয়েছেন।

মুসলমানের ভিতর, গোড়ার দিকে, কিছুটা দেখান আকরম খাঁ। মোল্লাদের হুনো খেয়ে সে-বই আর reprint করেননি। নজরুল ইসলাম গোড়ায় বিদ্রোহী, শেষের দিকে very traditionalist!

www.pathagar.com

এবারে আপনি একটু Voltaire পড়ুন। বিশেষ করে CANDID.

আপনার গল্পের প্লটটি যদ্যপি উপনিষদ থেকে নেওয়া তথাপি ইটিকে সম্পূর্ণ অভিনব না বললে পাপ হবে। Very dexterously managed.

আপনার গল্প বলার ধরনটি চমৎকার। আপনি excellent racounteur.

তবে এ পুস্তকে romantic রাজবাড়ির রোমাঞ্চকর ঘটনায় হঠাৎ ছেদ টেনে স্মার্ত নৈয়ায়িক পরিবারের দীর্ঘ কাহিনী সাধারণ পাঠককে খুশি করবে না। সে ওটা skip করবে। আম্মো করেছিলুম। তবে— অন্তত আমার কাছে— স্মার্ত যে কী করে নৈয়ায়িক হয়— Contradiction মনে হয়— সেটা দেখবার জন্য ফিরে এসে সেটি পড়ি। মন দিয়ে। কারণ এতে আমার personal interest আছে।

আমার যদ্দুর জানা, বৈদেশিক বৌদ্ধ জৈন চার্বাকপন্থীদের বাদ দিন; এক বেদান্ত ছাড়া আমাদের সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা সবটাই ঈশ্বরকে ignore করে (ন্যায়), 'প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ' (সাংখ্য), বা God-কে special position দেয় না। ন্যায়ের ভিত সাংখ্য ও বৈশেষিকের উপর। আর স্মৃতি তো দর্শন নয়— নিছক theology (মাকড় মারলে ধোকড় হয়।) প্রকৃত নৈয়ায়িক স্মৃতিকে বিলকুল উপেক্ষা করে। কারণ স্মৃতি নির্ভর করে entirely on 'আপ্তবাক্য' authority-র ডাণ্ডা। ন্যায়ের প্রথম starting point (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (inference e. g. ক) দেবদত্ত মোটা খ) দেবদত্ত দিনের বেলা খায়— গ) অতএব 'অনুমান' (I infer) দেবদত্ত রাত্রেও খায়, (৩) উপমান 'শব্দ' (credible testimony, যেটাকে 'শাস্ত্র' 'আপ্তবাক্য' 'সংহিতা' বলতে পারেন, এবং সেটা স্মৃতির the starting point. ('কস্যচিৎ ভাইপোস্য' বেনামিতে বিদ্যেসাগরের একটি humorous লেখাতে এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাবেন। সেখানে বড় ভাই নৈয়ায়িক, ছোট ভাই স্মার্ত। দু জনাকে নিয়ে রগড়।) ॥ হ্যাঁ, আলবৎ, হিন্দুসমাজে বাস করতে হলে লোকাচার মানতে হয় তাই পাঁড় নৈয়ায়িকও অসবর্ণে বিয়ে দেয় না, সগোত্র বিয়ে করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পট্টন্তরী তথা লোকাচারের অন্যান্য গোঁড়ামির Care করে না, অর্থাৎ সমাজপতি স্মার্তরা যতক্ষণ না খড়্গহস্ত হয়ে তার হুঁকো জল বন্ধ করার ভয় না দেখান। এঁরাই হচ্ছে typical নৈয়ায়িক। আপনি বলবেন, আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন, নৈয়ায়িক পাঁড় স্মার্তের মতো পট্টন্তরী নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে। আমি বলব, 'আম্মো দেখেছি, মেড়ো লন্ডনের খানদানি Dorchester হোটেলে হাত দিয়ে খানা খেয়ে টেবিলক্লথে হাত মুচছে।' কিন্তু Dorchester হোটেলের বর্ণনাতে সেটা typical নয়, সেটা accidental— যেমন, প্রেমের trangle সৃষ্টি করে, সমস্যা সমাধান করতে না পেরে লেখক একজনকে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মেরে ফেললেন। ব্যস, সমস্যার সমাধান ভেল! আমি বললুম, 'এটা আবার কী?' লেখক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কেন, মানুষ মোটর দুর্ঘটনায় মরে না?' তুলনাটা টায়টায় মিলল না; মোদ্দা— reality is no criterion for artistic achievement ('রসোত্তীর্ণ হওয়া')।

আচার্য গোষ্ঠীকে নবন্যায়ের পণ্ডিত না করে খাঁটি স্মার্ত করলে এ ঝামেলা হত না। আচার্য গৌতম তো নৈয়ায়িক ছিলেন না— অবশ্য ন্যায়শাস্ত্রের তখন জন্মই হয়নি।

তা সে থাক! এটা অত্যন্ত বাহ্য। কেন যে আমি উল্লেখ করলুম জানিনে, বোধহয় 'বিদ্যে' ফলাবার জন্য। কিংবা আপন নৈয়ায়িক গুরুর স্মরণে। পথ দিয়ে যেতে যতে সরস্বতী পুজোর

www.pathagar.com

বহ্যাড়ম্বর তথা বাহ্যাড়ম্বর দেখে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাকে বলেন, 'বর্বর, অনার্য, দ্রাবিড়সম্ভূত'। আমি বললুম, 'স্বয়ং শঙ্করও তো সাকারকে দ্বিতীয়স্থান দিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'তাঁর গুরু ছিল বৌদ্ধ আর সে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।' আমি বললুম, 'তাতে তো আপনার খুশি হওয়ার কথা। ভগবন! আপনিও ভগবানের থোড়াই পরোয়া করেন— বৌদ্ধদের মতো।' তিনি বললেন, 'ওরে মূর্খ! তোর কিচ্ছু হবে না। তোর শাস্ত্রচর্চা বন্ধ্যা-গমন, ন দেবায় ন ধর্মায়।' সেই দিনই প্রথম শিখি, এস্থলে 'ন ধর্মায়' বৌদ্ধধর্মকে refer করে, অর্থাৎ আমার শাস্ত্রচর্চা (হিন্দু) 'দেবায়' কাজে লাগবে না, (বৌদ্ধ) 'ধর্মায়'ও না।

আবার বলি এটা অত্যন্ত বাহ্য।

আলী

নীচু পট্টি,
বোলপুর

॥ শ্রীযুক্ত বোপদেব শর্মাকে (জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) লিখিত পত্র ॥

১

৭।৯।৬২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'যে কোন নিঃশ্বাসে' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আপনি লিখেছেন, 'যদি অর্থের সন্ধান কর, রসের সন্ধান কর, আওয়াজের অন্তরালে কোনও ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সন্ধান কর, তা হলেই তুমি প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্টাইন প্রমাণিত হয়ে যাবে।'

অতিশয় খাঁটি কথা।

কিছুকাল পূর্বে আমি একখানা বিদেশি জর্নলে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়ি। নাম ছিল, বোধহয়, Lady Chatterly's Lovers. Lady Chatterly অশ্লীল কি না সেই সম্পর্কে যে মোকদ্দমা হয় এবং তার পটভূমি নিয়ে তথ্যবহুল, ধীর, সংযত প্রবন্ধটি।

তাতে আছে, আদালত উকিল মক্কেল তাবৎ সজ্জন যখন শ্লীল-অশ্লীলে পার্থক্য করার মতো সংজ্ঞা পেলেন না তখন তাঁরা বলেন, "শুধোও সাহিত্যিকদের, তারা কী বলে"।

তার পর লেখক বলেছেন, 'সাহিত্যিকদের বেশিরভাগই সরল চিত্তে স্বীকার করলেন সেরকম কোনও dividing line-এর সংজ্ঞা তাঁরা দিতে অক্ষম।

তার পর লেখক বলেছেন, 'কিন্তু একদল ঝানু সাহিত্যিক আছেন তাঁরা জানেন, অশ্লীলতম রচনাকেও (যেটা নিয়ে কারও মনে কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয়) যদি তাঁরা ঘুণাক্ষরে অশ্লীল বলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক চেঁচিয়ে উঠবে— (এবারে আপনার ভাষাতেই বলি, তুমি 'প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্টাইন'।— এটা কিন্তু মিনিমামেস্ট!) "এরা— ফ্যাসিস্ট, হিটলেরাইট, ইমপেরিয়ালিস্ট, এবং (হালের বুলি) কলনিয়ালিস্ট"। এই দলের পিছনে আছেন কিছু কম্যুনিস্ট এবং কিছু অন্তত আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক (এবং বিশেষ করে পর্নাগ্রাফির) সম্প্রদায়।

আঁদ্রে জিদ একবার কম্যুনিস্টদের সমালোচনা করে বেধড়ক মার খান। উপরে বর্ণিত 'ঝানু সাহিত্যিক'রা সেই তত্ত্বটি জানেন, এবং 'ফ্যাসিস্ট' নামে পরিচিত হতে চান না।

www.pathagar.com

Obscurantism-এর বিরুদ্ধে লেখা দুটি প্রবন্ধ আমার জীবনকে richer করেছে। একটি আনাতোল ফ্রাঁসের Life and Letters-এ আছে, দ্বিতীয়টি Edmand Wilson-এর লেখা এলিয়টের সমালোচনা। ফ্রাঁসের সেই আপ্তবাক্য পুনরায় স্মরণ করি : I have passed the age when one loves what one does not understand— I love light. নমস্কার জানবেন।

কাগজ খতম।

গুণমুগ্ধ
সৈ. মু. আলী

শান্তিনিকেতন।

পু. বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন, to imitate-এর বাংলা 'অনুকরণ, to ape-এর বাংলা 'হনুকরণ'। এ দেশে বিলিতির 'হনুকরণ' হচ্ছে।

২

২৩।১০।৬২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের সর্বশেষে আছে, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠা কি এতই ঠুনকো জিনিস যে পাঁচজন অর্বাচীনের হাততালি না পেলেই তার বনেদ ধ্বসে যাবে।'

এতে প্রথম ইঙ্গিত আছে, আমি সাহিত্যিক (এটা উপস্থিত আমি মেনে নিলুম), (২) আমার প্রতিষ্ঠা আছে, (৩) সেটা বাঁচাবার জন্যে আমি অর্বাচীনদের হাততালি খুঁজে বেড়াই। এই তিন নম্বরের ইঙ্গিতটা হে সৌম্য, ভালো করে না জেনে কি করা উচিত?

এখন বক্তব্য, আপনি চান, সাহিত্যিকেরা স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে অধুনা সর্বসাহিত্যে যে Obscurantism চলছে সেটা সাহিত্য নয়, ও পথে চললে সাহিত্যের সর্বনাশ হবে। এই তো? আশা করি আমি আপনার মুখে এমন কোনও কথা চাপাইনি যেটা আপনার বক্তব্য নয়।

অর্থাৎ আপনি চান, সাহিত্যিকরাই সাহিত্যের গতি নির্দেশ করুন।

তা হলে নিবেদন, সাহিত্যে থাকে রস, এবং সেই গোড়ার জিনিস নিয়ে আলোচনা করেন, আলঙ্কারিকেরা। তাঁরা বলে দেন কোন্‌টা উত্তম রস, উত্তম সাহিত্য, আর কোন্‌টাই-বা অধম।

আলঙ্কারিক ভরত থেকে আরম্ভ করে অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি— এঁরা কি সাহিত্যিক ছিলেন? এঁরা কি কাব্য, নাট্য, আখ্যান, উপাখ্যান, মহাকাব্য ইত্যাদি প্রথম লিখে নিয়ে নাম করে ফেলে তবে সাহিত্যের গতি নির্দেশে হাটে নেমেছিলেন? আমার যতদূর জানা, এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। (Creative মাল)। অবশ্য এঁদের কারও কারও লেখা সরস, কিন্তু তবু তাঁদের সাহিত্যিক বলি না, বলি আলঙ্কারিক। সুরেশ সমাজপতি, অতুল গুপ্ত এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি (Creative সাহিত্য) করেছেন বলে জানিনে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যগুলোর ইতিহাস তথা ইউরোপীয় আলঙ্কারিকদের কথা আমি বড় একটা জানিনে (আমি সমস্ত জীবন ধর্ম, দর্শন, শব্দতত্ত্ব নিয়ে কাটিয়েছি)। কিন্তু আপনি

www.pathagar.com

বলতে পারবেন, প্লেটো থেকে আরম্ভ করে ক্রোচে পর্যন্ত, এঁদের ক-জন Creative literature সৃষ্টি করে, সাহিত্যিক নামে প্রখ্যাত হওয়ার পর, 'অর্বাচীনদের হাততালি' উপেক্ষা করে সাহিত্যের গতি নির্দেশ করে গেছেন।

আব্দুল করীম খান, ফৈয়াজ খান ইত্যাদি বড় বড় গাওয়াইরা যে ফিল্‌মি গানার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন নি, কিংবা বক্তৃতার কেম্পেন করেননি সে কি 'অর্বাচীনের হাততালি' থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে? পাঠান মোগল আমলেও দেখতে পাই, চিত্র-স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাদের ইতিহাস-লেখকরা, এঁরা এমারৎ বানাতেন না।

মাইকেল আঞ্জেলো, রাফায়েল ইত্যাদি বড় বড় ভাস্কর চিত্রকারদের ক-জন বাতলে দিয়েছেন ওইসব কলা কোন্ পথ দিয়ে যাবে। সব যুগেই নিকৃষ্ট আর্ট, নিকৃষ্ট movement in art থাকে। এঁরা কি তখন পোলেমিক লিখেছিলেন।

এবারে একটি অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ দেই— পাচক এবং ভোজনরসিক কি একই ব্যক্তি? আমার অগ্রজের মতো ভোজনরসিক (তিনি খান অতি অল্প, বলেন, 'আমি পেটুক নই'— এটা অবশ্য এস্থলে অবান্তর) আমি ত্রিজগতে দেখিনি। তিনি ডিম সেদ্ধ করতেও জানেন না। আমার মা অতিশয় নিপুণা পাচিকা ছিলেন। হালের চপ-কাটলিস, পুডিং-মাডিঙের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি।

বস্তুত এ সম্বন্ধে আমার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, সাহিত্যের তথা লিটারারি ক্রিটিসিজম এবং এসথেটিকসের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। আবছা আবছা মনে হয়; যারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাঁরা জানা-অজানাতে আপন আপন 'স্কুলে'র সমর্থন করে সাহিত্যের গতি নির্দেশ করতে বাধ্য, অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, কিন্তু সাহিত্যরস আস্বাদন করেন তাঁরাই এ-কাজের উপযুক্ত— আমার আবছা-আবছা বিশ্বাস ইতিহাসের হেথা-হোথা ব্যত্যয় থাকলেও প্রধানত সাহিত্য-রসিকরাই সাহিত্যের গতি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন (তাতে কোনও ফল হয়েছে কি না তা-ও জানিনে)। আপনি একটু চিন্তা করে জানাবেন। ইতোমধ্যে অতিশয় অনিচ্ছায় সবিনয় নিবেদন, আল্লা সামনে, আমি সস্তা-দামি কোনও হাততালির জন্য কখনও লিখিনি। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য, আমি পণ্ডিতজনদের জন্য লিখেছি অতি অল্পই। প্রধানত লিখেছি সেই ম্যান ইন দি স্ট্রিটের জন্য, যে হয়তো সামান্য ইংরেজি জানে, বাংলাটা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং সিরিয়স বই পড়তে নারাজ। হঠাৎ মনে পড়ল দশম শতাব্দীর কবি আব্দুর রহমান (অদহমান) তাঁর কাব্য, অপভ্রংশে লেখা *সন্দেশ রাসকে* বলেছেন, 'পণ্ডিতজন কুকবিতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আর অজ্ঞজন অজ্ঞতাবশত কবিতায় প্রবেশ করে না। এজন্য যে মূর্খ নয়, এবং পণ্ডিতও নয়, অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণির, আমার এ কাব্য তার জন্য।'

আপনি যদি এ কাব্যখানা পড়ে না থাকেন তবে দয়া করে জোগাড় করে নেবেন। Quite apart from our present discussion. এরকম উত্তম কাব্য আমি জীবনে কমই পড়েছি। আব্দুর রহমান-কৃত *সন্দেশ রাসক* edited by হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দি গ্রহরত্নাকর লিমিটেড, হীরাবাগ, বোম্বাই-৪)।

এবং finally বলুন তো, আমার নিজের প্রতি আমার যা কর্তব্য আছে সেটা পোলেমিকে ঢুকে সফল হবে, না, যেটুকু সময় পাই সেটা সৃষ্টিকর্মে (তা সে ভালো হোক মন্দ হোক)

www.pathagar.com

লাগালে। আমাকে আক্রমণ করে এ যাবৎ যেসব incompetent লেখা বেরিয়েছে আমি তো তার একটারও উত্তর দিইনি। তাতে সময় নষ্ট, শক্তিক্ষয় এবং সব বেফায়দা।

আমিও শারীরিক কুশলে নেই। বিশ্বভারতীতে চাকরি নিয়ে আমার সর্বনাশ হয়েছে। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

গুণমুগ্ধ
সৈয়দ মুজতবা আলী

শান্তিনিকেতন

॥ প্রাণতোষ ঘটককে লিখিত পত্র ॥

Indian Council for Cultural Relations
২১ সেপ্টেম্বর ৫০

প্রিয়বারেষু,

আসবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি— তখন কলকাতায় বড্ড ডামা-ডোল। এমনকি হাওড়া হয়েও আসিনি, এসেছিলুম দমদম হয়ে অ্যারোপ্লেনে।

এসে অবধি প্রায়ই ভেবেছি আপনাকে লিখি কিন্তু গোড়ার দিকে কাজে ব্যস্ত ছিলুম এবং শেষের দিকে দিল্লির বাতাবরণের চাপে এমনি নির্জীব হয়ে পড়ি যে আর কোনও কাজে মন যায়নি— সামান্যতম চিঠি লেখাতে পর্যন্ত না।

মৌলানা সাহেব আমাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে আসেন উপরের প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারিরূপে। আমার অপরাধ আমি আরবি, ফারসি এবং ফরাসি জানি। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান (এবং বর্তমানে একমাত্র) কর্ম হচ্ছে আরবি-ফারসি-তুর্কি-ভাষী মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র স্থাপনা করা। দিল্লির পররাষ্ট্র বিভাগ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞতাবশত এ-কর্মটি করতে পারেননি বলে মৌলানা সাহেবের শরণাপন্ন হন। মৌলানা সাহেবের জন্ম মক্কায়, পড়াশোনা করেন অজহরে কাইরোতে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব ভাষাই জানেন এবং অতি উত্তম আরবি লিখতে পারেন।

উপস্থিত আমরা একখানা আরবি ত্রৈমাসিক চালাচ্ছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ করে মিশর এবং ইরাকের কৌতূহলের অন্ত নেই— আমরা সেই কৌতূহলের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের সনাতন বাণী এবং পরবর্তী যুগের কৃষ্টি সামঞ্জস্য এবং বর্তমান যুগের গান্ধী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্মুখে পরিবেশন করবার চেষ্টা করছি। সাধারণের মনোরঞ্জন করবার জন্য *পঞ্চতন্ত্র* অনুবাদ করছি (*পঞ্চতন্ত্রের* কিয়দংশ একাদশ শতাব্দীতে 'কালিয়া দিমনি' নামে আরবিতে ও 'ইয়ার-ই-দানিশ' নামে ফারসিতে অনূদিত হয় এবং সেই সময় থেকে এই বই মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব্য-রজনী'র মতো জনপ্রিয় হয়ে আছে)।

তুর্কিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক আছেন, আমরা ইরানে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক পাঠিয়েছি। কাইরো, বাইরুৎ, দমস্কস, বাগদাদেও পাঠাবার বাসনা রাখি।

তা ছাড়া ছাত্র-পাঠানো, বিদেশি ছাত্রের আমন্ত্রণ, ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ, কলা-নিদর্শনের ফিল্‌ম ও ল্যান্টার্ন-স্লাইড, সঙ্গীতের রেকর্ড, বেতার-যোগে যোগাযোগ

www.pathagar.com

স্থাপনা-এসব বিস্তর কাজ সামনে পড়ে আছে। ভারতবর্ষের মৌলবি-মাওলানারা আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন,— পূর্বেই বলেছি, বিদেশ থেকেও কৌতূহলের উৎসাহ পেয়েছি।

আসছে বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগ খোলা হবে। তখন কাজ হবে, সিংহল, বর্মা, মালয়, থাই এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা। তার পর ক্রমে ক্রমে চীন-জাপান, পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকা।

ঈষৎ অবান্তর, তবু বলি— ইংলন্ডে কোনও বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, গাঁধী জন্মাননি তবু British Council for Cultural Relations প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আর আমাদের কর্তারা উপস্থিত একলক্ষ টাকা খরচ করছেন। ওদিকে ইংরেজ দুশো বছর ধরে বিদেশে আমাদের মুখে বিস্তর কলঙ্কপ্রলেপ প্রাণপণ 'প্রেমসে' লেপেছে— তার বিরুদ্ধে লড়তে হলে কত টাকার প্রয়োজন বিবেচনা করুন।

যাক্— আপনাকে আর পাঁচালী শোনাব না— পুজোর হিড়িকে নিশ্চয়ই বড্ড ব্যস্ত আছেন।

তবু দিনকাল কী রকম কাটছে জানাবেন। আমি মাসিক দৈনিক বসুমতী বহুকাল হল দেখিনি— বাংলা বলতে এখানে 'দেশ' 'আনন্দবাজার' আর 'সত্যযুগে'র সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝলকের তরে দর্শন হয়। 'আনন্দবাজার' ইত্যাদি দৈনিক হাওয়ায় আসে এবং এখানে অপরাহ্ণ তিনটের সময় বিলি হয়।

এখানে বাসা পেয়েছি Constitution House-এ। পার্লামেন্টের মহামান্যবর সদস্যরা এখানে সেশনের সময় বাস করেন। এঁরা M.P.; কেউ বলে 'মহাপুরুষ', কেউ বলে 'মহাপাপী', কেউ-বা বলে 'মহা-পাষণ্ড'। খোদায় মালুম, কোন্‌টা ঠিক।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী

102 Constitution House
New Delhi-1

২

সদন্তঃকরণেষু,

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আপনি জানেন। কিন্তু উপস্থিত শোকাতুর হয়ে আছেন বলে নিবেদন করছি—

অশৌচ ও শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থার গূঢ় অর্থ অশৌচের ক-দিন শোক করার পর, শ্রাদ্ধ-শান্তি করে পুনরায়, সাধারণ্যের মধ্যে আপন স্থান গ্রহণ করবে। শোকের অন্ত নেই, তাই পাছে মানুষ ক্রমাগত শোক করে করে তার কর্তব্য অবহেলা করে তাই শাস্ত্রকার ক-দিন পর দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের অর্থাৎ তার জ্ঞান আছে বলে আশা করা গিয়েছে, সে অল্পদিনেই মন বেঁধে কর্তব্য-কর্মে ফিরে যেতে পারবে— তাই তার অশৌচ (period of mourning) সবচেয়ে কম। পাছে না জেনে কেউ তাকে কোনও প্রকারের পীড়া দেয় তাই ওই সময়ে শোকাতুরকে বিশেষ বেশ পরতে হয়— ইংরেজ যে রকম কালো পোশাক পরে, কিংবা বাহুতে কালো পট্টি বাঁধে।

www.pathagar.com

অতএব, এখন কাজকর্মে মন দিন। কর্তব্য কঠোরতর হল, সাহায্য কমে গেল। কিন্তু দয়াময় চরম সহায়।

আমি কর্মে উপস্থিত থাকার জন্য বৃহস্পতিবার কলকাতা আসার ব্যবস্থা করেছিলুম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় দাঁত নিয়ে শয্যাশায়ী হলুম। কাল শেষ injection নিয়েছি। তবে আশা করি শীঘ্রই দেখা হবে।

আপনার

সৈয়দ

শান্তিনিকেতন

(৩)

২১।২।৫৭

প্রিয়বরেষু,

আপনি-আমি একই সময়ে চিঠি লিখেছি; আশা করি আমারটা পেয়েছেন। সেটাতে বসুমতীতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বাসনা রাখি তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ছিল।

লোহার ব্যবসাতে আপনাকে একদিন যেতে হবে সে-কথা আমি জানতুম কিন্তু এত শীঘ্র, সেটা ভাবিনি। এতে আপনি বিচলিত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ যদি পাট্টা কবুলিয়ৎ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়লা-বেলচা নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে থাকতে পারেন তবে আমরাই-বা এত নিরাশ হব কেন? তবে আপনার এই ব্যবসা থেকে একদিন বেরুনো আপনার পক্ষে হয়তো কঠিন হতে পারে। ভীষ্মদেব শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি বৃক্ষের উচ্চ শাখাতে আরোহণ করেছে তাকে অহরহ জাগ্রত থাকতে হয়। কাবুলিরা বলে; এ যেন সিংহের পিঠে চড়ার মতো। ঘুমাবার উপায় নেই। পড়ে গেলেই সিংহ খেয়ে ফেলবে। আমাদের গ্রাম্য কবিও বলেছেন,

> এমন অনেক বন্ধু আছে, আশা গাছে দেয় রে তুলে,
> ভালবেসে নামায় এসে এমন বন্ধু ক'জন মেলে?

কিন্তু জগদ্বন্ধু তো আছেন।

বসুমতীর জন্য হয়তো সুদক্ষ একজন কর্মচারীর প্রয়োজন হবে। তৈরি মাল নয়। খানিকটা কাঁচা। যে আপনার নির্দেশ নেবার মতো খানিকটা তালিম পেয়েছে কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। এখন থেকেই এবিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা করে এদিক-ওদিক নজর ফেলবেন। সময় এলে আমিও দু-একজনের নাম উল্লেখ করব।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এইবারে নিবেদন করি।

অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে খালাস পেয়ে উত্তরপাড়াতে বলেছিলেন, বিপ্লব কার্যে যুক্ত থাকার সময় প্রায়ই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতেন, দেশকে তিনি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর যেন সুস্পষ্ট ধারণা নেই— পদাতিক নাই-বা জানল তার লক্ষ্য কোথায়, কিন্তু সেনাপতিকে সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হতে হয়। অরবিন্দ তার পর বলেন, কিন্তু কাজের চাপে নির্জনে গিয়ে সে-বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ তিনি পাননি। তাই তিনি বাঙলার

জনসাধারণ এবং কর্মীদের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য অনুপস্থিতি কামনা করেছিলেন। এ-সব খুব সম্ভব আপনার জানা কথা, এবং এটাও নিশ্চয় জানেন, তার পর চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরি চলে যান।

লোহাতে ঢুকে আপনাকেও পরিষ্কার জানতে হবে লক্ষ্য আপনার কী। এখন ব্যবসাটির বিস্তৃতি ও পরিমাণ আপনি চিনে নেবেন। পরে কিন্তু আপনাকে একদিন নির্জনে গিয়ে চিন্তা করতে হবে আপনার লক্ষ্য কী, অর্থাৎ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় কী প্রকারে, কোন্ দিকে চললে মারের হাত থেকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত হওয়া যাবে। কিছুদিন পর কিয়ৎকালের জন্য এই নির্জনের সাধনাটি আপনি অবহেলা করবেন না। আমি আপনাকে কী উপদেশ দেব, কিন্তু আমার যদি দেবার মতো কিছু থাকে তবে এই একটিমাত্র উপদেশ।

'বসুমতী'তে প্রকাশিত নামের তালিকাতে আমার নাম দেবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমার সঙ্গে আপনার ঈশ্বর পিতৃদেবের কোনও লৌকিকতার সম্পর্ক ছিল না। তবে বাদ দিলেও দুশ্চিন্তা হত— আপনারা আমার মনের খবর পেয়েছেন কি না তাই ভেবে।

ওই সময়টা আমি দৈঃ এবং মাঃ উভয় বসুমতীর প্রত্যেকটির ছত্র পড়েছি। 'যুগান্তর' এবং 'স্টেটসম্যান'ও। আপনারা শোকাতুর ছিলেন বলে, কোনও জায়গাতেই পিতৃদেবের কোনও পাকা জীবনী বেরোয়নি। তার জন্য মনে মনে ব্যবস্থা করবেন। ইতোমধ্যে তাবৎ কাগজের কাটিং একটা জায়গায় রাখবেন। আমি আসছে বছর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখব। (আমার প্রথম ইচ্ছে হয়েছিল, শ্রাদ্ধের দিনই লেখাটি প্রকাশ করার, কিন্তু মন তখন শোকাতুর ছিল, দেহের পীড়াও ছিল— লেখাতে সংযম থাকত না, এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঁচজন অজ্ঞ বলে ভুল বুঝত)। ইতোমধ্যে কলকাতায় এলে কাগজপত্র নিজেই দেখে নেব। নতুবা সময় এলে আপনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য স্মরণ করিয়ে দেব।

আজ এখানে শেষ করি।

আপনার ভ্রাতা এবং ভগ্নীদের আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাবেন।

"এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্রবচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চলে;
পুত্রে পুত্রে মাতা-দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী-পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর;
ভায়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা হোক্ আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।"

— অথর্ববেদ

শান্তিনিকেতন
মুজতবা আলী

॥ শ্রীঅমলেন্দু সেনকে লিখিত পত্র ॥
(১৪৯/এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫)

১

২ জুলাই, ৫৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি শব্দতাত্ত্বিক নই, কাজেই আমার সাহায্য নিয়ে অভিধান নির্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। বিশেষত আমার কাছে ভালো অভিধান (আরবি, ফারসি, তুর্কি ভাষায়) নেই যে সেগুলো দেখে ত্রুটিবিহীন অভিমত দিতে পারি।

যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, কিছুটা ফারসি শিখে নিন, যাতে করে অন্তত সে ভাষার অভিধান কাজে লাগাতে পারেন।

আমি যে অর্থগুলো দিলুম সেগুলো ভাসা ভাসা— সাহিত্যিকের জন্য প্রশস্ত, শব্দতাত্ত্বিকের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো আমার বরাতে ফেলে অভিধানে ব্যবহার অবিচার করা হবে।

শামী-কাবাব— শম (Syria) দেশে প্রচলিত এই অর্থে শামী-কাবাব। মাংস পিষে বড়ার মতো চেপ্টা করে ভাজা কাবাব।

সীনা কলীজহ— পাঁজরের মাংস টুকরো টুকরো করে তার সঙ্গে lever (আস্ত কিংবা টুকরো টুকরো করে) মিশিয়ে শুকনো মাংসের ঝোল।

ফালুদা— প্রায় ice-cream.

জরীন কলম— সোনার কলম।

জহ্নুধারা— জহ্নুমুনির দেহ হইতে নির্গত (ধারা) কণা— জাহ্নবী অর্থে।

চাটিম চাটিম— তবলার বোলের অনুকরণে।

শব্দ— cf. সেতারের পিড়িং পিড়িং। Onomatopoeic.

পেতলে নিয়ে— পাতলা করে নিয়ে। পেতলে নিয়ে অচলিত slang.

কানজোখা— কান পর্যন্ত উঁচু।

হাঁসুলি বাঁক— হাঁসুলির মতো বাঁকা।

শুল্কদ্ধরণিক— যা ইচ্ছা লিখুন।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী

২

১৮।৭।৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রথম চিঠির উত্তর তখন ভালো করে দিতে পারিনি। চাকরির চাপ কখন যে জগদ্দল পাথরের মতো নেমে আসে আর কখন যে হঠাৎ হাল্কা হয়ে যায় তার হদিস পাওয়ার চেষ্টা আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো। না হলে তখনই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ

www.pathagar.com

জানানো উচিত ছিল, আপনি যে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করে আমার বইখানার ভুলক্রটি ধরে দিয়েছেন তার জন্য। সংস্কৃতের ওপর (কথা যখন উঠল তখন বলি, কোনও ভাষার ওপরই) আমার যথেষ্ট দখল নেই বলে নানা রকমের বালসুলভ ভুল করে থাকি। তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় আইন করেছেন, মূল ভাষাতে যে রকম বানান থাকবে— অর্থাৎ দীর্ঘ হ্রস্ব, স শ— বাংলাতে তার-ই কাছে আসবার চেষ্টা করবে। এরও ব্যত্যয় বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন— যদি বানানটি চালু হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুরনো বানানই চলবে। আমি এই ব্যত্যয় মেনেই লিখেছিলুম 'সাবাস'। সে দিন হঠাৎ দেখি রবিঠাকুর তাঁর অতি শেষদিকের লেখাতে লিখেছেন 'শাবাস' (কথাটা 'শাদ' ['আনন্দ'], যার থেকে 'শাদী', 'বিয়ে' অর্থে ব্যবহার হয়, 'বাশ্'— 'থাকা'— খুব সম্ভব সংস্কৃত 'বস্' ধাতু) কিংবা 'শাহ'— রাজা, বাশ্ থেকে হবে। যা-ই হোক না কেন, 'শ', 'স' নয়) কাজেই আবার বানান বদলাতে হল। এখন বলুন তো বাংলা লিখি কী প্রকারে।

আরবি, ফারসি, তুর্কি (তুর্কিস্থানের জগতাই তুর্কি ভাষা ও এশিয়া মাইনরের ওসমানলি তুর্কি ভাষাতে তফাত বাংলা অভিধানে এখনও করা হয়নি), উর্দু, সংস্কৃত, পর্তুগিজ আর অনেক ভাষা থেকে শব্দ এসেছে। এসব তাবৎ ভাষা শিখে, তাদের বানানের হ্রস্ব-দীর্ঘ জেনে তবে বাংলা লিখতে হবে। উত্তর হতে পারে অভিধান দেখো। কোন্ অভিধান? রাজশেখরবাবুর বইখানা অতি উত্তম কিন্তু তিনিও তো ওই কর্মটি করতে অক্ষম। জ্ঞানবাবুর অভিধান আরও বঢ়িয়া কিন্তু তিনি মেলা "গ্রাম্য" অথচ চালু কথা দেননি, এবং বানানের হ্যাপা সেখানেই তো বেশি। তবে?

'ওয়াকিফ-হাল' না লিখে আমি 'ওকিব-হাল' লিখেছিলুম, পাছে বাঙালি পাঠক এর 'ছদ্মবেশ' বর্জিত চেহারা চিনতে না পারে। বিশ্বভারতীর পুলিন সেন প্রথম কয়েক অধ্যায় প্রুফ দেখার সময় (সেগুলোর সমাস জোড়া, বানান consistency চমৎকার হয়েছে) ওটাকে 'ওয়াকিফ-হাল' করে দেন। তা হলে হেস্ত-নেস্তকে 'হস্তনীস্ত' এবং 'অকুস্থল'কে 'ওয়াকেয়াস্থল' লিখতে হবে। সুচতুর পাঠক কিংবা/এবং আপনার মতো দিকসুন্দরী-বল্লভ (আমার সরসিকা সবচেয়ে চিংড়ি ছোট-বোন ডিকশনারির নাম দিয়েছে 'দিকসুন্দরী' — অর্থাৎ সে সুন্দরী বানানের গোলকধাঁধায় দিক বাতলে দেন, তার পর ফিক করে হেসে বলেছিল, 'অবশ্য বাংলাতে ওনারা দিক দেখান না, দিক্ করেন বেশি।' প্রভাত মুখো 'দিক্করী'— যে দিক্ করে— 'রমণী' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'কুর্চশেখর তুখাঞ্জন...' এবং 'খট্টে খট্টে দিক্করিগণ' পদ্য পড়েছেন কি? অপূর্ব!) পূর্বপর (context — 'পূর্বপর' ঠিক প্রতিশব্দ কি না জানি না— আপনাকে চিঠি লেখা এক 'গব্বযন্তনা') বিবেচনা করে মানে ধরতে পারবে ঠিকই কিন্তু সাধারণ পাঠকের ওপর এই শব্দতত্ত্বের গর্দিশ কাঁপানো নিশ্চয়ই আর্য-আচরণ নয়।

কিন্তু যে প্রশ্ন মনে নিয়ে এ-পত্র লিখতে আরম্ভ করি সেটি— আপনার 'দিকসুন্দরী' কতদূর এগুলো? ইতোমধ্যে ওদুদ সাহেবের বইখানা বেরিয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই। ওটি কিন্তু অতি সাবধানে ব্যবহার করবেন। (১) শিলওয়ার, শল্ওয়ার ইত্যাদি। জিন্দেগী, জিন্দগী। পশ্তু, পুশ্তু। আরবি-ফারসি-উর্দুতে (জগতাই ওসমানলি তুর্কিতে এবং সিন্ধি-মপলা ভাষাতেও— বিবেচনা করি আরবি হরফে লেখা সব ভাষাতেই) vowel points অর্থাৎ জের-জবর-পেশ দেওয়া হয় না। তাই লেখা হবে জ-ন-দ-গ-ী (দীর্ঘ vowel points দেওয়া হয়)। সেই ভাবে প-শ-ত-উ। প্রথম vowel points নিয়েই বেশিরভাগ মতভেদ হয়। তার কারণ ওটা

www.pathagar.com

সাধারণত তাড়াতাড়িতে বলা হয়। তাই ওটাকে vague indistict vowel বলা হয়। ইংরেজিতে about, polite, err-এও এই vague indistict vowel. এই vague indistinct থেকে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যান্য vowel-এর সৃষ্টি। (Daniel Jones-এর An English Pronouncing Dictionary-র প্রথম পৃষ্ঠায় এর একটি উত্তম ছবি দেওয়া হয়েছে। (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রাচীন যুগে ঋ-এর উচ্চারণ ছিল এই vague indistinct vowel + a trill)। কাজেই শুনতে পাবেন— যদিও তাড়াতাড়ি বলা হয় বলে ঠিক ধরা যায় না— শিলওয়ার, শু...শ... etc। তাই আরবি ইল্ম্* = জ্ঞান বাংলায় এলেম; তাই ম-হ্-অ-ম-দ বাংলায় মুহম্মদ, মোহম্মদ, মহম্মদ, মামদো! (ঋষি আর্য, মহম্মদ মামদো!) অ-হ্-সা-ন (আরবি), ফারসি— ইহ্সান, উর্দু— এহ্সান, বাংলা— আসান (মুশকিল আসান)। ইংরেজ লেখে Peshwar : পাঠান বলে পি, কিংবা প্শাব্র।

কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

রুবাইয়াতের অন্ত্যানুপ্রাস aaba হবে। তার একটা দৃষ্টান্ত পাবেন 'দেশে বিদেশে'র ৩৭৪ পৃ.— সান্গে ওতন্ etc–'। মাঝে মাঝে a a a a ও হয়।

আরও দু একটা কথা উত্থাপন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পেটের অসুখে কাতর হয়ে পড়েছি। বাঙালির birthright— আমাশয়।

A. I. R
কটক

নমস্কারান্তে
মুজতবা আলী

পুনশ্চ
আপনি আমার লেখার যে প্রশংসা করেছেন তার দাওয়াই হিসেবে আপনাকে 'উষা' কাগজের আষাঢ় ১৩৬১-র (33B, Amherst street থেকে প্রকাশিত) শেষ পাতা পড়তে অনুরোধ করি। লেখক 'সেন'। কে বলে বদ্যিরা বড্ড ঐক্যবদ্ধ? আপনি বলেন, আমার লেখা আশমানের তারা, উনি বলেন, পিঠের পাঁচড়া (সিলেটি প্রবাদ)।

আপনার রাস্তা Tawnsend না Tawnshend? অভিধান বলেন, দুইটারই উচ্চারণ Taunzend.

৩

২৩।৭।৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি এবং উর্দুর মূল এবং বানান নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে 'মোহম্মদী' নামক মাসিকে। অথচ সেগুলোর ব্যবহার আজ পর্যন্ত কোনও কোষকার করেননি। রাজশেখরবাবুর অভিধানের প্রথম প্রকাশ ভুলে ভুলে ছয়লাপ ছিল। তার বহু ভুল

---

* এর থেকে 'মালুম', 'তালিম', 'মুয়াল্লিম'।

www.pathagar.com

দেখিয়ে এক বাঘা মৌলবি সায়েব মোহম্মদীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেক লেখা ওই মাসিকে বেরিয়েছে। এমনকি গত বৎসর ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোহম্মদীতে মৌলনা আক্রম (আক্রমণ।) খাঁর অভিধানের (ইটি তিনি শেষ করতে পারেননি) কিছুটা বেরিয়েছে। এইসব back number না দেখলে আপনার অভিধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ দু-চারটি শব্দের মূল আমাকে রীতিমতো হকচকিয়ে দিয়েছিল।

'ছবী'কে না হয় 'ছবি' লিখলেন, কিন্তু 'বুকের মাঝে বাজল যে বিন্ (বীণা) লিখবেন কি?

অথচ আপনিই 'নজীর' লিখেছেন।

কোষকারের অন্যতম প্রধান কাজই তো নিক্তি ধরে মাপা, এটা অচলিত না সুচলিত না অচল। তা না হলে তো সবাই অভিধান লিখত— আমিও লিখতুম। এ যেন কসাই বলছে, বকরির গলা কাটব কী করে, বড় মায়া হয়।

তাই দেখুন Oxford-কে Concise করতে গিয়ে কোষকারকে কতখানি ভাবতে হয়েছে। এ শব্দটি ইংরেজিতে মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে— কিন্তু প্রয়োগ করেছেন শেক্স্পিয়ার— দেবো কি দেবো না?

এককালে 'চলন্তিকা'য় 'সৈয়দ' শব্দ ছিল না যদিও 'শেখ' ছিল, 'মোগল' 'পাঠান'ও ছিল আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি 'সৈয়দ' দিলেন— অবশ্য কাকতালীয়ও হতে পারে।

পূর্ব বাংলার ভদ্র সাহিত্যে আজকাল হরবকত, ফজর, জোহর, আসর, মগরিব, এশা এই 'পঞ্চসন্ধ্যার' (পাঁচ নমাজের) উল্লেখ থাকে। আমার মা-ও বলতেন মগরিবের একটু আগে, কিংবা আসর-মগরিবের দরমিয়ান (অর্থাৎ মধ্যে) এবং এই পদ্ধতিতে সময় বোঝাতেন। আপনি এগুলো দেবেন, না দেবেন না? ওই তো আপনার গব্বযন্তনা— আমাদের কাছ থেকে এককণাও 'হমদরদী' পাবেন না। (সহ+অনুভূতি, হম্+দর্দ, Sym+Pathos)

ধর্ম জানেন, আমি মস্করা করিনি। আমার এখনও মনে পড়ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেনামিতে লেখা ('কস্যচিৎ ভাইপোস্য') ব্রজবিলাস কিংবা তার পরের কোনও বেনামি লেখাতে আমি 'কট্টর'* পেয়েছি। এবং 'চাটিম চাটিম' 'আঁধারের আলোতে' না হলে 'শ্রীকান্তে' পড়েছি। কোনও এক মজলিসে পিয়ারী গাইবেন, তবলচি চাটিম চাটিম বোল তুলছে। আমি সিলেটের খাজা বাঙাল। এসব 'লবজো' আমি তো আর গড়তে পারিনে।

সুনীতিবাবুর শব্দগুলো দেখিনি। বলি কী প্রকারে? ওদুদ সায়েবের অভিধান সম্বন্ধে আর কিছু বলতে আমি নারাজ। অপ্রিয় কথা বলতে আমার বড় বাধে।

চট্ট+আর্য-চাটার্জি, বন্দ্যো+আর্য=ব্যানার্জি— ইত্যাদি। বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলেন চট্ট+উপাধ্যায় ইত্যাদি থেকে নয়। তাঁর প্রবন্ধে এই আলোচনাটি পড়েছেন কি? যতদূর মনে পড়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন।

Tawnshend, Tawnsend দুটোই ইংরেজিতে আছে। উচ্চারণ একই— Taunzend/ Daniel Jones তাই বলেন। কিন্তু তা হলে অর্থাৎ বাংলায় টাউনজেন্ড লিখলে চিঠি মারা যাবে।

নমস্কারান্তে

কটক মুজতবা আলী

---

* 'করতা' পেয়েছি 'ফতোয়া' অর্থে এবং ওই অর্থেই 'তৈলবট'।

www.pathagar.com

৪

১২।১০।৫৪

সদন্তঃকরণেষু,

পূজার পাঁচটা লেখা শেষ হতে না হতেই গৃহিণী দুটি শিশু নিয়ে এখানে উপস্থিত। একটার ২ বছর ৮ মাস, আরেকটার ৯ মাস। তাছাড়া অলসেশিয়ন কুরছানা, রোডেসের মুর্গিমোর্গা, হাঁস, ফুলবাগান সবজিবাগান, বারবিট্ পাখি (গাছে, তার বাসার সুব্যবস্থা), পুকুরে পদ্ম— কত বলব? বিরাট ধুন্দুমার! আমি 'লবদ্বার' বন্ধ করে মুর্শিদের নাম জপ করছি। একদম Paradise lost!

অপরাধ নেবেন না কিন্তু আমার মনে হয়, ঢাকার লোক যদি কলকাতায় জন্মায় তবে তার দু কূলই যায়। কুট্টির স্ল্যাঙ সে শেখবার সুযোগ পায় না। আবার 'সামবাজারী'ও 'সেখে' না। অবশ্য যদি কেহ শ্যামবাজার অঞ্চলে মানুষ হয় তবে আলাদা কথা। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি সে অঞ্চলে বড় হননি। না হলে 'রেতে' এবং 'রান' সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতেন না।

পক্ষান্তরে আমি পনেরো বছর বয়সে সিলেটের যাবতীয় slang শিখে ঘটি দেশে আসি। তার পর বছর দুই শ্যামবাজারের 'রক্-ক্লাবে' বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে বিস্তর আড্ডা মারি। আমি নিজে বিশ্ববকাটে এবং একটি 'তুখোড় ইয়ার' (বিদ্যাসাগর পশ্য)।

অতএব এ বাবদে আপনি আমার কাছে 'ছোড্ড এড্ডা পোলাজ'। আপনি আমাকে যাবতীয় বিষয়ে টিড দিতে পারবেন, কিন্তু দাদা, বাঙাল-ঘটির এ-হেন অপূর্ব মাকালভেরেণ্ডা সংযোগ আপনি পাবেন না। এমনকি 'কুট্টি' গল্প সঞ্চয়ন আমার ভাঁড়ারে যা আছে তা কোনও ঢাকাইয়ারও নেই। কলিকাতায় দেখা হলে আমার চ্যালেঞ্জ রইল।

আমার এই ইয়ার্কিপনা কখনও যায়নি। প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, লন্ডন এবং প্রাগে এই কর্মটি আরও মনোযোগ সহকারে করি। আমার জীবনের নীতি,— বই পড়বে গুণীদের, আর মিশবে 'অজ্ঞ'দের সঙ্গে। গুণীদের সঙ্গে মিশে আর লাভ কী? তাঁদের যা বলার তা তো তাঁদের কেতাবেই রয়েছে। বরঞ্চ তাঁরা often very disappointing. পক্ষান্তরে অজ্ঞদের কোনও pretension নেই। তাই পদে পদে তারা চমক লাগাতে জানে। তাই ইয়োরোপের বহু শহরে আমি সর্বদা দিন কাটিয়েছি লাইব্রেরিতে, রাতটা 'পাবে'-'পাবে' — তাড়িখানায়। Smutty jokes-এর আমার যা 'সঞ্চয়িতা' (বিধুশেখর শাস্ত্রী যখন রবিবাবুকে বললেন শব্দটা ভুল তখন তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই কিন্তু ওটা বর্জন করেননি) সেটি— কী আর বলব, দম্ভ করতে নেই, মুর্শিদের মান— 'ক্রন্দসী' নিয়ে নিশ্চয়ই আমি শেষদিন পর্যন্ত কাজিয়া-কোঁন্দল করব। 'যে অর্থটি লোকে নেবে সেইটিই অর্থ, বাকি সব অনর্থ'— correct to a point. কিন্তু যে শব্দের অর্থ এখনও জনসমাজে liquid সেখানে আসল অর্থ, অভিধানে যা বলে, কবি যা mean করেছেন সেইটে বাদ দিয়ে এমন অর্থ নেব যেটা ব্যাকরণকে বলাৎকার করে, অভিধানকে অপমান করে এবং 'অনর্থ' বের করে কবিতাটির রসভোগ থেকে বঞ্চিত করে? তা হলে বেগুনকে 'প্রাণনাথ' বললেই হয়! আশা করি এই সরেস কুট্টি গল্পটি জানেন। নাহলে 'পঞ্চতন্ত্রে'র 'রেডুক্ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম' দ্রষ্টব্য।

আপনি ঠিক বলেছেন, কার্ত্তিক কেন কার্তিক হবে?

www.pathagar.com

চাটিম চাটিমে আপনার দ্বন্দ্ব কী বুঝতে পারলুম না। সানাইয়ের পোঁ, সেতারের পিড়িং পিড়িং— ঠিক সেই রকম শরৎবাবু বললেন, তবলার চাটিম চাটিম। 'পোঁ', 'পিড়িং পিড়িং'-এ যখন প্রশ্ন উঠছে না মিষ্টি না কর্কশ, তখন চাটিম চাটিমের বেলা উঠছে কেন? সব কটাই তো অনমটোপোয়েইক— না কী জানি বলে ইংরেজিতে। তা হলে বাতাসের শনশন, ভ্রমরের গুনগুন মিষ্টি না কর্কশ শুধাতে হয়।

শব্দে আপনি আসল root না দেখিয়ে immediate root দেখানোটা prefer করেন। তার থেকে বুঝতে পারছি, আপনার মন আমার যুক্তিতে সাড়া দেয়নি। পুনরায় নিবেদন করি।

(ক) কোনও অভিধান (একটু বড় সাইজের হলেই) immediate source থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত দেখায়, এবং

(খ) কোনও অভিধান (একটু ছোট সাইজের হলেই) শুধু শেষ শব্দ দেখায়।

আজ পর্যন্ত ত্রিভুবনে আমি কোনও অভিধান দেখিনি যেখানে (গ) শুধু immediate source দেখায়— এক রাজশেখরবাবুর অভিধান ছাড়া।

Inter alia — 'জোলাপ' সম্বন্ধে আমার আরবি অভিধান বলে শব্দটি ফারসি গুলাপ (গুল্ [ফুল] +আপ্ (অপ্ cognate with sanskrit অপ্ = জল থেকে। আরবি ভাষায় 'গ' এবং 'প' অক্ষর নেই বলে 'গুলাপ' শব্দ 'জুলাব' হয়ে গিয়েছে।) সেই আরবি শব্দ পুনরায় ফারসিতে ফিরে আসে 'জুলাব' রূপেই (যে রকম ফারসি গওহর আরবি জওহর— তার পর আবার ফারসিতে জওহর এবং গবেষণার ফলে পুনরায় 'গওহর'ও চালু হল। বাংলাতেও তাই দুটোই আছে— গৌহর proper noun-ও চালু আছে, আবার 'জওহর' (Prime Minister) [আমাদের P.M.-এর নাম অবশ্য জওয়াহির বা জওয়াহর, জওহর-এর বহুবচন]। 'জহুরি', জউরি = jeweller-ও আছে।

যে 'গুলের' (ফুলের) 'আব' (জল) খেলে জোলাপ অর্থাৎ purgative হয় সেটা বোধ হয় আসলে ইসবগুল।

আমার কাছে ১০। ১১ শতাব্দীর এবং পূর্বেকার আভিসেন্নাও অলবিরুনিয় ডাক্তারি বই নেই। থাকলে হয়তো প্রমাণ করা সম্ভব হত যে এঁরা মেক্সিকো আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই purgative জুলাব জানতেন।

এ বিষয়ে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যে বাংলা-জোলাপ ইংরেজি থেকে আসেনি। উর্দু-হিন্দিতে জোলাপ রয়েছে, ফারসিতে আছে, আরবিতে আছে, তার থেকে না নিয়ে নিয়েছি ইংরেজি jalap থেকে— যে শব্দ ইংরেজিতে আদপেই চালু নেই, সাধারণ ইংরেজি অভিধানেও থাকেই না, ১৭, ১৮ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে ইংরেজরা ব্যবহার করত বলে শুনিনি, সেইটে এল ইংরিজি jalap থেকে? উচ্চারণটাও লক্ষ করুন। ফারসিতে পরিষ্কার জোলাব, উর্দুতেও তাই। আর ইংরেজি jalap উচ্চারণ জ্যালাপ! ইংরেজি a-এর hat, fat, cat তো আমরা নিই হ্যাট, ফ্যাট রূপে, কিংবা হেট কেট রূপে 'হোট' 'কোট' রূপে নয়। এই সম্পর্কে oxford-এ julep শব্দটাও দেখে নেবেন।

অবশ্য আরবরা ভুল করে থাকতে পারে। হয়তো তাদের জোলাপ ফারসি গুলাপ থেকে আসেনি। এসেছে স্প্যানিশ jalapa থেকে। তাই-বা কী করে হয়? স্পেনিশে J অক্ষরের উচ্চারণ পরিষ্কার আরবীয় (স্কচ loch-এর মতো) তারা কোন্ দুঃখে ওটাকে 'জ' করতে যাবে!

www.pathagar.com

আর আপনি যেসব যাবতীয় বেজাতের ফিরিস্তি দিয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র স্প্যানিশদের সঙ্গেই আরবদের যোগসূত্র ছিল।

(Inter alia বাংলা লাশ, আমার মতে আরবি থেকে আসেনি। ফারসি 'লাশ' শব্দ এসেছে আবেস্তান— সংস্কৃত 'নষ্ট' থেকে 'নাশ' হয়ে 'লাশ' হয়ে। তুর্কির প্রশ্ন এখানে আদপেই ওঠে না।)

পর্তুগিজ সম্বন্ধে আপনার অবোধ্য কী লিখেছিলুম মনে পড়ছে না। যদি সে চিঠি ছিঁড়ে না ফেলে থাকেন (আমার বিনীত অনুরোধ ছিঁড়ে ফেলবেন; না হলে আমি-আপনি গত হওয়ার পর কোনও গাধা সেগুলো ছাপিয়ে দেবে এবং গুণীরা বলবেন, আমার Philology-তে claim-ও ছিল। আমার নেই; আমি আপনাকে কাঠবেরালির সেবা করছি মাত্র) তবে জানাবেন।

Mary, পর্তুগিজ থেকে, এটা পাবেন 'মাইরি' শব্দের under-এ।

চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী আপনার অভিধানে না থাকতে পারে কিন্তু চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি পঞ্চকুলীন ব্রাহ্মণ ঘোষ, বসু ইত্যাদি পাঁচ কায়েত, শেখ সৈয়দ মোগল পাঠান, কৈবর্ত, নমশূদ্র, হাড়ি ডোম ইত্যাদি থাকবে না এ-ও কি বিশ্বাস্য? এদের নিয়েই তো আপনার বাঙালি জাত। 'মোহাম্মদী'কে লিখে কোনও উত্তর পাবেন না। পেলে পাবেন কলকাতার-ই সাহিত্য পরিষদ কিংবা অন্য কোনও লাইব্রেরিতে।

'অবদান' তো চলে গেল। তা যাক্। উপায় নেই। আমি একটু মস্করা করে শব্দটা ব্যবহার করে থাকি।

এযাত্রা এই পর্যন্ত। আপনি যে লিখেছেন ৮ পাতা চিঠি শিগগির কারও কাছ থেকে পেয়েছি বলে ইত্যাদি, এত 'শিগগির' কথাটার ব্যবহার আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। আমি শিগগিরের ব্যবহার শুধু ভবিষ্যতের জন্যই দেখেছি। অতীত হলে দেখেছি, 'হালে', 'ইদানীং', 'এদানির', 'কিছুদিনের মধ্যে' ইত্যাদি দেখেছি। এদের কোনওটাই আপনি যে অর্থ দিতে চেয়েছেন সেটি প্রকাশ করে না, কিন্তু তার জন্য 'শিগগিরে'র প্রয়োগও দেখিনি। বিবেচনা করে জানাবেন।

বিজয়ার আলিঙ্গন জানবেন।

ভবদীয়
মুজতবা আলী

কটক

পুনশ্চ— ১৭।১০।৫৪

আমাদের 'জিলিপি' শব্দটা কোথা থেকে এসেছে জানেন কি? আমি জানিনে। পেটের অসুখের সময় দিল্লিতে গরম জিলিপি ঔষধার্থে খেতে বলা হয়।

৫

৭।৩।৫৮

প্রিয়বরেষু,

হরিচরণবাবুর অভিধানে ঁ স্বরবর্ণের শেষে আছে। এবং তাতে এক পৃষ্ঠাব্যাপী চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আপনি সেটি পড়েছেন কি? তাতে পাণিনি থেকে কেচ্ছা শুরু।

www.pathagar.com

আমি ১২।৩।৫৮ কলকাতা যাব। তার পর ঢাকা। ২০।৪।৫৮-এ কলকাতা ফিরে আসব। কলকাতায় কোথায় উঠব জানিনে। ঢাকার ঠিকানা, C/o, Mrs. Ali, Qamrunnesa Hostel, 10 Segun Bagicha, P.O. Ramna, Dacca.

আপনাকে দিয়ে আমার একটা কাজ করিয়ে নেবার বাসনা ছিল— অনেক দিন ধরে। ভরসা পেলে বলি।

Santiniketan সৈ. মু. আ.

॥ শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে (২৯।১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯) লিখিত পত্র ॥

১

২।৩।৭২

স্নেহের অর্চনা,

প্রথমে দুটি বড় প্যাকেট, পরে ছোট্ট একটি, সর্বশেষে যে-পত্রিকায় তোমার 'বনফুল' আছে এ-সব পেয়েছি। এ পর্যন্ত মাত্র একটা ভুঁইফোড় প্রকাশক ভিন্ন এখানে কলেজ স্ট্রিটের কোনও প্রকাশকই পশ্চিম বাংলার কোনও বই বিক্রির ব্যবস্থা করেনি। তুমি একবার ঘুরে যাও না। Permit পেতে তোমার অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবে পশুপতি খান পায়নি। অন্তত কেউ একজন নিখোঁজ বা/এবং মারা গেছে না বললে নাকি পারমিট মেলে না। তোমার সেই ঠাকুরমা, যে তোমাকে হামেশা "দিক্" করত, তাকে ঢাকাতে এনে গঙ্গাপ্রাপ্তি করাতে পার না?

এখানকার খাদ্যাদি আক্রা নয়। তবে ওষুধের দাম, বেবিফুড গয়রহ অগ্নিমূল্য। আশু ভবিষ্যতে চালের অভাব হবে কি না বলতে পারিনে। ... এখানে যা-সব হয়ে গিয়েছে তার গোর নিত্যি নিত্যি খোঁড়া হচ্ছে। একটা জিনিস আমাকে বড্ড বিচলিত করেছে। ধর্ষণের ফলে হাজার হাজার কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এদের অনেকের চতুর্দশ কুলে কেউ নেই। সমাজেও এরা স্থান পাবে না, অনেকেই— আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও। এই যে তার সন্তানটি হতে যাচ্ছে তার প্রতি এর অনুভূতিটা মিশ্র। একদিকে কোন্ পশুর চেয়ে অধম বর্বর পাঠানের সন্তান এটা, অন্যদিকে ত্রিসংসারে ওই তার একমাত্র সম্বল। এবং অনেক ক্ষেত্রে কি আমরা দেখিনি যে বিবাহিত রমণীর আইনত জাত সন্তান বর্বর পশুর মতো সমাজের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে— তবু মা তাকে ছাড়তে পারে না!

আশা করি তুমি/তোমরা কুশলে আছ। গণ্ডা দুই সাহিত্যিক এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এল, কিন্তু কোনও লেখিকা স্থান পেল না। তাজ্জব!

১৩৯ F ধানমণ্ডী, আন্কল্— আ
রাস্তা-১, ঢাকা-২
বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

২

খবরদার—!

কলকাতা

৩ আগস্ট ৭০

আম্মো ছেলেবেলায় একটি হাতের লেখা কাগজ চালাই। অবশ্য দাদার উপদেশ-আদেশের ওপর ভরসা করে। কাগজটার নাম ছিল "কুইনিন"— ম্যালেরিয়ার সে আমলের দাপট থেকে আজকের দিনের মস্তানরা বিস্তর বহুৎ শিখতে পারবে। আমার বয়স ১৫, দাদার সতেরো। ওই বয়সে সর্ব বালক হয় সব-জান্তা (all knowing age, কুকুরছানার যে-রকম ছ মাস বয়সে হয় all growing age, চটিজুতো থেকে সোফার মখমল তাবৎ জিনিস চিবিয়ে কুটি কুটি করে), তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আগাপাশতলা রিফর্ম করার দুর্বার কামনা জাগল আমাদের চিত্তে। তাই কাগজের নাম করা হল "কুইনিন"— সুদ্দুমাত্র তেতো কথাই শোনাব।

বলা বাহুল্য, আমরা অত্যল্পকালের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে দুশমন বানিয়ে ফেললুম। কিন্তু কাগজ বন্ধ হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। আজ না হয় আমার হাতের লেখা বগের ঠ্যাঙ কাগের বাসার মতো চিত্তির-বিত্তির। তখন ছিল রীতিমতো খুশ্‌খৎ, বিলকুল বদ্‌খৎ বা "বদ্‌খদ" ("বদ্‌খদ" আর "বদ্‌খৎ'" একই কথা) নয়। অতএব, আমারই ওপর পড়ল তাবৎ পত্রিকার আদ্যন্ত লেখার ভার। লাও ঠ্যালা!

এই দুই কারণে কাগজটি অচিরাৎ তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন।

আশীর্বাদ না জানিয়ে হুশিয়ারি জানালুম। সম্পাদকমণ্ডলী অপরাধ নেবেন না। কিমধিকমিতি।

— সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

॥ শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়কে (ভানু রায়) লিখিত পত্র ॥

১

৯।১।৬৬

ভাই ভানু রায়,

As usual শনির সন্ধ্যায় প্রুফ পেয়েছি। আমার শরীর আরও খারাপ। ম্যাপে একটা অতি নচ্ছার আতসি কাচ দিয়ে হিটলারের Russian অভিযানের অজানা-অচেনা জায়গাগুলো Pen down — ঘণ্টা দুই নাগাড়ে— করার দরুন কাল থেকে double image দেখছি— তাই একটু সময় লাগবে। তবে স্থির করেছি, যেমন যেমন হবে পাঠিয়ে দেব। "ধ্বনি" যুদ্ধের তাবৎ material যোগাড় করার পর এই হাল— লিখতে গেলে— বেশিক্ষণ একসঙ্গে, হঠাৎ সব blotted out হয়ে যায়। খুব সম্ভব এই সপ্তাহেই কলকাতা গিয়ে nursing home-এ ঢুকব— অবশ্য আমার main trouble-এর জন্য। তখন ডাক্তার যদি outside world-এর সঙ্গে contact না রাখতে দেয়, কিংবা কাজ করতে না দেয় তবে, ভাই তোমাকেই সব করতে হবে— 'বড়বাবু' বাবদে। আমার ছোকরাটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরও দু-একটি প্রাচীন দিনের লেখা— of course after 1949 — পাওয়া গেছে। তোমার যদি

www.pathagar.com

মনে হয়, তোমার বইয়ের size যথেষ্ট বড় হচ্ছে না, তবে আমাকে পত্রপাঠ জানিয়ো। কবে কলকাতা যাব জানিনে বলে এ কয়েকটা দিন জরুরি চিঠি বা প্রুফ Regd. পাঠিয়ো। এমনিতেই চিঠি হারায়— redirection-এ risk-টা greater. 'ধ্বনি'র উত্তর কবে লিখতে পারব? কে জানে! একটু wait করো please.

আ

২

28.02.68

ভ্রাত ভানু,

আমি দুই ব্যাটাকে তাদের বাপপিতেমর ভিটে দেখাতে সিলেট গিয়েছিলুম। ফিরে এসে তোমার কার্ডদ্বয় পেয়ে আনন্দিত হলুম। 'বড়বাবু' সম্বন্ধে আমি আর নতুন কী বলব!

এবারে তিনশোটি টাকার একখানা চেক শ্রীমোহিত চৌধুরী, Bus Proprietor, Nicha Patti, Bolpur. এই ঠিকানায় রেজিস্ট্রি করে পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা p.c -তে তাঁকে জানিয়ো, তাঁর নামে চেক গেল এবং টাকাটা আমার বাড়ি চালানোর খরচারূপে। তুমি যে আমার প্রকাশক সে খবরটাও দিয়ো।

বিমল মুখুয্যে (বড়দা)-কে ফোন (473419) করে জানিয়ো আমি মার্চের শেষ সপ্তাহে বা এপ্রিলে দেশে ফিরব। তাকে স্বয়ং পরে লিখব। গজেনদাকে নমস্কার ও তোমাকে শুভ ঈদের আলিঙ্গন।

আশীর্বাদক
সৈয়দ মুজতবা আলী

নিচের ঠিকানায় একখানা "বড়বাবু" পাঠাতে পারো?

Per Regd. Post
Pakistan National Oils Ltd.
A.S. Mahmud Esq.
Motijheel (মতিঝিল)
Dacca. E. Pak.

পুন. P.C.-তে 07 Paise স্ট্যাম্প লাগিয়ো।

Thanks.

॥ শ্রীমতী সুনন্দা সেনকে (লাবান, শিলং) লিখিত পত্র ॥

১

৬।১১।৫৮

বউদি,

তোমার চিঠি পেলুম। আমি একটা জিনিস এ জীবনে কখনও করে উঠতে পারলুম না। আর পারব না বলে পঞ্চাশের পর সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি এবং সর্ব ভুবনের গালাগাল খাই।

www.pathagar.com

সেটা balancing of the budget— টাকার নয়। সেটা তো আছেই, কিন্তু তার জন্য গালমন্দ শুনতে হয় না— হয় সময়ের। আপন পড়া, তা-ও হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া, নিয়ে এত বেশি সময় কাটিয়ে দিই যে অন্য কোনও কাজ করে উঠতে পারিনে। বিশ্ব-সংসার চটে যায়, ভাবে হৃদয়হীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন। আমি পড়ে পড়ে গাল খাই। তোমার short hand কি ক্রমেই long hand হচ্ছে? পাস করছ কবে? চাকরি নেবে কখন? আমি যা জমিয়েছিলুম তা তো বিলেতে গিয়ে ফুঁকে দিয়ে এলুম।

"যত টাকা জমাইছিলাম
 শুঁটকী মৎস্য খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
 গুলবদনীর মাইয়া।"

এবারে নাগাড়ে শুঁটকি মৎস্য খেলেও আর টাকা জমবে না। তবু ভরসা আছে গরমে শিলং আসব। বউবাচ্চা আসবে কি না সে তো বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কিছুই ঠাহর করতে পারছিনে। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। তোমার কর্তা কিরকম আছেন? বসন্তকালে বিরহ নাকি বড় পীড়াদায়ক— কবিরা বলেন।

শান্তিনিকেতন।

আলী সাহেব

(২)

২৩ নভেম্বর, ১৯৫৮

বউদি,

আজ তোমার পাঠানো জামাটি পেয়েছি, আমি এই দুপুরের গরমে সেটা পরে উল্লাসে নৃত্য করছি। জানিনে, তুমি আমার একটি গল্প "চাচা কাহিনী"তে পড়েছ কি না; তাতে বরোদার রাজা আবিসিনিয়ার রাজাকে একখানি লাল কাশ্মীরি শাল উপহার দেওয়াতে তিনি নাকি খুশির তোড়ে, সেই রেড-সির গরমে অঙ্গে শাল জড়িয়ে জাহাজময় উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আমার অবস্থা তাই, সেই বর্ণনা পড়ে নিয়ো— আমার হাল মালুম হবে। ইউরোপে পুরনো বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পগুজোব করেছি আর ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখেছি। এবং ভালো ভালো বর্দ্যো ব্যার্গান্ডি খেয়েছি। তবে অল্প-স্বল্প— ও জিনিস বেশি মাত্রায় খেলে সুখ পাওয়া যায় না। সত্যি বলছি বিনয় নয়— আমার লিখতে ভালো লাগে না, ওর ভিতর কেমন যেন একটা দম্ভ আছে। আজ এখানেই থাক, লেখাগুলো নিয়ে নাকের জলে, চোখের জলে।

আলী সাহেব

শান্তিনিকেতন

www.pathagar.com

॥ শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরীকে (লাবান, শিলং-৪) লিখিত পত্র ॥

[১৯৬৫ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্র' কয়েক পর্যায়ে 'পন্টক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। পড়ে মনে হল উদ্দিষ্টরা একাধারে অবিজ্ঞ এবং চালাকের ভানকারী। একটু পালটিয়ে 'পণ্ঠক' শব্দটি অধিকতর অর্থবাহী হয় কি না বিবেচনা করতে লেখায় যে উত্তর পাই সেই পূর্ণ চিঠিটি এতৎসহ প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি। চিঠির বয়ান 'পন্টক' শব্দের কৌসুলীর হলেও পরবর্তী এক কিস্তিতে তদীয় পন্টক শব্দ ব্যবহার কালে উল্লেখ করেছিলেন— 'অথবা পণ্ঠক' যেমন কোনও পাঠক মনে করেন (হুবহু ভাষাটি মনে নেই) ॥

১৬।১১।৬৫

জনাব চৌধুরী সাহেব,

আপনার নামটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু আশ্চর্য, চেহারাটি মনে নেই— (বোধহয় শ্যামবর্ণ ছিপছিপে) সাধারণত উল্টোটাই হয়। নয় কি?

'পঞ্চতন্ত্র' five days wonder.- ওর স্থায়ী মূল্য নেই। এবং যেই হাল্কাশৈলী ছেড়ে কদিচ কখনও সিরিয়স বিষয় নিয়ে আলোচনা করি অমনি পাঠককুল কড়া কড়া চিঠি লেখেন। আমি ভাঁড়— ওদের মতে— আমি আবার 'জ্যাঠামো' করতে যাই কেন? আপনি কিন্তু প্রাচীন দিনের আত্মীয়তার স্মরণে দয়া রাখবেন।

পণ্ঠক বলতে আমার কী আপত্তি? কিন্তু ঘটিরা বলে পাঁটা (পাঁঠা) মাতাব্যথা (মাথাব্যথা) কতা (কথা)! তাই পন্টক। ঘটিরা 'পাঁঠা' বলে না, বলে পাঁটা।

তদুপরি 'পাঁঠা' বা 'পাঁটা' বা 'পন্টক' অর্থ গবেট, গাড়ল— সে তো ঠক হতে পারে না— ঠক হতে হলে তো বুদ্ধির প্রয়োজন।

আপনার আশীর্বাদ মাথা (মাতা) পেতে নিলুম।

শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। কিমধিকমিতি ॥

পো. আ. বোলপুর, খাকসার
পশ্চিমবঙ্গ সিতু

পুঃ দয়া করে 'জনাব' 'সায়েব', 'ভবদীয়' লিখবেন না। আমাকে আগেরই মতো দেখবেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাঠকের নিবেদন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাঠকের নিবেদন

'অবধূত' যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে মুরুব্বিহীন হালে নিঃশব্দে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাংলার বাঙালি পাঠক মাত্র যে বিস্মিত হয়েছিলেন সে-কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে। এ তো মরুতীর্থ নয়; এ যে রসে রসে ভরা 'রসতীর্থ'।

হিন্দু তীর্থের প্রতি মুসলমানের কোনও কৌতূহল থাকার কথা নয়, কিন্তু এই গ্রন্থ পড়ে পূর্ব পাকিস্তানি একটি মুসলমান তরুণ আমাকে বলে, সে নিশ্চয়ই হিংলাজ দেখতে যাবে— সে তখন করাচিতে চাকরি করে, তার পক্ষে যাওয়া সুকঠিন ছিল না। আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি করো না। আর্টিস্টের মডেলের সন্ধানে কেউ কখনও বেরোয়! যে 'ভিখারিণী' ছবি তুমি পর্শুদিন একশো টাকা দিয়ে কিনলে তুমি কি সে ভিখারিণীর সন্ধানে বেরোও, যাকে মডেলরূপে সামনে খাড়া রেখে আর্টিস্ট ছবি এঁকেছিল? বরঞ্চ বলব, তাঁর সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হলে তুমি তো উল্টো ফুটে চলে যাও! কারণ, সে তো তোমার হৃদয়ে কোনও ইস্‌থেটিক আনন্দ দিতে পারে না। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, অবধূত-মহারাজ সাধু ব্যক্তি; সে সাধুতা তিনি লেখক হিসেবেও রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পুস্তকে তিনি অতিরঞ্জিত করেননি। কোনও কোনও সাধু-বাবাজি 'বড় তামাক' সেবন করেন; অবধূত কখনও করেছেন কি না বলা কঠিন— অন্তত তাঁর ডেরাতে সে 'খুশবাই' আমি পাইনি কিন্তু একথা বর্‌হক্ সত্য, তাঁর সৃষ্টিতে গঞ্জিকা-বিলাস বিলকুল নদারদ। কাজেই হিংলাজে গিয়ে তুমি টায়-টায় তাই পাবে, দফে দফে সে-সব জিনিসই পাবে যার বয়ান অবধূত 'ইমানসে' দিয়াছেন, তাঁর ইন্‌ভেনট্রিতে ফাঁকি পাবে না। এবং পাবে না— এবং সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা— তাঁর বই পড়ে যে কাব্যরস, যে কলা-সৃষ্টিরস, যে ইস্‌থেটিক ডিলাইট পেয়েছিলে সেই অনবদ্য অমৃত। তার শেষ প্রমাণ, সূর্যোদয় তো আমরা নিত্য নিত্যি দেখি; তবে সূর্যোদয়ের ছবি কিনি কেন?

তা হলে প্রশ্ন, অবধূত কি খাঁটি রিয়ালিস্টিক লেখক?

অবধূত কি বাস্তব জগৎ ছাড়িয়ে যেতে পারেন না?

কল্পনার ডানা জুড়ে দিয়ে তিনি যদি আমাদের নভেলকে উড্ডীয়মান না করতে পারেন তবে বাস্তবের কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে কী এমন চরম মোক্ষ লাভ![১]

---

১. 'যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

www.pathagar.com

এর উত্তর অতিশয় সরল। অবধূত যদি তাঁর কল্পনা, তাঁর সৃজনীশক্তি, তাঁর স্পর্শকাতরতা মরুতীর্থের পাতায় পাতায় ঢেলে না দিয়ে থাকতেন তবে পুস্তকটি রসকষহীন মরুই থেকে যেত। বড়জোর সেটা হত গাইড বুক। গাইড বুক, বড়ই প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, আর্ট আরম্ভ হয় ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখানে প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। রাধু মালী কেনেস্তারায় করে নাইবার জন্য যে-জল এনে দেয় তাতে প্রয়োজন মেটে বটে, কিন্তু নন্দলাল কর্তৃক বহুবর্ণে বিচিত্রিত কুম্ভ মস্তকে ধারণ করে যখন তন্বঙ্গী মরাল গমনে জল নিয়ে আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে আসে আর্টের উপাদান, সেই জলের সঙ্গে সঙ্গে আসে কল্পনার উৎস, সৃষ্টির অনুপ্রেরণা— সেই পুণ্যবারিই মরুতীর্থকে 'শ্যামল সুন্দর' করে তোলে, সে তখন দেয় 'তৃষ্ণা-হরা সুধাভরা সঙ্গসুধা' এবং কে না জানে 'সঙ্গ' ও 'সাহিত্য' বড় কাছাকাছি বাস করে।

কিন্তু ওই 'মরুতীর্থ'ই তো অবধূতের একমাত্র বা সর্বশ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টি নয় যে সুদ্দুমাত্র এইটে বিশ্লেষণ করেই আমরা পুস্তক ও লেখকের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যাব, এবং প্রশ্ন, রসের হাটে ভ্রমণকাহিনী কোন্ কাতারে বসার হক্ক ধরে, বাজারের বৈচিত্র্য নির্মাণে তার সেবা কতখানি, সে পাবে কোন্ শিরোপা? বিশেষত বাংলা সাহিত্যে? লোকে বলে 'ঘরমুখো বাঙালি'; কাজেই তার কাছ থেকে আর সবকিছুই আশা করা যেতে পারে, শুধু ভ্রমণকাহিনীটি মাফ করে দিতে হয়। তাই যদি হয়, তবে বলব, 'পালামৌ'-র পরই 'মরুতীর্থ'। এবং তার পরও তাকে কেউ আসনচ্যুত করতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এসব আলোচনায় আমরা গুরু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিই।

তবে কি অবধূত শুধু ভ্রমণকাহিনীর কীর্তনিয়া— পার্ এক্সেলাস?

অধীন সমালোচক নয়, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকও নয়। তার প্রধান পরিচয়— সে যা মনে করে— পাঠকরূপে। সে বই পড়তে ভালোবাসে এবং যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায়, বা নসিবের গর্দিশে, যাই বলুন, সে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়ার ফলে বাংলা ছাড়াও দু-একটি অতিশয় ধনী তথা খানদানি ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছে, তথাপি সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আপন মাতৃভাষা বাংলাতেই বই পড়তে। এবং কোনও বই পড়ে— বিশেষ করে সে বইয়ের লেখক যদি অখ্যাতনামা হয়, তাকে যদি নববধূর মতো লজ্জিত শঙ্কিত পদে বাংলা বাসরে প্রবেশ করতে দেখে তবে আঙ্গিনা যেতে তার কল্যাণ কামনা করে, বয়েস ছোট হলে আশীর্বাদ জানায়। আবার বলছি, পাঠক হিসেবে। 'অবধূত' 'শংকর' আদিকে আমি উদ্বাহু হয়ে অযাচিত অভিনন্দন জানাই, বাংলা সাহিত্যে তাঁদের প্রবেশলগ্নেই। পরবর্তীকালে কেউ কেউ আমাকে আরও আশাতীত আনন্দ দিয়েছেন, কেউ কেউ দেননি, কিন্তু সে নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই, কারণ এ-দুজনা আমাকে নিরাশ করেননি।

অবধূতের বয়স হয়েছে, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। আমিও তদ্বৎ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমি সমালোচক বা অধ্যাপক নই,— তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমার লিখবার যেটুকু হক্ক আছে সে শুধু, তিনি লেখক পার্-এক্সেলাঁস, আমি তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকদের ভিতর পাঠক পার্ এক্সেলাঁস, পাঠকোত্তম। আমি 'উদ্ধারণপুরে'র কাছেই বাস করি, এর সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। এ 'ঘাট' দিয়ে উভয়ে একসঙ্গে না গেলেও শীঘ্রই আমরা 'ওপারে' মিলিত হব। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সৃষ্টির চরম রহস্য জেনে নেবার পূর্বেই অবধূতের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে আমার বিস্ময় প্রকাশ করে যাই।

www.pathagar.com

আমার পরিচিত কোনও কোনও কনিষ্ঠের ধারণা— যার উল্লেখ এইমাত্র করলুম যে, অবধূত আসলে ভ্রমণকাহিনী লেখক। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ধারণা ভুল না-ও হতে পারে। কারণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি,— গেরুয়াধারীকে সরাসরি প্রশ্ন শুধানো অনুচিত— তিনি দীর্ঘকাল সন্ন্যাসী-শ্রমণজনোচিত স্থান পরিবর্তন বা পর্যটন করেছেন, এবং সে-কারণে তাঁর রচনাতে সবসময়ই অল্পবিস্তর আনাগোনা থাকে, এবং পরোক্ষভাবে সেটাকে ডাইনামিক করে তোলে। এটা সদ্‌গুণ, কিন্তু এটা অবধূতের একমাত্র গুণ তো নয়ই, প্রধানতম গুণও নিশ্চয়ই নয়।

আবার, কোনও কোনও কনিষ্ঠের ধারণা— এরা সাধারণত আমার সমুখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে— অবধূত প্রধানত সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ফক্কুড়ি ধাপ্পাবাজি আছে সেটার নিরতিশয় নগ্নরূপ আমাদের সামনে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এটাও পূর্বেকার মতো আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। ফক্কুড়ি, ধাপ্পাবাজি, বুজরুকি,[২] — এরই মোলায়েম নাম 'ধরাধরি' বা 'তদ্‌বির (অবধূতের ভাষায়ও বোধহয় আছে, 'বসুন্ধরা পূর্বে বীরভোগ্যা ছিলেন; অধুনা তদবিরভোগ্যা')— এসব তো সর্বত্রই আছে, এবং এ-বাবদে সন্ন্যাসীদের নিদারুণ টিট দিতে পারে হালফিলের গৃহীরা, এবং কলকাতায় তাদের সন্ধানে বিস্তর তক্‌লিফ বরদাস্ত করতে হয় না; বস্তুত তাদের অনাহারে প্রাণ অতিষ্ঠ। হাট-বাজারে, মেলা-মজলিশে, সাহিত্য-বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে— যেখানে বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বপ্রেম সেখানেই তো বিশ্ব ফক্কুড়ি— এ তো পাড়ার পদিপিসিও জানে। তার দাওয়াই কী, সে-ও তো অজানা নয়। শুধু অজানা— এ-খাটাশের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অবধূত সমাজ-সংস্কারক নন— ডন্ কুইক্‌সটের মতো নাঙ্গা তলওয়ার দিয়ে বেপরওয়া বায়ুযন্ত্র (উউন্ডি-মিল) আক্রমণ করা তাঁর 'ধর্মে' নেই। লোকটি বড়ই শান্তিপ্রিয়। শুধু যেখানে বর্বর পশুবল অত্যাচার করতে আসে, এবং সে পশুবল ফক্কুড়িতেও সিদ্ধহস্ত সেখানে অবধূত, ফক্কুড়ির মুষ্টিযোগ ফক্কুড়ি ছাড়া নানাপন্থা বিদ্যতে বিলক্ষণ জানেন বলেই সেটা বীভৎস রুদ্ররূপে দেখাতে জানেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, শীলের দিক। লেখক হিসেবে এটা তাঁর নগণ্যতম পরিচয়। কারণ লেখক হিসেবে 'হীরো' রূপে তিনি কস্মিন্‌কালেও আত্মপ্রকাশ করতে চাননি।

আর্ট ও জীবন নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন কবিরাজ গ্যোটে। সে আলোচনা বহুস্থলে এতই সূক্ষ্ম যে আপনার-আমার মতো সাধারণ পাঠক দিশেহারা হয়ে যেতে বাধ্য। তবে সে আলোচনার ভিতর না গিয়ে সরাসরি আর্টের ভিতর জীবন ও কোনও কোনও স্থলে লেখকের জীবনীরও অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সংকট-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তই এস্থলে যথেষ্ট। বাঙলা দেশে কেন, পৃথিবীর হাস্যরসিকদের ভিতর 'পরশুরামে'র স্থান অতি উচ্চে। অথচ যেসব সৌভাগ্যবান তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন হাস্যরস ঠাট্টা মস্করা দিয়ে তিনি মজলিশ না জমিয়ে বরঞ্চ সুযোগ দিতেন আমাদের মতো রামা-শ্যামাকে। একবার তাঁকে আমি একখানা চিঠিতে লিখি, তাঁর বাড়ির ও পাড়ার ছেলেদের সামনে আমি ম্যাজিক দেখাব, তবে তিনি সে-স্থলে সশরীর উপস্থিত না থাকলেই ভালো। তিনি কাতর কণ্ঠে উত্তর লেখেন, 'আমাকে গুমড়োমুখো দেখে ভাববেন না, আমার

২. বুজরুকি শব্দটি এসেছে ফারসি বুজরুগ থেকে— অর্থ অতি ভদ্র; মুরব্বী, সাধুজন, উচ্চ-স্থানীয়; সেইটার অভিনয়, বাংলায় ভণ্ডামি।

www.pathagar.com

রসবোধ নেই।' অবধূতের বেলা ঠিক তার উল্টো। তাঁর লেখাতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে,— যেন হাসতে হাসতে তিনি বুজরুকির মুখোশ একটার পর একটা ছিঁড়ে ফেলছেন; কোনও কোনও স্থলে সেই সুবাদে তিনি বিকট বীভৎস রসেরও অবতারণা করেছেন কিন্তু অকারণে হাস্যরস অবতারণা করতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ অন্তরঙ্গজনের মধ্যে অবধূতের অন্য রূপ। সেখানে তিনি অভিনয়সহ যে বিশুদ্ধ হাস্যরস উপস্থিত করেন সে যে কী স্বচ্ছ, কী চটুল।— যেন পার্বত্য নির্ঝরিণী আপন বেগে পাথর হতে পাথরে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে— তাঁরাই শুধু জানেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ। তাঁর একটি অভিনয় এমনই অনবদ্য যে সেটি টেলিভিশনে দেখানো উচিত। চুঁচড়ো চন্নগর অঞ্চলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোজন করা অভদ্রতার চূড়ান্ত। নিমন্ত্রণকারী সোনার থালার চতুর্দিকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিমন্ত্রিতের সামনে গলবস্ত্র হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বার বার শুধু ফরিয়াদ জানাবেন, তিনি অতিশয় দরিদ্র, সামান্যতম অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম; এবং নিমন্ত্রিতজনও অতি-বড়-গাওয়াইয়ার মতো তালের আড়ির সঙ্গে কুআড়ি লাগিয়ে ইস্টিকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই— থালার সামনের পিঁড়িতে বসাটাও নাকি পবিত্র, যুগ যুগ সঞ্চিত সর্ব ঐতিহ্যভঞ্জনকারী সখৎ বেয়াদবির চূড়ান্ত— বলবেন, প্রায় চোখের জল ফেলে, যে, এরকম অত্যুত্তম ব্যবস্থা তাঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও দেখেনি, এ বাড়ির গৃহিণী রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী, আর হবেই-বা না কেন, এঁরা যে পুরুষানুক্রমে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরীশঙ্কর, 'নীলকণ্ঠ'! এহেন রসময় চাপান-ওতর বাস্তবে কতক্ষণ ধরে চলত বা এখনও চলে সে অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু অবধূত মৌজে থাকলে নিদেন আধঘণ্টা, এবং উভয়পক্ষের সেই নিছক কথার তুবড়িবাজি ফুলঝুরি শুধু লেখাতে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ একা অবধূতই দুটি পার্ট একসঙ্গে প্লে করে যান। ক্ষণে গল-বস্ত্র কাঁদো-কাঁদো কাতর নিমন্ত্রণকারী, ক্ষণে চরম আপ্যায়িত, কৃতজ্ঞতার ভারে আজানুন্যুব্জ, আনন্দাশ্রুতে চক্ষুদ্বয়সিক্ত নিমন্ত্রিত।

এবং এখানে এসে সত্যই অবধূতকে জোব্বার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে হয়!

অথচ আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, গেরুয়ার খুঁট না, শৌখিন নিমন্ত্রিতের জেব থেকে বেরিয়ে এল ফুলকাটা-লেস লাগানো হাওড়া-তোড়-হাল্কাসে-হাল্কা বেড়শিট সাইজের রুমাল! বিশ্বাস করবেন না, আমি পেলুম ভুরভুরে আতরের খুশবাই। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রিতজন কণামাত্র খাদ্য স্পর্শ করবেন না— ভাবখানা এই, আমাদের কারওরই বাড়িতে অন্নাভাব নেই, তদুপরি খানদানি নবাব মাত্রই ডায়াটে থাকেন।

এই অভিনয় করার পরিপূর্ণ বিধিদত্ত দক্ষতা ছিল অতি বাল্যকাল থেকেই আরেকটি লেখকের— চেখফ্‌। পাঠশালে যাবার সময় থেকেই তিনি বাপ-কাকা পাড়া-প্রতিবেশী সক্কলের অনুকরণ করে অভিনয় করতে পারতেন— কেউ কেউ খুশি হয়ে তাঁকে লেবেনচুস-লাট্টুটা উপহারও দিতেন।

এই অভিনয়দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকের 'সকলং হস্ততলং'— লেখা তখনই হয় convincing; তার বিগলিতার্থ অভিনয় করার সময় যেরকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষায় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। এখানে

www.pathagar.com

কর্মটি কঠিনতর। কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গি করতে পারবেন না, চোখের জল ফেলে দেখাতে পারবেন না। অর্থাৎ টকি-সিনেমার কাজ গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে সারতে হচ্ছে। আসলে তার চেয়েও কঠিন, কারণ, কণ্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশি ভেল্কিবাজি দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা— কেউ-বা স্ল্যাঙ ব্যবহার করে, কারও-বা ইডিয়ম জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বলে ভশ্চাযের মতো সংস্কৃত-ঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক— এ সব-কটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির লোকের কথাবার্তা convincing ধরনে প্রকাশ করা যায় না। এ বাবদে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ : মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। আমি এ-বিষয় নিয়ে অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছি; এ-স্থলে বলি, এ যেন একটা মিরাক্‌ল্‌। মাইকেল বাল্যাবস্থায় যশোর ছাড়েন, তার পর সেখানে আর কখনও যাননি। তদুপরি অনেক কাল কাটালেন বাঙলার বাইরে। অথচ পরিণত বয়সে এই নাটকে, অর্ধশিক্ষিত, হিন্দু কর্মচারী, তার অশিক্ষিত হিন্দু চাকর, অশিক্ষিত মুসলমান চাষা, তার চেয়েও অগা তার বউ, এবং আরও চার-পাঁচজন— সবাই মিলে অন্তত সাত-আট রকমের কথা বলে খাঁটির চেয়েও খাঁটি মধুর যশোরি ভাষায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শেডে।

'আলাল', 'হুতোম', 'পরশুরাম' পেরিয়ে এ-যুগে এলে পাচ্ছি দু জন লেখক যাঁদের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে। অবধূত জানেন খাস কলকাত্তাই কিন্তু এ-কলকাত্তাই হুতোমের কলকাত্তাই নয়, কারণ এর থেকে বহু আরবি-ফারসি শব্দ উধাও হয়ে গিয়েছে, ইংরেজি ও হিন্দি ঢুকেছে এবং অভাব-অনটনের ভিন্ন জীবন প্যাটার্ন নির্মিত হওয়ার ফলে এত নতুন ইডিয়ম সৃষ্ট হচ্ছে— এবং গজেন্দ্র মিত্র জানেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঘরোয়া মেয়েলি ভাষা। যত দিন সাধুভাষা চালু ছিল ততদিন এ দুটোর অল্পই কদর ছিল, কিন্তু চলতি ভাষা— সে-ও প্রধানত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা— কল্‌কে পেয়ে আসর জমানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর চাহিদা বাড়বেই। জনগণের কথ্য ভাষার শিকড় দিয়ে লিখিত ভাষা যদি নিত্য নিত্য প্রাণরস আহরণ না করে তবে সে একদিন শুকিয়ে গিয়ে 'ডেড ল্যান্‌গুইজ্‌' হয়ে যায়— সংস্কৃত, লাতিনের বেলা যা হয়েছিল, এ-দেশের 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে'র যা হয়েছে। তাই বাংলা থেকে সাধুভাষা বর্জন করে আমরা ভালোই করেছি। ভাষাটির কাঠামো ছিল ঢাকার কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রচলন হল মেট্রপলিস্‌ কলকাতায়। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম এঁদের সকলেই রাঢ়ি ও কর্মভূমি কলকাতায়। এঁরা ঢাকার শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ, বচন-ভঙ্গি আমদানি করতে পারেন না, আবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এসব মাল—পূর্বে যাকে বলেছি 'শিকড় দিয়ে প্রাণরস আহরণ করা'— সাধুভাষার সঙ্গে ঠিক জুৎসই লাগসই হয় না, ফিট্‌ করে না। এখন সে অসুবিধা ঘুচেছে। (ঢাকা মেট্রপলিস্‌ হতে চলল— সেখানকার লেখকরা যদি সাধুভাষাতে প্রাণরস সঞ্চার করতে পারেন তবে সে-ও নবীন পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হবে)।

কিন্তু এহ বাহ্য।

অবধূতের আনাগোনা বাঙলা দেশের বাইরেও বটে। বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে' যাদের সঙ্গে আমাদের ভবঘুরে প্রতিনিয়ত কথা বলছেন তারা বাঙালি নয়, অথচ বাংলার মারফতেই তাদের চরিত্র convincing করতে হবে। সে আরও কঠিন কর্ম। কিন্তু লেখক যে রকম

গোড়ার 'মজুমদার' 'রায়সাহেবের "ঘোড়ার" পিঠে চড়া', 'সুবাসী দিদি' কলকাত্তাইদের ফুটিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমনি অবাঙালি 'অমরনাথ' 'জুলিমেম' এবং আরও গণ্ডায় গণ্ডায়। ভাষা করায়ত্ত থাকলে হাতিকেও বাংলা বলানো যায়।

অবধূতের প্রতিটি গ্রন্থ পড়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ-লোকটি কিসের সন্ধানে দুনিয়াটা চষে বেড়ায়? তার পায়ে চক্কর আছে সে তো বুঝি, এবং বলা উচিত কি না জানিনে— তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়ে খবরটা পেয়েছি যে, তিনি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে সে-তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। কিন্তু তান্ত্রিক একবার পথ পেয়ে গেলে তো ঘুরে বেড়ায় না! গ্যোটে বলেছেন, চরিত্রবল বাড়াতে হলে জনসমাজে যাও; জিনিয়াসের সাধনা করতে হলে নির্জনে, একাগ্র মনে। আমার মনে তখনই প্রশ্ন জেগেছে, 'আর যারা সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ঘোরে?' বরদার মহারাজ আমাকে বলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় প্রতি শনিবারের সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে নর্মদার পারে পারে (হিমালয়ের পরেই নাকি সেখানে ওঁদের পরিক্রমা-ভূমি) ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ পেয়েও ছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর করুণ কাহিনী পাঠক উপেন বাঁড়ুয্যের অদ্বিতীয় পুস্তক 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় পাবেন। এঁকে আনা হয়েছিল বারীন-উল্লাস-উপেনদের চরিত্রবল গড়ে দেবার জন্য। কিছুদিন এঁদের সঙ্গে থাকার পর ইনি প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় করেন, বিপ্লবীদের ভয়াবহ পন্থা পরিত্যাগ করতে। এঁরা যখন কিছুতেই সম্মত হলেন না তখন তিনি, সেই মুক্ত পুরুষ, শব্দার্থে সজল নয়নে বাগানবাড়ি ছেড়ে চলে যান। যাবার সময় অতিশয় দুঃখের সঙ্গে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান সেটা আন্দামানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না, অবধূত খুব সম্ভব এরকম একটি লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বা ঘুরে মরছেন। বিবেকানন্দ এ রকম লোক পাননি— বরঞ্চ অন্যেরা, তিনি কিছু পেয়েছেন কি না, তার সন্ধানে লেগে যেত— এবং রামকৃষ্ণ মুক্ত পুরুষ হলেও এ ধরনের লোক নন। তিনি তো সর্বত্রই লোকচক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত। তাঁর সন্ধানে বেরুনো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে তো আমাদের কাজ চলে না। তিনি জীবন্মুক্ত। ছেলেবেলা থেকেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। আমরা খুঁজি এমন একজন, যিনি পঞ্চাশবার ফেল মারার পর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। আমরা ফেল করেছি আড়াইশো বার। তিনিই বুঝবেন আমাদের বেদনাটা কোন্‌খানে। যে সাধক সাধনার পথে খানা-খন্দে পড়ে হাড়-হাড্ডি গুঁড়িয়েছেন তিনিই তো শুধু আমাদের 'খবরদার! হাফিজ্!' চিৎকার করে আগে-ভাগে হুশিয়ার করতে পারেন।

কিন্তু কেন এই না-হক্ক মানুষের সন্ধানে হয়রানি?

উত্তরে সর্বদেশের গুণীজ্ঞানী মানী-অভিমানী তত্ত্ববিদের সেরা বলেন, ভগবানের মহত্তম সৃষ্টি মানুষ, অতএব মানুষের সন্ধানে বেরুতে হয়। চণ্ডীদাসও বলেছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। উত্তম প্রস্তাব। অবধূতও বলেছেন, এই বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে'ই— 'হিমালয়ের পথ ঘাট মঠ মন্দির নিয়ে বিস্তর লেখা হয়ে গেছে। সেইসব গ্রন্থ পাঠ করলে হিমালয় সম্বন্ধে জানতে বাকি থাকে না কিছুই। সুতরাং আর একবার হিমালয়ের পরিচয় দিয়ে লাভ কী! তার চেয়ে হিমালয়ের মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলে নিই আমি। অনেকের কাছে

www.pathagar.com

হিমালয়ের সব থেকে বড় আকর্ষণ হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীরা। আমি চেষ্টা করছি এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানতে। (কারণ) অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ।'[৩] (এর পর অবধূত আরও তিনটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য রচনা করে মনে মনে প্রশ্ন শুধিয়েছেন বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কিংবা উভয়ই, কিন্তু সে-প্রশ্ন, সে বিস্ময় নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মতো ভাষার জউরি প্রথম যে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ওই দিয়েই তিনি কর্ম সমাধান করতে পারতেন, অথচ কেদার বদ্রীর পথে গঙ্গা যমুনার এমনই হুহুঙ্কার যে নিদেন তিনটি বার চিৎকার না করলে মানুষ নিজের গলা নিজেই শুনতে পায় না)।

ফারসিতে একটি দোঁহা আছে :

'কুনদ্ হম্ জিন্স্ ব্হস্ পর্ওয়াজ্'
কবুতর ব্ কবুতর বাজ্ ব্ বাজ্।'

'The same with same shall take its flight
The dove with dove and kite with kite'

'স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা; শিকরে শিকরে লয়ে।'

অতএব হিমালয়ের হোক বা পৃথিবীর অন্য যে কোনও স্থলেরই হোক, সাধু-সন্ন্যাসীদের চিনতে হলে তাঁদেরই একজন হতে হয়। অবধূত এ বাবদে তাঁর একাধিক গ্রন্থে এ তত্ত্বটির উল্লেখ করেছেন। এই সর্বজনীন গণতন্ত্র আমাকেও আনন্দ দেয়। লন্ডনের এক প্রাতঃস্মরণীয়া সমাজসংস্কারিকা নারী যখন দেখলেন যে, পতিতাদের জন্য তিনি কোনও সেবাই করে উঠতে পারছেন না, তখন তিনি তাদেরই সমাজে প্রবেশ করলেন। (আশা করি কেউ অন্যায় সন্দেহ করবেন না, যে আমি সাধুসন্ন্যাসী, পীর-দরবেশ ও পতিতাদের একপর্যায়ে ফেলছি। এই অধমের পরিবারের মাত্র শতবর্ষ পূর্বেও রীতি ছিল যে সর্বকনিষ্ঠকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যেতে হত)। মহিলাটি শেষ পর্যন্ত সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর সে-সমাজ ত্যাগ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটি অতুলনীয়, অমূল্য।

অবধূত মৌনব্রত, অজগরব্রত, পন্‌ছিব্রত[৪] সবই করলেন।

---

৩. শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবধূত সাতিশয় শ্রদ্ধা করেন, এ-কথা আমরা জানি কিন্তু ক্ষণে বিশ্বাসী, ক্ষণে agnositic ক্ষণে nihilist, ক্ষণে কী, ক্ষণে কী না— মা কালীই জানেন— এই লোকটির ধোঁকা যায় না, ঠাকুরের সর্বনীতি বাবদে। বলছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "সব মতই মত সব পথই পথ।" বিদুর বাবার পথটা কী জাতের পথ তা আমি দেখেছি। ও-পথে ভগবানকে পাওয়া যায় না, শয়তানকে পাওয়া যেতে পারে!' "নীলকণ্ঠে' পৃ. ১৬৯/৭০।

৪. অজগর আহার সংগ্রহের জন্য কোনও প্রচেষ্টাই করে না— এর বিরুদ্ধ মতবাদ আমি দক্ষিণ ভারতে শুনেছি। একাধিক গুণী বলেন, সে নাকি বড় মধুর শিষ দিয়ে পশুশাবক, এমনকি অত্যধিক কৌতূহলী বালকবালিকাকে আকর্ষণ করতে পারে।

www.pathagar.com

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যামো সঠিক চিনতে পারলেন প্রজ্ঞানাথ। সার্থক তাঁর নাম। প্রজ্ঞাবলে বলে দিলেন 'তোমার পথ আলাদা। হয় তুমি নিশ্চিত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে, নয়তো ছুটে বেড়াবে।' আর যোগাভ্যাস বাবদে বললেন, 'তোমার জন্য ওই নাক-টেপাটেপি নয়, তোমার ধাতে সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়াবে।'

সেই ভালো। নইলে তাঁর অবস্থা বিশ্বকবি বর্ণিত 'ঘোড়া'র মতো হয়ে যেত। 'অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়ায়; এ দৌড়ায় বিনা কারণে, যেন তার নিজেরই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পর "না" হয়ে যাবে।"

'না' হয়ে গেলে (নত্বং, নাহং, নায়ং লোকঃ) 'নীলকণ্ঠ' লিখত কে!

কিন্তু আমরা ভুল করছি না তো?

স্পষ্ট দেখতে পারছি তিনটি 'অবধূত'। যে অবধূতকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, যে অবধূত বই লেখেন এবং যে অবধূত লাট্টুর মতো চক্কর খায়। তিন জনাই কি একই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই নয়। অন্তত তৃতীয় অবধূতকে দ্বিতীয় অবধূতের সঙ্গে গোবলেট করলে দু জনারই প্রতি ডাহা অবিচার করা হবে। বহু সার্থক লেখক প্রথম পুরুষে রসসৃষ্টি করেছেন; তাই বলে কি লেখক ও তাঁর 'আমি' চরিত্র একই ব্যক্তি? ডি ফো আর রবিনসন, সুইফট আর গালিভার কি একই ব্যক্তি? এমনকি এই নীলকণ্ঠেই তিনি যে একাধিকবার আত্মচিন্তা করতে করতে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন সে পরিচয়ের সঙ্গে লেখক অবধূতের কি সবসময় মিল আছে?

বিশেষ করে আমি একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফারসি অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে— সার্থক রস-সৃষ্টি করতে হলে চাই শনাখ্‌তন্‌-ই-হদ্দ-হর্‌চিজ্'। অর্থাৎ শনাক্ত করতে পারা (শনাখ্‌তন্‌) প্রত্যেক বস্তুর (হর্‌চিজ) সীমা (হদ্দ)'[৫] তার বিগলিতার্থ; প্রচণ্ডতম আত্মসংযম। বার বার ভুলে যাই আমরা 'সব কিছু বলতে গেলে কিছুই বলা হয় না'; বার বার প্রলোভন[৬] আসে, আরও একটুখানি বলে নিই; তা হলে কেচ্ছাটার আরও জেল্লাই বাড়বে। শৈলী ভাষা বাবদে পার্ফেক্ট্ আর্টিস্ট হাইনে পর্যন্ত প্রথম যৌবনে এ-প্রলোভন থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর গুরু, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, আলঙ্কারিক বারন (ব্যারন্) ফন্ শ্লেগেলের কাছে তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'এ কী! তোমার বল্লভার গালে অতগুলো তিল দিয়েছ কেন?' হায়, আমরা বার বার 'হদ্দ শনাক্ত' করতে পারিনে, ভাবি তিল যখন সৌন্দর্য বৃদ্ধি[৭] করে তখন এঁকে দিই মানসসুন্দরীর গণ্ডদেশে গণ্ডাদশেক তিল!

পূর্বে লিখিত কোনও কোনও অনবদ্য গ্রন্থেও অবধূত মাঝে-মধ্যে ভুলে যেতেন 'স্টপ্ ইটিং হোয়াইল ইট্ ইজ্ টেস্টিং!'— অর্থাৎ খাঁটি বাঙালির কৃত্রিম 'উচ্ছ্বাস' থেকে তিনি সবসময় নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি— বস্তুত তাঁর সবচেয়ে মশ্‌হুর কেতাবেই সবচেয়ে বেশি

---

৫. 'রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়।'— রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ. ২৮৪। পুনরায়, 'প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই।' সমপুস্তক, পৃ. ২৬০।

৬. 'লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না।' পৃ. ২৬০।

৭. হে শিরাজী, হে সুন্দরী, হে তরুণী সাকী/এমনই হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি।
তব কপোলের ঐ ক্ষুদ্র তিল লাগি/বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি ॥

www.pathagar.com

চন্দ্রশেখরীয় 'উদ্‌ভ্রান্ত' উচ্ছ্বাস— কিন্তু 'নীলকণ্ঠে' তিনি যে পার্ফেক্ট্ ক্যাডেন্‌স্ অব্ রেস্ট্রেন্‌স্ দেখিয়েছেন, সেটি আজকের দিনের কোনও বাঙালি লেখকই দেখাতে পারবেন না। এবং এই 'হৃদ্দ শনাক্ত করাটা' তিনি 'নীলকণ্ঠে' করেছেন অবহেলে, অক্লেশে। যেন ভানুমতী কড়ে আঙুল দিয়ে লৌহ ত্রিপিটক অদৃশ্য করে দিলেন— ছাতি না ফুলিয়ে, মাস্‌ল্ না বাগিয়ে, ঘেমে নেয়ে কাঁই না হয়ে। এই এফর্টলেসনেস পৃথিবীর সর্বকর্মক্ষেত্রেই চরমতম কাম্য।

হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলে আছেন যোগীবর, আরেক উলঙ্গ যোগী গড়াগড়ি দিচ্ছেন বরফের উপর, নায়ক স্বয়ং পেরিয়ে গেলেন মারাত্মক ধস্, তার পর সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত— পাঠক সর্বক্ষণ শুধোচ্ছে কী করে হল, তার পর কী হল? 'নো রিপ্লাই? সে কি মিসি বাবা!' এমনকি কলির কেষ্ট ঠাকুর— 'অ! কন্ কী কর্‌তা? আমাগো লাঙ্গুলবারিয়ায় জিতেন সাধুর নামডাও শোনেন নাই কানে— পোড়াকপাল— ' বসমতী যশোবতী গুজরাতি (জাতে 'পরেখ'— 'বাংলা 'পরখ', পরশপাথর থেকে— ঠিক পরখ করে চিনে নিয়েছে সচ্চা মাল) ফরাসিতে যাদের বলে 'ভোরাইও'র এস্থলে 'মাজোকিট ভোয়াইওর'—[৮] একমাত্র প্যারিসেই যাঁরা অজ্ঞাতবাসে ঘাপটি মেরে থাকেন, তাদেরই এক মহাপ্রভু দৈবযোগে হয়ে গেছেন নীলকণ্ঠে এসে মঠের মোহান্ত— ইনিই তা হলে নীলকণ্ঠের নীল গরল— এবং গণ্ডায় গণ্ডায় কত সাধু কত চোট্টা কত সাধারণ জন, কত মাছি কত পিসু। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করেছে কেদারনাথ দর্শনাভিলাষিনী পুণ্যশীলা মেমসায়েব জুলি আর তার স্বামী এন্‌ড্রেন্। আমি হিন্দু নই, কেদারবদ্রী দর্শন করলে আমার অশেষ পুণ্য হবে, এ-ফতোয়া আমার তরে নয়, কিন্তু মনে করুন, আমি যদি কেদার যাবার জন্য স্বপ্নাদেশ পাই, আর ত্রিযুগীনারায়ণ পেরিয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছনো মাত্রই ঝাড়া তিন দিন ধরে চলে ঝড়, বজ্রপাত— তাঁবু পর্যন্ত উড়ে চলে যায়— 'হাজার হাজার দৈত্য রে-রে করে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে যেন'— কী! 'বিধর্মী চলেছে মহামহিম (লর্ড)[৯] কেদারনাথকে

---

৮. সব দেশেই এক রকম লোক আছে যারা পাপাচারের এমনকি অনৈসর্গিক পাপাচারের নিষ্ক্রিয় 'দর্শক'রূপে আপন কাম চরিতার্থ করে। ফরাসিতে 'দেখা'='ভোয়ার', 'দর্শক' 'ভোয়াইওর'— (আমরা 'দৃশ্' থেকে 'দ্রষ্টা', ইংরেজ to see থেকে seer ভবিষ্যৎদ্রষ্টা' মুনি ঋষির জন্য ব্যবহার করি, ফরাসিতেও সেরকম 'ভোয়ার' থেকে 'ভোয়াইওর' সদর্থে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি— সেখানে Vovant = 'ভূতভবিষ্যৎ দ্রষ্টা' এবং Clairvoyant=clear-seer সমস্যাটিও আমরা চিনি। ফরাসি ভাষায় বাঙালি পড়ুয়া যেন দুম্ করে কোনও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাজনকে 'ভোরাইওর' না বলে বসে! Romain Rolland, on, C'est un grand voyeur!' বলে এক গুজরাতি নিরীহ সজ্জন প্যারিসের ফরাসি সমাজকে প্রথমটায় স্তম্ভিত করে দেন; পরে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঠাঠা করে অট্টহাস্য তোলেন এবং এই সম্প্রদায়ের কামনা— শব্দার্থে— পূর্ণ করার জন্য প্যারিসের 'অন্ধকার' অংশে প্রচুর প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু টিকিট এতই আক্রা যে অধীন সরেজমিন তদন্ত করতে পারেনি। এদের অন্যতম প্রোগ্রামে একজন আরেকজনকে বেধড়ক চাবুকও কষায়, পেরেকওয়ালা জুতো দিয়ে লাথি মারে, এবং নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা দেয়। এর গাহককে 'মাজোকিসই ভোয়াইওর' বলা হয় এবং একদা আরব ছোঁড়ারা প্রোগ্রামে প্রধান অংশ নিত বলে— হয়তো— 'ভোয়াইয়্যু' শব্দের অর্থ— 'স্ট্রিট আরব'।

৯. 'লর্ড' কেদারনাথ সম্বন্ধে আমার এক মুখুজ্যে ভাতিজাও লেখে 'ঠাকুর দেখতে তেমন কিছু না, কিন্তু সন্ধেবেলায় যখন ডিনারের ইভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন বড্ডই মাইডিয়ার দেখায়।' তবে কেদার না হয়ে ইনি পথমধ্যের অন্য কোনও "লর্ড"ও হতে পারেন।

www.pathagar.com

দর্শন করতে, এতখানি স্পর্ধা বুঝি নীলকণ্ঠের সহ্য হচ্ছে না।'— এবং সর্বশেষে 'বিরাট এক ধস্ নেমে কেদারনাথের তিন মাইল আগের রামওয়াড়া চটি লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে'— তখন আমার মনের অবস্থা কী হয়! বেচারি বিদেশিনী যবনী মেমসায়েব জুলির জীবনে এই দুর্দৈবই ঘটেছিল। একেবারে মুষড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ে— স্বামীকে বললে, 'চলো ফিরে যাই'। তার স্বামী অবধূতকে বলছেন, 'জুলি মনে করছে, লর্ড কেদারনাথকে দর্শন করতে হলে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত, ততটা পবিত্র আমি (স্বামী) নই।'

কেদারবদ্রী-গামীর কাফেলা তো চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছেই— তার এবং মানসাদি বহু তীর্থযাত্রীর বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিয়েছেন 'নীলকণ্ঠে'র বহু বহু পূর্বের বিস্তর 'জরিন-কলম' বাঙালি, ইংরেজি, জর্মন, ইতালিয়ান ইত্যাদি লেখক আপন আপন মাতৃভাষায়— কিন্তু নীলকণ্ঠে চলেছে অবধূতের বাছাই করা আরেকটি চরিত্রের কাফেলা, হেঁটমুণ্ড সাধক, যশোমতী, মেমসায়েব যাদের কয়েকজনের উল্লেখ এইমাত্র করেছি; কিন্তু হায়, অবধূত, রসসৃষ্টিতে 'দ্বন্দ্ব' কোথায় সেটা 'শনাক্ত' করে ফেলেছেন এবং আমাদের কৌতূহল যখন চরমে পৌঁছায়, আমরা কলরব তুলে শুধোই, 'এটা কী করে হল? তার পর কী হল?' তখন তিনি মৃদু হাস্য করে স্টপ্স্ ইটিং বিকজ ইট ইজ টেস্টিং। মাথা চাপড়ে বলতে ইচ্ছে করে 'পোড়া কপাল আমাগো। লাঙ্গুলবারিয়ার জীতেন সাধুর লগে লগে আর বেবাকগুলির নামডাক ভি ভালো কইরা বুঝাইয়া কইলা না, কর্‌তা!'

কটাক্ষ করা এ-পাঠকের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, কবিগুরু কি ক্লেরভইয়াঁসের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর পরিনির্বাণের স্বল্পকাল মধ্যেই এই গৌড়ভূমিতে তিন-তিন হাজারি পাঁচ-পাঁচ হাজারি পাতার মনসব নিয়ে পিলপিল করে বেরুবেন উপন্যাসের আমীর-ওমরাহ-কেতাব নয়, পুঁথি নয়, আস্ত এক-একখানা ইঁটের থান, না তারই পাঁজা হাতে নিয়ে— এবং এদেরই উদ্দেশে বলেছিলেন 'মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলছে। কিছুতেই তাল পৌঁছচ্ছে না শমে।'[১০] অবধূত শমে পৌঁছতে জানেন। তিনি-নিজেই এক জায়গায় আধারহস্যছলে বলেছেন— কারণ সোজাসুজি ধর্মোপদেশ তিনি দেন না, নীতিও প্রচার করেন না— 'সাক্ষাৎ অমৃত কি না! খাঁটি অমৃত কি আর তাড়ির মতো ভাঁড় ভাঁড় খেতে হয়?' কারণ এর হদিস্-সবুত রয়েছে তাঁর, আমার, আপনার গুরু রচিত পাতঞ্জলের যোগসূত্রের ন্যায়সাহিত্যের সূত্রাবলিতে : 'উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায় অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্য।'[১১] এ তত্ত্বটি বুঝে নিলে অবধূতের বাক্‌সংযম পাঠককে গভীরতম আনন্দ দেবে— আপনা কল্পনাজাল বোনার পথ দেখিয়ে দেবে।

এ-বাবদে শেষ প্রশ্ন : নীলকণ্ঠে তথাকথিত অলৌকিক কারখানা, ধর্মের নামে নিকৃষ্টতম পাপাচার, লাঙ্গুলবারিয়ার জীতেন সাধুর পন্থা, 'মাজোকিস্ট ভোয়াইওর' বিদুর বাবার পন্থা— পাতার পর পাতায় প্রাচীন নবীন একটার পর আরেকটা সমস্যা যেন পান্ডোরার কৌটো থেকে বেরিয়ে— ওই কালীকমলীচটির বেশুমার ছারপোকারই মতো— চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং সর্বাপেক্ষা মহামোক্ষম সমস্যা যেটি স্বয়ং অবধূতই তুলেছেন তিনটি শব্দ দিয়ে, যদ্যপি

১০-১১. রবীন্দ্রনাথ, সমগ্রন্থ

www.pathagar.com

একটিই যথেষ্ট হত (তাজ্জব মানতে হয়, লোকটা কী সরল, কী 'নাইফ' এরকম সিংহের গহ্বরে মাথা গলায়!) এবং যার উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি সেটি আবার বলি— শোনা জিনিসই মানুষ ফের শুনতে চায়— 'অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা হলেন পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ।' তার পর বলছেন, 'সত্যিই কি তাই!' (তিনি অনায়াসে প্রথম শব্দটি মাত্র দিয়ে, তা-ও শেষের 'ই'টি খারিজ করে দিয়ে লিখতে পারতেন, 'সত্যি!'— কারণ ফারসিতে বলে দানিশমন্দ্‌রা এক হর্‌ফ্ ব্যস আস্‌ত্— 'বুদ্ধিমানের জন্য একটিমাত্র হরফই যথেষ্ট— সমুচালফ্‌জ্ এন্তের (লজ্জো) তক্‌ফাজিল-ফজুল— বস্— এন্তের।' কিন্তু আমার মতো অগা পাঠকও এন্তের। আমার মাথায় নিদেন তিনটে শব্দের তিনটে ডাঙশ মারলে তবে কি না একটা শব্দ মগজে সিঁধিয়ে ঘিলুর ঘিয়ে ভাজা হয়)।

সে-প্রশ্নের উত্তর? সে-সমস্যার সমাধান? এবং বাদবাকিগুলো?

এবার আর 'ফোনের মিসিবাবা' না— এবারে উচ্চতর পর্যায়ে যাই। বিচারপতি পন্টিয়ুস্ পিলাটুসের ('জেস্টিং পাইলেট') সওয়ালে খ্রিস্ট যখন বললেন, 'আমি এসেছি সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে।' তখন পিলাটুস্ শুধোলেন 'সত্য কী?' হোয়াট ইজ ট্রুথ? এবং খ্রিস্ট কোনও উত্তর দেবার পূর্বেই (উত্তর পাবেন কি না তার প্রতীক্ষা না করেই) কেউ কেউ বলেন, স্মিতহাস্য করে বিচারালয় ত্যাগ করলেন।[১২]

এখানেও তাই। অবধূত শুধোচ্ছেন বা/এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, 'সত্যি?' এবং ওইখানেই দিলেন খতম করে। কিংবা মুলতুবি— 'সিনে ডাইই'। কেন?

আবার তা হলে গুরুপদপ্রান্তে বসি। তিনি প্রব্‌লেম ও তস্য 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ', আকছারই দম্ভে প্রকম্পিত সলুশন্-বিজড়িত কাব্য উপন্যাসাদি সম্বন্ধে বলছেন, 'মেঘদূত কাব্য থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্যভাবে গৌণ।... কাব্য হিসেবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসেবে প্রব্‌লেম হিসেবে (আমার সমস্যা হিসেবে) ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পর স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্‌লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্‌লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকেই সম্পূর্ণ করা তার কাজ। প্রব্‌লেমের গ্রন্থিমোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়'।[১৩] অবধূত এ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। নীলকণ্ঠ তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

---

১২. আসলে পিলাটুস উচ্চশিক্ষিত খানদানি রোমবাসী, ইংরেজ ভাইসরয়দের মতো পরাধীন ইহুদিদের ওপর শাসন করতে এসেছেন জেরুজালেমে। তাবৎ গ্রিকদর্শন তাঁর নখাগ্রদর্শনে এবং সোক্রাতেস যখন প্রশ্নে প্রশ্নে তথাকথিত পণ্ডিতজনকে না-জবাব করে দিতেন এবং পণ্ডিত শেষটায় বিভ্রান্ত হয়ে শুধাত, তা হলে তুমিই বল "সত্য কী?"— সোক্রাতেস তখন মৃদুহাস্য করে চলে যেতেন বা বলতেন 'আম্মো জানিনে'! এ-সব তত্ত্ব পিলাটুস জানতেন, এবং আরও ভালো করেই জানতেন, ইহুদিদের ভিতর দর্শনের কোনও চর্চা নেই। তাই 'সত্য'-এর স্বরূপ নির্ণয় তিনি রাস্‌টিক, সরল-বিশ্বাসী খ্রিস্টের কাছ থেকে চাননি।

১৩. পুনরায় 'ইব্‌সেনের নাটকগুলো তো একদিন কম আদর পায়নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসেনি?' 'সাহিত্যের মাত্রা', সমগ্রন্থ পৃ. ২৬০।

www.pathagar.com

উত্তম গ্রন্থের চুম্বক দেওয়া, বিশ্লেষণ করা, 'তুলনাত্মক সাহিত্যের' দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাকে ওই 'জায়'-এর আর পাঁচখানা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন; পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় মাত্র। কিন্তু সে-পরিচয় দেওয়ার সময়েও লেখক— অবধূতের সর্বকালীন ও আমার জানা মতে তাঁর সর্বাগ্রগণ্য গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে— এ-পরিচিতি দেবার হক্ক আমার একান্ত, অন্তত সেই কারণেই— অধমের মনে ধোঁকা লাগে, মিছরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তার সুতোটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি না তো? কে জানে, আমি যে-সূত্রটি ধরে এ-পরিচিতি পেশ করেছি সেটা অতি অবশ্য সূত্র বটে, কিন্তু হয়তো ওই মিছরির সুতোরই মতো! সুতো চিবিয়ে তো কোনও পাঠক মিছরির রস পাবেন না! সান্ত্বনা এইটুকু যে, বহুশত বছর ধরে অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকমণ্ডলী কালিদাসের পরিচিতি দিতে গিয়ে লিখেছেন— এবং সেটিকে অজরামর করার হেতু গদ্যে প্রকাশ না করে শ্লোকাংশে বেঁধেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। তাঁদের মতো অমুকের কাছে যাও 'পদলালিত্যের' জন্য, অমুকের কাছে যাও 'অর্থগৌরবে'র তরে— আর কালিদাস?— ওহ্! তার 'উপমাটি' উত্তম; এবং তাঁদের শেষ সুচিন্তিত আপ্তবাক্য, সর্বগুণসম্পন্ন কবি কিন্তু মাঘ! আজ আমরা জানি, সুদ্ধমাত্র তুলনার বাহাদুরি দেখিয়ে কেউ মহৎ কবি হতে পারেন না— উত্তম তুলনা দিতে পারা গুণটি অলঙ্কারশাস্ত্রপেটিকাসঞ্চিত একটি নিরাড়ম্বর অলঙ্কার মাত্রই, এবং এ সাদামাটা তুলনা-অলঙ্কারের কথা দূরে থাক, সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিয়েও কুরূপাকে সুরূপাতে পরিবর্তিত করা যায় না— কালিদাস ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন অলঙ্কারাতীত বিশ্বকর্মা, তুলনা-নির্মাণে দক্ষতা ছিল তাঁর সামান্যতম কৃতিত্ব।...তাই এ-স্থলে আমি যে পরিচিতি দিলুম সেটা হয়তো কালিদাসের বেলায় গোড়াতে যে-রকম হয়েছিল সেই রকম নিতান্তই আত্যন্তিক, ঐকান্তিক, অবান্তর, গুরুত্বহীন পরিচয়। কিন্তু ভরসা রাখি, কালিদাসের মতো বিশ্বকর্মা না হয়েও অবধূত ভবিষ্যতে একদিন কালিদাসের মতো সুবিচার পাবেন, কারণ ন্যায়াধীশ-মহাকালের সম্মুখে সবাই সমান।

মহাকালের দরবারে কালিদাস অবধূত বরাবর— এ কথাটা আমাকে পুনরায় বলতে হল। কারণ আমি জানি, একাধিক জন, এমনকি অবধূতের গুণী গাহকও ঈষৎ ভ্রু কুঞ্চিত করে শুধোবেন, আমি যে এক নিশ্বাসে চেখফ্, কালিদাস ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে অবধূতের নামোচ্চারণ করি তার অর্থ কি এই যে, আমার মতে এঁরা সবাই সমগোত্রের! এর উত্তর যে কোনও অদ্য দিনের চোদ্দ ক্যারেটের আলঙ্কারিক, যে কোনও বটতলার চতুরানন চতুর-আনী মোক্তার চতুর্মুখে চতুর্ভদ্র সাফাই গাইতে পারবেন কিন্তু আমার এ সবেতে কোনও প্রয়োজন নেই। অধীনের নাক বরাবর অতিশয় সুচিন্তিত তথা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নিবেদন মাত্র একটি : অবধূত কেন, তাঁর চেয়ে শতগুণে নিরেস কোনও কবিকেও যদি আজ অধিক পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং প্রয়োজন-অনুরোধে তৃতীয় পক্ষের দোহাই কেটে তাঁকে/তাঁদেরকে আবাহন জানাতে হয়, তবে কি আমি বে-ওক্ফ নাদানের মতো স্মরণ করব পাড়ার আকাট যেদো-মেদোকে? না, গঙ্গাস্বরূপা তৃতীয় কন্যা মাতা কুন্তীদেবীর অনুকরণে স্মরণ করব ধর্মরাজ, পবমেশ্বর, বাসবাধিপতিকে? কালিদাস, চেখফ, রবিকবিকে? না, বিবাহবাসরের 'প্রীতি-উপহার'-রচক পোয়েট লরিয়েটকে, দাস্যমনোবৃত্তি-সঞ্জাত অধুনা-বিস্মৃত, ভি.আই.পি. কুলের চরম পদলেহনাবতার ভি.আই.পি'র ঘোষ 'কবি'কে? অবশ্য, অতি অবশ্য, যদি অবধূত মহাকালের মোকদ্দমা হেরে যান (যদ্যপি আমার বিশ্বাস ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে সাক্ষীরূপে

www.pathagar.com

না ডেকে যেদো-মেদোকে ডাকলে মক্কেল অবধূত মোকদ্দমা তো হারবেনই, এস্তক সুপ্রিমকোর্টে আপিল করবার তরে সার্টিফিকেট অবধি পাবেন না!) তবে সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি যে-কেস হাতে নিয়েছি সেটি মর্মান্তিক। কারণ অবধূত আমাকে বাংলা সাহিত্যের হট্টগোলের মাঝখানে তাঁর নাম সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করার জন্যে মোক্তার পাকড়াননি। বস্তুত আমিই সম্পূর্ণ, স্বেচ্ছায়, আপন খুদ্, খুশ-এখতেয়ারে, অবধূতের সত্য মূল্য নিরূপণার্থে, সাহিত্য আদালতের 'নিরপেক্ষ বন্ধু', 'আমিকুস্ কুরিআত্র্যা'রূপে অবতীর্ণ হয়েছি। সে-স্থলে হয়তো অবধূত বাধা দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এবাবদে সুবুদ্ধিমান বলে সাহিত্যিক, দেওয়ানি, ফৌজদারি সর্বআদালত এড়িয়ে চলেন। এটি 'এক্স পার্টি', এক-তরফা মোকদ্দমা।

কিন্তু আদালতের তুলনাটা কথায় কথায় উঠল। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ', রবিকবির 'যোগাযোগ' কোনও আদালত বিচার করবে না। নীলকণ্ঠও কোনও এজলাসের সম্মুখে দাঁড়াবেন না।[১৪] সাহিত্যে সর্বকালের সর্বজনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক পাঠক স্বয়ং। 'আদালতে'র বাইরে আমিও নগণ্য পাঠক। সে কিরে আমি এ-প্রস্তাবনার প্রস্তাবনাতেই একাধিকবার কেটেছি। এবং আমি অতিবৃদ্ধ পাঠক বলে একাধিক নবীন পাঠক আমাকে শুধোবে,

'নীলকণ্ঠ বইখানা ভালো?'

'অত্যুত্তম।'

'সর্বোত্তম?'

'এতাবৎ লিখিত বইয়ের মাঝে সর্বোত্তম, কিন্তু এ-কেতাব সর্বোত্তম হবে না, যদি ইটি সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে অনুপ্রেরণা না যোগায় যে এটাকেও পেরিয়ে গিয়ে তিনি আরও উত্তম কেতাব লিখতে পারেন।'

এবারে শেষ কথা।

'চেনা বামুনের গলে পৈতা কেন মিছে?'— ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। অবধূতের গলায় আমি আবার পৈতে পরাতে যাচ্ছি কেন— বিশেষত তিনি যখন উৎকৃষ্ট রাঢ়ি ব্রাহ্মণ? কিন্তু তিনি যে গেরুয়া পরেন এবং যতদূর জানি, গেরুয়া পৈতে দুটো একসঙ্গে পরা নিষিদ্ধ। তবু যে আমি নব 'পরিচিতি'র এই পৈতেটি তাঁর গণ্ডে জড়িয়ে দিচ্ছি তার কারণ তিনি মায়াজালে বদ্ধ হয়ে কিছুদিন ধরে আমাদের সঙ্গে বাস করছেন— তিনি যা করুন, করুন— আমাদের উচিত তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি-পরিচিতির পৈতেটি তাঁর সামনে নিবেদন করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লার কসম খেয়ে বলতে পারি, ওই-পৈতেটিও ভস্ম করে তিনি একদিন অন্তর্ধান করবেন— নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কিংবা ধূর্জটির জটায়। সেই পৈতেটি এই (এবং একমাত্র এই পৈতেটিই আমার চেনা এক নম্বরের অবধূত, দুই নম্বরের লেখক অবধূত ও তিন নম্বরের গ্রন্থের 'আমি' অবধূত তিনজনকেই একসঙ্গে পরানো যায়।

১৪. বছর কয়েক পূর্বে কিন্তু রসসমুদ্রে এহেন একটা টর্নাডো-ম্যালস্ট্রোম হব-হচ্ছে হব-হচ্ছে'র পাঁয়তারা কষছিল এমন সময় জানিনে কার হুকুমে শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। রীতিমত 'বিল' তৈরি হয়েছিল; ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সায়েব স্থির করে দেবেন, কোন্ নাটক উত্তম, অভিনয় করা যেতে পারে!

www.pathagar.com

তিন অবধূতেরই বোধহয় সবচেয়ে প্রিয় শ্লোক—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা করার প্রবৃত্তি, কুল, শীল তথা জাতের বড়াই'— এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। অত্যুত্তম প্রস্তাব। তাই 'নীলকণ্ঠে' দেখতে পাই, খেতে না পেয়েও তাঁর কষ্ট হচ্ছে না দেখে তিনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন— সন্ন্যাসীবর ক্ষুধা জয় করে ফেলেছেন! — পরক্ষণেই আনগ্ন গাত্রে বরফে গড়াগড়ি দিলেও তাঁর শৈত্য বোধ হয় না দেখে তিনি তো সপ্তম স্বর্গে। নীলকণ্ঠের উচ্চতর স্তরে যে দুটি সাক্ষাৎ কৃতান্তদ্বয়, দারুণ অন্নাভাব ও নিদারুণ শৈত্য, এ দুটিই— নামে অবধূত এখন সিদ্ধিতে অবধূত— জয় করে ফেলেছেন! এবারে তিনি টেলিফোন খুঁজছেন, লর্ড কেদারনাথের সঙ্গে একটা রাঁদেভু স্থির করে তাঁর সঙ্গে শেকহ্যান্ড করবেন বলে!

আর লজ্জা ঘৃণা ভয় ইত্যাদি সে তো অবধূত কবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন— পুস্তকে বিনয়বশত যা বলুক বলুক। আমি পুনরায় এক কোমর গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পৈতে স্পর্শ করে পাঁচপীরের কসম খেতে রাজি আছি।

কিন্তু হায়, অবধূত এ-পৃথিবীতে এসেছেন অশুভক্ষণে। তাঁর নির্ঘণ্ট দীর্ঘ, তিনি কোন্ কোন্ পাশ হতে মুক্ত হতে চান, তিনি কোন্ কোন্ রিপু জয় করতে চান! অনেকগুলি জয় করতে করতে তো উঠছেন তিনি উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর লোকে— চিত্তলোক এবং ইহলোক উভয়েতেই— পৌঁছেই গেছেন গরুড়চটি। সম্মুখে আর চড়াই নেই— কেদার ক্রোশমাত্র দূরে। অবধূত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিলেন। কিন্তু, হা-হতোস্মি, সকালে দেখেন এ কী! রাতারাতি হড়হড়িয়ে নেবে গেছেন যাত্রারম্ভস্থল দেবপ্রয়াগে!... আবার আরম্ভ হল নতুন করে রিপুজয় চিত্তজয় অজগর-পন্থা পক্ষী-পন্থা মারফত, আরোহণ করলেন না জানি আরও কত উচ্চ ভূমিতে। এবারে রাতারাতি হড়হড়িয়ে চুঁচড়োয়— হ্যাঁ, আমাদের এই চুঁচড়োয়!

কেন? কেন এ-দুর্দৈব?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস— অবশ্য অবধূত এবং বাঙালি পাঠক আমার সঙ্গে একমত না হলে আমি বিস্মিত হব না— তিন অবধূতে একজোটে যে-সব পাশ ছিন্ন করার মতলব নিয়ে সেগুলোর নির্ঘণ্ট নির্মাণ করেন তখন একটি পাশের কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। সেটি কী?

ইংরেজিতে বলে milk of human kindness। দুঃখীর প্রতি দরদ, অপমানিতের প্রতি সহানুভূতি, অত্যাচারীর প্রতি প্রকাণ্ড আক্রোশ (এমনিতে অবধূত রাগের পাশে বাঁধা পড়েন না)— এককথায় পীড়িত, বঞ্চিত, ধূলিলুণ্ঠিত জনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর বুক যেন বেদনাভরে, করুণাভারে ভেঙে পড়ে যেতে চায় (যে অবস্থায় পূর্ব বাংলার মেয়ে বলেছিল, 'ইচ্ছা করে, হৃদয়ডারে, গামছা দিয়া বান্ধি') কিন্তু থাক্, এটা গুছিয়ে বলবার মতো ভাষা আমার নেই।

এই মিল্ক্ অব্ হিউমেন কাইন্ডনেসের পাশ সম্বন্ধে না তিনি সচেতন, না তিনি তপস্যা করেন সেটা ছিন্ন করতে! তবে কি মুক্তপুরুষের হৃদয়ে আমাদের মতো বন্ধুজনের প্রতি

www.pathagar.com

করুণাধারা প্রবাহিত হয় না? অবশ্যই হয়। লক্ষগুণ বেশি হয়। কিন্তু তার পূর্বে মুক্ত হওয়ার জন্য এ-পাশও ছিন্ন করতে হয়।

কিন্তু আমি নিরাশ হচ্ছিনে। এই নীলকণ্ঠ হিমালয়েই, এই পথ দিয়ে যাবার সময়ই ক্ষুদ্রহৃদয়দৌর্বল্যবশত (Milk of human kindness!) ধর্মপুত্র স্বেচ্ছায়-সঙ্গী সারমেয়টিকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি। ধর্মরাজ তৎসত্ত্বেও তাঁর জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দেন। সেই ব্যত্যয় কি আবার হতে পারে? নীলকণ্ঠের উপাসক মাত্রই এর উত্তর দিতে ভয় পাবেন। আমি তাঁর উপাসক নই। আমি নিরপেক্ষ তৃতীয়পক্ষ। আমি নির্ভয়ে বলব, এই 'ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য' হৃদয়ে ধারণ করেই অবধূত নীলকণ্ঠের হৃদয়ে স্থান পাবেন। কিন্তু খ্রিস্ট সাধুর স্মরণে বলি, 'মোক্ষ? মোক্ষ নিশ্চয়ই চাই, প্রভু, কিন্তু not just yet!' অবধূতের মোক্ষটিও যেন বিলম্বে আসে। কারণ, পূর্বোক্ত খ্রিস্ট সাধু বলেছেন, তখন মুক্ত পুরুষ মৌন হয়ে যান। অবধূত পূর্ণ তিন বছর নীলকণ্ঠে মৌনব্রতী ছিলেন— আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ তার পর তিনি বাংলা সাহিত্য-মজলিশে তাঁর সাধনার ধন সঙ্গীতে পরিবর্তিত করে গান গাইলেন এক যুগ ধরে।

এবারে মৌন হলে সাহিত্যের সাধারণ পাঠক, সাধারণ 'মানুষ' বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ তিনিই গেয়েছেন—

'জয়, মানুষের জয়!'

এই একটিমাত্র জয়ধ্বনি আছে দগ্ধপৃথ্বীতলে, যে জয়ধ্বনিতে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি কৃষ্ণ কি শ্বেত সর্বমানুষ আত্মহারা হয়ে যোগ দেয়॥

ঈদ দিবস, ১৩৭২
সৈয়দ মুজতবা আলী

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি অবধূত বিরচিত "নীলকণ্ঠ হিমালয়" ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com